সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্দ্দশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—o—

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৪।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ আনা।

পরিষদ্-গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাতে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৬৫০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাকে প্রকৃতি করিয়াই বিজয়পণ্ডিতী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১।০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১।০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা—৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বক্তৃতা—৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগ ৸০

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর যক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীপর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

৺রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ *

সাধারণের বিশ্বাস যে, বৃটীশ সিংহের প্রভাব বিস্তারের সহিত বাঙ্গালায় ইতিহাস চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। এমনও অনেকে বলিয়া থাকেন যে মার্সম্যান অথবা ষ্টুয়ার্ট সাহেবই আমাদের জন্মভূমির প্রথম ইতিহাস লিখিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। এমন কি বঙ্গপল্লীর ইতিবৃত্তলেখক সুপ্রসিদ্ধ হণ্টর সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে এই সপ্তকোটীজন-পালিতা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির পরিচয় দিবার জন্য একজন জেনোফন বা একজন থুসিডাইডিস্ জন্ম গ্রহণ করেন নাই! প্রকৃত কি তাই! যে দেশ সভ্যতার চরম শিখরে একদিন অধিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের সভ্যতালোকে একদিন সিংহল, এমন কি ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আলোকিত হইয়াছিল—যে দেশের জ্ঞানালোকে তিব্বত, চীন, এমন কি জাপান পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ, যে দেশ শত শত ধর্ম্মাচার্য্যগণের লীলাস্থলী,—যে দেশের রাজভক্ত প্রজাগণের অসাধারণ বীর-কীর্ত্তি কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কল্হণ উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের ইতিহাস নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের ও বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হই-তেছে, যে বঙ্গবাসী একদিন জ্ঞানগৌরবে ও ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অক্ষয়লেখশিলাফলকে, কুম্ভোত্তির তাম্রপট্টে যে বঙ্গরাজগণের বীরত্ব ও কীর্ত্তিকলাপ আজও বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, তাঁহারা জাতীয় গৌরবের নিদর্শন ইতিহাসের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, তাহাও কি কখন সম্ভব?

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বঙ্গবাসী বড়ই ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন,—এখনও সেই অনুরাগের নিদর্শন একবারে লোপ পায় নাই! অনুসন্ধান করিলে বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই ইতি-হাসের প্রভূত মালমসলা বাহির হইতে পারে। কোন সমাজের উত্থান পতন, বিভিন্ন সময়ের রীতিপদ্ধতি এবং স্মরণীয় ব্যক্তিগণের নাম ও বংশানুচরিতকীর্ত্তন করাই ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, বহু প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুসমাজে ঐরূপ ইতিহাসের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। আমরা আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি যে, শ্রাদ্ধকালে

* বহরমপুরে যে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন হইবার কথা ছিল, সেই অধিবেশনে পাঠ করিবার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধ লিখিত। পরে সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয়। সা০ প০ প০ স০।

বা কোন উৎসবে ভারত ও পুরাণেতিহাস পাঠ করিবার নিয়ম ছিল। বাল্মীকীয় রামায়ণ-পাঠেও জানা যায় যে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহসভায় বর ও কন্যাপক্ষ হইতে তত্তৎ পূর্ব্বপুরুষগণের বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সুপ্রাচীন প্রথা ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনসমাজে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের মহাভারতপুরাণাদি, বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থ ও জৈনদিগের নানা পুরাণ ও পট্টাবলী হইতে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি—বঙ্গবাসী চিরদিনই ইতিহাসের সমাদর করিতেন, প্রতি জাতি প্রতি সমাজ ও প্রতি পল্লীর মধ্যে ইতিহাসচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল, ইতিহাসচর্চ্চা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, যে দিন হইতে বাঙ্গালায় ইংরাজপ্রভাব বিস্তৃত হইল, উচ্চ নীচ সকল সমাজে যে দিন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত হইতে চলিল, সেই দিন হইতেই বঙ্গবাসী প্রকৃত ইতিহাস-চর্চ্চায় বিমুখ হইলেন। সে সময়ের ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত বঙ্গসমাজের অবস্থা স্মরণ করিলে মনে বড়ই ক্ষোভের উদয় হয়; তাঁহারা রিচার্ড দি সেকেণ্ড বা হেন্‌রী দি ফিফ্‌থের চৌদ্দপুরুষের পরিচয়, অসভ্য কানিবলদিগের চরিত্রকথা অথবা রোম-সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের ইতিহাসপাঠই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের আপন দেশের, আপন সমাজের, এমন কি প্রতি শ্রেষ্ঠ ঘরের এক একখানি বিস্তৃত ইতিহাস আছে, সে কথা তাঁহারা এক কালেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ সমাজের ইতিহাসানভিজ্ঞতাহেতুই বিদেশী সাহেবেরা আমাদিগকে কতকটা অর্দ্ধসভ্য ইতিহাসানভিজ্ঞ জাতি মনে করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রকৃতই কি আমাদের জন্মভূমিতে জেনোফন বা থুসিডাইডিসের মত ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করেন নাই? আমি গৌরবের সহিত, স্পর্দ্ধার সহিত জানাইতেছি যে বঙ্গদেশে শত শত জেনোফন বা শত শত থুসিডাইডিস্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উজ্জ্বলকীর্ত্তির নিদর্শন এখনও খুঁজিলে যথেষ্ট মিলিতে পারিবে। বঙ্গবাসী স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্মপ্রেমিক, ভক্তি-প্রেমিক ও জ্ঞানপ্রেমিক। এই বঙ্গদেশ শত শত ধর্ম্মবীরগণের লীলারঙ্গভূমি। ২২ জন জৈন তীর্থঙ্কর, তাঁহাদের পরে ভগবান্ শাক্যসিংহ ও তদনুবর্ত্তী শত শত বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য এই বঙ্গদেশে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে এখানে নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। প্রায় ৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও রাঢ়দেশে নিবৃত্তিমূলক চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে অর্থাৎ আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ১৮শ বর্ষ কাল এই রাঢ়দেশে থাকিয়া রাঢ়বাসীকে ধর্ম্মমার্গে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তৎপরে ভগবান্ বুদ্ধদেবও অঙ্গ রাজধানীতে ভিক্ষু-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জৈন শ্রাবক ও বৌদ্ধশ্রমণদিগের প্রভাব খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঢ় ও গৌড়মণ্ডলে অব্যাহত ছিল। তৎপরে মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের সহিত ব্রহ্মণ্য-প্রভাবের সূত্রপাত হয়। এ সময়েও গৌড়বঙ্গে পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাব জন সাধারণের মধ্যে

আধিপত্য করিতেছিল। রণরঙ্গের রাজনৈতিক চিত্র সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যাভ্যুদয়ের সহিত জাতীয়তা রক্ষার দিকে তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহার অল্পকাল পরেই বর্দ্ধনবংশীয় শ্রীহর্ষদেব শশাঙ্ককে পরাজয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার পর শতাধিক বর্ষকাল তান্ত্রিক বৌদ্ধপ্রভাবই চলিয়াছিল। তৎপরে বৈদিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শূরবংশীয় প্রথম পঞ্চগৌড়েশ্বর আদিশূর উপাধিধারী মহারাজ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়।

এই সময় হইতেই গৌড়বঙ্গের জনসাধারণ মধ্যে একটী প্রতিকূল-স্রোত বহিতে আরম্ভ করে। এতদিন জনসাধারণ নিবৃত্তিমার্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুধ্যান করিতেছিলেন, এতদিন গৌড়বঙ্গ-সমাজে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তিচরিত্র, বৌদ্ধ ও জৈনাচার্য্যগণের গুরুপরম্পরা প্রভৃতি ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস পরিকীর্ত্তিত হইতেছিল, এতদিন তাঁহারা এক প্রকার সংসার-বৈরাগ্যের গাথাই সর্ব্বত্র শুনিতেছিলেন, বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদের সে চিত্র যেন পরিবর্ত্তিত হইল, সংসারের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়া নিবৃত্তির সেবা কতদূর ফলদায়ক, তাহারই চর্চ্চা চলিতে লাগিল। দুইটী প্রতিকূল-স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে অল্পদিন পরেই বৈদিক-সমাজের অধঃপতন বা পরাজয় সাধিত হইল। পালবংশের অভ্যুদয়ের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইল, গৌড়বঙ্গের আপামর সাধারণ তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলে শ্রেয়স্কর ও সহজসাধ্য ভাবিয়া পরম সমাদরে তান্ত্রিকধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই নব ধর্ম্মেরও দুইটী দিক্ ছিল, তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক। নব ধর্ম্মমতে—প্রবৃত্তিসাধনায় সিদ্ধ হইলে তবে নিবৃত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়। কিন্তু এই নবধর্ম্ম ভিক্ষু বা সাধকের উপযোগী হইলেও সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী হয় নাই। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্য্যগণ পালরাজসভায় তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা অসাধারণ ক্ষমতাশালী সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ মুমুক্ষু ভিক্ষুসঙ্ঘের কার্য্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু অনধিকারী সংসারীর হস্তে তাহার বিপরীত ফলে গৌড়বঙ্গ-সমাজে ঘোর অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই অনর্থ নিবারণ করিবার জন্যই অথচ তান্ত্রিকতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে গৌড়েশ্বর বল্লালসেন কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। এই সময়ে সেনরাজগণের কৌশলে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ নবাভ্যুদিত হিন্দুতান্ত্রিক সমাজে মিশিয়া গেলেন। হীনাচার হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ বৈদিকাচারে আনিবার জন্যই লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি সেনরাজগণ কএকবার সমাজ সমীকরণকল্পে কুলপদ্ধতি প্রচলিত করেন। সমাজকে উন্নত আদর্শে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়েই কুলমর্য্যাদার ও সমাজ-সমীকরণের সৃষ্টি। এই সময়ে যেন এক অপূর্ব্ব তাড়িত শক্তিপ্রভাবে আব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যেই স্ব স্ব আভিজাত্যের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছিল। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে সমাজের জনসাধারণ কেবল নিবৃত্তিমার্গ ও জ্ঞানের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বতন সমাজের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা স্ব স্ব সমাজরক্ষা ও ধর্ম্মপালনে অগ্রসর হইলেন।

পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ধর্ম্মবীরগণের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ ও দেবচরিত এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের গুরুপরম্পরারূপ বংশানুচরিত ইত্যাদি ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসেরই শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইত, মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে জাতীয় ইতিহাস রক্ষার দিকে সামান্ত দৃষ্টি পড়িলেও এবং মহারাজ আদিশূরের সময়ে বৈদিকসমাজের সুপ্রাচীন প্রথা অবিলম্বিত হইলেও সেনরাজগণের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অতিপ্রাচীন আর্য্যসমাজের আদর্শে সমাজনৈতিক ইতিহাসরচনা আরম্ভ হইল। নানা প্রাচীন জৈন গ্রন্থে বিবৃত তীর্থঙ্করমাহাত্ম্য, স্থবিরাবলী-চরিত, ভোট ও নেপাল হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধাচার্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপ, উত্তরবঙ্গে অদ্যাপি প্রচলিত মহীপালের গান, মাণিকচাঁদের গান ও গোপীচাঁদের গান প্রভৃতি সেই প্রাচীন গাথা বা ধর্ম্মেতিহাসের সামান্য নিদর্শন। নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিপ্লবে আমাদের জন্মভূমির ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস এক প্রকার বিলুপ্ত হইলেও—প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে এবং দেশ-প্রচলিত প্রাচীন গাথায় তাহার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র থাকিলেও আমাদের পূর্ব্বতন সমাজনৈতিক ইতিহাস এখনও বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বলিতে কি,যাহা অপর দেশে নিতান্ত বিরল,এমন কি নাই বলিলেই হয়, গৌড়বঙ্গে তাহাই সুপ্রচার। বাঙ্গালীর চিরদিন লক্ষ্য ছিল ধর্ম্ম ও সমাজের দিকে। শত শত দেশবৈরির আক্রমণে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইলেও—সহস্র সহস্র রাজনৈতিক সংগ্রামে গৌড়বাসী জয়শ্রী অর্জ্জন করিলেও রাজকীয় ইতিহাসের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাই গৌড়মণ্ডলে রাজনৈতিক ইতিহাস সেরূপ প্রচলিত হয় নাই। তাই আমরা রণক্ষেত্রের ইতিহাস—শোণিতপ্রবাহে ভাসমান বিভিন্ন রাজবংশের রাজনৈতিক কীর্ত্তিকলাপ—রীতিমত লিপিবদ্ধ দেখিতেছি না। তবে যে রাজনৈতিক ইতিহাস এ দেশে সর্ব্বকালেই একেবারে অনাদৃত ছিল, তাহা মনে করিতে পারি না। এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাস—রাজবংশ, রাজপুরুষ বা রাজানুগৃহীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শত শত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কীটদষ্ট পুথির মধ্য হইতে অতি অল্প সংখ্যক রাজেতিহাসের সন্ধান পাইয়াছি,—তন্মধ্যে নেপাল হইতে আবিষ্কৃত রামপালচরিত, শ্রীহর্ষের গৌড়োর্ব্বীশকুল-প্রশস্তি ও বিজয়-প্রশস্তি, বিক্রমপুর হইতে আবিষ্কৃত বল্লালোদয় এবং শ্রীহট্ট হইতে আবিষ্কৃত শ্যামলবর্ম্মচরিত উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইতে পারিলেও ঐ কয়খানি গ্রন্থ মধ্যে এক সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের কতক কতক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারিবে। কে বলিতে পারে ঐরূপ শত শত রাজচরিত যত্নাভাবে বিলুপ্ত না হইয়াছে ?

যাহা হউক, রাজনৈতিক ইতিহাস রাজসংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণে তাহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। সাধারণে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া আত্মীয় স্বজনপরিবেষ্টিত স্ব স্ব পল্লী মধ্যে স্ব স্ব সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন। স্ব স্ব সমাজের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধিতা রক্ষা, স্ব স্ব কুলধর্ম্মপ্রতিপালন এবং স্ব স্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরব কীর্ত্তন, এই কয়টী

বিষয়েই সাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ও মনোযোগ ছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালার সকল উন্নত সমাজেই বিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে অযত্নে অনাদরে সেই জাতীয় ইতিহাস আমরা নষ্ট করিতেছি, সেই প্রকৃত ইতিহাসের দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন। কেবল কতকগুলি রাজবংশের তালিকা এবং কোন্ বর্ষে কে কোথায় যুদ্ধ করিল, কোথায় কিরূপে জয় পরাজয় হইল, কেবল এই সকল ঘটনাকে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইতিহাস বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা প্রতি সমাজ, প্রতি জাতি, প্রতি গোষ্ঠী, এবং প্রতি শ্রেষ্ঠ বংশের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস আদরের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে এই বঙ্গ দেশে মহারাজ শশাঙ্কের সময় হইতে এক বিশাল সার্ব্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ রাজার আশ্রয়ে কোন্ স্থানে কোন্ সমাজের অভ্যুদয় এবং কিরূপে সেই সেই সমাজের বিস্তৃতি, পুষ্টি ও সমাজবন্ধন সাধিত হইয়াছে, কোন্ গুণে বা দোষে কোন্ সময়ে কিরূপে কোন্ সমাজের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে, কি সামাজিক নিয়মে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি বা দলপতি অথবা সমাজে উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছেন,—কিরূপ অসদাচরণে, কি কারণে সনাতন সদাচার বিসর্জ্জনে, কি প্রকার অনুদার নীতির অনুসরণে কোন্ কোন্ সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে, কোন্ সময়ে কিরূপ ধর্ম্মবিপ্লবে কোন্ কোন্ শ্রেষ্ঠ জাতি অধঃপতিত এবং কোন্ কোন্ হীন জাতি উন্নত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিবার ধারাবাহক সামাজিক ইতিহাস আমাদের আছে। সমাজের গতি, পদ্ধতি ও রীতি নীতির অনুসরণ করিয়া শত শত বঙ্গীয় জেনোফন বঙ্গীয় সমাজের সেই অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুসভ্য য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে সার্ব্বজনীন ইতিহাসের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেও আজও য়ুরোপীয় সমাজে যে ইতিহাস সঙ্কলনের সুযোগ আসে নাই—অর্থাৎ যাহা অপর দেশে নাই বলিলেই হয়, তাহা আমাদের আছে, ইহা কম গৌরবের বা কম শ্লাঘার কথা নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজপ্রভাব বিস্তারের সহিত আমরা সেই প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস-চর্চ্চায় বিমুখ হইয়াছি। আমাদের অমনোযোগিতায় ও অবহেলায় শত শত সামাজিক ইতিহাস নষ্ট করিয়াছি। তথাপি এই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হইতে ৮।১০ বর্ষের সামান্য চেষ্টায় আমি যে অতি সামান্য অংশ যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও আপনারা বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা প্রায় ৫০০ খণ্ডে বিভক্ত, ২০ খানি মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ হইবে। তাহা সাধারণতঃ কুলগ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি জাতি বা সমাজ নির্ব্বিশেষে ঐ সকল সামাজিক গ্রন্থ উপযুক্ত সমাজতত্ত্বজ্ঞের হস্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঐ সকল কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মূল পুরুষ কেহই এই বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী নহে। কি বৈদিক, কি অবৈদিক, কি কুলীন কি শ্রোত্রিয়, কি মৌলিক কি অমৌলিক, কি সিদ্ধ কি সাধ্য ব্রাহ্মণ হইতে নবশাখ পর্য্যন্ত সকল

জাতিরই এই বঙ্গদেশে আদিবাস নহে। কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, কেহ কান্যকুব্জ, কেহ বারাণসী, কেহ মগধ, কেহ মহারাষ্ট্র, কেহ দ্রাবিড়, কেহ মধ্যভারত, কেহ বা উৎকল হইতে আসিয়া এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার একই ব্যক্তির সন্তানগণ মধ্যে আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বৈলক্ষণ্যে, বিভিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমাজে আশ্রয় হেতু কেহ রাঢ়ীয়, কেহ বারেন্দ্র, কেহ বৈদিক, কেহ মধ্যদেশী, কেহ পাশ্চাত্য, কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ উত্তররাঢ়ী, কেহ দক্ষিণরাঢ়ী, কেহ বঙ্গজ, কেহ উত্তর বারেন্দ্র, কেহ দক্ষিণ বারেন্দ্র, কেহ পঞ্চকোট, কেহ মঙ্গলকোট, ইত্যাদি একই শোণিত ধারা বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নামে পরিগণিত হইয়াছে।

এ দেশে প্রথমাগত সম্মানিত ব্যক্তিগণের বসবাস স্থাপনের পর বংশানুচরিত কীর্ত্তন ও বিভিন্ন সমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির যে সকল কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়।

ফেরিস্তা ও রিয়াজ-উস্-সলাতিন্ নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে 'শাকলদীপ' বা শাকলাধিপ পারস্য হইতে আসিয়া পূর্ব্বভারত জয় করিয়া খৃঃ পূঃ ৬০০ বর্ষেরও পূর্ব্বে এখানে 'গৌড়'নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্দ্বারা মনে করা যাইতে পারে যে আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে গৌড়দেশে শাকল বা শাকদ্বীপীয়গণের আগমন ঘটে। কৃষ্ণদাসমিশ্র রচিত 'মগব্যক্তি' নামক ভারতীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, পুণ্ড্রদেশে আসিয়া যে সকল শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ প্রথম উপনিবেশ করেন, তাঁহারা এখানে রাজপূজিত হইয়া পুণ্ড্রার্ক নামে খ্যাত হন।[১] ইঁহাদেরই এক শাখা খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "পুণ্ডরীক" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অপর এক শাখা উৎকলে সমুদ্রতীরে উপনিবেশ করিয়া 'কোণার্ক' নামে প্রসিদ্ধ হন।[২] এই কোণার্ক শাখার শাকদ্বীপী (অথর্ব্ববেদী) ব্রাহ্মণগণ এখন উৎকলের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণই ভারতের সর্ব্বত্র সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিপূজা সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন, তৎপূর্ব্বে ভারতে দেবপূজা প্রচলিত থাকিলেও প্রতিমা গড়িয়া পূজা প্রচলিত ছিল না। কালে এই শাকদ্বীপীয়গণের মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈবদীক্ষাপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। ফিরিস্তা ও রিয়াজ নামক মুসলমান ইতিহাসে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন প্রমাণ-বলে লিখিত হইয়াছে যে, গৌড়রাজসভায় ঝাড়খণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ হইতেই প্রথমে সূর্য্যমূর্ত্তি ও তৎপরে অপর দেব ও পিতৃগণের মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হয়।[৩] মৌর্য্যরাজবংশ সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই নিকট দেবমূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছিলেন। এখনও গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে এই আচার্য্য-ব্রাহ্মণগণ দেবতা-চিত্রণ করিয়া থাকেন।

---

(১) "বর্ণৈর্যোপাসিতা নতা নৃপচয়ৈঃ কিং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুণ্ড্রার্কা জগদস্তি পাটনপটুপ্রজ্ঞা জপা ধার্ম্মিকাঃ॥"

(২) "কোণার্কা দলগান্তে সুবিমলমনসঃ সন্তি যেহস্তঃ সমুদ্রং, কোণার্কং পূজয়ন্তো মুনিসুরনিকরৈর্বন্দ্যপাদ্যার্ঘ্যমানাঃ॥"

(৩) Riyazus Salatin, (Asiatic Society's Ed.)

বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ হইতে ছোট নাগপুর পর্য্যন্ত জঙ্গলমহল "ঝাড়খণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ময়ূরভঞ্জাধিপ "ঝাড়খণ্ডকা রাজা" বলিয়া পার্ব্বতীয় কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি চুয়াড়-জাতির নিকট পরিচিত। ময়ূরভঞ্জের উত্তরপূর্ব্বাংশে পেরাগড়ী নামক স্থানে এখনও "ঝাড়েশ্বর" নামে অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ এবং অতি প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমায় ভঞ্জভূমে এখনও "ঝাড়খণ্ডেশ্বর" মহাদেব বিদ্যমান। এই প্রদেশ উৎকল ও রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় 'মধ্যদেশ' বলিয়াও পরিচিত ছিল। এখান হইতে শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণগণ যে গৌড়রাজসভায় গ্রহপূজা করিবার জন্য এক সময় গিয়াছিলেন, রাঢ়ীয় শাকল-দীপিকা নামক অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।* এরূপ স্থলে মুসলমান ঐতিহাসিকের কথা ধরিলে ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ গিয়া গৌড়সভায় দেবমূর্ত্তি পূজা প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। ময়ূর-ভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশের এখনও নানা স্থানে শাকদ্বীপী আঙ্গিরস ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে, তাঁহারা বহুকাল হইতেই রাজসম্মানিত ও শ্রাদ্ধে বরণীয়।

পুণ্ড্রার্ক বা গৌড়াগত সেই আদি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এখন "বারেন্দ্র গ্রহবিপ্র" বলিয়া পরিচিত। অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে, সামান্য কতক-গুলি পাতড়া মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায় যে অতি পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপ (Skythia) হইতেই তাঁহারা এদেশে আগমন করিয়াছেন।

সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্রাট্ কনিষ্কের নবাবিষ্কৃত অনুশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সমস্ত পূর্ব্বভারত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার অধীন ও তন্নিযুক্ত ক্ষত্রপ-গণ এই পূর্ব্ব অঞ্চল শাসন করিতেন। নানা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেও ঠিক হইয়াছে, উত্তরে খোতান, পশ্চিমে পারস্য এবং দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ পর্য্যন্ত কনিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। শাকপতি কনিষ্কের সময়ও এদেশে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মা গুপ্ত-নরপতিগণের সময়েই বৈদিক বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের সময় গৌড়রাজসভায় শাকদ্বীপীয় গ্রহ-বিপ্রগণের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে। আমরা মহাদেবের কারিকা নামক অতি প্রাচীন গ্রহবিপ্র-কুলপঞ্জিকা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে কোন সময়ে গৌড়েশ্বর মহারাজ শশাঙ্ক গ্রহ-বৈগুণ্যে অতিশয় রোগপীড়িত হইয়াছিলেন। নানা বৈদ্যের চিকিৎসায়ও তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য তিনি সরযূতীর হইতে কতিপয় গ্রহবিপ্র আনাইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাবিধি গ্রহযজ্ঞ সমাধা করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলে রাজার আদেশে তাঁহারা সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণও জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, রাঢ় ও বঙ্গে নানা স্থানে তাঁহারা আসিয়া উপনিবেশ করেন,

---

* "দণ্ডপাণি মহানন্দো দশ বিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতাঃ॥" (রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা)

স্থানভেদে তাঁহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে।[৪] শাকদ্বীপীয়গণের প্রধান পরিচয়গ্রন্থ "মগ-ব্যক্তি" হইতেও আমরা জানিতে পারি যে সরযূতীরে "বালার্ক" নামে এক শাখা রাজসম্মানিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৫] গুপ্তসম্রাট্ বালাদিত্যও একজন সৌর ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালার্ক নামক সূর্য্যপূজক মগব্রাহ্মণগণই সম্ভবতঃ বালার্ক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হয় যে সম্রাট্ বালাদিত্য ও তাঁহার পরবর্ত্তী মগধের অপর গুপ্তরাজগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে শাসন দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।[৬]

মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত এ দেশের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশধরগণ এখন "সরযূ-পারিয়া" ও নদীয়া বঙ্গসমাজভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আদিশূরের সময় বৈদিকব্রাহ্মণ-প্রভাব কালে এই শাক-ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব হ্রাস হয়, তৎপরে জ্যোতির্বিদ্যার গুণে পালরাজ-গণের সভায় তাঁহাদের কতকটা প্রতিপত্তি ঘটিলেও সেনরাজগণের সময় হইতে কনোজীয় সাগ্নিক ও বৈদিক বিপ্রগণের রাজসম্মান ও সাধারণের উপর প্রতিপত্তি বিস্তারের সহিত মগব্রাহ্মণ-সমাজের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। এমন কি পূর্ব্বতন রাজসম্মানিত গ্রহবিপ্রবংশীয়গণ অনাচরণীয় শূদ্রবৎ গণ্য হইতে থাকেন, এই কারণে অদ্যাপি বঙ্গের কোন কোন স্থানে উক্ত শাকদ্বীপীগণ 'বিপ্র'সন্তান বলিয়া গণ্য হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে উচ্চজাতির নিকট তাঁহাদের জল অস্পৃশ্য। এই পূর্ব্বসম্মানিত শাকদ্বীপীয় বিপ্রসমাজের অধঃপতনের সহিত অবস্থাবৈগুণ্যে ইঁহাদের বহুতর সামাজিক ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা ও উমেশচন্দ্রের কারিকা এবং বাঙ্গালা পদ্যে রচিত রামদেবের কুলপঞ্জী পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে আরও মিলিতে পারে।

উপরোক্ত বিভিন্ন সমাজভুক্ত শাক-ব্রাহ্মণগণের গৌড়ে বা বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের বহুকাল পরে কিঞ্চিদধিক ৫ শত বর্ষ হইতে চলিল, মধ্যদেশ (সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমা) হইতে আরও কএকজন শাকলব্রাহ্মণ সন্তান গৌড়দেশে আগমন করেন, তাঁহাদের ৪র্থ বা ৫ম পুরুষ অধস্তন বংশধরেরা রাঢ়দেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়া রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র বলিয়া পরিচিত

(৪) "কদাচিন্নৃপতি শ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ। পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং পাপ স ধার্ম্মিকঃ ॥
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ন মুক্তো রোগসঙ্কটাৎ। ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুমিয়েষ নৃপপুঙ্গবঃ ॥
মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ। আহূয় সরযূতীরাৎ নৃপস্যাদেশতস্ততঃ ॥......
প্রার্থিতা গৌড়ভূপেন চাগতা গৌড়মণ্ডলম্ ॥ গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বা তু তেষাং রাজ্ঞা মহাত্মনাম্।
গ্রহযজ্ঞবিধানার্থং বৃতাস্তে নিজ মন্দিরে।... বৃতা গৌড়েশ্বরেণৈতে ব্রতিনো হোমকর্ম্মণি ॥
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ। সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া ॥"

(মহাদেবরচিত গ্রহবিপ্রকারিকা)

(৫) "বালার্কা যে মগাস্তে লিখিতগুণময়াঃ সন্তি তীরে সরয্বা জ্যোতির্বিদ্যাসমুদ্রপ্রতরণপটবো বৈদ্যবিদ্যাবরিষ্ঠাঃ ॥
নানা দেশাগুচিন্তা নিজকুলতিলকাঃ কামকান্তাঃ কলাভিঃ পূর্ণাশ্চন্দ্রা ইবালিং বভুরমরনিভৈঃ পূজ্যমানাঃ ক্ষিতীশৈঃ॥"

(মগব্যক্তি)

(৬) Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, P. 217.

হইয়াছেন। ময়ুরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে সকল আঙ্গিরসের বাস দেখা যায়, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের সহিত রাঢ়ীয় শাকলব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহারের কতকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এই রাঢ়ীয় শাকলব্রাহ্মণের কএক ঘর আজিও "আঙ্গিরস" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের বহুতর কুলগ্রন্থের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা, কুলানন্দের সংস্কৃতকারিকা, কুলানন্দের বাঙ্গালাকারিকা, অচ্যুতপঞ্চাননের রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা ও গ্রহবিপ্রকুলবিচার নামক কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। রীতিমত অনুসন্ধান চলিলে আরও মিলিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কনোজাগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয়ে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে।

প্রাচীন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলপঞ্জিকার মতে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর জয়ন্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া বেদমার্গ প্রচারের আয়োজন করেন। এই সময় কনোজ হইতে বৈদিক বিপ্রগণ গৌড়রাজসভায় আগমন করেন।—তৎকালে মহাকবি ভবভূতির প্রতিপালক মহারাজ যশোবর্ম্মদেব কনোজের অধীশ্বর; কনোজ-রাজধানী সে সময়ে বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনের লীলাস্থলী এবং প্রধান প্রধান বৈদিক বিপ্রগণের কর্ম্মভূমি। ভবভূতির নাটককাব্য সমূহে ও বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে সেই সময়ের চিত্র প্রকটিত, তাই আদিশূরকে নিজ রাজ্যে বৈদিকাচার প্রচারার্থ কনোজ হইতেই সাগ্নিক বিপ্র আনিতে হইয়াছিল। হরিমিশ্ররচিত সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণকারিকা হইতেও জানা যায় যে আদিশূরের বংশধরের সময়েই পালবংশ প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করেন। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর মতে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, দক্ষ ও ছান্দড় প্রভৃতি যে সাগ্নিক বিপ্রসন্তান প্রথমে রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় বিপ্রগণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। বাসস্থান অনুসারে এই ভূশূরের সময়েই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিনটি শ্রেণীভেদ ঘটে। প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মুখে শুনা যায় যে, রাঢ়ীয় মুখুটী বংশের বীজপুরুষ শ্রীহর্ষের পুত্র শ্রীনিবাস সর্ব্বপ্রথম আদিশূরের পরিচয় ও কনোজাগত সাগ্নিক পঞ্চগোত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে সেই মূল গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। পালরাজগণের সময়ে যাঁহারা আবার যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্ব স্ব কুলধর্ম্মপরিচয়, গুরুপরিচয় ও সংক্ষেপে রাজপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ে প্রথমে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ এবং পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণের দারুণ অধঃপতন ঘটে। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে কেহ কেহ "ডোমপণ্ডিত" নামে পরিচিত। এই ডোমপণ্ডিতগণের গৃহে কিছুকাল পূর্ব্বে সেই সকল আদিধর্ম্মকুলগ্রন্থ রক্ষিত ছিল; অযত্নে এবং বঙ্গের ধ্বংসশীল জলবায়ুর গুণে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই ডোম-পণ্ডিতগণের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট সেই আদিকুলগ্রন্থসমূহের খণ্ডিত সামান্য নিদর্শন

মাত্র পাওয়া যাইতেছে। উপযুক্ত অনুসন্ধান চলিলে সেই অপূর্ব্ব জাতীয় উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগৃহীত হইলেও হইতে পারে।

বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ে পালঅধিকার বিস্তৃত হইলেও দক্ষিণ রাঢ়ে আদিশূরের বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব করিতেছিলেন। হরিমিশ্রের কারিকা ও রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীমধ্যে সেই শূরবংশীয় রাজগণের বংশাবলি ও তাঁহাদের সময়কার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * আদিশূরের বংশধর প্রথমে গৌড় বা বারেন্দ্রপ্রদেশ হারাইলেও উত্তররাঢ় কিছুকাল তাঁহাদের অধিকারে ছিল, এই উত্তররাঢ়ে শূরবংশীয় আদিত্যশূর নৃপতির শাসনকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পঞ্চ বীজপুরুষ আগমন করেন এবং এই উত্তররাঢ়ে বাস হেতু তাঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হন। শ্যামদাসী ডাক, শুকদেব সিংহের ঢাকুরী, ঘনশ্যাম মিত্রের কারিকা প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় আছে। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ ও নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানিতে পারি যে রাজা জয়পালই প্রথম উত্তররাঢ় অধিকার করেন এবং আদিশূরানীত কনোজীয় বিপ্রগণের মধ্যে রাঢ়বাসী কয়েকজন প্রধান পণ্ডিত জয়পালের দান গ্রহণ করেন এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কএকজন প্রধান ব্যক্তি পালরাজের মন্ত্রিত্বলাভ করিয়া উত্তররাঢ়ে নানা কীর্ত্তি স্থাপন ও প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ উত্তররাঢ়ের নানা স্থানে সামন্তনৃপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন—তাঁহাদের রাজকীয় ক্ষমতা কোন স্বাধীন নৃপতি হইতে কম ছিল না। এমন কি রাজা মানসিংহের উত্তররাঢ় অধিকারকালেও কোন কোন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন, নানা উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ এবং রাজা মানসিংহের সময়ে উত্তররাঢ়ে সমাগত জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের পুণ্ডরীক-কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা নামক কুলগ্রন্থে তাহার কিছু কিছু পরিচয় আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্যকুলকে শূদ্র জাতিতে পাতিত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিক বহু সম্ভ্রান্ত জাতি পালরাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণবণিক ও সদ্গোপ জাতি প্রধান। সুবর্ণবণিক জাতি পালরাজগণের সহিত যৌনসম্বন্ধেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

* শূরবংশীয় রাজগণের নাম যথা—

> "আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
> ধরণীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণাশূরঃ ॥
> এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ।
> বেদবাণাঙ্গশাকে (৬৫৪) তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
> বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥" (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী।)

শূরবংশীয় শেষ নৃপতি রণশূরের নাম মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ তিরুমলয়ের শৈললিপিতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শিলা-লিপির মতে তিনি দক্ষিণরাঢ়ের রাজা ছিলেন এবং রাজেন্দ্রচোলের হস্তে পরাজিত হন।

কর্জ্জনার গোবর্দ্ধন মিশ্র সর্ব্বপ্রথম সুবর্ণবণিক জাতির কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধভূপালসংস্রবহেতুই সেনরাজগণের সময়ে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত গৌড়বঙ্গ মধ্যে সুবর্ণবণিক জাতির সামাজিক অধঃপতন ঘটে। আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতে উদ্ধৃত শরণ দত্তের উক্তি হইতেও আমরা তাহার বেশ পরিচয় পাই। বৌদ্ধাচার হেতু সদ্‌গোপ জাতিও এদেশে হিন্দুসমাজে অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদানীন্তন কালেও মহাযান-মতাবলম্বী শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মত কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইশত বর্ষ পুর্ব্বে রচিত মণিমাধবের "সদ্‌গোপকুলাচার" হইতে কএকটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"পূর্ব্বে নাহি ছিল মহী, তার কথা শুন কহি,
ভূত ভবিষ্যতির প্রমাণ।
যুগ প্রলয়ের কালে, পৃথিবী ভাসিল জলে,
একা মাত্র ছিলা ভগবান্॥
হস্ত পদ নাহি তার, দশদিশ শূন্যাকার,
দুই চারি দশ দিক্‌পাল।
আদ্যশক্তি এক কায়া, কে জানে তাহার মায়া,
জলেতে ভাসিল কতকাল॥
সৃষ্টির কারণ হরি, মনে অনুমান করি,
তনুতে বাহির হৈল শক্তি।
আদ্যাশক্তি নারায়ণী, বীণাপাণি সনাতনী,
সৃষ্টি করিবারে দিলা যুক্তি॥
আপুনি আপন কায়, সৃজিল অনাদ্য রায়,
শুন সবে হয়ে এক মতি॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্ম ঠাকুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বৌদ্ধযুগের যে সদ্ধর্ম্মের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি প্রকাশ করিয়াছেন, সদ্‌গোপকুলগ্রন্থ হইতে যেন আমরা সেইরূপ আভাষ পাইতেছি। কেবল সদ্‌গোপ বলিয়া নহে, তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায়, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমে শূন্যমূর্ত্তি সদ্ধর্ম্ম নিরঞ্জনের স্তবের পরিচয় পাইয়াছি। বৌদ্ধদিগের নিকট তাঁহাদের ধর্ম্মই 'সদ্ধর্ম্ম' নামে প্রসিদ্ধ। এমন কি ১৬৭০ শকে রচিত তিলকরামের যে তন্তুবায়-কুলজী পাইয়াছি, তাহাতে ঐ গ্রন্থ "সদ্‌ধর্ম্মাচার-কথা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"মাধবের সূত্র দেখি করিলু বর্ণন ॥
তিন গ্রন্থে কুলাজীর কৈলা সমাধান।
সদ্ধর্ম্ম আচারকথা শুনে পুণ্যবান ॥

পুরন্দর কুলে জন্ম বর্গে তিলকরাম।
কিঙ্কর বলিয়া আমার প্রথম আখ্যান ॥
ষোল সত্তরি শকে সূত্র দেখি কৈল।
হরি হরি বল কথা সমাধান হৈল ॥"

তিলকরাম নামে অপর এক ব্যক্তি ও পরশুরাম গন্ধবণিক জাতির কুলগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দ্বিজপাত্র পরশুরাম "তাম্বুলীপরিচয়" এবং রামেশ্বর দত্ত "তিলির পরিচয়" লিপিবদ্ধ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণপ্রভাব কালে রচিত হওয়ায় প্রতিপাদ্য মূল কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে জাত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে ইতিহাসবহির্ভূত অনেক বাজে অলৌকিক কথাই স্থান পাইয়াছে।

পশ্চিমোত্তর বঙ্গে যখন বৌদ্ধ প্রভাব অব্যাহত, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেছিল। পাশ্চাত্য বৈদিক রাঘবেন্দ্র কবিশেখর * প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে "ভবভূমিবার্ত্তা" নামক গ্রন্থে নিজ সমাজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহারাজ হরিবর্ম্মদেব তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই পরাক্রান্ত নৃপতি দক্ষিণাপথ হইতে সমুপাগত জৈন বৌদ্ধাদি বহুতর নৃপতিকে পরাজয় করিয়া একাম্রক্ষেত্রে (ভুবনেশ্বরে) হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতির বহুশত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র, বাল-বলভী ভট্ট (ভবদেব) প্রভৃতি সাতজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সচিব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে কান্যকুব্জে মুসলমান আগমন, দস্যুভয় এবং কনোজপতির রাজ্যনাশ ঘটে, এই বিপ্লবের সময়েই গৌতম গোত্রজ গঙ্গাগতিপ্রমুখ কএকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের অনুমতি লইয়া কোটালিপাড়ে বাস করেন, সেই সময়

* রাঘবেন্দ্র এইরূপ হরিবর্ম্মদেবের প্রশস্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"স্বস্তি সমস্ত-নরপতিকুলললামপ্রোদ্দণ্ডভুজদণ্ড-মণ্ডিত-বিকরাল-করবাল-ভয়-প্রকম্পিত-দক্ষিণাপথাগতাশেষ-রিপুরাজন্য-জৈনবৌদ্ধাদি-বিধর্ম্মি-শর্ম্মসম্মর্দ্দন-খর্ব্বীকৃত-সর্ব্বোর্ব্বীপতি-গর্ব্বগৌরবো নাগেন্দ্রপত্তনাদ্যনেকদেশ-বিজয়লব্ধোদ্দামজয়শ্রীরেকাম্রকাননপ্রতিষ্ঠাপিত-হরিহরবিরিঞ্চি-বৈদেহীরাঘবলক্ষ্মণহনুমদাদ্যষ্টোত্তরশতাদ্ভুতবৈজয়ন্তী-বিভাবিতামন্দগন্ধ-প্রসূ-প্রসূনপটল-সৌন্দর্য্যাদিস্তব্ধ-নন্দনকানন-বৈভব-পরমামোদময়োদ্যান-সমলঙ্কৃত-সুরপথ-সংস্পর্শিসুন্দর-মন্দিরমন্দাকিনী-বিমলকীলাল-কমলকহ্লারেন্দীবর-শোণারবিন্দবৃন্দসংশোভিতসুবিশাল-সরোবরসংহতি......দেশনিবাসনিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনিপুণপরিজ্ঞান-লব্ধানল্পবৈচক্ষণ্য বালবলভী-ভট্টাচার্য্য গর্গবাচস্পতিপ্রমুখবিশ্ববিখ্যাতসপ্তসচিবসাহচর্য্যনির্বর্ত্তিত সম্যক্ স্বপরারাষ্ট্রসর্ব্বব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বর-পাদারবিন্দসন্দর্শনার্থসমুদ্যতস্বজননীস্বচ্ছন্দপরিচারকৃতে প্রবর্ত্তিতপ্রশস্তবর্ত্মাসদনুমতপ্রতিনিয়তসন্নীতিপরিসেবন সম্প্রাপ্ত পরমশর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্যশেষজনপদবহুমতাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্মানুগতাখিলকর্ম্মা দিগন্তসন্তত-কীর্ত্তিসন্ততিরত্যন্তদয়ার্দ্রচেতা ভূদেবভূদানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মা জয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজা শ্রীহরিবর্ম্ম দেবঃ। যস্য হি কৃপয়াস্মৎপূর্ব্বতনঃ সুখমিহ হ্যবাস।"

হইতেই কোটালিপাড়ের বৈদিক সমাজের সূত্রপাত। * রাঘবেন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বঙ্গাগমন প্রসঙ্গে যেরূপ ব্রাহ্মণসমাজের গতি বিধি, আহার ব্যবহার ও বসবাসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কুটীরবাসী সরল হৃদয় পুণ্যচেতা মুনি ঋষিগণেরই যেন উপযুক্ত, সেই প্রাচীনকালে কুটীরবাসী উন্নত ব্রাহ্মণ সমাজ কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা কতদূর আড়ম্বরশূন্য ছিলেন এবং কিরূপ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, কবিশেখরের রচনায় তাহার প্রকৃত চিত্র যেন পরিস্ফুট হইয়াছে। †

* "রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দাবানলং দস্যুভয়ং বিভাব্য
এতদ্বিযুক্তং ধনধর্ম্মদেহপ্রাণাদিরক্ষার্থমিতঃ প্রয়াণম্।
কর্ণাবত্যাং স আসীদ্বহুগুণনিলয়ো ধার্ম্মিকস্তীর্থসেবী
নাম্না গঙ্গাগতিঃ স স্বসুতধনযুতো গোত্রতো গৌতমোঽসৌ।
বেদাচার্য্যোঽতিমানী হরিচরণরতঃ সামবেদৈকশাখী
মিশ্রোপাধিঃ সুবিজ্ঞাগমনিগমপরঃ কৌথুমী কর্ম্মশীলঃ॥
তৎকালাকুলোদ্ভবদস্যুসাধ্বসং দৃষ্ট্বা তদা দাবধনঞ্জয়ঞ্চ।
ত্যক্তো সুধীরৌ কিল তাং ভবক্ষিতিং দুঃখেন দুঃখার্দ্দিতবন্ধুবর্গকৈঃ॥"
(রাঘবেন্দ্র কবিশেখর)

† কবিশেখর রচিত সেই চিত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—
"স স স্বং পরিগৃহ্য কর্ম্মকুশলং ভৃত্যত্রয়ং রঞ্জকং
পঞ্চাশ্বং খরপঞ্চকং বপনকক্ষৈণেয়চর্ম্মাষ্টকম্।
গ্রন্থং তন্ত্রমনেকমন্ত্রসংহিতং বেদং স্বকীয়ং সুতং
দায়াদর্ভমনেকদ্রব্যসহিতং গঙ্গাগতিঃ প্রস্থিতঃ॥
নাভ্যন্তশ্মশ্রু স্বতিশুভ্রবর্ণৌ বিশালভালোন্নতনাসিকৌ চ
বিস্তীর্ণকর্ণান্তবিশালনেত্রৌ বিশালবাহূদরজানুবক্ষৌ।
সুদীর্ঘপৃষ্ঠাস্তজটাকলাপৌ সুদীর্ঘপৃষ্ঠার্পিতলম্বমানৌ
স্কন্ধদ্বয়ে কম্বলকম্বলাগ্রৌ তন্মেখলা মেখলয়া পিনদ্ধা॥
*　　*　　*　　*
কাশীং গতঃ কাশীপতিঞ্চ দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতান্ দেবচয়ান্ দদর্শ
মহাশ্মশানং মণিকর্ণিকাঞ্চ দেবালয়ান্ সর্ব্বসু ভক্তিযুক্তঃ॥
*　　*　　*　　*
ততোঽভ্যাগচ্ছন্নকুলেশসংজ্ঞং লিঙ্গঞ্চ শম্ভোঃ পরিদর্শনায়
গঙ্গাং মহাপীঠগতাঞ্চ দেবীং দৃষ্ট্বা প্রতস্থে প্রতিপূজ্য তাম্বং॥
যজ্ঞে বিহঙ্গাকুলিতাংশ্চ বৃক্ষান্ ফলান্বিতান্ পুষ্পলতাবিতানান্।
সশস্যভূমিং সলিলং সুরম্যং দৃষ্ট্বা মুদং লেভির এব তেঽতি॥
পথে পৃদাকুবিপিনে তরক্ষুর্জলেঽতিনক্রাঃ পুরবাশ্চ বক্রাঃ।
চিন্তেম মদ্যো লবণাম্বুপূর্ণা দৃষ্টে্তি দোষায় চ ষজ্ঞমিচ্ছুঃ॥

কবিশেখর নিজ কুলগ্রন্থে জৈন বৌদ্ধরাজবিজয়ী ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে শতাষ্টোত্তরশত মন্দির-নির্ম্মাতা যে হরিবর্ম্মরাজের পরিচয় দিয়াছেন, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বেজনীসার গ্রাম হইতে তাঁহার তাম্রশাসন এবং ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিমূলক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়ে মহাপরাক্রান্ত

ততঃ প্রয়াতঃ পুরহূতপালিতাং দিশঞ্চ তত্তৎপরিচিন্তয়াকুলঃ।
দেশং সুরম্যং বহুশস্যসংযুতং কোটালিপাটং ব্যবহারবর্জ্জিতম্॥
প্রবঙ্গহীনঃ ফলনম্রপাদপঃ লুলাপকোলক্ষতরক্ষুবর্জ্জিতঃ।
সন্ন্যাসিনামাশ্রয়দস্যুহীনো বাসায় দেশো রুচয়ে বভূব॥
যদ্দেশ মধ্যে স হি ঘর্ঘরো নদো যং ব্রহ্মপুত্রেতি চ কেচনাহবদন্।
তস্যেন্দ্রভাগে ক্ষিতিতুঙ্গভূতলে পর্ণালয়ানাং নব চক্রুরুৎসুকাঃ॥
তমালতকাম্রাতকবিল্বঘারুণা ধাত্রীজ্জলপ্লক্ষকদম্বহিজ্জলাঃ।
অশোকজম্বাম্রকবংশকিংশুকা বিরেজিরে তে যুগদিক্ষু বেশ্মনঃ॥

*　　*　　*　　*

বিলোক্য তস্মাজ্জলমগ্নদেশং যথাগমে বর্ষসু ভূরি বারি।
ভেলাং প্রচক্রুঃ কদলীক্রমৈশ্চ ক্ষুদ্রাঞ্চ দীর্ঘাং গমনাগমায়॥
ততশ্চ সর্ব্বে স্বগৃহাণি চক্রুর্দৃঢ়াণি মুস্তাপরিবেষ্টিতানি।
কন্দুলকাশোর্দ্ধসমাচিতানি বংশৈশ্চ বেত্রৈশ্চ নবানি তত্র॥
ততঃ সুখেনাষ্টসমাসমাপ্তৌ বঙ্গে স্থিতৈঃ সাধুভির্বন্ধুবর্গৈঃ।
অন্বিষ্য তৎস্বসুতাদানহেতোরলব্ধকামো বিররাম মিশ্রঃ॥
ততোহষ্টবর্ষে বিগতে সুতায়া বিপ্রো বরার্থং পরিচিন্ত্যমানঃ (?)
অতীত্য দেশান্ স বহূন্ সভৃত্যস্তৎকান্যকুব্জং পুনরাজগাম॥
বরং স্থিরীকৃত্য বরং কুলেষুযশ্চাগ্রণীঃ শুনকেশ্বাসীদেব।
যশোধরং নাম যশোহন্বিতং তং ত্রিংশৎসমাস্তস্য বয়স্তদানীম্॥
গুণান্বিতঃ সোহতিবিশালবুদ্ধির্ধ্যগ্নিহোত্রী সুবিশালনেত্রঃ।
সামর্গযজুর্বেদবিদাং গরিষ্ঠ উপাধিরস্যাপি চ মিশ্র এব॥
আহূয় বন্ধূন্ পরিতঃ স্থিতা যে যশোধরস্যাপি তথার্ত্বিজশ্চ।
কন্যাপ্রদানগ্রহণে তয়োস্তদ্বিচার্য্য সর্ব্বৈঃ করণীয়মুক্তম্॥
ততঃ পুরোধাঃ স্বয়মাহ বাক্যমানস্যচেষ্টৌ ভবতাং ভবন্তৌ।
গঙ্গাগতিস্তাংশ্চণকান্ ফলাদীন্যত্তক্ষয়ং ত্ব দধিলড্ডুকানি॥
ততোহভ্যগচ্ছৎ কিল রাজধানীমনন্তরং শ্রীহরিবর্ম্মরাজ্ঞঃ।
বাচস্পতিস্তস্য সভাপতির্যস্তেনৈব রাজ্ঞো ভবনং বিবেশ॥
তমাশিষা ভূপতিং বর্দ্ধয়িত্বা তত্র স্থিতৈর্বাড়বৈর্বন্দিতোহসৌ।
মিশ্রেণ বাচস্পতিনা সমেত্য পরস্পরং ক্ষেমমথাবভাষে॥
রাজাপি নত্বা তমথাবভাষে কুতো ভবানাগতঃ কেনচাত্র।
বদস্ব যথাহিতং বিপ্রবর্য্য মত্তঃ কিলাবাপস্যসি যদ্ধি যুক্তম্॥

দক্ষিণাপথাধীশ্বর প্রসিদ্ধ জৈনরাজ রাজেন্দ্র চোল গৌড়বঙ্গ রাঢ় ও দণ্ডভুক্তি বা বেহার জয় করিতে আসিয়াছিলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তিরুমলয়ের গিরিলিপি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজয় করিলেও মহারাজ হরিবর্ম্মদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। বৌদ্ধ পালনৃপতিগণও বোধ হয় হরিবর্ম্মদেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই কথাই বৈদিক কুলজ্ঞ রাঘবেন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সময়ে গজনীপতি সুলতান মাহ্মুদ ৯৪২ শাকে কনোজ আক্রমণ করেন, সেই মুসলমান আক্রমণ হইতে ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বহুলোক কনোজ পরিত্যাগ করেন, তন্মধ্যে বঙ্গাগত কয়েকজনের মাত্র পরিচয় রাঘবেন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তৎপরেই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির প্রতি বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দলে দলে আসিয়া তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে উপনিবেশ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক মহারাজ বিজয়সেনের সাময়িক ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর বৈদিক প্রায় ৩শত বর্ষ হইল, সদ্বৈদিককুলপঞ্জিকা নামে এক বৃহৎ পাশ্চাত্যবৈদিক সমাজের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি গ্রন্থের উপক্রমে লিখিয়াছেন,

"বিচার্য্য তত্ত্বমূলানি চালোক্য তাম্রশাসনম্।
ক্রিয়তে কুলপঞ্জীয়মীশ্বরেণ চ ধীমতা॥"

অর্থাৎ বৈদিক সমাজের আদিতত্ত্বসমূহ বিচার করিয়া এবং তাম্রশাসন দেখিয়া এই কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানিকে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। এই কুলপঞ্জী মতে, মহারাজ বিজয়সেনের পিতা সুবর্ণরেখা-প্রবাহিত কাশীপুরের নিকট রাজত্ব করিতেন।* বিজয়সেনের দুই পুত্র মল্ল ও শ্যামল। মল্লকে পৈতৃক রাজ্যে রাখিয়া কনিষ্ঠ শ্যামলকে লইয়া মহারাজ বিজয় বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। নীলকণ্ঠ রচিত যশোধর-বংশমালা প্রভৃতি বৈদিক কুলগ্রন্থ মতে, ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ বিজয়সেন সপুত্র শ্যামলবর্ম্মসহ গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হন।* রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কুলগ্রন্থে এই বিজয় সেনই দ্বিতীয় আদিশূর বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। ইনি রাঢ়-গৌড়বঙ্গে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন।

নিশম্য রাজ্ঞো বচনং তমাহ গঙ্গাগতিং নামতো বিদ্ধি মাং ভো।
সমাগতঃ কান্যকুব্জাদিদানীং কোটালিপাটে ভবতঃ স্থিতোঽহম্॥
যত্তবামেতন্মম বাসভূমেঃ করেষু মাং যোজয় যদ্ধি যুক্তম্।
পিতেব পুত্রান্ পরিপালয়াস্মান্ ন নো ভয়ং ভবিতা তত্র বাসে॥
নিশম্য বাক্যং তত আহ রাজা করৈর্বিনা বৃত্তিকরীং গৃহাণ।
ভূমিস্তু যাস্তোঃ পরিতোঽস্তি যাবৎ ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ করমাহরিষ্যে॥"

* "ত্রিবিক্রম মহারাজ সেনবংশসমুদ্ভবঃ। আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরীসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণবত্নময়ী শুভা। স্বর্ণাম্বসলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতারিণী॥

তন্মধ্যে তৎপুত্র শ্যামল কর্তৃক আনীত পঞ্চ গোত্রই আজও পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে শ্রেষ্ঠ বা কুলীন বলিয়া সম্মানিত। নীলকণ্ঠের যশোধরবংশমালা প্রভৃতি বৈদিক কুলগ্রন্থ মতে শ্যামল-বর্ম্মা ১০০১ শকে শাকুনসত্র উপলক্ষে উক্ত পঞ্চ গোত্রজ পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণকে কর্ণাবতী হইতে আনাইয়া বহু শাসন গ্রাম দান করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভব-ভূমিবার্ত্তা, ঈশ্বর বৈদিক রচিত পাশ্চাত্যবৈদিককুলপঞ্জী, নীলকণ্ঠের যশোধর-বংশমালা বা ধুল্লার গুনকবংশকারিকা, লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা, মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধ-তত্ত্বার্ণব, বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা, প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের ইতিহাস বিবৃত আছে। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন যে, শ্যামলই পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বতন রাজন্যগণকে পরাজয় করিয়া বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হন এবং বর্ম্মোপাধি ধারণ করেন। আবার সামন্তসারের বৈদিককুলার্ণবে লিখিত আছে যে শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় অধীশ্বর (বিজয়সেনের) আশ্রয়েই পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীয়বারেন্দ্রদোষ কারিকায় লিখিত আছে যে বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রভাবে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, মহারাজ বিজয়সেনের গৌড়াধিকারের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ কুলগ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের অভিষেক-বর্ষেই দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের কতিপয় বীজপুরুষ এ দেশে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কান্যকুব্জ, কেহ হরিদ্বার, কেহ অযোধ্যা, কেহ কাশী, কেহ বা কাঞ্চীপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সন্তানগণ এক্ষণে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নন্দী, চাকী, দাস প্রভৃতি পদ্ধতিতে পরিচিত † এবং গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও সম্মানিত। প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে কায়স্থ বীজপুরুষগণের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হইবে যে তাঁহারা সেনাধীশ্বরের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য করিবার জন্যই যেন এ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরমমাহেশ্বর বিজয়সেন যেরূপ রাজ্যবিস্তারের সহিত বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন সেইরূপ বৈদিকগণের কতকটা বিরোধী হইয়াছিলেন। সেই জন্যই প্রাচীন বৈদিক কুলগ্রন্থে পিতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের নাম থাকিলেও বল্লালসেনের নাম

অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াম্। আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকম্ ॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পুর্য্যাং মহামতিঃ। পত্নী তস্য বিলোলা চন্দ্রপূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ যৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ। স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষকয়াবুভৌ ॥"

(ঈশ্বরবৈদিকের কুলপঞ্জী)

† "বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।"

(১) বিজয়ের পিতা হেমন্তসেনের নামান্তর।

স্থান পায় নাই। গৌড়াধিপ বল্লাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহের আচরিত বৈদিক ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন না করিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ে সে বেগ কতকটা নিবারিত হইলেও পালবংশের অভ্যুদয়ে তান্ত্রিকতার স্রোতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রবল হইয়াছিল। মহারাজ বিজয়সেন প্রকৃত হিন্দু গৃহস্থের অনুপযোগী সেই বিসদৃশ আচার নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও নানা স্থান হইতে সমুপাগত কায়স্থগণ তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। এ সময়ে তান্ত্রিক ও বৈদিক মতাবলম্বীদিগের মধ্যে একটী দারুণ সংঘর্ষ চলিতেছিল। যতদিন মহারাজ বিজয়সেন জীবিত ছিলেন, ততদিন তান্ত্রিকেরা মস্তকোত্তলন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের সহিত মহারাজ বল্লালের নিকট উৎসাহ পাইয়া তান্ত্রিকেরা আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। তান্ত্রিকাচারে যাঁহারা গৌড়বঙ্গসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং বল্লালের তান্ত্রিক কুলাচারের যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর তাঁহাদিগকে কৌলীন্য প্রদান করিয়া একটী পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করিলেন এবং যাঁহারা তৎপ্রবর্ত্তিত কুলাচার বৈদিকাচারসঙ্গত নহে মনে করিয়া বাধা দিয়াছিলেন, রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক বরং তাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে অনাদিবর সিংহ-বংশীয় বল্লালসেনের অন্যতর মন্ত্রী ব্যাসসিংহ ও দেবদত্তবংশীয় বহুতর দত্ত বল্লালের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করায় জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রঢাকুর গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বল্লালের সভায় বহু কায়স্থ তাঁহার কুলাচারের সমর্থন করিতে না পারায় নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় সুদূর উত্তর বঙ্গে পলায়ন করেন এবং জটাধর নাগের আশ্রয়ে একটী পৃথক্ সমাজ গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রপারদর্শী পাশ্চাত্য বৈদিকগণও বল্লালের রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিয়া বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে কিন্তু ১ম আদিশূরের সময় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে সমাগত কনোজের সাগ্নিক বিপ্রপঞ্চকের বংশধরগণ বহুকাল তান্ত্রিকগণের সহিত এক সমাজে বাস ও অনেকটা একাচারী হইয়া পড়ায় বল্লালের পক্ষ লইলেন এবং মহারাজ বিজয়সেনের সময় সমাগত কতকগুলি কায়স্থসন্তানও রাজসম্মানলাভের প্রত্যাশায় মহারাজ বল্লালসেনের পোষকতা করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন স্বীয় মতানুবর্ত্তী বা দলভুক্ত প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও বংশবিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন। দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বল্লালসেন মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় বা মৌলিক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। *

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লালসেন সেই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বহুতর তাম্রশাসন দ্বারা কুলস্থান দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। † মহারাজ বল্লাল-

* মৎপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থকাণ্ড ১ম ভাগে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে এখানে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না।

† "তাম্রপট্টে কুলং লেখ্যং শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥" (হরিমিশ্রকারিকা।)

সেনের কুলবিধি স্থাপনের পূর্ব্বে কি ব্রাহ্মণ ও কি কায়স্থসমাজের মধ্যে রীতিমত শ্রেণীভেদ বা সমাজপার্থক্য ঘটে নাই।—কি ব্রাহ্মণ ও কি কায়স্থ এ দেশীয় নানাশ্রেণীর কুলগ্রন্থ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এবং উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে বল্লালের কুলবিধির পূর্ব্বে বিবাহাদি ও অন্নব্যবহার প্রচলিত ছিল। বল্লালসেনের কুলবিধি প্রচলিত হইলে যাঁহারা রাজবিধি স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বল্লালী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন শ্রেণি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়েই গৌড়বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে প্রধানতঃ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, উৎকল বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পাশ্চাত্য বৈদিক ইত্যাদি শ্রেণীচতুষ্টয় এবং কায়স্থসমাজ মধ্যে উত্তরাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই শ্রেণী চতুষ্টয় গঠিত হইল। তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় ব্যাসসিংহ জাতীয় সম্মান-রক্ষার জন্য প্রাণদান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা লক্ষ্মীধর উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সমাজপতি ও করণগুরু বলিয়া পূজিত হইয়া ছিলেন। করণগুরু লক্ষ্মীধরের চেষ্টায় উত্তররাঢ়ে সমাগত বল্লালের মত বিরোধী কায়স্থগণকে লইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ গঠিত হয়। এইরূপে জটাধর নাগের চেষ্টায় বারেন্দ্র সমাজ গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গসমাজ তখনও গঠিত হয় নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের বীজপুরুষগণ তখনও গৌড় ও নবদ্বীপ অঞ্চলে মহারাজ বল্লালের উভয় রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া ও গৌড়বিজয়ের পর লক্ষ্মণপুত্র মহারাজ বিশ্বরূপের সময় দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ এই দুই স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের সূত্রপাত এবং মহারাজ লক্ষ্মণপৌত্র দনোজা মাধবের সময়ে তাঁহারই উৎসাহে বঙ্গজ সমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন কুলনিয়মের অধীন হইয়াছিল। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ-কুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

"দনুজ মাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
সেন পদ্ধতিতে তাঁহান মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হইলা চিন্তাপর॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থকুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥"

দ্বিজ বাচস্পতির কারিকা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, মহারাজ দনৌজা মাধবের গোষ্ঠীপতিত্বগ্রহণের পূর্ব্বে বল্লালী নিয়মের অধীন প্রধান কুলীন কায়স্থগণ গৌড় দেশেই বাস করিতেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ-রাজসভায় আহূত হইবার পর তাঁহাদিগকে লইয়াই সম্ভবতঃ বঙ্গজ শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে কায়স্থগণও বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে,—মহারাজ বল্লালসেন মৃত্যুকালে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কেবল তান্ত্রিক কুলাচারদ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প, একারণ তিনি মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকে তৎপ্রবর্ত্তিত কুলবিধির সংস্কার করিবার উপদেশ দিয়া

যান। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তান্ত্রিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বরং পিতামহ বিজয়সেনের ন্যায় বৈদিক আচার-প্রবর্ত্তনের জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এই কারণে তিনি বহুসংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণকে তাম্রশাসন দ্বারা বহুতর গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এবং হলায়ুধ, পশুপতি ও কেশব প্রভৃতি তাঁহার সভাস্থ বৈদিক পণ্ডিতগণ দ্বারা, বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের উপযোগী গ্রন্থ সকলও রচনা করাইয়াছিলেন। এদিকে পিতার আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তিনি কুলীন সমাজের সংস্কারেও মনোযোগী হইয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধকে দিয়া মৎস্যসূক্ত নামে একখানি মহাতন্ত্র প্রচার করেন। তান্ত্রিকপ্রধান গৌড়-বঙ্গ-সমাজে তান্ত্রিক আচারের মধ্যে বৈদিক আচারের প্রবর্ত্তনই মৎস্যসূক্ত নামক মহাতন্ত্রপ্রচারের উদ্দেশ্য। মৎস্যসূক্তে তান্ত্রিক সমাজের সংস্কারের জন্য লক্ষ্মণসেন প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আজও গৌড়-বঙ্গের হিন্দু সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত দেখিতেছি, মহারাজ লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিকসমাজের যে সমন্বয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহা মৎস্যসূক্ত পাঠ করিলে বিশেষ রূপে জানা যাইতে পারা যায়। যাহা হউক বৈদিক আচারপ্রবর্ত্তনের জন্য লক্ষ্মণ সেনের মনোগত অভিপ্রায় থাকিলেও এবং তান্ত্রিকগণকে বৈদিক গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া বৈদিক প্রাধান্যস্থাপনের চেষ্টা থাকিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই। এমন কি দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাঁহার সম্মানিত বৈদিক সমাজও তান্ত্রিক সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া "তান্ত্রিকী বৈদিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতি কীর্ত্তিতা" ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইয়া তন্ত্রেরও বেদমূলকতা ঘোষণা করিতেছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের কুলবিধি প্রচলিত হইবার পর তন্নিযুক্ত কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রত্যেক কুলীনের অংশ-বংশনির্ণয়ার্থ কুলগ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হইতে থাকে। বল্লালসেনের সময়ে যে সকল কুলগ্রন্থ রচিত হয়, সে সমস্ত গ্রন্থ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তৎপৌত্র কেশবসেনের সভাসদ এড়ুমিশ্ররচিত কুলগ্রন্থের কতকটা পাওয়া গিয়াছে। এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন, মুসলমান কর্ত্তৃক নদীয়া ও গৌড় অধিকারের পর রাজা কেশবসেন পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে অপর এক সেনরাজের সভায় পলায়ন করেন। পূর্ব্ববঙ্গাধিপ সেই সেনরাজের সভাতেই সেই রাজকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এড়ুমিশ্র বল্লালী কুলনিয়ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে পূর্ব্ববঙ্গাধিপ সেনরাজের সভায় রাজা কেশব সেন ও এড়ুমিশ্র প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই নৃপতি তাম্রশাসনে 'স গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ' ও "বিশ্বরূপসেনদেব" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ সেনকে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল মুসলমান-দিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, এ কারণ তিনি সমাজ-সংস্কারের দিকে মনোযোগ করিতে পারেন নাই। হরিমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনৌজামাধব লক্ষ্মণসেন যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সংসাধনের জন্য তিনি সকল

কুলীনপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সৎপণ্ডিতদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই দনৌজামাধবই চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বঙ্গজ-সমাজের সমাজপতি হইয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে কেবল ধার্ম্মিক সৎপণ্ডিতদিগকেই সম্মানিত করেন, সেইরূপ গৌড় হইতে প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থ ও কুলাচার্য্যদিগকে আনাইয়াও চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাতেও বল্লালী কুলীন সমাজের কএকবার সমীকরণ হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কুলবিধি এখন ব্রাহ্মণসমাজ হইতে উঠিয়া গেলেও বঙ্গজকায়স্থ-সমাজে আজও প্রচলিত রহিয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ হইতেই বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এ কারণ আজও চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজকায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান বলিয়া পরিগণিত। দনৌজামাধবের আশ্রয়ে বহু কুলাচার্য্য কুলীনসমাজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে হরিমিশ্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকারিকা মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই কারিকা হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের আদর্শ, ইতিহাস এবং গৌড়বঙ্গের পূর্ব্বতন রাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই দনৌজামাধবের সময়েই যে সকল বৈদ্য রাঢ় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা বঙ্গজশ্রেণি বলিয়া গণ্য হন, অর্থাৎ সেই সময়ে বৈদ্য-সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু পঞ্চকোট, রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ এই ত্রিবিধ শ্রেণিভেদ ঘটিয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পর রাঢ়ে ও গৌড়ে মুসলমান অধিকার ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে তখনও সেনবংশের অধিকার ছিল। দনৌজামাধবের সময়ই পূর্ব্ব বঙ্গ মুসলমান কবলিত হইয়াছিল, এ কারণ তিনি আত্মরক্ষার্থ সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপ নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মুসলমান স্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা শুদ্ধাচার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই দনৌজামাধব সমাজ বন্ধন করেন। এই সময় হইতেই বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা নিবারিত হইতে থাকে। তাহা আমরা বিভিন্ন শ্রেণির পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি।

রাঢ়ে গৌড়ে মুসলমান অধিকার বিস্তারের সহিত এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু সমাজের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবার সূত্রপাত হইলেও রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজ গৌড়ের প্রথম মুসলমান নৃপতিগণের নিকট বিশেষ সম্মানিত ও তাঁহাদের উৎসাহে সমাজেও অনেকটা প্রতিপত্তি লাভ করেন। চতুর্ভুজদাসের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, ভরতমল্লিকের রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলতত্ত্ব বা সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, কবিকণ্ঠহারের বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কুলগ্রন্থে তাহার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ, কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির আত্মপরিচয় ও কায়স্থকুলগ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে অনেক সদাচারী

* "আহূয়ান্ পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্ প্রযচ্ছতি মহীপতিঃ।
মধ্যে সৎপণ্ডিতানাঞ্চ ধার্ম্মিকাণাং বিশেষত.॥" (হরিমিশ্র)

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আবার রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন, এ সময় যাঁহারা সে স্থানে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ কেহ কেহ সেই সেই স্থান নামে অথবা কেহ কেহ সেই সমাগত প্রথম ব্যক্তির নামেও পরিচয় দিতে থাকেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময় যে সকল কায়স্থ সেনাধিপের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালসেনের পূর্ব্বে অর্থাৎ পালবংশের সময় উত্তররাঢ়ের নানাস্থানে সামন্ত নৃপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন, সেনবংশের সময় তাঁহাদের কতকটা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলেও মুসলমান বিপ্লবকালে তাঁহারা আবার মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, কখন কখন তাঁহারা দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, কখন বা স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াসী হইয়া গ্রহ-বৈগুণ্যে মুসলমাননিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন।

যাহা হউক, মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ীয়গণ উত্তররাঢ়ে কতকটা অর্দ্ধস্বাধীন ভাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। আমরা কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, যে রাজা মানসিংহ আসিয়াই তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করেন এবং সেই সময় হইতেই উত্তররাঢ়ীয় রাজন্যবর্গের অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইতে থাকে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের শেষ বীর কায়স্থ রাজা সীতারাম রায়। সম্মানিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সামন্তবংশের পরিচয়, বহু সংখ্যক কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা "শ্যামদাসী ডাক", শ্যামদাসের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, ঘনশ্যাম মিত্রের ঢাকুর, ঘনশ্যামী কক্ষোল্লাস, শুকদেব সিংহের কুলপঞ্জী, শুকদেবী কক্ষানির্ণয়, শুকদেবীগ্রামনির্ণয়, শুকদেব সিংহের ঢাকুরী, দ্বিজঘটকসিংহের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, দ্বিজ সদানন্দের ঢাকুরী, দ্বিজ সদানন্দের বঙ্গাধিকারীকারিকা, জনমেজয়ের নিবারিল ঢাকুরী, ধনঞ্জয়ের কক্ষানির্ণয়, অভিরাম মিত্রের ঢাকুরী, বল্লভের গ্রামভাবনির্ণয়, জয়হরিসিংহের কক্ষোল্লাস, বংশীবদনের কুলপঞ্জিকা, কুলানন্দের কারিকা প্রভৃতি কএকখানি প্রধান গ্রন্থের নাম করিলাম, এই সকল গ্রন্থ ঐতিহাসিক সাহিত্য হিসাবেও অতি মূল্যবান্। চারি শত হইতে দুই শত বর্ষের পূর্ব্বে ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। একটী সম্মানিত সমাজের উত্থান ও পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে ঐ সকল কুলগ্রন্থে বিবৃত।

মুসলমান-শাসনকালে বাঙ্গালী যে হীনবল ছিলেন না, তাঁহারা যে অস্ত্রচালনায় ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তাহা আমরা উত্তর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ সমাজের কুল পরিচয় হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এমন কি সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যপণ্ডিত ভরতমল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেনভূমের রাজবংশের মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হন। * সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা তখন কায়স্থ

* "ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ। তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥

সমাজের সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া গণ্য ছিল। কায়স্থ-সমাজের অবশ্য শিক্ষণীয় হইলেও বঙ্গের অপরাপর জাতিও কেহ নিশ্চেষ্ট বা ভীরু ছিলেন না। এমন কি আমরা ধ্রুবানন্দের মহাবংশ নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও প্রধান কুলগ্রন্থে পাইয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান রাঢ়ে আসিয়া পুনরায় সমাজ পত্তন করেন, তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই বীর-ব্রতধারী এবং যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এমন কি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের শেষ ভাগে রাজা গণেশ তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে গৌড়ের বাদশাহকে মারিয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর কুলপরিচয় বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়া মুসলমান ফকিরের কৌশলে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও গৌড়ের চারি পার্শ্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব তখনও হ্রাস হয় নাই। সেই সকল বারেন্দ্র ভূম্যধিকারিগণের পরিচয় নানা বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারেন্দ্র-সমাজে কাপপ্রতিষ্ঠাতা সমাজপতি রাজা কংসনারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে ইনি ২য় বল্লাল বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। কুলগ্রন্থে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের উপাধি ও পরিচয় হইতে জানা যায় যে তৎকালীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজেও বিশেষ ভাবে মুসলমানপ্রভাব ঘটিয়াছিল। এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণসমাজেও ঐ সময় দুই দল দাঁড়াইয়াছেন। একদল মুসলমান আদব কায়দা, মুসলমানী রীতিনীতি ও মুসলমানী উপাধির পক্ষপাতী, আর একদল হিন্দু শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া চলিতে, হিন্দু রীতিনীতি পালন করিতে এবং পূর্ব্বপুরুষের নামগুণ রক্ষা করিতে তৎপর। শেষোক্ত দলের প্রধান সমাজ নবদ্বীপ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর নদীয়ার ব্রাহ্মণসমাজকে লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা ও চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি জয়ানন্দ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

"নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥"

বাস্তবিক নদীয়ার পণ্ডিতসমাজকে ধনুর্দ্ধারী দেখিয়া গৌড়েশ্বরও বিচলিত হইয়াছিলেন, এমন কি তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর যে দারুণ মুসলমান অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহা নিবারণ করিতে এবং ব্রাহ্মণসমাজের স্ব স্ব অধিকার বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবি জয়ানন্দের গ্রন্থ ও নানা কুলপঞ্জিকায় সে কথা বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে কতকটা

রাজা বিজয়সেনস্ত তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ। চন্দ্রবৎ চন্দ্রসেনোঽভূৎ বুধসেনো বুধোপমঃ॥
চন্দ্রসেনোঽভবৎ রাজা ভিষজামপি সম্মতঃ। লক্ষ্মীনারায়ণঃ খ্যাতো দেবভূদেবসেবকঃ॥
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্ত অষ্টাদশ কুমারকাঃ। চন্দ্রধানাদয়ো জাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি॥
অষ্টৌ সুতা অপরাশ্চ চন্দ্রধানাদয়োঽভবন্। যে সারাস্তে চ স্বদবৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ॥
অষ্টৌ পুত্রাস্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ। অসারেষ্বপি পুত্রেষু চন্দ্রধানঃ প্রতাপবান্।
ততশ্চামরসেনোঽভূৎ বলবানস্ত্রপণ্ডিতঃ॥" ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা ২১০ পৃষ্ঠা।

নিরাপদ হইলে—স্ব স্ব সমাজসংস্কারেও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে মেলপ্রচলন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে কাপ-প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে আখড়ায় চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজের সম্মিলন, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে গৌড়েশ্বরের রাজস্ব-সচিব গোপীনাথ বসু পুরন্দরখান্ কর্ত্তৃক কুলবিধি ও একজাই প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানা হিন্দুসমাজে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই সময়ের সামাজিক বিবরণ শত শত কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যে যে সমাজে রীতিমত কুলপঞ্জিকারক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, এই সময় হইতেই তাহার একটা রীতিমত ব্যবস্থা হইতে থাকে। মেলপদ্ধতি লইয়া শত শত ক্ষুদ্র কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৬ খানি আমাদের হস্তগত। এতন্মধ্যে দেবীবরের মেলবন্ধ, ও ভাগভাবাদি নির্ণয়, শ্যামচতু-রাননের বৃহৎ কুলপঞ্জিকা, গোপাল কবিভূষণের ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা, হরিহর ভট্টাচার্য্যের কুলসার, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, মহেশমিশ্রের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা, দনুজারিমিশ্রের সারাবলী, হরি কবীন্দ্রের দোষতন্ত্রপ্রকাশ, নুলা পঞ্চাননের দোষকারিকা এবং নীলকান্ত ভট্টের পিরালী কারিকা উল্লেখযোগ্য। পুরন্দরখানের কুলবিধি প্রচলনের পর পূর্ব্ববর্ত্তী কুলগ্রন্থের অনুসরণে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের শত শত কুলগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে কুলীন ও মৌলিক উভয় সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কুলগ্রন্থ একত্র করিলে সংখ্যায় প্রায় দুই শতাধিক হইবে, এত অধিক কুলগ্রন্থ অপর কোন সমাজের পাওয়া যায় নাই। উক্ত কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে মালাধর ঘটকের কারিকা, ঘটককেশরীর দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা, দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির রাঢ়ীয় কারিকা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৃহৎ সমীকরণকারিকা, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসার, কুলসর্ব্বস্ব, ঘটক বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলীনসমাজের এবং সার্ব্বভৌম ঘটকের বড় ঢাকুর, সরস্বতী ঘটকের ঢাকুরী, বাচস্পতি ঘটকের ঢাকুরী, ঘটক শম্ভুবিদ্যানিধির ঢাকুরী, ঘটক নন্দরাম মিত্রের ঢাকুরী, ঘটক কাশীনাথ বসু এবং মাধব বসুর ঢাকুরীতে কুলীন ও মৌলিক উভয় সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজেও পূর্ব্বাদর্শে পূর্ব্বাপর বহুতর কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ও কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে দ্বিজ বাচস্পতির বৃহৎ কারিকা, দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজীসার সংগ্রহ, ঘটক চূড়ামণির বঙ্গজ সমীকরণকারিকা, ধ্রুবানন্দ ঘটকের বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা, বৃহৎ সমীকরণ গ্রন্থ, বঙ্গজ সম্ভাববিবেক, দ্বিজ রামানন্দের বঙ্গজ ঢাকুরী ও বঙ্গজ সমাজনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজের ন্যায় রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যসমাজেও সমাজসংস্কার ও গৌরব কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বহুতর কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুর্জ্জয় দাসের কুলপঞ্জিকা, ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা বা সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, ৺ভরত মল্লিকের রত্নপ্রভা বা বিশিষ্ট কুলীনপরিচয়, কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, চতুর্ভুজের কুলপঞ্জী, রাঘব কবিরাজের সম্ভাববিবেক, জগন্নাথের ভাবাবলী, রামকান্তের দোষাবলি প্রভৃতি গ্রন্থই প্রধান।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজে পরস্পরের জাত্যুৎকর্ষ লইয়া সামাজিক আন্দোলন চলিতেছে, এই দুই শ্রেষ্ঠ জাতির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া অনেক কুলতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি

উভয় সমাজে মনোমালিন্য ঘটাইবার চেষ্টায় আছেন ; কিন্তু আমরা ৺ভরতমল্লিক, কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি উক্ত বৈদ্য কুলগ্রন্থসমূহ হইতেই জানিতে পারি যে বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য কুলীনগণের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকেই নাগ, ধর, পাল, গুহ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিক-কায়স্থকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন,* এমন কি তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপিও সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া উচ্চ সম্মান লাভে অধিকারী। উপরোক্ত কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজের প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ হইতে বেশ জানা যায় যে, পূর্ব্বে উভয় সমাজে এখনকার মত সঙ্কীর্ণ ভাব ছিল না, দলাদলী ছিল না, বৈবাহিকসম্বন্ধ স্থাপনের আপত্তি ছিল না ;—অল্প দিন হইতেই দ্বেষাদ্বেষী বৃদ্ধি এবং যৌন সম্বন্ধ বন্ধ হইয়াছে। এখন উভয় সমাজ রক্ষা করিবার জন্য উভয় সমাজের প্রকৃত কুলেতিহাস প্রকাশের সময় আসিয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ইদানীন্তনকালেও কতকগুলি দাক্ষিণাত্য, জিঝোতিয়া ও মৈথিল ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে কোন কোন ব্রাহ্মণসমাজে মিলিত হইয়াছেন। এই সকল নবাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতকগুলি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে উৎকল হইতে দক্ষিণ বঙ্গে আসিয়া বঙ্গাধিপের উৎসাহে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পূর্ব্বতন দাক্ষিণাত্য-সমাজের সহিত সম্মিলিত ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ৺প্রাণকৃষ্ণের বৈদিককুল রহস্যে তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মানসিংহের সময়ে বুন্দেলখণ্ডবাসী কএকজন জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণবীর তাঁহার সঙ্গে বঙ্গবিজয়ে আগমন করেন এবং এদেশে আসিয়া তাঁহারা এখানকার ভুঁইহার ব্রাহ্মণদিগের সহিত সম্মিলিত হন, পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা নামক গ্রন্থে তাঁহাদের কুলপরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

বলিতে কি, এখনও উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান হয় নাই, অতি সামান্য অনুসন্ধানে অল্পদিন মধ্যে যে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

এখন বিচার করিয়া দেখুন, বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের কত বিশাল উপকরণ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন বঙ্গবাসী সকল জাতিই কতদূর ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচয় দিবার ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত মালমসলা সংগৃহীত হইলে গৌড়বঙ্গের এক বিশাল ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারিবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

* কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ও ৺ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা দ্রষ্টব্য। উভয় গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছে।

কবি জয়কৃষ্ণ দাস

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হয়, এই সময় হইতে বহু বৈষ্ণব কবিকে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় শত বর্ষ কাল মধ্যে শত শত বৈষ্ণব কবির কলকণ্ঠে সাহিত্যকুঞ্জও কূজিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাম কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, যেগুলি থাকিবার সেগুলি আছে—সেই সকল কাব্যের প্রচার থাকুক বা না থাকুক, ভক্তগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এতদিনের পরে কবি জয়কৃষ্ণ দাসের "রসকল্পলতা" নামক কাব্যের পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য বড়ই সুললিত, যার পর নাই চিত্তোন্মাদী ও প্রেমভক্তির উদ্দীপক। ভাবের উৎস ভাষার গুণে যেন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, পড়িতে পড়িতে মন গলিয়া যায়, শরীর শিহরিয়া উঠে। এরূপ কাব্য বাস্তবিকই সাহিত্যের সম্পদ।

কবিপ্রসিদ্ধি সংস্কৃত কবিগণের বড়ই প্রিয় বস্তু—তাহা তাঁহাদের পরিত্যাগ করিবার যেন উপায় ছিল না। রামরম্ভার সহিত উরুর—চন্দ্রমা ও কমলের সহিত মুখের—মৃণালের সহিত বাহুযুগলের—এইরূপ কতকগুলি উপমান উপমেয়ের নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে সংস্কৃত কবিগণ যেন ধর্ম্মতঃ বাধ্য। চন্দ্রকিরণ, কোকিল কূজন, দক্ষিণানিল বিরহবিষাদের কেবল মাত্র উত্তেজক, অতএব তাহা বিরহবর্ণনায় কোনমতে পরিত্যজ্য নহে বলিয়া তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। বৈষ্ণব কবিগণের সমক্ষে তৎকালে অন্য আদর্শ ছিল না বলিয়া তাঁহারা পথ-পরিবর্ত্তনে সাহস পান নাই; মানময়ী রাধার দুর্জয় মানে সকলেই তাঁহার মুখ দিয়া "কাল বসন পরিব না," "কাল কোকিল দেখিব না," "কাল কোকিলের কুহু রব শুনিব না," "কাল তমালে চন্দন লেপিব," "নীল আকাশে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইব" ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণদ্বেষ বর্ণনা দ্বারা আপনাদের কাব্যে একঘেয়েমী দেখাইয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ পাঠক এরূপ একঘেয়েমী ভাল বাসেন না। একজন কবির "মানভঞ্জন" পাঠ করিয়া অন্যের মানভঞ্জন পড়িলে নূতন কিছু খুজিয়া মিলে না—সকলেরই একভাব—কেবল ভাষার ভেদ দেখিয়া যতদূর সম্ভব তৃপ্তি লাভ করিতে হইবে। আলোচ্য কবির রচনায় উপরি উক্তবিধ একঘেয়েমী ততটা নাই। জয়কৃষ্ণ দাসের কাব্যে অনেক নূতন ভাব ও নূতন অভিব্যক্তির সমাবেশ আছে।

অতঃপর আমরা কবির রসকল্পলতার পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। তিনি নিম্নোক্ত কবিতায় কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন,—

"কাননে কালিয়া জলদ কাঁতি, অমর চপলা চমকে ভাতি,
ইন্দ্রক ধনুকিয়ে ময়ূরকি চান্দ, হৃদয়ে বৈজয়ন্তী মালয়ে।
মুকুতা দাম হীরক সুপাঁতি, মুরলী গর্জ্জন কতেক ভাতি,

ময়ূর নটন্ত পেখল সারি, দাদুরি কিঙ্কিণী জালরে ॥
শারদ চন্দ্রমা বদন রাজ, সুখদ চন্দ্রমা বিপিনে সাজ,
বরিখে অমিঞা মধুর বোল, নয়ন চাহনি ভোর রে।
দুর্দ্দৈব পবন উদয় ভেল, চাতক পিয়াসে মরিয়া গেল,
সখীর মাঝে কহত রাই, পড়িলা ললিতা কোররে ॥
দারুণ বিরহ পরম ভেল, মরমে মরমে পশিয়া গেল,
বিরলে বসিতে ভাবনা সিন্ধু, হায় রসিক চান্দ রে।
সে দিঠি রঙ্গিম ভঙ্গিম ঠাম, দশন সুচারু কুন্দ দাম,
মধুর মাধুরী সুচারু গন্ধ, জয়কৃষ্ণ মনহি বান্ধ রে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাখালগণের সহিত গোষ্ঠে গোচারণার্থ গমন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার প্রাণাধিকা প্রণয়িনী শ্রীরাধিকা তাঁহাকে দর্শন করিলেন, এবং তাঁহার প্রাণেশ্বরের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি দ্বিতীয় কবিতায় উভয়ের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"বনে গেলা বিনোদিয়া কানু।
কিবা সে বিনোদ চূড়ে, বরিহা পরাণ উড়ে,
অধরে মধুর বাজে বেণু ॥
বেড়িয়া রাখালগণে, ধেনু লয়্যা গেলা বনে,
বনচর বড় ভাগ্যবানে।
করে হরি দরশন, আনন্দিত তনু মন,
ভ্রমর কোকিল করু গানে ॥
যমুনার তীরে তীরে, কুসুমিত তরুবরে,
কুপে কুপে বিকশিত ভেলা।
অনেক তপের ফলে, হরিপদসেবা মিলে,
অবহেলে পদরজ পেল্যা ॥
ধন্য সুখময় ধাম, বৃন্দাবন সার নাম,
ধন্য ধন্য স্থাবর জঙ্গম।
সখীগণ সঙ্গে করি, গান করে সে মাধুরী,
গলাগলি দারুণ রোদন ॥
আপন দুর্দ্দৈব দিন, বিধি কৈলা ভাগ্যহীন,
গেল্যা বনে দেখিতে না পাই।
জয়কৃষ্ণ দাস ভণে, হেরিয়া রাধার পানে,
চিন্তা কেন তোমার কানাঞি ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধা কৃতকৃতার্থা, তাঁহার শ্রীরাধিকা জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার, তাঁহার নবনীরদলাঞ্ছিতশ্যামরূপ দর্শনে তাঁহার মনপ্রাণ ভুলিয়া গিয়াছিল, তিনি মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রণয়ীকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অতএব তখন তিনি মুগ্ধা—অতঃপর তিনি প্রিয় মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিতা—ইহাও অস্বাভাবিক নহে। উৎকণ্ঠার পরিণাম বিহ্বলতা ক্রমে তাঁহার ধৈর্য্য টুটিল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পুনর্দর্শনের জন্য ব্যাকুলা হইলেন, আর সুস্থির রহিতে পারিলেন না—কলস কক্ষে কালিন্দীকূলে উপস্থিত হইলেন, সেখানে আঁখি ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ইহাতে উভয়ের দর্শন-পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ে উভয়কে নয়নের অন্তরালে রাখিতে যেন নিতান্ত নারাজ, লোকলজ্জা ভয়ে শ্রীরাধিকাগৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, অপরাহ্নে যখন তিনি গোপবালকগণপরিবেষ্টিত হইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা অট্টালিকা শিরে আরোহণ করিলেন, এবং সেখান হইতে দেখিলেন তাঁহার ইহ সংসারের সর্ব্বস্ব কানাইয়া-লাল গোধূলির শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া এবং গোষ্ঠের পথ আলোকিত করিয়া আসিতেছেন,—

"অট্টালি উপরে বৈঠল রসবতী রঙ্গিনী সখি মণিমালা।
ঝাঁকি ঝোরখে তুরু হেরই আয়ত নাগর কালা॥
শ্রীদাম সুদাম দামহি সখাগণ বেণু বিশালাদি পুর।
গোধন গমন ধূলি তনু অম্বরে অম্বর আদি পরিপূর॥
হোই হোই রব ঘন বোলত মধুরিম নটবর ভঙ্গিম ঠাম।
দোলহি অলক, চূড়ে শিখা চন্দ্রক, খচিত কুসুমকি দাম॥
লোচন খঞ্জন ভাঙু কামধনু গণ্ডহি কুণ্ডল দোল।
বনে বনমাল হৃদয়ে বিরাজত ঝলমল সুন্দর লোল॥
ভুজ যুগবর করিকর দোলত করহি বলয় রসাল।
মুখ সুধাকর, কম্পিত বিম্বাধর, মুরলী গান বিশাল॥
কমল চরণে মঞ্জির বর ঘন হেরই বিধুমুখী বালা।
নয়নক বাণ বিধলি রঙ্গিনী সখী তনু অনু তনু দেলা॥
শ্যামের চরণ গমন মন্দহি কম্প পুলক ভরত অঙ্গ।
নিজ গৃহে গমন, করল বর মোহন, জয়কৃষ্ণদাস প্রেমরঙ্গ॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিলেন—শ্রীরাধিকা অট্টালিকা শিরে উঠিয়া সখীগণ সঙ্গে তাঁহার সম্মোহন রূপ দর্শন করিলেন। তাঁহার সহিত মিলিতে পারিলেন না বলিয়া উৎকণ্ঠা বাড়ীতে লাগিল। রজনী সমাগতা, এই সময়ে বিরহিণীর বিরহ ব্যথার বৃদ্ধি। ভগবৎ-

প্রেমবিহ্বলা শ্রীরাধা এক্ষণে তন্মনা,—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এ সময় তাহার অন্য চিন্তা নাই—গৃহকর্ম্মে মন নিবিষ্ট নহে, করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা ঘটিয়া উঠে না। রাত্রিকালে সকল রোগেরই যখন বৃদ্ধি দেখা যায়—তখন এই বিরহ-ব্যাধিরই বিরাম মিলিবে কেন, সুতরাং তাহাকে বড়ই ব্যথিত হইতে হইল, কবি নিম্নোক্ত কবিতায় সুন্দররূপে তাহার বিরহবর্ণনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন,—

"হরিক কোরে গোরি রভসে ঘুমায়ল, প্রেম চউকি তহি জাগি।
খনহি খনহি ঘন চমকি উঠত, কাঁহা হরি করম অভাগী॥
সো নব নাগর, রসময় সাগর, গুণ গরিম রসসিন্ধু।
বিছুরি রহ মোহে সো নাহি মিলল, না হেরিনু সো মুখ ইন্দু॥
ঢর ঢর ঢর ঢরকত লোচন, অরুণ কিরণ পরকাশ।
গদ গদ ভাখত, পুলক কম্পিত, যে জন অধরহি হাস॥
পিউ পিউ করি, জীউ অব যায়ব, কাম কৃশানুক জ্বালা।
জয়কৃষ্ণদাস বোলত কোরে তু যা, তেজহি বিহরক মালা॥"

এই দুঃসহ বিরহ জ্বালার উপর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রীরাধিকাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিল। সুন্দর ভাবে সুন্দর ভাষায় কবি তাঁহার মুখ দিয়া বংশীর গঞ্জনা-গীতি গাইয়াছেন,—

"সখি জাতি কুল শীলে, ভরম ভাঙ্গিয়া দিলে,
হেনই ডাকাতিয়া বাঁশী।
বাঁশ ঝাড়ে তার জন্ম, ছিদ্র জালে পরিপূর্ণ,
কৃষ্ণাধরে খায় সুধারাশি॥
সেই অহঙ্কার ধরে, মোর নাম গান করে,
বাউলী করিলা গুরু মাঝে।
কি করিতে কি না করি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
দূর কৈল যত লোক লাজে॥
ঘুচায়ে নিরিবন্ধ, কৌতুকী বিষম কন্দ,
কত রঙ্গ প্রকাশয়ে সেই।
প্রবেশ করিল কাণে, তাপিত হইল প্রাণে,
পরিহাসে মন হরিলেই॥
যখন রন্ধনে থাকি, বাজে রাধা নাম ডাকি,
বিপরীত রন্ধনেতে করে।
জয়কৃষ্ণ দাসে ভণে, হেরিয়া রাধার পানে,
কৃষ্ণদূতী বুঝহ অন্তরে॥"

এই কবিতায় কবি আপনার জন্মভূমির ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন—ব্রজভাষা ছাড়িয়া

দিয়াছেন। ইহাতেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে সেকালে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় ব্রজভাষার ব্যবহারও যেন বৈষ্ণব কবিগণের কবিপ্রসিদ্ধি মধ্যে পরিগণিত ছিল।

ক্রমে শ্রীরাধিকা লজ্জাভয় হারাইলেন, তাঁহার গুরুজনগঞ্জনার ভয় রহিল না। সে সংসারে থাকিয়া অহর্নিশি কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান সার করিতে পারা গেল না, সে সংসারের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান দূরে গেল, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—

"কানুক কলঙ্ক ভূষণ পরিয়া,
যোগিনী হইয়া যাব।
জাতি শীল কুলে, তিলাঞ্জলি দিয়া,
নবরূপ ধিয়াইব॥
এ ঘর করণ, কিসের কারণ,
সকলই মিছাই বন্ধ।
শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
পরমে গোকুল চন্দ॥
ভাবিতে ভাবিতে, মনে নাহি চিতে,
সদাই ঝুরি মরি।
এ নব যৌবন, গেল অকারণ,
কি করিতে কি না করি॥
অন্ন জল আর, সবে ভেল দূর,
ঔষধ সমান মোরে।
জলজ লোচন, রাতুল চরণ,
জয়কৃষ্ণদাস ঝোরে॥"

শ্রীরাধিকার বিরহাগ্নি ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিল, তিনি সুস্থির হইতে না পারিয়া অভিসারিকা হইলেন, একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শুভদর্শনলাভ লালসায় গমন করিলেন, ঈশ্বরাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী—তিনি শ্রীরাধার প্রেমভক্তি বুঝিতেন, তাঁহার বৈরাগ্য দর্শনে স্বয়ং ব্যথিত হইলেন, অনুরাগিণী রাধিকাকে দর্শন দিবার জন্য নন্দগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইলেন। পথিমধ্যে উভয়ের শুভ সাক্ষাৎকার—কিন্তু শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে অনেক কষ্ট ভুগিয়াছিলেন, দুশ্চিন্তার তাড়নায় অনেকবার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, এই সময়ে সে সকল কথা মনে উদিত হইল, একটু অভিমান দেখা দিল,—তিনি মানিনী হইয়া "মান" করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় জন্মিল, যাহাই হউক পশ্চাৎ শ্রীকুঞ্জে তাঁহাদের শুভ সম্মিলন ঘটিল—প্রণয়ীযুগল পরিতৃপ্ত হইলেন।

বৃন্দাবনের যাবতীয় গোপবালা সকলেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ছিলেন—সকলেরই মনে কৃষ্ণ প্রেমের প্রবল তরঙ্গ নিয়ত উঠিত, খেলিত, মিশাইত। অল্লাধিক সকলেরই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ

হইয়াছিল বটে, কিন্তু শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী সমধিক সৌভাগ্যবতী, এতদুভয়ে শ্রীকৃষ্ণের বড় অনুকম্পা ছিল। তাঁহাদের উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিনী। নিশাবশেষে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকাও সে রাত্রিতে তাঁহার মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না, সে রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার মিলিল না, অধিকন্তু চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপনের কথা উঠিল, মানময়ী শ্রীরাধিকা "মানিনী" হইলেন। নিম্নোক্ত কবিতায় শ্রীরাধার মানবর্ণন করিয়াছেন,—

"দুর্জ্জয় মানিনী রাধা,
শ্যামা সখীক দূরহি তেজল
উপপাদ দারুণ বাধা॥
ভ্রমরক নাদ, নাদ পিককুল,
শ্রুতিপথে পরশ নুপুর।
স্তনযুগল ঘন, চন্দনে লেপই,
লোচনে কাজর দূর॥
চারু চিবুকপর, মৃগমদ তেজল,
তেজল নীলিম বাস।
অম্বরে জলধর, তাহা নাহি পেখই,
পটাঞ্চলে বদন বিকাশ॥
তমাল তরুবরে, চুণ লেপায়ল,
ক্রোধহি পরিপূর অঙ্গ।
শ্যামরু দূতী প্রতি, ভয়ভীত অন্তরে,
বচন না করু ভঙ্গ॥
দূতহিঁ দূত চলু, মিলনি শ্যামরু,
দারুণ দারুণ মান।
জয়কৃষ্ণ দাস বোলে সুমধুর
আপেসি ধারহ কাণ॥"

মান-বর্ণনা পরিপাটী হইয়াছে। তাহার পর সাতটী পদ বা কবিতায় দূতী মানপরিহারার্থ শ্রীরাধিকাকে বুঝাইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মান ভাঙ্গিল না। প্রথম কবিতাটী নাতিদীর্ঘ হইলেও তদ্দ্বারা কবির কৃতিত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে জগজ্জনজীবন, ও ঐশ্বরিক অন্যান্য বহুল গুণগ্রামে বিভূষিত করা হইয়াছে,—

রাগ দেশা।

শুনহ সুন্দরী রাধা।
গোকুল চাঁদহি, মোহে পাঠায়ল,
তেজই জানকি রাধা॥

সো বর নাগর, গুণের সাগর,
জগজন প্রাণহি প্রাণ।
সো মুখমাধুরী, বচন চাতুরী,
ব্রজভরি গুণীগণ গান ॥
পশুপাখী নরে, মগন দরশনে,
মৃততরু অঙ্কুরিত হয়।
আপনক ভাগী, মানহি সুন্দরি,
প্রসন্ন নাগর তোয় ॥
তোহারি নামগুণ, সদত রটতহি,
তুহু তাহে পরম সোহাগী।
মানহি তেজল, দূতী পরবোধয়ে,
জয়কৃষ্ণ দাস অনুরাগী ॥”

শ্রীরাধার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা চরম সীমায় পঁহুছিয়া ছিল—কবি জয়কৃষ্ণ দাসের শ্রীকৃষ্ণকে তজ্জন্য বিদেশিনী, সন্ন্যাসিনী বা নাপিতিনী সাজিতে হয় নাই, অথবা “দেহিপদপল্লব মুদারম্” বা নিজ মুখে তদনুরূপ অনুনয় বিনয় করিতে হয় নাই—দূতীর উক্তিতেই কবি তাঁহার ব্যাকুলতা যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছেন,—

রাগ আমোদ।

দূতী বলে শুন রাধে, নিবেদি তুয়া পদে,
তোমার অপেক্ষা ধরি কাণ।
তরুতলে করি বাস, রাধা রাধা রাধা ভাষ,
ঢর ঢর অরুণ বয়ান ॥
পুলকে কদম্ব অঙ্গ, ক্ষণে ধরে কত রঙ্গ,
দশদিক্ করয়ে নেহার।
ক্ষণেক রোদন করে, ক্ষণে ডাকে উচ্চস্বরে,
মুরছি পড়য়ে বারেবার ॥
বাউলীর প্রায় হৈয়া, ইতিউতি ধায় ধায়্যা,
ক্ষণে স্থিরে আত্মনিন্দা করে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ আয়, রজনী বহিয়া যায়,
মিলাইয়া দেহ দূতী মোরে ॥
এসব প্রলাপ করে, তুমি মান কর দূরে,
অতি ঝাট করহ পয়ান।

শুনিয়া এসব কথা, চলিলা রাধিকা তথা,
জয়কৃষ্ণ দাস রস গান ॥”

দূতী কত যত্ন করিয়া, কত বুঝাইল, কিছুতেই রাধিকার মানভঞ্জন হইল না, কিন্তু আপনা হইতেই সেই দুর্জ্জয়মান ভগ্ন হইল। মান ভাঙ্গিল, কিন্তু মিলন হইল না—মথুরা হইতে অক্রুর বৃন্দাবনে আসিলেন, কংসের বধসাধনকাল সমাগত, অতএব তাঁহার মথুরাগমন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কৃষ্ণলীলার একটী প্রধান কাজ কংসবধ—অন্য কথা কি, পুরাণকারের মতে কংস-বধের জন্যই কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। অতএব কৃষ্ণাবতারের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য শ্রীরাধিকার মানের খাতিরে বন্ধ বা বিলম্ব হইতে পারে না। ঈশ্বরাবতারের পক্ষে তাহা শোভা পায় না। শ্রীকৃষ্ণের মধুপুর যাত্রা অবধারিত হইল, বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিদায়বার্ত্তা ঘোষিত হইল, রাধিকা তাহা শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতা হইলেন, তাঁহার দুর্জ্জয়মান দূরে গেল, ব্যথিত হৃদয়ে, আকুল প্রাণে তিনি অস্থির হইলেন, উন্মাদিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—

কাঁহা তুহু যায়ব, তুহে নব নাগর,
বিরহ অনলে মোরে ডারি।
তুহারি বদন চাঁদ, দরশনহু যব,
তব হাম মরণ বিচারি ॥
রহ রহ মন্দির মাঝ।
রসময় সায়র, প্রেম সুধাকর,
কোরে বঞ্চব ব্রজ মাঝ ॥
অরুণহি লোচন, করুণ চাহনি,
লোরহি কত শত ধার।
বোলত গদ গদ, মধুরিম সুন্দরি,
তো-বিনু কো আছ আর ॥
বিরহিনী অসিত, শসিত ঘন ঘন,
কম্পিত অধরহি নাঞি।
কম্পহি কম্পিত, পুলক মুকুলিত,
জয়কৃষ্ণ দাস মুরছাই ॥

শোকের তরঙ্গ বৃন্দাবন উচ্ছ্বাসিত করিল—গোপ সমাজ বিচলিত হইল, নন্দ যশোদা কাঁদিয়া আকুল, গোপাঙ্গনাগণ ধূল্যবলুণ্ঠিতা, অশ্রু জলে বৃন্দাবনের মাটী ভিজিয়া গেল—বৃন্দাবনের বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে হাহাকার শব্দ—বনে পশু চরে না, গাছে পাখী ডাকে না, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে না—মধুপ মধুপান করে না। কীট পতঙ্গাদি সকলেই নীরব নিস্পন্দ, সকলেই বিষম শোকাচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার এই খানেই অবসান। ইহার পর আর তিনি

ব্রজভূমে প্রত্যাগমন করেন নাই। সেই দিন হইতে বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে আর বংশীধ্বনি হয় নাই, ব্রজবালাগণও আর কালিন্দীকূলে বিহার করে না, বৃন্দাবন শোকাচ্ছন্ন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা—কবি তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কেবল শ্রীরাধিকার বিরহ-বিধুরতার বর্ণনার্থ কয়েকটী কবিতা রসকল্পলতায় গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগ-বিধুরা রাধিকা আকাশকে, মেঘকে, দক্ষিণানিলকে, শুক পক্ষীকে ও হংসকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মথুরা যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে কবি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেগুলি বিলক্ষণ করুণ-রসোদ্দীপিকা, প্রবন্ধের বাহুল্যাশঙ্কায় সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর প্রভাসতীর্থে গোপিনীগণের সহিত শেষ সম্মিলন-বর্ণনা দ্বারা কবি আপনার কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। রসকল্পলতা মধ্যে জয়কৃষ্ণ দাসের রচিত কবিতা সর্ব্বসমেত ৮৪ চুরাশিটী আছে, শশীশেখরের দুইটীমাত্র পদও এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

কাব্যের উপসংহার শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"প্রভাসে রাধার বাণী,　　শুনিয়া গোকুল মণি,
কহে তাহে করিয়া পীরিতি।
দারুণ বিধাতা মোরে,　　আনাইয়া এতদূরে,
রাখে লয়্যা দূর দ্বারাবতী॥
তোমার বিরহানলে,　　সদা মোর হিয়া জ্বলে,
ডুবি ভাসি ভাবনা-সাগরে।
কি করিতে কি না করি,　　ধৈরজ ধরিতে নারি,
সদা ধ্যান করিতে তোমারে॥
আছে দুই চারি সুর,　　নারায়ণ-শক্তি হেতু,
নষ্ট কৈলে যাবো বৃন্দাবনে।
তুমি মোর দুনয়ন,　　আমার অমূল্য ধন,
তোমা-বিনু কি আছে ভুবনে॥
করুণ নয়নে নীর,　　ভিজিল হিয়ার চীর,
পুন কহে গদ্‌গদ ভাষা।
জয়কৃষ্ণদাস ভণে,　　করুণা করিয়ে মনে,
দীনবন্ধু চরণ ভরসা॥
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
"রসকল্পলতা" কহে জয়কৃষ্ণ দাসে॥"

ইহার পর কবির পরিচয়জ্ঞাপক একটী শ্লোক দৃষ্ট হয় যথা,—

"গড় বাড়ী * বস বাস, শ্রীরাম মোহন দাস,
নিত্যানন্দ-প্রেমে মগ্ন অতি ।
তস্য সুত কেনারাম, সদা মুখে গৌর নাম
বিনা অন্য দেবে নাই মতি ॥
রথযাত্রা বাল্যকালে, শিক্ষা করি কুতূহলে,
কিছু কালে তাহে মত্ত ছিলা ।
ইথে গৌর ইচ্ছা মনে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে,
দক্ষ হবো মনেতে করিলা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে, মোহন ছুতরের ঘরে,
কীর্ত্তনের আদরশ (আদর্শ) আনিল ॥
প্রথমেতে গৌরচন্দ্রী, শিক্ষা করি মহানন্দী,
ক্রমে ক্রমে শিখিলা সকল ।
ছিনু আগে কেনারাম, অশেষ কৃপার ধাম
গুরু দিলা জয়কৃষ্ণ নাম ।
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি, তাই পরিচয় করি,
সাধ ইথে না হইবে বাম ॥
গৌরকৃপার কথা, রচি রসকল্পলতা,
লিখি তিঁহো যেবা লেখাইল ।
শকে শশী ষড় বিন্দু, তায় মিলাইয়া সিন্ধু,
মার্গ শীর্ষে সমাপ্ত হইল ॥"

জয়কৃষ্ণ দাসের রসকল্পলতার কোথাও অশ্লীলতাদোষ দৃষ্ট হয় না ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত ।

* জেলা হুগলির আরামবাগ মহাকুমার কাছারী হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে বায়ড়া পরগণার রাণা রঞ্জিৎ-সিংহের গড়ই গড়বাড়ী নামে পরিচিত ।

দেবমূর্ত্তি—জেমো।

দেবমূর্ত্তি—উদ্ধারণপুর।
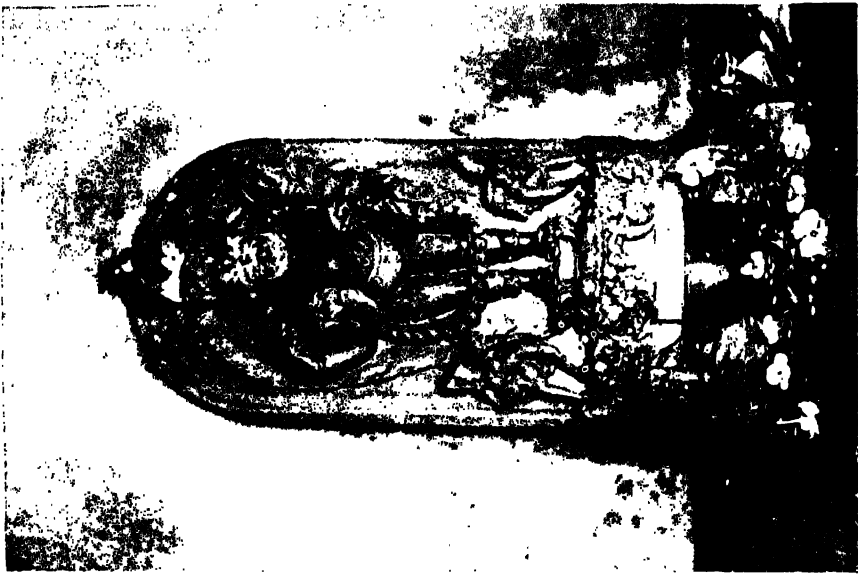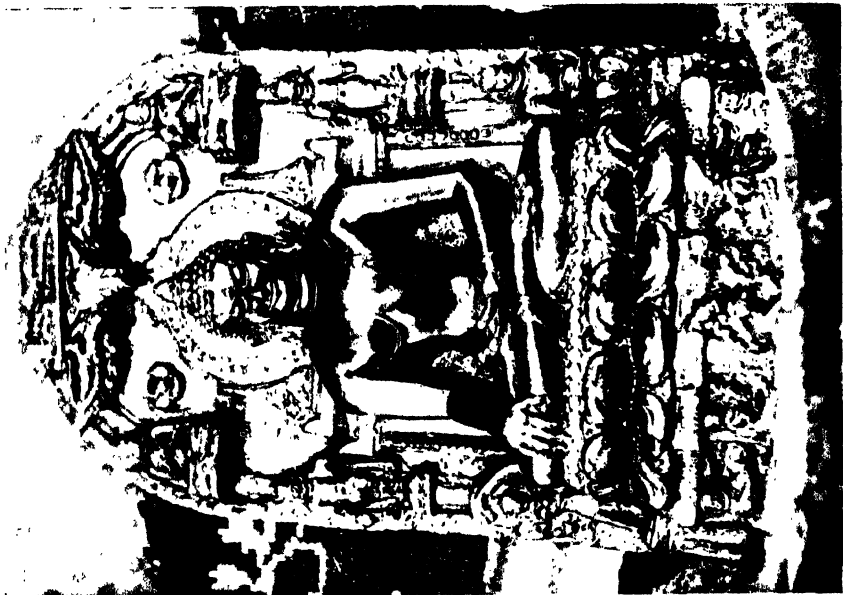
গ্রাম-দেবতা

এই প্রবন্ধে জেমোকান্দি নামক গ্রামের প্রধান গ্রাম্যদেবতার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তৎপূর্ব্বে জেমোকান্দির সম্বন্ধে একটু বিবরণ আবশ্যক। মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ—ভাগীরথীর পশ্চিমতীর হইতে বীরভূমির সীমানা পর্য্যন্ত কান্দি মহকুমা। কান্দি মহকুমার উত্তরাংশে দ্বারকা ও মধ্যভাগে ময়ুরাক্ষী নদী বীরভূম জেলা হইতে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদয় নদী মিলিত হইয়া বাবলা নাম ধরিয়া ভাগীরথীর সমান্তরপ্রবাহে কিছু দূর গিয়া কাঁটোয়ার উত্তরে উদ্ধারণপুর গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

গত সেনসাস্ তালিকার মতে কান্দি মহকুমার বিবরণ এইরূপ—

কান্দি সবডিবিশন—আয়তন ৫১২ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা—৮৮৪, গৃহসংখ্যা—৭১১১৮, লোকসংখ্যা—৩,৩৪,০৫৩; থানা অনুসারে লোকসংখ্যা—(১) কান্দি—৩১৯২৪, বরেঁায়া—৬৯,৮০৬, খড়গাঁ—৬৩,৭৭২, ভরতপুর—১,২১,৯৪৭, গোকর্ণ—৪৬,৬০৪। মহকুমায় হিন্দু—২,১৯,৯৭৩, মুসলমান—১,১২,১১৪, প্রেতোপাসক (animist)—১৯১৬।

ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্ব্বতীরে কান্দি বা জেমোকান্দি, মিউনিসিপালিটির অধীন নগর—লোক-সংখ্যা প্রায় ১২০০০; পাঁচ ওয়ার্ডে বিভক্ত—কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া, ছাতিনাকান্দি।

কান্দি ও ভরতপুর থানার সমুদয় ও বরেঁায়া ও গোকর্ণের কিয়দংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণা। স্থানীয় কিংবদন্তী যে আকবর বাদশাহের আমলে ফতেসিংহ নামক হাড়ি রাজার অধিকারে থাকায় পরগণার ঐ নাম হয়। রাজা মানসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠান দমনে আসেন, সেই সময়ে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী বুন্দেলখণ্ডবাসী জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ সবিতাচাঁদ দীক্ষিত হাড়িরাজাকে পরাস্ত করিয়া ঐ পরগণা দিল্লীর অধীন করেন ও মানসিংহের কৃপায় ফতেসিংহের জমিদারী পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সবিতার বংশধরেরা তদবধি ফতেসিংহের অধিকারী আছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহের আমলে জমিদারি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এক খণ্ডের অধিকারীরা বর্ত্তমান জেমোর রাজা ও অন্য খণ্ডের অধিকারীরা বাঘডাঙ্গার রাজা নামে ফতেসিংহে পরিচিত। বাঘডাঙ্গার অধিকৃত ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুর ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কান্দির উত্তরে খড়গ্রাম থানার অন্তঃপাতী সেরপুর আতাই গ্রামে মানসিংহ ওসমানের অধীন পাঠানসেনা ধ্বংস করেন।

কান্দি মহকুমা উত্তর রাঢ়প্রদেশের উত্তরাংশ—কান্দি গ্রাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কেন্দ্র। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কান্দি ও

তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেন; সেখান হইতে তাঁহাদের বংশীয়েরা বাঙ্গলা ও বিহারে বিস্তৃতি লাভ করেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহের জন্মস্থান কান্দি—ঐ অঞ্চলে তাঁহার বংশধরেরা কান্দির রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ—কলিকাতায় তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজ-পরিবার নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কালে কান্দির এণ্ট্রান্স স্কুল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি যাহা কিছু সৌষ্ঠব, সমস্তই লালাবাবুর বংশের প্রসাদে অনুষ্ঠিত।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে উত্তররাঢ় একটু বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ফতেসিংহ পরগণার উত্তর প্রান্তে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাঙামাটি গ্রাম—যাহাকে অনেক পণ্ডিতে হুয়েংচ্যাং বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানীর অবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। ঐ স্থান বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী, কান্দি বহরমপুর হইতে অষ্টক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে।

উত্তররাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। তন্ত্রবর্ণিত একান্ন মহাপীঠের মধ্যে অন্যূন সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫।১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহাদের অবস্থিতি এইরূপ দেওয়া আছে—

১। অট্টহাস—দেবী ফুল্লরা—লুপলাইন আমেদপুর ষ্টেশনের নিকট।

২। কিরীট—দেবী বিমলা—বহরমপুরের নিকট বড়নগরের সন্নিহিত।

৩। নলহাটী—দেবী কালিকা—লুপলাইনে নলহাটি ষ্টেশন।

৪। বহুলা—দেবী বহুলা—কাঁটোয়ার সন্নিহিত কেতুগ্রাম।

৫। ক্ষীরগ্রাম—দেবী যুগাদ্যা—কাটোয়ার সন্নিহিত।

৬। বক্রেশ্বর—দেবী মহিষমর্দ্দিনী—বীরভূম সিউড়ির নিকট।

৭। নন্দিপুর—দেবী নন্দিনী—লুপলাইন সাঁইথা ষ্টেশন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির বাসহেতু কান্দির সমীপবর্ত্তী কতকগুলি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। যথা—(১) ভরতপুর—গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতা হৃদয়ানন্দের বাসস্থান। তাঁহার বংশধরদের গৃহে চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর চিহ্নিত যে গীতাগ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহার ফটোগ্রাফ গত ভারত-শিল্প-প্রদর্শিনীতে সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল। (২) মালিহাটি—শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের বাসস্থান। (৩) টেঁয়া—দ্বিজ হরিদাস এবং বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের বাসভূমি। (৪) ঝামটপুর—কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসভূমি। (৫) উদ্ধারণপুর—উদ্ধারণদত্তের নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

এই প্রবন্ধে কান্দির প্রধান গ্রামদেবতার বিবরণ দেওয়া হইতেছে। দেবতার নাম রুদ্রদেব—কান্দি ও পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের অধিবাসী ইঁহার ভক্ত-উপাসক। রুদ্রদেবের বর্ত্তমান মন্দির কান্দির অন্তর্গত জেমোগ্রামে অবস্থিত; ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ-জমিদার জেমো ও বাঘডাঙ্গার রাজারা তাঁহার সেবাইত। Journal of the Asiatic Society Part III (Anthro-

pological Part) No I, 1898, গ্রন্থে এই দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল ; প্রবন্ধের নাম "On a Rain Ceremony from the District of Murshidabad," লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্। কোন বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিলে মন্দিরস্থ দেববিগ্রহকে কলসী কলসী জল তুলিয়া একবারে জলমগ্ন করিতে পারিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন ; মন্দিরের দ্বার ও ছিদ্রাদি বন্ধ করিতে আপত্তি নাই ; নতুবা ঘরের ভিতর জল দাঁড়াইতে পারিবে না। রুদ্রদেবের মানস করিয়া লোকে শূল প্রভৃতি ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করে ; রুদ্রদেবের পাণ্ডারা কুকুরদংশনের ও সর্পদংশনের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

দেবতার ইতিহাস এই,—সিংহোপাধিক উত্তররাঢ়ীকায়স্থগণের মূলপুরুষ অনাদিবর সিংহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার বংশধর বনমালী সিংহ ময়ূরাক্ষীতীরে বন কাটিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন ও তদবধি কান্দি গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। বনমালীর বংশধর রুদ্রকণ্ঠের সময়ে কামদেব ব্রহ্মচারী নামক সিদ্ধ সন্ন্যাসী বৃক্ষারোহণে আকাশপথে কামরূপ হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, তিনি ময়ূরাক্ষীতীরে অবতীর্ণ হইয়া কান্দিতে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার নিকট দুইটি দেববিগ্রহ ছিল ; উভয়কেই তিনি কালাগ্নিরুদ্রমূর্ত্তি বোধে উপাসনা করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য আদি গোঁসাই ; রুদ্রকণ্ঠ সিংহও তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রুদ্রকণ্ঠকে বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করিয়া পূজার ভার দিয়া যান। পরবর্ত্তীকালে ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদারেরা রুদ্রকণ্ঠের বংশধরের নিকট বিগ্রহদ্বয় কাড়িয়া লন। তদবধি বিগ্রহদ্বয় ফতেসিংহের জমিদারের নিকট গৃহদেবতা ও সর্ব্বসাধারণের নিকট গ্রামদেবতারূপে পূজিত হইতে থাকেন।

চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বে "দাদুরঘাটা" উপলক্ষে বিগ্রহদ্বয় সমারোহে গঙ্গাতীরে স্নানার্থ নীত হইত। গঙ্গা কান্দির চারিক্রোশ পূর্ব্বে। একবার স্নানের সময় বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যে অন্যতর বিগ্রহ অন্তর্হিত হন ও গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুর গ্রামে প্রকাশ হন। তদবধি তিনি উদ্ধারণপুর গ্রামে অবস্থান করিয়া তত্রত্য জনসাধারণের পূজা পাইতেছেন ; এবং জেমোর দেবতার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জেমো ও উদ্ধারণপুর উভয় স্থলেই পূজা ও অনুষ্ঠানের প্রণালী একরূপ ; চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বে গাজনের পূজা উদ্ধারণপুরে একদিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ পরে বুঝান যাইবে।

উক্ত কিংবদন্তী হইতে কামদেব ব্রহ্মচারীর আনুমানিক কালনির্ণয় হইতে পারে। ফতেসিংহের বর্ত্তমান জমিদারেরা সবিতাচাঁদ দীক্ষিতের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ ; আর পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর রুদ্রকণ্ঠ সিংহ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ। সবিতাচাঁদ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহের সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন, অতএব ষোড়শশতাব্দীর প্রথমভাগে কামদেব গোস্বামী ও রুদ্রকণ্ঠ সিংহ বর্ত্তমান ছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত।

চৈত্রমাসের শেষভাগে রুদ্রদেবের গাজন বা বার্ষিক উৎসব। ১৯শে চৈত্র উৎসবের

আরম্ভ; তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবতা বেশভূষা করিয়া "বার" বা 'দরবারে' বসেন। পরিচারক ভক্ত ও দর্শকেরা ঢাকের বাদ্য সহ মন্দিরে উপস্থিত হন। বেতনভোগী পূজক ও পরিচারক ব্যতীত অবৈতনিক কর্ম্মচারী ও পরিচারক অনেকগুলি আছেন; সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকে পুরুষানুক্রমে এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্মান বোধ করেন। কর্ম্মচারীদের শ্রেণিবিভাগ যথা—

(১) পূজক ও পরিচারক ব্রাহ্মণ—ইঁহারা ভূমিসম্পত্তি বা বেতন ভোগ করেন।

(২) দেয়াশীল
(৩) বিষয়া
(৪) মচানা
(৫) মলমত্তি
(৬) স্বর্ণমত্তি

ইঁহারা নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট পরিচর্য্যায় নিযুক্ত; দেবতার শয্যা অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি ইহাদের জিম্মা।

(৭) কোতোয়াল
(৮) থানাদার
(৯) চৌকিদার
(১০) নকিবদার

ইঁহারা শান্তিরক্ষাদি কর্ম্মে নিযুক্ত।

(১১) ছড়িদার
(১২) আশাবরদার
(১৩) শোটাবরদার
(১৪) আড়ানিবরদার
(১৫) নিশানবরদার
(১৬) চামরবরদার

ইঁহারা বারের সময় দেবতার পার্শ্বে সসজ্জ হইয়া উপস্থিত থাকেন ও মিছিলের সময় সঙ্গে যান।

(১৭) মের্দ্ধা—সংখ্যায় চল্লিশ জন, ইঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী চল্লিশখানি গ্রামের প্রতিনিধি। গ্রামস্থ লোক রুদ্রদেবের প্রজা; মের্দ্ধাগণ প্রজামধ্যে মণ্ডলস্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন যাহারা গাজনের সময় ব্রতগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের নাম 'ভক্ত'। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল বাউড়ি পর্য্যন্ত সকলেই ব্রতগ্রহণে অধিকারী; শ্রেণিভেদে তিন দিন হইতে পোনের দিন পর্য্যন্ত ব্রতগ্রহণের নিয়ম। ব্রতধারীর পক্ষে দিনের ব্যবস্থা উপবাস, সন্ধ্যার পর ফলমূল ভোজন। ব্রতধারীর চিহ্ন, স্কন্ধে "উত্তরী" ও হস্তে "বেত্রদণ্ড"; উত্তরী রেশমে বা কার্পাস-সূত্রে নির্ম্মিত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভক্তেরা অপরাহ্ণে গ্রামস্থ নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে একসঙ্গে স্নান করেন ও পরস্পরের গলায় "উত্তরীয়" পরাইয়া ব্রতগ্রহণ করেন। এইরূপে সহস্রাধিক লোকে ব্রতগ্রহণ করেন; নিম্নশ্রেণির লোকই অধিক।

সন্ন্যাসীদের শ্রেণিভেদে উপাধিভেদ ও কর্ম্মভেদ আছে। যথা—

(১) কালিকার পাতা—ইহারা পিশাচবেশে মৃত নরদেহ লইয়া নৃত্য করে, অনুষ্ঠানের নাম "মড়া খেলা"।

(২) মায়ের পাতা—ইহারা ডাকিনী সাজিয়া নাচিয়া বেড়ায়। পরিচ্ছদ রাঙা কাপড়, গলায় ফুলের মালা, গায়ে রূপার গহনা, মাথায় লম্বা চুল, মুখে আবিরের প্রলেপ, হাতে বেত্রদণ্ড, মুখে চীৎকার, ইহাদের লক্ষণ।

(৩) চামুণ্ডার পাতা—ইহাদের সাজসজ্জাও ঐ রূপ বিকট; উপরন্তু মুখে মুখোস পরিয়া ইহারা নাচে, অনুষ্ঠান "মুখোস খেলা" বা "মোস খেলা"।

(৪) লাউসেনের পাতা—ইহারা লাউ, কুমুড়া প্রভৃতি হাতে লইয়া নাচে।

(৫) ধূলসেনের পাতা—ইহারা ধূলি ছড়ায়।

(৬) ব্রহ্মার পাতা—ইহারা হোমাগ্নি বহন করে।

(৭) জলকুমরির পাতা—ইহারা খেচুরি ভোগ জলে ডুবায়।

ঐ সকল সন্ন্যাসীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; তদ্ব্যতীত সাধারণ ভক্তের সংখ্যার কোন নির্দ্দেশ নাই; এবং সাধারণ ভক্তের সংখ্যাই অধিক।

১৯শে চৈত্র ব্রত বা উৎসবের আরম্ভ। ঐ প্রথম দিনের সায়ংকালে অনুষ্ঠান "কাঁটা ভাঙা",—এ দিন সন্ন্যাসীরা কাঁটাগাছের ডালে শয্যা রচনা করিয়া তাহার উপর গড়াগড়ি দেয়। তৃতীয় দিন পুনরায় কাঁটাভাঙা। ষষ্ঠদিনে সন্ধ্যার পর "সিদ্ধি ভাঙা"—সে দিন সকলে সিদ্ধি খায়। নবম রাত্রিতে "চোরা জাগরণ",—সে দিনও কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। দশম রাত্রি "জাগরণ"—এই দিন সমারোহ-ঘটনা। সহস্র সন্ন্যাসী ও সহস্রাধিক দর্শকে মন্দির ও পার্শ্বস্থ স্থান পূর্ণ হয়; সমস্ত রাত্রি ঢাকের বাদ্য ও জনকোলাহল; প্রত্যেক গ্রাম হইতে ভক্তের দল মের্দ্ধার অধীনতায় ঢাকের সহিত মন্দিরে উপস্থিত হয়। মায়ের পাতা, চামুণ্ডার পাতা প্রভৃতি সকলে আসিয়া নাচিতে থাকে। গভীর রাত্রে "শাঁখ চুরি"—পূজার দ্রব্যমধ্য হইতে একটা শঙ্খ হঠাৎ অদৃশ্য হয়, কোতোয়াল চৌকিদার প্রভৃতি চোর ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করে, শেষে দর্শক মধ্য হইতে চোর ধরা পড়ে, তাহার বিচারশেষে দণ্ড হয় একমুদ্রা। বলা উচিত, একই ব্যক্তি প্রতিবৎসর শাঁখচুরির জন্য ধরা পড়িতেছে, এবং সে পুরুষানুক্রমে শাঁখচোর। শেষরাত্রির অনুষ্ঠান "মড়া খেলা"—বীভৎস ব্যাপার। "কালিকার পাতা"রা আস্ত মড়া—মনুষ্যের শবদেহ,—অনেক সময় গলিত শব—আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাদ্য ও ধূপের ধূঁয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূর্ব্বে শব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাদুরি, অভাবে গোটাকতক শুকনা মাথা। শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নিরুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্য্যত্বে সংশয় নাই। কান্দি মহকুমার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা উপলক্ষেও এই বীভৎস অনুষ্ঠান চলিত আছে; ১২৮৮ সাল হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বাস্থ্যরক্ষার অছিলায় কান্দির মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; তদবধি

মড়াখেলা বন্ধ হইয়াছে, এখন কালিকার পাতারা কেবল নাচে, কখনও বা নারিকেল ফলে নরমুণ্ডের অনুকরণ করে।

ওয়াডেল সাহেব তাঁহার Lamaism or Buddhism in Tibet নামক গ্রন্থে লামাদের অনুষ্ঠিত যে সকল পৈশাচিক অভিনয়ের সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পড়িলে বোধ হয়, তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত অনুষ্ঠানের সহিত এই "মড়াখেলা" অনুষ্ঠানের কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকিতে পারে।

সূর্য্যোদয়ের পর দেবতাকে পালকিতে চাপাইয়া ময়ূরাক্ষী তীরে যেখানে কামদেব ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে, সেইখানে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রামের ভদ্রলোক পালকি বহন করেন; আপামর সাধারণ সমারোহে কোলাহল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। নদীতীরে উপস্থিতির পর অহোরাত্রের অনুষ্ঠান যথা :—

১। অভিষেক—অর্থাৎ যথাবিধি স্নান।

২। পূজা, হোম, বলিদান ;—পূজান্তে পায়সান্ন ভোগ।

৩। "দাতুর ঘাটা"—রুদ্রকণ্ঠ সিংহের কোন বংশধরের আনীত তেল মাখাইয়া দেবতাকে নদীর জলে স্নান করান হয়। পূর্ব্বে এই দাতুরঘাটার জন্য দেবতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত। দ্বিতীয় বিগ্রহের অন্তর্দ্ধানাবধি উহা বন্ধ হইয়াছে।

৪। সমাগত উপাসক ও দর্শকদিগের প্রদত্ত পূজা, ভোগ, প্রণামী।

৫। রাত্রিকৃত্য,—উদ্ধারণপুরে দাতুরঘাটা পূর্ব্বদিনে সম্পাদিত হয় এবং এই দিন সেখানকার মন্দির বন্ধ থাকে। সেখানকার দেবতা অদ্যাপি কামদেব ব্রহ্মচারীকে ভুলেন নাই। অদ্য রাত্রিতে তিনি ময়ূরাক্ষী তীরে ব্রহ্মচারীর সমাধির উপর বসিবার জন্য অদৃশ্য ভাবে উপস্থিত হন। পূজক ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত পদ্ধতি ক্রমে উভয় দেবতার একসঙ্গে পূজা করেন। নিদাঘকালে তান্ত্রিক আচারে পূজা হয়। পূজার নিয়ম সাধারণের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। পূজার পর মৎস্যসহ খেচুরি ভোগ। ভোগের যাবতীয় উপকরণ ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়। জমিদারের পক্ষের গোমস্তা ভিক্ষার দ্রব্য লইয়া আগে হইতে উপস্থিত থাকেন। ভোগের পর জলকুমরির পাতা সেই অন্ন নদীজলে অর্পণ করে। ইহাতে নানা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে—কোমরে কাছি বাঁধিয়া জলকুমরিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; নদীতীরে লোকে দড়ি ধরিয়া দাঁড়ায়। তিনি অন্নের হাঁড়ি মাথায় লইয়া জলে ডুব দেন ও তখনই অচেতন হইয়া পড়েন। অচেতন হইতেই হইবে। তীরবর্ত্তী লোকে দড়ি টানিয়া তাঁহাকে উপরে তোলে ও চৈতন্য সম্পাদন করে।

পরদিন পুনরায় পালকি চাপিয়া সমারোহ সহকারে মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। এই দিন চৈত্রসংক্রান্তি। মন্দিরে আসিয়া পুনরায় স্নান পূজা হয়; সাধারণে পূজা দেয়, ও বহু ছাগশিশুর বলিদান হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রতধারী সন্ন্যাসীরা আপন গ্রামের নির্দ্দিষ্ট জলাশয়ে স্নান করিয়া উত্তরী ত্যাগ করিয়া ব্রত সমাপণ করেন। পূর্ব্বে এই দিন চড়ক হইত; এখন তাহা নিষিদ্ধ।

অপর পৃষ্ঠায় জেমো ও উদ্ধারণপুর উভয় স্থানের দেবমূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। গত অগ্রহায়ণ মাসে সাহিত্যপরিষৎ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়কে ফটোগ্রাফার সমেত ঐ প্রদেশের স্থানীয় তথ্যসংগ্রহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহারাই এই ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার লিখিত স্থানীয় তত্ত্বের বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উভয় প্রতিকৃতি দেখান হইয়াছিল। তিনি নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"জেমোর রুদ্রদেবের মূর্ত্তি বস্তুতঃ শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। শাক্যমুনি পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট :—পার্শ্বে বোধিসত্ত্বগণ ও দেবগণ বর্ত্তমান—পদ্মাসনের নীচে উপাসকেরা অবস্থিত। উপরে পালঙ্কের উপরে মহাপরিনির্ব্বাণোন্মুখ বুদ্ধদেব শয্যাশায়ী। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি। গলদেশে যজ্ঞসূত্র ব্যতীত নাগোপবীতের চিহ্ন রহিয়াছে—সমাধিমগ্ন বুদ্ধদেবও নাগবেষ্টিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ললাটে তৃতীয় লোচনের চিহ্ন আছে। এই তৃতীয় লোচনও সম্ভবতঃ নাগোপবীতবৎ উত্তরকালে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। বুদ্ধমূর্ত্তি বহুস্থানে মহাদেবের মূর্ত্তিতে এইরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

উদ্ধারণপুরের বিগ্রহ ভৈরবমূর্ত্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহার নাম বজ্রভৈরব, হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রচূড় বা রুদ্রভৈরব। তাঁহার চারি হাত; তিন চক্ষু, গলে নরমুণ্ডমালা; এক হাতে বজ্র ধরিয়া ডাকিনী পিশাচী প্রভৃতিকে শাসন করিতেছেন। অন্য হাতে পদ্মদল; ঊর্দ্ধে সর্পফণা। উভয় পার্শ্বে ভৈরবের শক্তি নারীমূর্ত্তি। ভৈরবকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; পদ্মাসনের নীচে উপাসকেরা কম্পিত-কলেবরে অবস্থিত।"

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত রুদ্রদেবসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"গত প্রদর্শনীক্ষেত্রে জেমোর রুদ্রদেবের মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম, সেই সময় আমার সন্দেহ হয় যে ইহা বুদ্ধমূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন পরিষদে "প্রদর্শনীতে পরিষৎ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেদিন আমি এই মূর্ত্তি যে বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছি। এই প্রমাণ কলিকাতা মিউজিয়ামের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মূর্ত্তিটি একটি বৃহৎ পদ্মের উপরিস্থিত সিংহাসনে আসীন। প্রকাশিত চিত্র দেখিলে বোধ হইবে যে, নিম্নলিখিত সাধনা এই মূর্ত্তিরই ধ্যান। মূর্ত্তির মস্তকের উপর একটি বৃক্ষের দুই একটি শাখা দেখা যায়, ইহা মহাবোধিদ্রুম। বৃক্ষশাখার উপরে পর্য্যঙ্কে শয়ান অপর একটি মূর্ত্তি আছে। ইহা মৃত্যু বা মহাপরিনির্ব্বাণের চিত্র। মূর্ত্তির মস্তকের দুই পার্শ্বে পদ্মের উপর উপবিষ্ট ধর্ম্মচক্র মুদ্রান্বিত দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। স্কন্ধের দুই পার্শ্বে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান অপর দুইটি মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ও বামে লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন। ইহা বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভ-কালের মূর্ত্তি। এই সময়ে তিনি বোধিদ্রুমতলে বজ্রাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত Auguste Foucher (অগস্ত ফুসে) নেপাল হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুথির মধ্যে বজ্রাসনস্থ বুদ্ধের সাধনা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই—

অথ বজ্রাসনসাধনা।

"শ্রীমদ্‌বজ্রাসন বুদ্ধভট্টারকম্ আত্মানং ঝট্ ইতি নিষ্পাদয়েৎ। দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্ম্মারসংঘটিতমহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিতবামকরং ভূস্পর্শমুদ্রাদক্ষিণকরং বন্ধুকরাগারুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনুং সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং (সেবনকবিগ্রহং) বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্মধাতু স্বভাবাত্মকোঽহং ইত্যহঙ্কারং কুর্য্যাৎ।

তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়বোধিসত্বং সুবর্ণগৌরং দ্বিভুজং জটামুকুটধারিণং গৃহীতচামরদক্ষিণকরং নাগকেশরপল্লবধরবামকরং। তথা বামে লোকেশ্বরং বোধিসত্বং শুক্লং জটামুকুটিনং চামরধারিদক্ষিণভুজং কমলধারিবামকরং এতদ্‌দ্বয়ং ভগবন্মুখং অভিবীক্ষ্যমানং পশ্যেৎ।" *

জেমোর রুদ্রদেবের মন্দিরের উঠানে বাঁধান বেদির নীচে এক চণ্ডালীর মুণ্ড সমাহিত আছে, এককালে ঐ মুণ্ডের ভয়ে গ্রামের লোকে বিব্রত হইয়াছিল। রাস্তায় পথিক দেখিলেই ঐ মুণ্ড লাফ দিয়া কামড়াইতে যাইত। কিছুতেই উহার শাসন মানে নাই। অবশেষে কালিকার পাতরা উহাকে ধরিয়া রুদ্রদেবের নিকট খেলাইলে উহা শান্ত হয়। তৎপরে উহাকে সমাহিত করা হইয়াছে, উহার চতুঃপার্শ্বে আরও কতকগুলি নরমুণ্ড সমাহিত আছে।

এই প্রদেশে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কান্দি মহকুমার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায়, কচিৎ বা জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম্মের মন্দির কোথাও মাটির কুটীর, কোথাওবা তাহারও অভাব ;—অশ্বত্থাদি বৃক্ষের নীচে মন্দিরের স্থান। গ্রামের লোকে চাঁদা তুলিয়া বৎসরান্তে পূজা দেয়—গ্রামের লোকেই উদ্যোগকারী—জমিদারের নামে পূজার সঙ্কল্প হয়—জমিদার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি বা অর্থ দিয়া পূজার সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম্ম গ্রামদেবতা ; গ্রামের যাবতীয় লোকে সেই পূজার নির্ব্বাহের জন্য দায়ী। ধর্ম্মের মন্দির অনেক স্থানে জমিদারের খাজনা আদায়কারীর কাছারিতে, কোথাও বা গ্রামের টাউনহলে পরিণত।

পূর্ণিমার গাজনে নিম্নশ্রেণীর লোকেই ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। ঢাকের বাদ্য ও কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি পূজার প্রধান উপকরণ। কোথাও বা হোমের ও বলিদানের ঘটা আছে।

পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রি 'জাগরণ' ; তৎপূর্ব্ব রাত্রি চোরা জাগরণ, জাগরণের দিন 'বাণ গোঁসাই' গ্রাম্য বালকের মাথায় চাপিয়া ঢাকের সহিত ভিক্ষায় বাহির হন। বাণ গোঁসাই দীর্ঘাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড—কাষ্ঠের এক প্রান্তে মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা থাকে। গৃহস্থ স্ত্রীরা বাণ গোঁসাইকে তেল সিঁদুর মাখাইয়া চাউল ভিক্ষা দেন। ভিক্ষার সংগৃহীত তণ্ডুলে ধর্ম্মরাজের পূজা হয়। জাগরণের রাত্রি মণ্ডপে জনকোলাহল ও ঢাকের বাজনা। মাঝে মাঝে "দোলান"

* সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয়ের দিকে তাহার ও বামপার্শ্বে লোকেশ্বরের দিকে সুধনকুমারের মূর্ত্তি আছে।
Foucher, Etude sur L'iconographie Bouddhique De L' Inde, Deuxiéme Partie p. 16 and fig. 1.

গীত। শেষ রাত্রিতে "মুখোস" খেলা; বিকট মুখোস পরিয়া ভক্তেরা নৃত্য করে। রাত্রিশেষে "মড়াখেলা"—রুদ্রদেবের মড়াখেলার অনুরূপ।

মড়াখেলার সময় কালিকার পাতারা ডাকিনীর বেশে শবের চারিদিকে উপবেশন করে—শবের গায়ে আবির মাথায়—শবকে লইয়া নানাবিধ সোহাগ করে—মন্ত্র তন্ত্র পড়ে—চারিদিকে বেষ্টন করিয়া গান গায় ও ঢাকের বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করে। গানের দুই চারিটা নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

১। ওরে সাজ্‌লে—
ধুল ধুল ধুল, সাজলে, ধুল ধুল ধুল।
প'ড়েছে মায়ের পাতা উদম করে চুল॥ [উদাম=মুক্ত]

২। ওরে সাজ্‌লে—
শ্মশানে গিয়েছিলাম মশানে গিয়েছিলেম, সঙ্গে গিয়েছিল কে ?
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই সঙ্গে সেজেছে॥

৩। ওরে সাজ্‌লে—
কা'ল বাছা খেয়েছিলে টুকুইভরা মুড়ি।
আজ বাছার মুণ্ড যায় ধুলায় গড়াগড়ি॥
[টুকুই=তালপাতায় নির্ম্মিত মুড়ি খাইবার ক্ষুদ্র পাত্র]

৪। ওরে সাজ্‌লে—
সোণার আঁচির সোণার পাঁচির সোণার সিংহাসন।
তার উপর ব'সে আছেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥ [পাঁচির=প্রাচীর]

৫। ওরে সাজ্‌লে—
কার গাছেতে কেটেছিলেম খণ্ড কলার বা'ল।
আজ, পুত্রশোকে আকুল হলেম, কেবা দিলে গা'ল॥
[বা'ল=বাইল=শাখা ; গা'ল=গালি]

৬। ওরে সাজ্‌লে—
জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ তামার বাটি।
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ ঢাকের কাঠি॥

৭। ওরে সাজ্‌লে—
তুই ত মেরা ভাই, সাজ্‌লে, তুই ত মেরা ভাই।
তোর সঙ্গে গেলে, সাজ্‌লে, শিব দরশন্ পাই॥ [মেরা=আমার]

৮। ওরে সাজ্‌লে—
ভাল বাজালি ঢেকো ভেয়ে তোর মা আমার মাসী।
এন্যোদ্ কারে বাজা সাজ্‌লে বেনোদ্ ক'রে নাচি॥

[ঢেকো = ঢাকবাদক ; ভেয়ে = ভাইয়া = ভাই ; এনোদ্ = আনন্দ ; বেনোদ্ = বিনোদ]

মধ্যাহ্নে "ভাড়ার আনা"—ভক্তেরা দূরের কোন জলাশয় হইতে কলসী ভরিয়া জল তোলে ও মাথায় লইয়া ঢাকের বাজনার সহিত নাচিতে নাচিতে মন্দিরে উপস্থিত হয়। নাচিবার সময় মূর্চ্ছার অভিনয় হয়—দেবতা মূর্চ্ছাগ্রস্তে "ভর" দেন ও তাহার মুখ হইতে নানা গুপ্তকথা, নানা ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া ফেলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নের রৌদ্রে নাচ—তাহাতে সর্ব্বত্র মূর্চ্ছাভিনয় না হইতেও পারে। তৎপরে পূজা, হোম, বলিদান। সন্ধ্যার সময় 'দাড়ুর ঘাটা'; ধর্ম্মঠাকুর—এক বা একাধিক সিন্দূরমণ্ডিত শিলাখণ্ড পূজারির মাথায় চাপিয়া স্নান করিতে যান ও স্নানান্তে মণ্ডপে মিছিলসহ ফিরিয়া আসেন। মিছিলের প্রধান অঙ্গ "বাণ ফোঁড়া"; একদল লোক পেটের দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা বিন্ধাইয়া কাঁটার দুই অগ্রভাগ একত্র করিয়া তাহাতে নেকড়া জড়ায়; নেকড়ায় তেল দিয়া আগুন জ্বালে ও আগুনের উপর ধূনা ছিটাইলে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহাই বাণফোঁড়া। ইহার সহিত "শঙ" থাকে ও বাদ্যভাণ্ডের অনুষ্ঠান থাকে। রাত্রিকালে যাত্রা প্রভৃতি কবি গানের অনুষ্ঠানে উৎসব সমাপন।

প্রাচীন চম্পা

সার্দ্ধ দুই সহস্র সৎসরের যে কয়েকটি প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধিশালী নগর আজও বর্ত্তমান, তাহার অধিকাংশই হিন্দুতীর্থ। যদি সেগুলি আজও হিন্দুতীর্থরূপে পরিগণিত না হইত, তাহা হইলে প্রাকৃতিক সন্নিবেশসম্পন্ন প্রয়াগ ও কাশীর ন্যায় দুই একটি নগর ব্যতীত অন্য গুলির অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। হিন্দুতীর্থ নয় বলিয়াই বৈশালী, তক্ষশিলা ও শ্রাবস্তীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। যে কয়টি অতি প্রাচীন নগর আজও বর্ত্তমান, চম্পা তন্মধ্যে অন্যতম। চম্পাও এককালে হিন্দুতীর্থ ছিল, কিন্তু পরে চম্পার সে খ্যাতির বিলোপ ঘটে। প্রাচীন চম্পা, চম্পাপুরী বা চম্পানগর নামেও অভিহিত হইত। বর্ত্তমান কালে ইহা চম্পা-নগর বলিয়াই কথিত হয়। তবে প্রাচীন চম্পানগর আরও বিস্তৃত ছিল; বর্ত্তমান ভাগলপুর সহরের পশ্চিমাংশ সমস্তই তখন চম্পানগরের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন রাজ্যগুলির মধ্যে অঙ্গ অন্যতম। অঙ্গ অতি ক্ষুদ্র রাজ্য; বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশই কেবল অঙ্গ-রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রাচীন অঙ্গের রাজধানী চম্পা। মহাভারতে কয়েকস্থলেই ইহার উল্লেখ আছে। যখন বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের জন্ম হইল, তখন কুন্তী আপন কানীনপুত্রকে অশ্বনদীর জলে পরিত্যাগ করিলেন। ভাসিতে ভাসিতে কর্ণ চর্ম্মণ্বতী বা চাম্বল নদীতে আসিলেন; তথা হইতে যমুনায়, পরে যমুনা বাহিয়া ক্রমে গঙ্গায় আসিলেন; অবশেষে মঞ্জুষা অঙ্গরাজধানী চম্পাপুরীতে পঁহুছিল। সূতপত্নী রাধা তখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন; তিনি শিশুকে গ্রহণ করিয়া পালন করিলেন। পরবর্ত্তী কালে কর্ণ দুর্য্যোধনের বন্ধু হইয়া অঙ্গরাজ্যের

রাজাস্বরূপে অভিষিক্ত হইলেন। মহাভারতে অন্যস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, অঙ্গরাজ্যে ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে অঙ্গরাজ লোমপাদ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে নদীবাহিয়া নৌকাযোগে নিজ রাজধানী চম্পাপুরীতে অনাবৃষ্টিনিবারণ জন্য লইয়া আসেন। হিন্দুর অপর মহাগ্রন্থ রামায়ণেও কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি ঋষ্যশৃঙ্গের এই উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন, তবে অঙ্গ-রাজধানীর নামোল্লেখ করেন নাই। মহাভারতের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বেও চম্পা অঙ্গের রাজধানী ছিল।

মহাভারতের অপর একস্থলেও চম্পার উল্লেখ আছে। বনপর্ব্বে তীর্থবর্ণনকালে পুলস্ত্যঋষি ভীষ্মকে চম্পায় ভাগীরথীস্নান করিতে বলিতেছেন; ইহা হইতে জানা যায় যে, মহাভারতীয় যুগে চম্পায় প্রাচীন আর্য্যগণের তীর্থস্থল ছিল।

ঐতিহাসিক যুগে চম্পার বহুবার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। ভারতীয় ঐতিহাসিক যুগ মগধের শিশুনাগ বংশের অভ্যুদয়ের সময় হইতে আরম্ভ হয়। তখন সেই সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই যে, অঙ্গ একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। বৌদ্ধজাতকগ্রন্থে চম্পার স্বাধীনতার উল্লেখ আছে। শিশুনাগবংশীয় মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্বকালে ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। মগধরাজ তখন ভারতসম্রাট্। বহুশতাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী পুনঃ পুনঃ মগধেরই অঙ্কশায়িনী হন। প্রাচীন অঙ্গেরও মগধের শক্তিবলে ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়। মহারাজ বিম্বিসার রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই অঙ্গের স্বাধীনতা লোপ হয়। অঙ্গরাজ তখন মগধের করদ হইলেন। পরে শিশুনাগবংশের অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ করিলে সাম্রাজ্যের প্রান্তস্থিত দেশগুলি পুনরায় আপন আপন স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকে। অঙ্গ সেই সময়ে সম্ভবতঃ কিছুকালের জন্য হৃতস্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। কিন্তু শীঘ্রই আবার মগধের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া আসে; অঙ্গের স্বাধীনতাও তৎসঙ্গে বিলুপ্ত হয়। এইরূপে মগধসাম্রাজ্যের উন্নত অবস্থা হইলে অঙ্গ মগধসাম্রাজ্যভুক্ত হইত। আবার তাহার অধঃপতন ঘটিলে স্বাধীনতা কতকপরিমাণে ফিরিয়া পাইত। অবশেষে প্রাচীনকালেই অঙ্গের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক মহাত্মা হুয়েনসাংএর চম্পা পরিদর্শনের পর স্বাধীন চম্পা বা অঙ্গ রাজ্যের আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। হুয়েনসাংএর পরেই কর্ণসুবর্ণ বা আধুনিক রাঢ়দেশের পরাক্রান্ত রাজা শশাঙ্ক প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের রক্ষক-স্বরূপে উন্নীত হইয়া মগধ, এমন কি নিজ গয়া পর্য্যন্ত জয় করেন এবং বৌদ্ধশ্রমণগণের নৃশংসরূপে বিনাশ ও পবিত্র বোধিদ্রুম পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া আর্য্যধর্ম্মে কলঙ্কলেপন করেন। এই শশাঙ্কের রাজত্বকালে অনুমান হয় যে অঙ্গ কিছুকাল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। এই অঙ্গরাজ্যে প্রাপ্ত পালরাজগণের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের অভ্যুত্থানের সময় অঙ্গ আবার মগধরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজির বেহার জয়ের সময় পর্য্যন্ত অঙ্গ এইরূপে মগধসাম্রাজ্যভুক্তই রহিয়া যায়। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভের পর অঙ্গ বা চম্পার বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বিভিন্নকালে বিভিন্নধর্ম্ম চম্পানগরে আধিপত্য করিয়াছে। প্রাচীনকালে চম্পা হিন্দুতীর্থ। পরে চম্পায় জৈনধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখা যায় এবং বহুকাল পর্য্যন্ত চম্পা জৈননগররূপে খ্যাত ছিল। বহু জৈনগ্রন্থে চম্পার উল্লেখ পাওয়া যায়। উপবাই (ঔপপাতিক) সূত্র নামক প্রথম জৈন উপাঙ্গে শ্রেণিক বা রাজপুত্র কোণিক নৃপতি এই চম্পাপুরীতে বাস করিতেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। কোন কোনও জৈনগ্রন্থে এই কোণিকনৃপতিই এই নগর স্থাপন, কোথাও বা সংস্কার করেন বলিয়া বর্ণনা আছে। এই শ্রেণিক রাজা ও তাঁহার পুত্র কোণিক উভয়েই জৈন ছিলেন এবং চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। অতএব তাঁহারা আড়াই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্দ্ধমানদেশনা নামক জৈনগ্রন্থে সুদর্শন শ্রেষ্ঠীর কথায় চম্পাপুরীর জৈনধর্ম্মাবলম্বী দধিবাহন রাজার উল্লেখ আছে। শ্রীপালচরিত্রের শ্রীপাল রাজাও জৈন এবং চম্পাপুরীর নৃপতি ছিলেন। উক্ত উপবাইসূত্রে চম্পাপুরী সমৃদ্ধিশালী বাহ্যান্তর শত্রুরহিত ধনধান্যাদিপূর্ণ মনুষ্যাকীর্ণ প্রশস্তরাজমার্গবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরাধ্যায়ন, বারপ্রমেনি প্রভৃতি জৈনগ্রন্থেও চম্পাপুরীর উল্লেখ আছে। চরমতীর্থঙ্কর মহাবীর পর্য্যটনকালে দুইবার চম্পানগরে আসেন ও একবার এই স্থানেই চতুর্মাস যাপন করিয়াছিলেন। দ্বাদশতীর্থঙ্কর জৈনগুরু বাসুপূজ্য চম্পানগরেই জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় জীবন অতিবাহিত করেন। এই সব কারণে চম্পা জৈনদের একটি প্রধান তীর্থ। এখনও বহু সহস্র জৈন গুজরাট প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর চম্পায় তীর্থদর্শন অভিলাষে আসে। জৈন শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী উভয় সম্প্রদায়েরই চম্পানগরে সুবৃহৎ দুইটি মন্দির আছে। দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দির বর্ত্তমান নাথনগর ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অবস্থিত ও অতি সুদৃশ্য। ইহাতে বাসুপূজ্যের মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মন্দির নদীতীরে, বর্ত্তমান চম্পানগর বাজারের নিকটেই অবস্থিত। এ দুইটি মন্দিরই আধুনিক, কিন্তু এগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপরেই নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। চম্পানগরে মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভে জৈনমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইহাতে পূর্ব্বকালে চম্পানগরের জৈনধর্ম্মপ্রাবল্যের বিষয় কতকটা উপলব্ধি হয়। ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই প্রস্তরনির্ম্মিত, তবে ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি মূর্ত্তি ভাগলপুরের মৃত-রায়-সূর্য্যনারায়ণ সিংহের ভবনে রক্ষিত আছে।

জৈনধর্ম্ম যে কেবল চম্পানগরেই আধিপত্য করিয়াছে তাহা নহে, এক সময়ে প্রাচীন অঙ্গ-রাজ্যের সর্ব্বত্রই ইহার প্রাবল্য ছিল। অঙ্গরাজ্যস্থিত মন্দারপর্ব্বত দিগম্বর জৈনের তীর্থ। গ্রীকদিগের নিকট ইহা মালিয়স্ শিখর নামে অভিহিত হইত। মন্দার শিখরের নিম্নস্থ সমতল-ক্ষেত্রে জৈনমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে প্রাচীন কীর্ত্তির আরও বহু-তর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এখানে কোনও কালে এক বৃহৎ-নগর বর্ত্তমান ছিল।

প্রাচীন চম্পায় বৌদ্ধধর্ম্মেরও অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির

পর পর্য্যটনকালে তোন্‌ফিও নামক নগরে আগমন করেন। অনুমান হয়, তোন্‌ফিও বর্ত্তমান চম্পানগরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী বর্ত্তমান ভাতুরিয়া নামক গ্রাম। ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন কুশীনগরে শালবন মধ্যে পরিনির্ব্বাণের জন্ত শেষ শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তথাগতকে বলিতেছেন, "হে ভগবন্, কুশীনগর একটী জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র নগর; আপনি এখানে পরিনির্বৃত হইবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে; সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা ভগবানের শরীরপূজা করিবেন। হে ভগবন্, এই শাক্যনগরে পরিনির্বাণগত হইবেন না"। অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই কথাগুলি বুদ্ধচরিতকার লিপিবদ্ধ করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সেই পূর্ব্বকালেও চম্পা এক বৌদ্ধ মহানগরী বলিয়া গণ্য ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে চম্পার অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে চম্পায় গকুরা সরোবর নামে এক বৃহৎ সরোবর ছিল। এই সরোবর গকুরা নামক কোনও রাণীর নামে খ্যাত ছিল। চম্পানগরে বর্ত্তমান "ক্লীভলাণ্ড হাউস" নামক ভবনের পশ্চিমে সরোবর নামে খ্যাত এক প্রকাণ্ড দীঘি এখনও আছে। ইহার অধিকাংশই এখন মজিয়া গিয়াছে। ইহাই বোধ হয়, প্রাচীন গকুরা সরোবর। ভাগলপুরের নিকটস্থ খোগা নামক স্থান সম্ভবতঃ গকুরার অপভ্রংশ। এই গকুরা সরোবরের তীরে চম্পকারণ্য নামে এক উপবন ছিল। তথায় বুদ্ধদেবের সময়ে ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। মহাবংশগ্রন্থে চম্পারাজ কর্ত্তৃক এক ব্রাহ্মণকে বৃত্তিদানের উল্লেখ আছে ও ইহাও জানিতে পারা যায় যে, সম্রাট্ অশোকের মাতা চম্পার এক ব্রাহ্মণকন্যা। জাতকগ্রন্থেও চম্পার উল্লেখ আছে। চম্পার বণিকগণ চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন বলিয়া জাতকে বর্ণিত হইয়াছেন। চীনপরিব্রাজক ইৎসিংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, চম্পা বৌদ্ধনগরী বলিয়া এত অধিক খ্যাতি ছিল যে কাম্বোজ বা কোচিন-চীনেও চম্পা নামে এক নূতন নগরের নামকরণ হইয়াছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও চম্পার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। চম্পানগরে বহু স্থলে বৌদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চম্পানগরে কর্ণগড় নামে একটী দুর্গ আছে; ইহা অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় অর্দ্ধ মাইল প্রশস্ত। উচ্চ ভূমির উপর এই দুর্গ অবস্থিত, কিন্তু এ উচ্চতা স্বাভাবিক নহে। মানুষের কৌশলেই এ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত পরিখা বিদ্যমান, তাহারই মৃত্তিকা হইতে ও সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া এ দুর্গের উচ্চতা সম্পাদিত হইয়াছে। পরিখার পরপারের ভূমি চতুর্দ্দিকেই সমতল। দুর্গ মধ্যস্থ ভূমি তাহার তুলনায় অনেক উচ্চ, কিন্তু তাহাও সমতল। ইহা হইতে বোধ হয় যে, এ উচ্চতা স্বাভাবিক নহে। ইহা ব্যতীত আজ চারি বৎসর হইল, দুর্গ মধ্যে কূপখননকালে দেখা গিয়াছে যে, দুর্গমধ্যস্থ ভূমি ভরাট মৃত্তিকার ন্যায়, ভাগলপুর সহরের অন্য স্থলের বহু কঙ্কর-বিশিষ্ট মৃত্তিকার ন্যায় নহে। পরিখা এক্ষণে অনেক স্থলেই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে একটী ইংরাজের সৈন্যাবাস ছিল; এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখন সেখানে

পুলিস কনেষ্টবলদিগের শিক্ষালয় ও রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহের দাতব্য চিকিৎসালয় বর্ত্তমান। এই দুর্গের নৈঋত কোণে মনস্কামনা-নাথ নামক একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। তাহার নিকটেই সংস্কৃত পাঠশালা নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, এই মন্দির ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত অঙ্গরাজ কর্ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার গঠনপ্রণালী হইতে জানা যায় যে, ইহা সহস্র বর্ষের অধিক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বকালের হইলে এত দিন বিদ্যমান থাকিত না। ইহাতে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে চম্পায় বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস হইলে কিংবা তাহার কিছুকাল পরেই বৌদ্ধমন্দির স্থলে এই হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন মুসলমানেরা অনেক হিন্দুমন্দির মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন, হিন্দুগণও সেইরূপ বুদ্ধগয়ায় ও চম্পায় বৌদ্ধমন্দিরকে হিন্দুমন্দিররূপে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মনস্কামনা-নাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ও সন্নিকটেই অনেকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতেও বোধ হয় যে পূর্ব্বে এ স্থলে একটী বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদুর্গে বর্ত্তমান দাতব্য চিকিৎসালয়ের সন্নিকটে বর্গাকার বৃহদায়তন কতকগুলি ইষ্টক ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। বারাণসী সন্নিকটস্থ বৌদ্ধাশ্রম সারনাথের ভগ্নাবশেষ মধ্যে এইরূপ কতকগুলি ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। অনুমান হয় যে উভয়ই সমকালে নির্ম্মিত। এই সব কারণে বোধ হয় যে এই দুর্গ কোন বৌদ্ধরাজকর্ত্তৃক বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রচলিত নাম কর্ণগড় এবং সাধারণের বিশ্বাস যে, ইহা মহাভারতীয় রাজা কর্ণের নির্ম্মিত। প্রকৃত ইতিহাস যখন ভারতবাসী ভুলিয়া যাইত, তখন প্রাচীন কীর্ত্তি বা গৌরব চিহ্নগুলি তাহারা কোনও পৌরাণিক বা কাল্পনিক লোকের নামের সহিত সংযোগ করিয়া দিত। এই কারণেই লোকে চম্পার বৌদ্ধদুর্গকে কর্ণগড় নামে অভিহিত করেন। বুকানান হ্যামিলটন ও উইলফোর্ড অনুমান করেন যে, এই দুর্গ কর্ণবংশীয় কোনও জৈনরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তাঁহার যুক্তি এই যে, চম্পানগরে জৈন তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্যের জন্ম হয় এবং চম্পানগরে জৈনধর্ম্মের আধিপত্য ছিল, সুতরাং এ দুর্গ জৈনরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এ যুক্তির যে কোন ও সারবত্তা নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবে কর্ণবংশীয় নামে খ্যাত কোনও রাজবংশ যে চম্পায় কখনও রাজত্ব করেন নাই, তাহা বলা যায় না। অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, পরবর্ত্তী কালের রাজগণ বংশমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য পূর্ব্বতন কোনও পৌরাণিক বীরপুরুষের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন চম্পার রাজগণের মহাভারতীয় কর্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

চীনপরিব্রাজক হুয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতপরিভ্রমণকালে চম্পানগরে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার সংক্ষেপে বর্ণনা আছে। তখন নিকটস্থ হিরণ্য-পর্ব্বত বা মুঙ্গেরে বৌদ্ধপ্রভাবের আতিশয্য ছিল বটে, কিন্তু চম্পানগরে তখনই হইতে বৌদ্ধ-প্রভাবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চম্পানগরের তখন দশটি সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধাশ্রম এবং

দুইশত সংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন। হুয়েন সাং ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, নগরটি চতুর্দ্দিকে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর নির্ম্মিত এক প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরের আর চিহ্ন নাই বটে কিন্তু এই মৃত্তিকাস্তূপের অংশবিশেষ এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে প্রাচীরবেষ্টিত চম্পানগরের আয়তন কিরূপ ছিল। এই মৃত্তিকাস্তূপের কতক-অংশ বর্ত্তমান নাথনগর রেল ষ্টেশনের অব্যবহিত পশ্চিমে এখনও বিদ্যমান। ইহার মধ্যে একাংশ নূতন ষ্টেশন তৈয়ারী হওয়ার পর রেলওয়ে কোম্পানী কাটিয়া সমভূমি করিয়াছেন। এই স্তূপ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই পশ্চিমমুখী হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ চম্পার পশ্চিম সীমা গঙ্গা। পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান নাথনগর রেলষ্টেশনের প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বে এই মৃত্তিকাস্তূপ বর্ত্তমান রেললাইন অতিক্রম করিয়াছে ও এখনও তাহার কতকাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণে রেললাইনের আধমাইলের মধ্যেই এই প্রাচীন মৃত্তিকাস্তূপের অংশ বর্ত্তমান। চম্পার উত্তর সীমান্তে গঙ্গা ছিল। উত্তর দিকস্থ গঙ্গাতীর হইতে চম্পার দক্ষিণ অংশের মৃত্তিকাস্তূপ প্রায় দেড়মাইল দূরবর্ত্তী।

হুয়েন সাং আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাংশে পার্ব্বত্য প্রদেশ বর্ত্তমান। তিনি নগর নিকটস্থ গুহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুহাগুলি বর্ত্তমান ভাগলপুর সহরের পূর্ব্বাংশে আজও গঙ্গাতীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এগুলি বাস্তবিক গুহা নহে, ভূগর্ভপ্রোথিত খোদিত সুড়ঙ্গমাত্র। কিছুদূর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গগুলিতে যাওয়া যায়, কিন্তু অবশেষে এগুলি এত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে যে তাহাতে প্রবেশ দুঃসাধ্য। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুরের তৎকালীন ডাক্তার সাহেব এই সুড়ঙ্গ মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত যান। তিনি তথায় একটী নরকঙ্কাল দেখিতে পান ও সেই কঙ্কালের নিকটে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মুদ্রাও পান। এগুলি প্রাচীন কালের বর্গাকার বিশেষ চিহ্নসমন্বিত মুদ্রা। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্যাক্ট্রীয় গ্রীকদিগের সহিত সংঘর্ষের পূর্ব্বকালে ভারতে এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নগরনিকটস্থ এই গুহাগুলি অন্যূন দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত। হুয়েন সাং চম্পানগরের ১০০ লি (প্রায় ৮।।০ ক্রোশ) দূরবর্ত্তী বহুসংখ্যক গুহাসমন্বিত গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক শৈল শিখরেরও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কহল-গ্রামনিকটস্থ পাথরঘাটা নামক স্থান। এখানে পর্ব্বতোপরি বহুসংখ্যক বৌদ্ধগুহা আছে। এখানে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তিও ছিল। তাহার মধ্যে অতি সুদৃশ্য কতকগুলি মূর্ত্তি বারণস্ (Barnes) সাহেব কর্ত্তৃক নীত হইয়া কহলগ্রামে পাহাড় বাঙ্গালায় সজ্জিত রহিয়াছে। এখনও অনেক মূর্ত্তি পাথরঘাটাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। হুয়েন-সাংএর সময়েও তথায় এক হিন্দু মন্দির ছিল, এক্ষণে তথায় বটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান। প্রাচীনকালে ইহা বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়েরই তীর্থ ছিল।

এই বৌদ্ধপ্রভাবকালে প্রাচীন চম্পার বিদ্যারও চর্চ্চা ছিল। চম্পাবাসী কাত্যায়ন-বংশীয় জিন নামক এক বৌদ্ধ লঙ্কাবতারসূত্র নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লঙ্কা-বতারসূত্রে কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের একত্র নামোল্লেখ হেতু মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যা-

ভূষণ মহাশয় অনুমান করেন যে অন্যতম স্মৃতিকর্ত্তা কাত্যায়নই গ্রন্থরচয়িতার পূর্ব্বপুরুষ। ইহা সত্য হইলে স্মৃতিকর্ত্তা কাত্যায়নকে অঙ্গের অধিবাসী বলিয়া ধারণা করিলে অন্যায় হয় না।

পরে স্বাধীনতা হারাইলে ও বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইলে চম্পানগরের অবনতি ঘটিতে আরম্ভ হয়। তবে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়া বহুকাল ইহা বাণিজ্যস্থল ছিল, এবং বহুসংখ্যক বণিক এখানে বাস করিত। অঙ্গ ও বঙ্গের কিংবদন্তীমূলক চাঁদসওদাগরের বাস এই চম্পানগরেই ছিল। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সহিত প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের অজ্ঞাত স্থানীয় বা অনার্য্য দেবদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল; চম্পানগরেও মনসার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল, যাঁহারা এ নূতন পূজার অমান্য করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চাঁদ সওদাগর প্রধান। চাঁদসওদাগরের প্রতি মনসা বা বিষহরী দেবীর দৈবভাবের অনুচিত পৈশাচিক অত্যাচারের কথা, আর তৎসঙ্গে সাধ্বী পুত্রবধূ বেহুলা বা বিপুলার পতিভক্তির কথা আজও অঙ্গবঙ্গীয় নরনারীর এক অদ্ভুত উৎসবের সহিত জড়িত। একথার সৃষ্টি চম্পায় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পরেই ঘটিয়াছিল। যখন অঙ্গ ও বঙ্গ একই রাজত্বে পরিণত হয়, তখনই বোধ হয় এ বিচিত্র কাহিনী বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করে। পরে সমগ্র বঙ্গে এ কাহিনী বিস্তৃত হয় এবং যেখানে চম্পানগর বা তত্তুল্য কোনও নামের গ্রাম বর্ত্তমান, সেই খানেই তাহাদের অধিবাসিগণ চাঁদসওদাগরের আবাসস্থল বলিয়া মনে করে। বর্দ্ধমান, বগুড়া, এবং শ্রীহট্ট জেলাতেও এইরূপ গ্রাম বর্ত্তমান আছে। তথাকার লোক মনে করে যে তাহাদেরই জেলার চম্পানগরে বেহুলার অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু এসব গ্রামগুলি সমস্তই গঙ্গাতীর হইতে বহুদূরবর্ত্তী। বেহুলা আখ্যানের চম্পানগর এই অঙ্গ রাজধানী প্রাচীন কালের চম্পা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। এখনও মনসার ভাসানের দিন শ্রাবণমাসে চম্পানগরে গঙ্গাতীরে বেহুলাঘাটে সতী-বেহুলার যশঃ ঘোষিত করিয়া এক বৃহৎ উৎসব হয়। যেখানে চান্দননদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে, সেই খানেই বেহুলার ঘাট বর্ত্তমান। সন্নিকটে নগরমধ্যস্থ একটী গৃহ বেহুলার আবাস্থল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বেহুলার ঘাটের নিকটেই একটী পরিত্যক্ত বৌদ্ধমন্দির এখনও আছে। তাহাতে কেবলমাত্র একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন পালিবোথরা নামক নগরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন লোকে ঠিক জানিতে পারে নাই যে পালিবোথরা বা পাটলীপুত্র বর্ত্তমান পাটনার সহিত অভিন্ন, তখন কেহ ভাবিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান চম্পানগরই প্রাচীন পালিবোথরা। এই ভাবিয়া দুইজন ইংরেজ সেনানী চম্পানগর হইতে চান্দননদীর তীরে প্রাচীন কীর্ত্তির আবিষ্কার মানসে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে পাটলীপুত্রের নিকট প্রবাহিতা হিরণ্যবাহু বা গ্রীক ইরানাবোয়াস্ এবং চান্দননদী একই। যাহা হউক সে ভ্রম লোকের এখন নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্র ও কপিলবস্তু খননে প্রথিতযশা রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভূগর্ভ খনন করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার মানসে

চম্পানগরে আগমন করেন। কিন্তু কার্য্য আরব্ধ হয় নাই। চম্পানগরে খনন করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে আমার বিশ্বাস।

তক্ষশীলা, বৈশালী, পাটলীপুত্র, বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের নগরসমূহের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষগুলি আবিষ্কারের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। চম্পা তাহাদেরই ন্যায় প্রাচীন হইলেও চম্পায় বহুসংখ্যক প্রাচীনকীর্ত্তি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। চম্পা অতীতের স্মৃতিবহন করিতেছে; কিন্তু হায়, চম্পায় কয়জন অধিবাসী তাহার প্রাচীন গৌরবের বিষয় অবগত আছে, কয়জন জানে যে তাহার জন্মস্থান তাহার পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র তীর্থস্থান?

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।

দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্ব

দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব্বের উৎপত্তির সহিত জৈনগুরু মহাবীরের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঐ পর্ব্বদ্বয়ের প্রসঙ্গসূত্রে তদীয় চরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্দ্ধমান। ইনি মহাবীর, মহাবীরনাথ, বর্দ্ধমান নায়পুত্ত, শ্রীবর্দ্ধমান জিন, নায়কুলচন্দ, নাথকুল-নিগন্থ; নিগন্থনাথ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাবীর চতুর্ব্বিংশ তীর্থংকর ও অন্তিম জিন। ইনি বৈশালী নগরীর কোল্লাগ সন্নিবেশে নায় * (জ্ঞাতৃ) বা নাথ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ খত্তিয় বা সিদ্ধার্থ রায়া নায়কুলের প্রধান ছিলেন এবং তাঁহার মাতা ত্রিসলা (বিদেহ-দত্তা) বৈশালীর রাজা চেটকের ভগিনী ছিলেন। সিদ্ধার্থের গোত্র কাশ্যপ ও ত্রিসলার গোত্র বাশিষ্ঠ ছিল। কথিত আছে, মহাবীর প্রথমে কোডালগোত্র ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তের পত্নী জালন্ধ-রায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষিতে জন্মিয়াছিলেন। নীচকুলে (ব্রাহ্মণকুলে) তীর্থংকরের জন্মগ্রহণ করা উচিত নয় বলিয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় গর্ভরূপ মহাবীর, দেবানন্দার কুক্ষি হইতে ত্রিসলার উদরে নীত হইয়াছিলেন। মহাবীরের পিতা ও মাতা পার্শ্বনাথের শিষ্য পরম্পরার ধর্ম্মমত মানিয়া চলিতেন। মহাবীর, সমরবীর রাজার কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন এবং ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তদনন্তর পার্শ্বনাথের ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মসংস্কারক ও সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়াছিলেন। ইনি ৩২ বৎসর বয়সে অচেল (উলঙ্গ) শ্রমণ ও ৪৩ বৎসর বয়সে কেবলী † ও জিন ‡ হইয়াছিলেন। শ্রমণভগবান্ মহাবীর, ভগবান্ বুদ্ধের সম-

---

* জৈনদের দুই প্রধান সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। নায়-কে শ্বেতাম্বরেরা জ্ঞাত ও দিগম্বরেরা জ্ঞাতৃ বলেন।

† কেবলী—"কেবলানি পরিপূর্ণানি শুদ্ধান্যনন্তানি বা জ্ঞানাদীনি যস্য সন্তি স কেবলী"।

‡ জিন—"রাগাদিজেতৃত্বাদিতি"।

সাময়িক ছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি সীহ, নির্গ্রন্থ, (বন্ধনহীন) § জৈন সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবগ্‌গে দেখিতে পাই, ভগবান্ বুদ্ধ যে কালে বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেকালে সেনাপতি সীহ, নিগণ্ঠনাত-পুত্তের (মহাবীরের) নিকট বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন।

মহাবীর, কৌশাম্বীর রাজা শতানীক এবং রাজগৃহের রাজা শ্রীণিককে (শ্রেণিক বিম্বিসার) জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। গুজরাটের জৈনদের মতে মহাবীর বিক্রম সংবৎ আরম্ভের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে (৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবনকাল ৭২ বৎসর।
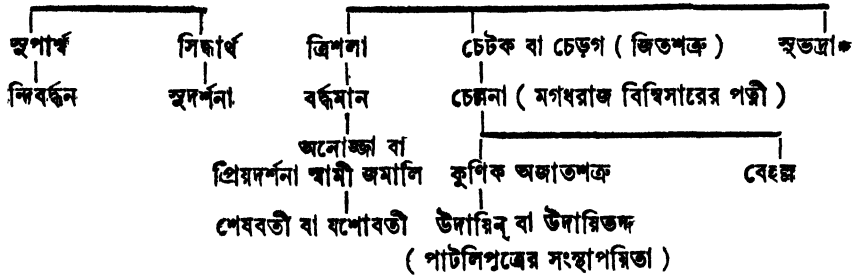
কার্ত্তিক মাসে স্বাতিনক্ষত্রে অমাবস্যার রাত্রিশেষে † পাপা বা পাবা ‡ নগরীতে মহাবীরের নির্ব্বাণ হইয়াছিল। হরিবংশপুরাণে কথিত আছে মহাবীরের নির্ব্বাণের পর পাপা নগরীতে দীপোৎসব হইয়াছিল—

> "জলৎ প্রদীপালিকয়া প্রবৃদ্ধয়া সুরাসুরৈর্দীপিতয়া প্রদীপ্তয়া।
> তদাস্ম পাবানগরী সমংততঃ প্রদীপিতা কাশতলা প্রকাশতে॥
> তথৈব চ শ্রেণিক পূর্ব্বভূভুজঃ প্রকৃত্য কল্যাণমহঃ সহপ্রজাঃ।
> প্রজগ্মুরিংদ্রাশ্চ সুরৈর্যথাযথং প্রযাচমানা জিনবোধিমর্থিনঃ॥
> ততস্তু লোকঃ প্রতিবর্ষমাদরাৎ প্রসিদ্ধ দীপালিকয়াত্র ভারতে।
> সমুদ্যতঃ পূজয়িতুং জিনেশ্বরং জিনেংদ্রনির্ব্বাণবিভূতিভক্তিভাক্॥

---

§ পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুরা নির্গ্রন্থ। সূত্রকৃতাঙ্গে পেঢালপুত্র মেদার্যগোত্র উদক, পার্শ্বের সম্প্রদায়ী নির্গ্রন্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

* হরিবংশ পুরাণ অনুসারে জিতশত্রু, নৃপেন্দ্র সিদ্ধার্থের অনুজার পতি ছিলেন। অতএব সুভদ্রাকে সিদ্ধার্থের ভগিনী বলিয়া জানা যাইতেছে। সিদ্ধার্থ ও চেটক পরস্পরের ভগিনীপতি ছিলেন।

† "কার্ত্তিকে স্বাতিষু কৃষ্ণভূতসুপ্রভাত সন্ধ্যাসময়ে" ইতি হরিবংশপুরাণ।

‡ বর্তমান পড্রৌর বা পপৌর, ইহা Sewan এর প্রায় ১।• ক্রোশ পূর্ব্বে সংস্থিত। পাবাবাসী মল্লগণ, বৈশালির লিচ্ছবিদিগের সহায় ছিলেন।

প্রবৃদ্ধ জলমান প্রদীপশ্রেণি যাহা সুর ও অসুরগণ দীপিত ও প্রদীপ্ত করিতেছিল, তদ্দ্বারা সমগ্র পাবা নগরী ও তদুপরিস্থিত আকাশতল প্রদীপিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল। আরও শ্রেণিক বিম্বিসার আদি সহস্র সহস্র ভূপতিগণ, কল্যাণ উৎসব করিয়া এবং ইন্দ্রগণ দেবগণের সহিত অর্থিভাবে মহাবীরের নিকট জ্ঞান যাচ্ঞা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। সেই হইতে জিনেন্দ্রের নির্ব্বাণের ঐশ্বর্য্যে ভক্তিযুক্ত ভারতের লোক, বৎসর বৎসর আদর করিয়া প্রসিদ্ধ দীপালি দ্বারা জিনেশ্বরকে পূজা করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত অনহিলবাড় পাটনে ১৩৩৬ সংবতে লিখিত আচার্য্য সর্বানন্দ সুরি বিরচিত 'দীপোৎসবকল্প' নামক একখানি তালপত্রের পুঁথি আছে। ঐ পুঁথির শেষ শ্লোক দ্বারা জানা যায়, মহাবীরের নির্ব্বাণ হইলে নন্দিবর্ধন নৃপ তৎপ্রতি প্রেমবশত চিন্তান্বিত হইলে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে বুঝাইয়া আদর সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন, তদবধি জগতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামক পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই শ্লোক এই—

"আনংদক্রমকংদকংদলসমুদ্ভূতামৃতে নির্বৃতে
বীরে শ্রীমতি নংদিবর্ধননৃপস্তৎপ্রেমচিন্তান্বিতঃ।
সংবোধ্যাদরসুংদরেণ মনসা স্বস্রা স্বয়ং ভোজিতঃ
তৎপ্রাবর্ত্তিত পর্ব সর্ব জগতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াবিধম্॥"

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

মালদহের গ্রাম্যশব্দ

বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মালদহ জেলার আদিম শব্দসমূহের লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ জেলায় বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস। প্রত্যেক জাতির ভাষার বিশেষত্ব আছে। কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, তিওর, চামার, বাগ প্রভৃতি আদিম জাতিদের মধ্যে নূতন নূতন শব্দ দেখা যায়। প্রত্যেক জাতির উচ্চারণের বিশেষত্ব আছে। কথা শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, কোন্ জাতীয় লোক কথা কহিতেছে। আমাদের বিদ্যালয় সমূহ, সমুদয় জাতির ভাষা ও উচ্চারণ এক করিয়া দিতেছে। তবে প্রাচীন লোকদের মুখে ও নারী জাতির মধ্যে সাবেক কথাগুলি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। শব্দগুলি লোকের মুখে যেমন উচ্চারিত হয়, লিখিয়া তাহা প্রকাশ করা যায় না। করিয়া ধরিয়া প্রভৃতি 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কর্য়া ধর্য়া রূপে উচ্চারিত হয়। আমি, আমার প্রভৃতির স্থানে হামি, হামার উচ্চারিত হয়। অনেক শব্দ পারসী ও হিন্দীমূলক। দুটী প্রাচীন রাজধানী এ জেলায় ছিল বলিয়া এমন হইয়াছে। এমন কতকগুলি শব্দ আছে, তাহার মূল নির্ণয় করা অসাধ্য। যেমন 'চাকুন কুন্ কুন্' শব্দ

ইহার অর্থ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। মালদহ জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে আসামী ভাষার অপরূপ সৌসাদৃশ্য আছে। কেন এমন হইল, অনুসন্ধেয়। 'কে' বিভক্তি প্রায় ব্যবহৃত হয় না, উহার পরিবর্ত্তে 'ক' ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গের ভাষার অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহ মালদহ জেলার ভাষার অধিক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। হিন্দীর প্রভাবও অল্প নয়। প্রচলিত শব্দ ও তাঁহার অর্থ যথা—

অপহতা—পোড়াকপালে। প্রয়োগ—লোকটা বড্ড অপহতা।

আপুছি—যে স্ত্রীলোককে কেহ পুছেনা, যে স্ত্রীলোকের রূপগুণ এত সামান্য যে কেহ তাহার খবর লয়না।

আঠারাম—বলবান্। প্রয়োগ—মানুষ খাঞা হৈছ আঠারাম।

কর্ত্তানী—কর্ত্রী।

কায়া—পুংচিহ্ন। এ জেলার উত্তর অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

কুই—কূপ।

কাঠবাপ—মাতার উপপতি। বিপিতা।

কাঠবেটা—উপপত্নীর স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, অথবা উপপত্নীর গর্ভজাত নিজের ঔরস পুত্র।

আশানাশী—যে স্ত্রীলোকের আশা ভরসার স্থল নষ্ট হইয়াছে।

কাহাবা—কলহকারিণী স্ত্রীলোক।

আয়েছে বা আহেছে—আসিয়াছে।

কুর্ত্তা—স্ত্রীলোকের গায়ের জামা।

কোমড়ি—কোমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত জামা।

একষট্টি বা একবাট্ —অদৃশ্য হওয়া। প্রয়োগ—সে একষট্টি করিয়াছে।

কুত্তা—কুকুর কুত্তী—কুকুরী।

কুনঠি—কোন্ ঠাই? প্রয়োগ—কুনঠি আছে?

কিগুণে—কি জন্য?

কাপড় কানি—কাপড় চোপড়

আলকোটান—জানিয়াও না জানার ভাব দেখান, এই শব্দটী স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে।

আলকোটানী—যে স্ত্রীলোক অজ্ঞতার ভাণ করে।

কেছুয়া পেটী—যে স্ত্রীলোক বেশী খায়।

কাঁড়ি—গরুর খাদ্যপাত্র।

কুশিয়াল বা কুশার—ইক্ষু।

ওক—বমন।

কাত্তারী—ছোট মাটীর পাত্র।

অভাবে বা আভাবে—অভাবে।

আকার বাকার—ব্যস্ততা।
ওলাহন বা ওলানা দেওয়া—খোটা দেওয়া।
কালাপিতা—বিরক্ত। প্রয়োগ—জি, কালাপিত্তা হয়ে গেল।
একনা—একটু। একনা লবণ দেও।
আব—এখন। যথা, আব্ সব ছিন্ ভিন্ হয়ে গেল।
করালী—চৈত্রমাসের আম।
কহর—দুর্ভিক্ষ। প্রয়োগ,—সহরে পড়িলে কহর, তখন ছাড়ি সহর।
কাণফুস্‌কি—গোপনে কাণ পাতিয়া শোনা।
কল্লা—দুষ্ট, জারজ।
আতি যাওয়া—জারজ পুত্র। বিনা বপনে আপনা হইতে বীজ পড়িয়া যে গাছ অঙ্কুরিত হয়।
কল্লা দারাজ—প্রবঞ্চক বিশেষ।
আথুম—বেআক্কেল্। প্রয়োগ,—এলাম ভাই ফ্যাকম্ ধর্যে আমরা আথুম দুজনা।
গানকরি ভাই তালকাণা আর মানকাণা।
কাটকাপাস—না খাইয়া নিরম্বু উপবাসে পড়িয়া থাকা।
আমলাগা—আমপাকা। যথা আমলেগেছে অর্থাৎ আম পেকেছে।
ক্যারাগাছ—ছোট গাছ।
আপরূপ—অপরূপ।
অথ্‌নে—এক্ষণে।
কাপ—ঠাট্টা, তামাসা।
আন্‌খা—আশ্চর্য্য।
কট্‌কটানী—যে স্ত্রীলোক ঝগড়ার সময় অধিক কথা বলে।
আমসোস—শাশুড়ীর মাতা।
কর্ম্মা আম—বড় জাতীয় আমের মধ্যে ছোট আম।
আষ্ট্যাছাড়া—অসার, অপ্রাসঙ্গিক। প্রয়োগ—তোমার আষ্ট্যাছাড়া কথা।
কালমুহা—যে পুরুষের মুখে ঝগড়া লাগিয়া আছে।
কালপ্যাচা—বালকদের প্রতি গালি।
কাবিল—উপযুক্ত।
আতাছি—যে কাজকর্ম্ম করিতে ক্লান্ত হয় না।
আতার কাতার—যন্ত্রণাতে ছট্‌ ফট্ করা।
আল্‌ফা—বিনা কষ্টে যাহা পাওয়া যায়। প্রয়োগ—আমার আল্‌ফা টাকা কিনা,
যে তোমাকে দিব।
উটকান—দোষ খুজিয়া বাহির করা।

অলোপ—লোপ।

অচাষা—চাষা। প্রয়োগ—হামাকে অচাষা পেয়েছ কিনা।

অমন্দ—মন্দ। প্রয়োগ—হামি কি অমন্দ কহনু ?

উঠানা—রোজ রোজ কোন দোকান হইতে দ্রব্য লওয়া।

আস্‌নাই—প্রণয়। স্ত্রীপুরুষের প্রেম।

ঢেকির আস্‌নাই—যে সকল কথায় হাঁ করে।

আথ্‌লাগাড়ী—যে স্ত্রীলোকের পাছা বড়, তাহাকে এই বলিয়া গালি দেয়।

উধ্‌রা—যে এখানে ওখানে খাইয়া বেড়ায়।

আনামাক্কা—যে দেখিয়া চলে না, কাণার মত।

আয়ান্—যে জিদ্ ছাড়ে না।

আয়ানী—যে স্ত্রীলোক জিদ্ ছাড়ে না। প্রয়োগ—আয়ান কোরে বসে আছে।

তোহে কহোঁ গোয়ালিনী আয়ানের রাণী।

কেমনে জানিবা দান তুঁ বড় আয়ানী। (পদকল্পতরু)

কুন্‌কুনয়ে উঠা—বাড়িয়া উঠা। যেমন, পাতাগুলা কুন্‌কুনয়ে উঠেছে।

খ্যামশ্—প্রতীক্ষা। প্রয়োগ—দিন দুত্তিন প্রাণ খ্যামশ্‌কর তোমারে সাজাব।

খাইমুছী—যে স্ত্রীলোক সকলকে মুছিয়া খাইয়াছে।

খিটকাল—অপরিষ্কার। জঞ্জাল।

খড়ি—জ্বালানি কাঠ।

খোটই—প্রাচীরের তাক।

খান্‌গি—নিজের। খান্‌গি বাড়ী—নিজের বাড়ী।

খাইট্টা—যে স্ত্রীলোক সকলকেই খাইয়াছে।

খাণ্ট্যাকথা—কর্কশ কথা।

আচ্‌কা—আশ্চর্য্য, আকস্মিক। প্রয়োগ—আচ্‌কা কথা বলিয়া মনে খট্‌কা লাগিয়া দিলি।

খাখারনাশা—যে স্ত্রীলোকের কলঙ্ক রটায়।

খাপ্‌সনী—যে স্ত্রীলোক কেবল ঝগড়া করে।

খাইপালী—যে স্ত্রীলোক বার বার খায়।

খাল্লত বারত—কমিবেশী।

খ্যাদ্‌রা—ঘৃণিত, অপরিষ্কৃত।

খুদ্‌রা—খুচ্‌রা

গে বা ওগো—ওহে। স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্বোধনসূচক অব্যয়।

গাজেলি—যাহারা গাঁজা খায়, গাঁজাখোর।

গন্না—গ্রহণ। প্রয়োগ—চাঁদের গন্না লেগেছে।

শুঠ্‌ঠি—শুটি। প্রয়োগ—আমের শুঠ্‌ঠি।

খোরা—বাটী।   খুরি—ছোট বাটী

গহমা সাপ—গোখুরা সাপ

গোঠা—ধাপড়ি, শণকাঠি বা তুঁতের কাঠিতে গোবর মাখাইয়া শুকাইয়া লইলে গোঠা প্রস্তুত হয়।

গাপাগাপ—গপ্‌ গপ্‌। প্রয়োগ—গাপাগাপ করিয়া খাইস।

খাস্তানা—ক্লান্ত হওয়া   খাড়িয়া—মলমূত্র ত্যাগের স্থান।

খোস্‌বো—সুগন্ধ   খোসবোই—যাহার সুগন্ধ আছে।

খলিফা—ওস্তাদ, দরজি, শিল্পনিপুণ

কাশ্যা—যাহার কাস আছে, কেসো রোগী।

গতর পোষা—যে শরীরটাকেই পুষিয়া বেড়ায়।

গাট্যা—মোটা সোটা লোক।   দোগ্না—দ্বৈধ, সন্দেহ।

উটক্রু—সঙ্কীর্ণ। প্রয়োগ—স্থানটা বড্ডই উটক্রু।

আষ্টল—আস্তাকুড়।

কহ্লর—আগ্রহাতিশয্যবশতঃ যে ঝুকিয়া পড়ে। প্রয়োগ—লোকটা যেন আকালের কহ্লর।

আক্তিয়ে যাওয়া—ক্লান্ত হওয়া। প্রয়োগ—মেহনৎ করিতে করিতে আক্তিয়ে গিয়েছে।

কাণফুস্কি—চুপে চুপে কাণে কথা লাগান।

ঘয়লা—ঘড়া বা কলস।   ঘিনাহা—ঘৃণার্হ।

ঘোলমাঠ্যা—সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোলমাল করিয়া দেওয়া।

ঘুসকী—যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষগামিনী হয়।

ঘটঘটানী—যে স্ত্রীলোক এঘর ওঘর দৌড়া দৌড়ি করিয়া সকল দ্রব্য নাড়িয়া বেড়ায়।

ঘুমনী—ভিজা মটর, ছোলা, বরবটী সিদ্ধ করিয়া তাহা তেল লঙ্কা দিয়া ভাজিলে যে দ্রব্য হয়।

ঘুসকুটান—স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা সত্বেও তাহার নিকট প্রণয়ের কথা বলা।

ঘাবড়ান—ভয় পাওয়া, যেমন লোকটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে।

কাইঞা—কৃপণ।   গুল্লা—পায়ের গুল্ফ

চুরণি—স্ত্রীচোর

চম্পট—পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া, যেমন লোকটা চম্পট দিয়েছে

চিড়িয়া—পাখী   চিড়িয়া চট্‌কুন—পাখী টাখি।

ঘস্‌কে যাওয়া—সরিয়া যাওয়া।

চাষস—লাঙ্গল দ্বারা ভাল করিয়া মাটী গুঁড়া করা।

চিপড়ি—গোবরের গুঠা বা ঘুটা।

চাঙ্গি—মড়া বহনের বাঁশের মাঁচা

চোতে কাণা—চৈত্রমাসের রৌদ্রে যাহার দৃষ্টি শক্তি কমিয়াছে। যে দেখিয়াও দেখে না।
প্রয়োগ—ওরে হামার চোতে কাণা।

খুড়স্যেস্র—খুড়ি শাশুড়ী।

চিড়্কা—যে লোক সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়।

চড়া উতার—কবির বা গম্ভীরার গানের সওয়াল জবাব।

ছ্যাঁচা—সত্য কথা জারুয়া—জারজ

জবড়জঙ্গ—জড়ভরতের মত কেমন একটা

জুয়ারি—যাহারা জুয়া খেলে। ঝুট মুট—মিথ্যা কথা বলা।

জামখোরা—বড় বাটী। ছপ্পর—চাল

জাত জুত্তি—জাতি টাতি

ঝাপড়া—ঘন। প্রয়োগ—ঝাপড়া চুল ঝাপড়—দ্রুত।

ছুত্তি—তুঁত পাতার বায়না। ইহার জন্য দূর্ব্বা ঘাস ব্যবহৃত হয়। টাকা না দিয়া হাটুর
উপড় দূর্ব্বাঘাস দিলে তুঁত পাতার বায়না দেওয়া হয়।

ছাইচ—ঘর লেপনের ছেড়া কানি।

জিয়ের ধকে—মনের সাহসে। জি—মন অথবা শরীর, প্রাণ।

ঝাঙ্গড়—শেওড়াগাছের ডাল খণ্ড খণ্ড করিয়া একত্র বাঁন্ধিয়া জলে ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে
কাঁকড়া, চিঙ্ড়ি প্রভৃতি মৎস্য আশ্রয় লয়, এই কাঠের বোঝাকে ঝাঙ্গড় বলে।

জৈ জলপান—জলপান প্রভৃতি।

জিন্দগানি বা জিনগানি—জীবন।

ঝাকাসা—বাদলার দিন।

ঝাইল—যে বৃহৎ থলিয়ায় জিনিস পত্র রাখা যায়। ইহাতে অনেক জিনিস ধরে।

জানজি খেয়ে লেগেছে—মনঃপ্রাণে লেগেছে। আদা জল খেয়ে লেগেছ।

টে বা ওটে—লো বা ওলো। স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্বোধন সূচকঅব্যয়।

টে—তেল তুলিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত পলা।

টাকা উকা—টাকা প্রভৃতি, মালদহ অঞ্চলে সাদৃশবোধক অব্যয়ের আন্তবর্ণ উ হয়, বঙ্গের
অন্য অঞ্চলে মাছ টাচ্, ভাত টাত্ বলে, মালদহ অঞ্চলে মাছউচ্ ও ভাতউৎ বলে।

জুয়ায়না—যোগ্য হয় না, যেমন, এ কাজ জুয়ায় না অর্থাৎ করিতে নাই।

ঝামরান—কাল হওয়া বা বিবর্ণ হওয়া, যেমন, লোকটা ভাবিতে ভাবিতে ঝামরাইয়া গিয়াছে।

টিট—ধূর্ত্ত।

টুয়া—জলে যাহার উপর দাঁড়াইয়া শিপ্ দিয়া মাছ ধরে।

টং—চোখ্ মুখ লাল, যেমন রাগিয়া টং হইল।

ট্যাঙ্গা—অল্প, যেমন বড় ট্যাঙ্গা হইয়াছে।

ট্যাঙ্গস্—ঠ্যাঙ্ ড়াইয়া হাটা, যেমন ট্যাঙ্গস্ মেরে হাট্‌ছে।

টস্কেনা—অবনত হয় না, যেমন ভাঙ্গে ত টস্কেনা।

টালমাটাল—বাহানা, ছলকরা।

টিপা—কৃপণ, যেমন, লোকটা বড় টিপা।　　ঢুড়া—অন্বেষণ করা।

ঢুড়ঢুড়ানি—যে স্ত্রীলোক ঢুড়িয়া বেড়ায়, প্রয়োগ—ঢুড়ঢুড়ানী কালী তোমার নাম ঃ
মানুষ খাঞা হেছ আত্মারাম।

ঢৈ—ডাইল ঘোট্‌না।　　ঢগ্ধা—বিবাদ।

ডাং—দুষ্ট ধরণের লোক।　　ড্যাব্দর—নিন্দা করা।

ডহর—মাঠের মধ্যে দুইজনের জমির মধ্যখানে যে ফাক জায়গা থাকে, এবং তাহার ভিতর দিয়া গবাদি পশুগণ যাতায়াত করে।

ডেরহাতি—ওলাউঠা রোগ।

ডাগ্‌গা চোখ্যা—যাহার চোখ বড় বড়।　　থোম—থাম বা স্তম্ভ।

জুয়াতা টাকা—সঞ্চিত টাকা।　　থুক—থুথু।

তোক—তোমাকে। "কে" বিভক্তির বদলে মালদহ প্রদেশে "ক" ব্যবহৃত হয়, যেমন তোকে স্থানে তোক, আমাকে স্থানে মোক হয়।

ধুলপা—এ দেশের কোন কোন জাতির মধ্যে রীতি আছে যে, বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে বাতাসা ও মাছ বিতরণ করা হয়, তাহাকে ধুলপা বলে।

দইমাছ—ধুলপার পর পাত্রপক্ষ, পাত্রীপক্ষের বাটীতে আসিয়া দধি মৎস্য দেয়, এই কার্য্যের নাম দইমাছ।

দোঘা—গোরুর দড়ী।　　ঢাকুন কুন্‌কুন্—অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ।

তেতুলিয়া—তিন পুত্রের পর জাত কন্যা।

তেতুল্যা—তিন কন্যার পর জাত পুত্র।

তোব্‌রা—তামাক টীকা রাখার জন্য বাঁশের বা তালপাতা নির্ম্মিত পাত্র।

তফর—নাকাল হওয়া।

ঢাকনমুখা—কদাকৃতি ব্যক্তি, যাহার মুখ ঢাকন অর্থাৎ শরার মত।

দোস্‌রা ঘর—উপপত্নী।　　দিগ্‌দারি—বিরক্ত করা।

ধুম্‌সা—বড় মোটা পুরুষ।　　ধুম্‌সী—বড় মোটা স্ত্রীলোক।

ধুম্মা—খুব মোটা।

দস্তরখান—যাহার উপর বসিয়া মুসলমানেরা আহার করে।

ধুম্মাপেটা—যে পুরুষের পেট বড় মোটা।

ধুম্মাপেটী—যে স্ত্রীলোকের পেট বড় মোটা।

তৈ তরকারী—তরকারি প্রভৃতি।　　নন্দু—ননদের স্বামী

ধারী—ঘরের ধারের যে অংশ মাটী দিয়া বান্ধান থাকে।

খোঙ্গা—শূকরের ছানা। নামাতোলা—ওলাউঠা রোগ।

ধাপ্পা—ফাকি। ধাধস্—আক্কেল্।

ধান্দু—ব্যাকুপ। নিথাট্টু—অক্ষম পুরুষ, যে খাটে না।

নিচ্চোড়—যে ঋণ করিয়া পরিশোধ না করে।

নাথক—অক্লান্ত, যে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হয় না।

ধুম ধড়াক্কা—ধুমধাম। ধামধুম—ধুমধাম।

ধাতকে উঠা—ধক্‌ধক্ করিয়া উঠা। যেমন, আগুন ধাত্‌কে উঠেছে।

ধাতিঙ্গা—লম্বা। যেমন, ছেলেটা ধাতিঙ্গা হয়ে উঠেছে।

পুঁদি—গুহ্যদ্বার। বে—"হে" সম্বোধনসূচক অব্যয়ের সদৃশ।

বিয়া—স্ত্রী-চিহ্ন। এ জেলার উত্তরাঞ্চলস্থ নীচ জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

ব্যথিতখাগী—যে স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজনকে খাইয়াছে।

পহেলাঘর—বিবাহিতা পত্নী থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে অথবা উপপত্নী রাখিলে বিবাহিতা প্রথমপত্নীকে পহেলাঘর বলে।

ভাতার আউলী—সধবা।

ভাতধুনা—যে কেবল পরের ভাত খায়। পরের গলগ্রহ।

পুছ্ কর—জিজ্ঞাসা কর। পারনুনা—পারিলাম না।

বম্বু—মোটাসোটা।

ফাকিয়ে—মুখে দিয়ে, যেমন ফাকিয়ে করে তানা নানা অর্থাৎ মুখে দিয়া চূর্ণ করে।

ফজ্জাৎ—কষ্ট পাওয়া, গালি দেওয়া।

নিছে—নাই, এজেলার উত্তরাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

বুড়বাক ও বুড়ব্যাক ধান্দু—নির্ব্বোধ

মদতি—যাহারা মদৎ অর্থাৎ গুলি খায়, প্রয়োগ—আমরা লয়া মদত্তি গরব করব আর কি। দুপররেতে আম পড়েছে কুড়াবার যাছি॥

কটিকচাঁদ—ফুলবাবু। মোলাহেজা—লজ্জা, মোকাবেলা।

দোশন্—তেল তুলিবার লৌহনির্ম্মিত পলা।

ফতাই—এক প্রকার হাত কাটা জামা যাহা গায়ে সাটা থাকে।

বহিরা—বধির।

প্যাচ্চর—বদমাইশ, দুষ্ট। পটচ্চর শব্দজ কি ?

পালঠ্যা—নিলর্জ্জ, দুষ্ট, নিষেধ করিলে কিংবা গালি দিলেও যাহার লজ্জা বোধ হয় না।

ভ্যাপ্‌টা সাপ—হেলে সাপ। বইর—বদরী।

টক—অভ্যাস, যেমন—এটা আমার টক হইয়া গিয়াছে।

বোঝা ভিন্দা—মোট, বোঝা।   পর্শা—পরশু।

ফাকি—চূর্ণ, গুড়া।   ফকির ফ্যাকড়া—ফকির টকির।

বেকেন—অথবা কিংবা, যেমন রবিবার বেকেন সোমবার।

বেলে—কি? যেমন গোপাল বেলে কলিকাতায় গিয়েছে?

নিশানী—সিঁড়ি। নিঃশ্রেণী শব্দজ কি?

মুকহাত—বাহু, যেমন—আমার মুখ হাত হইয়াছিল।

বাঘাড়—যে স্থানে মৃত পশু ফেলান যায়, ভাগাড়।

বীজিট্যাঙ্গা—দুষ্ট। বালকের প্রতি এই শব্দটী প্রযুক্ত হয়, যেমন এ ছোড়া বড় বীজিট্যাঙ্গা।

মড়া—মৃত। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে এই শব্দে সম্বোধন করিয়া প্রণয় কোপ প্রকাশ করিয়া থাকে। সম্বোধন ভিন্ন অন্যস্থলেও স্ত্রীলোকে, পুরুষদিগের প্রতি প্রয়োগ করে।

ফ্যাকম্ বা প্যাকম—তামাসা, প্রয়োগ—মড়া ফ্যাকম ধরে বসে আছে।

বৈভালমার—নষ্টা স্ত্রীলোক   মরকা—ভঙ্গপ্রবণ।

ভোয়া—ধোয়া, প্রয়োগ—নর্দ্দমা ভোয়া হইয়াছে।

পহি—পগার।

ফুটানীরাম—যে বেশী বাবুগিরি অথবা গর্ব্ব করে।

ব্যাকার—অসুস্থ, যেমন জি ব্যাকার হইয়াছে।

ফুকুর ফুকুর—মন্দ মন্দ হাসি।   ভুল্কি মারা—উঁকি মারা।

মুঙ্কী সয়তান—দুষ্ট লোক, মিট্‌মিটে সয়তান।

মর্কাহা—ভঙ্গপ্রবণ।

বুই—বালকদের প্রতি ভয় দেখাইবার শব্দ।

বোবো—ঠাকুরাণ দিদি।   বরাপু—ঠাকুরদাদা।

ভাত ছুয়ানী—অন্নপ্রাশন।

পেন্দী মাসী—স্ত্রীলোকদের প্রতি গালিবিশেষ।

পেন্দী মিন্‌সা—পুরুষদের প্রতি গালি বিশেষ।

বুঢ়া খুর্‌কুন্—অতিবৃদ্ধলোক।   পল্ পল্—পাকিয়া তল তল করা।

পশ্‌করি—এক জনের বসিবার উপযুক্ত চাটাই।

মৈমসলা—মসলা ও তৎসদৃশ দ্রব্য।

মুট্‌কিয়া থাক—শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া চুপ্ করিয়া থাকা প্রয়োগ—মট্‌কিয়া রহিল্যা শিব হামার কথা শুন্যা।

বাণুকা—বর্ণনা করা

ভর্কাডুবা—যে ভরা ডুবায়, এই শব্দটী মহাজনী কারবারে প্রবঞ্চকদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বাঁইয়া—যেবাম হস্তে কার্য্য করে।
বোল্‌দা—যে বলদের উপর জিনিষ পত্র চাপাইয়া ব্যবসায় করিয়া বেড়ায়।
পিসোস—পিসী শাশুড়ী। বড়সোস্—শ্বশুরের মাতা।
পুত থাকী—যে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায়।
বদঢঙ্গা—যে পুরুষের বিশেষ কোন গুণ নাই। বিষকুট্যা—যাহার ব্যবহার বড়ই কর্কশ।
ভাগ্‌গু—যে পালাই যায়, যে হাটিয়া যায়।
মাটকীপেটা—যাহার পেট খুব মোটা।
পেটনান্দড়া—যতই পায় ততই যে খায়।
বেগ্‌গম—বে খবর। মাগুয়া—স্ত্রৈণ।
মাদিমাহিল—স্ত্রীবশীভূত। ভড়ক—জাকজমক।
বদ্‌বো—দুর্গন্ধ বাস্তা—পর্য্যুষিত, বাসী।
বিলন্দী—বোলবাইগানের সূচনা।
বোলবাই—গম্ভীরা পর্ব্বের তৃতীয় দিবসে যে গান হয়।
ফেকা—ফেলান। বরকতত—প্রতুল হওয়া।
বাহারা বা ব্যেহার—ঘর ঝাড়ি দেওয়া।
পাঠ্যা—পুরুষদের প্রতি স্ত্রীলোকদের গালি বিশেষ।
বাদকুট্টা—হিংসা করা। বদখোব—যাহার স্বভাব ভাল নয়।
পানাই—পাঁচনী। ফম্—স্মরণ—যেমন ফম হচ্ছেনা।
বাত্‌কে উঠা—চমকিয়া উঠা। বুড়া ফ্যাত্‌না—অশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ।
প্যাকনা—আবদার করা। বিরক্ত করা।
পান্‌ছা—গামছা।
বিচ্—তফাৎ। যেমন কথায় বিচ্ পড়িল।
ফষ্টি—ফুটানী
ফুস্কি—ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা বলা।
ফ্যাচ্‌কা—যে লোক অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া তামসা দেখে।
বুন্দ—খুব উচ্চ।
মারিকমারা—মারামারি। রুয়া—তুলা।
মস্তারাম—বলবান্। লজ্জাৎ—আস্বাদ।
ভাস্‌সা—রন্ধন, মৈথিল ব্রাহ্মণদের কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।
লাথকুচ্চা—যে লাথি খাইয়া সহ্য করিতে পারে।
ল্যাথর—ঝঞ্ঝাট।
লাহাড়ি—পাইট্ মজুরদের প্রাতঃকালের জল খাওয়া।

বুজি—জুজু, বালকেরা ব্যবহার করে।

লিকি—মাথার উকুন।　　লুতা—অন্নাদি পাকের হাড়ী পরিষ্কার করার ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

লহর—আনন্দ　　রাহা—পথ।

লদ্‌বদ্‌—মোটা মানুষের আস্তে আস্তে হাটা।

লগ্যা বা লগি—কোটা আকর্ষী। নৌকার চোড়।

লুস্‌কি—চুপ করিয়া ঘরে ঢুকা।　　লিক্‌—গাড়ী চলিয়া গেলে চাকার যে দাগ পড়ে।

লুকুর লুকুর—টুক্‌ টুক করিয়া চাহিয়া থাকা।

লান্দা ফান্দা—গোলমাল করা।

লাইহোর—স্ত্রীলোকদের পিত্রালয়।

লেহাজ—লজ্জা।　　রাশ—জল বা দুগ্ধের বড় কলসী বা দুগ্ধের বড় ভাণ্ড।

লোরুখা—পুরুষপক্ষী।　　রেস্তি—ব্যঞ্জন।

লক্‌ করিয়া থাক—চুপ করিয়া থাক।

লকে লকে—আস্তে পা ফেলিয়া, যেমন লকে লকে যাও।

লথরা—তামসা।　　লাদম্বরা—ভাল মন্দ জ্ঞানরহিত।

লোড়া কোড়ানী—উঞ্ছকার্য্যকারিণী।　　লস—ঢিল, প্রলোভন।

লাল বুঝক্কর—যে লোক কিছু জানে না, অথচ সমস্তই জানি বলিয়া ভাণ করে।

সাহোন্‌—সাহা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়, প্রয়োগ—সাহেনে বাড়া আছে?

সর্ব্বরক্ষা—সর্ব্বনাশ না বলিয়া অনেকে এই শব্দটী ব্যবহার করে, ভয় পাছে সর্ব্বনাশ বলিলে হয়ত বক্তার বিপদ্‌ হইবে।

সরাপি—যাহারা সরাপ অর্থাৎ মদ খায়; অথবা যাহারা পয়সা কড়ির ব্যবসায় করে।

শুত্‌লে—শুইলে।

সুরকি দেওয়া—মাছ ধরিবার সময় অথবা ঘুড়ী উড়াইবার সময় সুতা ঢিল দেওয়া।

মুক্কা—কীল, মুষ্ট্যাঘাত, যেমন, বুড়া ষাঁড় হুকা ভেঙ্গে খেঁয়ে গেল মুক্কা।

ল্যাকান—তুল্য, লক্ষণ শব্দ হইতে উৎপন্ন।　　ভ্যাক্‌না—বাঁকা বেড়া।

সাহান—বক।　　শক্কর—চিনি, শর্কর শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সত্যনাশা—যে পুরুষ সত্য ভঙ্গ করে, স্ত্রীলোক তাহাকে সত্যনাশা বলে।

সাতাপু—পিচ্‌ ফল।　　শুকটী—অতিশীর্ণা স্ত্রীলোক।

সুম—কৃপণ।　　সল্লা—পরামর্শ।

সাথুরা—যে তীর্থ যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করায়।

হলাকান্‌—শ্রান্ত, ক্লান্ত। যেমন ঢুড়তে ঢুড়তে হলাকান হনু।

হামি—আমি।　　হামার—আমার।

হামশায়া—প্রতিবেশী, পাড়ার লোক।

হান্ঠ্যা—অনর্থক, অসম্ভব, অপ্রাসঙ্গিক। প্রয়োগ—হান্ঠ্যা কথা বলিয়া আগুন লাগিয়ে দিলি প্সায়।

হুড়—লোকের ধাক্কা ধাক্কি।

হেহু—ব্যাকুপ, নির্ব্বোধ, যেমন গোয়ালা জাতিটা বড় হেহু।

হারুণ—দুষ্ট, প্রয়োগ—তুইত না বড় হারুণ রে? হরকট—খুব তিক্ত।

হুলু বুলু—ব্যস্ততা, প্রয়োগ—এত হুলু বুলু কর কেন?

হ্যায়াই—এখানে এস, এখানে আয়।

মাসোস বা মুসোস—মামী শাশুড়ী।

হিল্লা—অবলম্বন, আশ্রয়, যেমন একটা হিল্লা জুটিয়াছে।

হটু—যে হটিয়া যায়, বিবাদ করিয়া যে হারিয়া যায়।

হরকত—হানি। হদক্কি—খাওয়ার উপর খাওয়া।

হাড়ি টোঙ্‌না—যে খাইয়া নিন্দা করে।

মুব্‌ণা—যে ঋণ করিয়া পশ্চাৎ পরিশোধ না করে।

হেকট—যে কথা শুনেনা, প্রয়োগ—ছেলেটা বড় হেকট।

লাল্লা—লালায়িত।

হাল্‌কাজিয়া—তরল বুদ্ধির লোক।

হন্তরং—অন্তরায়। হটকার—হঠাৎকার।

টানের বছর—অন্নকষ্টের বৎসর।

বরাত—প্রযোজন, যেমন হামার ত্রকনা বরাত আছে।

ছাম—মাছ, এ জেলার উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কাঁসারি জাতি ব্যবহার করে।

গাজোল—বর্ষা বাদল, এ জেলার উত্তরাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

৮। গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রাচীন পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পলতিকায় ভগবল্লীলা সম্বন্ধে মহাজন পদাবলী যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে গৌরাঙ্গলীলাসম্বন্ধে মহাজন ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে যতগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে, সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জগদ্বন্ধু বাবু এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিদূর্দ্ধ, পঞ্চদশ শত প্রাচীন পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৮০।৮৫ জন পদকর্ত্তার পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে আছে। ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকাংশে পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় ব্যতীত মহাজন পদ-সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু এই পুস্তক সঙ্কলনের জন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক [illegible] পদ [illegible] কীর্ত্তনীয়া এবং টহলদারের [illegible] অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ [illegible] সংগৃহীত পদাবলী গায়ক পাঠকের সুবিধার জন্য ভগবল্লীলার ন্যায় গৌরাঙ্গলীলার বিবিধ অবস্থাভেদে তরঙ্গে এবং প্রতি তরঙ্গে বিবিধ উল্লাসে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৭৫০ এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবল মাত্র ২৲ টাকা। গুরুদাস বাবুর দোকানে ও মজুমদার লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল।৵০ আনা।

(পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অভাব-মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষা আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুঁথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পরিষৎ-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্দ্দশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—o—

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৪

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮০ আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
১৩১৪ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

———00———

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বি,এল্।

সহকারী সভাপতিগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী এম্‌এ, ডি,এল, এফ, আর, এ, সি,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্‌এ, বি,এল,

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ,

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ,

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্‌এ,

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,

পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব,

ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ, বি,এল,

গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী,

ছাত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌এ।

নির্ব্বাচিত-সভ্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ,

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,

কুমার ” শরৎকুমার রায় এম্‌এ,

” বিহারীলাল সরকার,

” শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,

” রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর,

” যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিএ,

” চারুচন্দ্র বসু।

আনানীত সভ্য।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ,

” অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ,

” অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল,

” নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌এ, বি,এল

ধ্বনি-বিচার

মহাকবি কালিদাস বাক্যের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে হরগৌরীর সম্বন্ধের ন্যায় নিত্য জানিয়া বাগর্থপ্রতিপত্তির জন্য হরগৌরীকে প্রণামান্তে তাঁহার মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হালের পণ্ডিতেরা অনেক মাথা খুঁড়িয়াও ঐ সম্বন্ধ কোথা হইতে কিরূপে আসিল তাহা আজিও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ভাষার কতকগুলি শব্দ স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষার অন্তর্গত যাবতীয় শব্দের এইরূপে উৎপত্তি বুঝা যায় না। কা কা করে বলিয়া কাকের নাম কাক, আর কুহু কুহু করে বলিয়া কোকিলের নাম কোকিল, ইহা বুঝা যায়, এমন কি কেঁউ কেঁউ যে করে সে কুকুর, ইহাও অনুমান চলে। এইরূপে কতকদূর যাওয়া চলে, কিন্তু বহুদূর নহে।

স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতটাকে ইংরাজিতে পণ্ডিতের ভাষায় অনোমাটপিক থিয়োরি বলে। বিদ্রূপ করিয়া ইহাকে bow-wow theory বা ভেউ ভেউ থিওরি বলা হয়। বলা বাহুল্য এই ভেউ ভেউ থিওরির দৌড় খুব বেশী নহে।

আমাদের বাঙ্গালাভাষায় কিন্তু ইহার দৌড় বোধ করি অন্য ভাষার চেয়ে অধিক। ধ্বনির অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করেন নাই। বলা বাহুল্য প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে ইহাদের স্থান নাই, দৈবাৎ দয়া করিয়া দুই একটাকে স্থান দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু গণিতে বসিলে ইহাদের সংখ্যার সীমা পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে।

বাঙ্গালা দেশের শাব্দিক পণ্ডিতদিগের নিকট ইহাদের আদর নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালার কবিগণ ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে ভাষার উপর অধিকারে যাঁহার তুলনা মিলে না, বাগ্‌দেবী যাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূত হইয়া মধুবৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্র এই শ্রেণির শব্দগুলিকে কেমন প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শাব্দিক পণ্ডিতেরা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির আলোচনায় কুণ্ঠা বোধ করিতে পারেন, কিন্তু অন্নদামঙ্গলের 'দলমল দলমল গলে মুণ্ডমালা' বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইবে না।

এই অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দগুলির বিশিষ্টতা এই যে উহাদের অধিকাংশ শব্দই দেশজ শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় উহাদের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেশজ বলিয়া উহাদের গায়ে অনার্য্যের গন্ধ আছে এবং এ দেশের শাব্দিক পণ্ডিতেরা, যাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষার শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই গন্ধ সহিতে পারেন না। তাঁহারা সহিতে না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধা আর্য্যা সংস্কৃত-ভাষা ঠাকুরাণী যে কালক্রমে এই শ্রেণির বহু শব্দকে হজম করিয়া লইয়াছেন, তাহা যে কোন সংস্কৃত কোষগ্রন্থ খুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং

বৈদিক সংস্কৃতের সহিত আধুনিক সংস্কৃতের তুলনা করিলেও তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। সংস্কৃত কবিগণও যে ইহাদিগকে কাব্যের ভাষায় স্থান দিতে দ্বিধা করেন নাই, তাহার প্রচুর উদাহরণ আছে। ভারতচন্দ্রের মত বাঙ্গালী কবির এই শ্রেণীর শব্দের প্রতি একটা বিশেষ টান ছিল, তাহাত জানাই আছে। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেও এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার "থটমট থটমট খুরোত্থধ্বনিকৃত" ইত্যাদি কবিতা অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। মহাকবি ভবভূতি, মার্জ্জিত ভাষা ব্যবহারে যাঁহার সমকক্ষ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল, তিনি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাঁহার কবিতাকে সাজাইতে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'ভবভূতি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে।

সাহিত্যের পক্ষে যাহাই হউক, এই শব্দগুলিকে বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীর কথা কহা একবারে বন্ধ করিতে হয়। আমাদের কাজ কর্ম্ম ঘরকন্না চলে কিনা সন্দেহ হয়। অন্ততঃ এই হিসাবেও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় এই শব্দগুলিকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির একটা বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন; তৎপূর্ব্বে আর কেহ সেই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না জানি না। একটা উদাহরণ দিব। কাকে কা কা করে, আর কোকিলে কুহু কুহু করে, গাড়ী ঘর ঘর করিয়া চলে, আর মানুষে খুক খুক করিয়া কাশে; এই সকল দৃষ্টান্তে স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কোন গোল নাই। আমরা হি হি করিয়া হাসি, আর খট খট করিয়া চলি, এখানেও স্বভাবের অনুকরণ। কিন্তু রাগে যখন গা গশ গশ করে, তখন কি বাস্তবিকই এইরূপ ধ্বনি বাহির হয়? যখন গট্ মট্ করিয়া তাকান যায়, তখন চোখ হইতে বড় জোর একটা জ্যোতি বাহির হয়, কোন শব্দ বাহির হয় না। শীতে যখন হাত পা কন্ কন্ করে, তখন মাইক্রোফন লাগাইয়াও সেই ধ্বনি শোনা যায় না। বুকের ভিতরের দুরদুরনি বা ধুক্‌ধুকনি ষ্টেথসকোপ লাগাইলে কর্ণগোচর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাঙা টুক্‌টুকে কাপড় হইতে কোনরূপ টুক্‌টুক্ শব্দ আবিষ্কারের কোন আশা দেখি না। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির ধারা কখন ঝিমঝিম, কখন ঝমঝম, কখন ঝপঝপ করিয়া শব্দ করে, তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ঝিক্‌ঝিকে বেলায় যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের অরুণকিরণ নারিকেল গাছের মাথাকে রঞ্জিত করে, তখন কোনরূপ ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ শুনি নাই। আঁধার ঘরে চক্ চক্ শব্দে বিড়ালকর্ত্তৃক দুধের বাটির দুগ্ধ অপহরণবার্ত্তা ঘোষিত হয় বটে, কিন্তু চক্‌চকে দুয়ানিকে কখন চক্‌চক্ শব্দ করিতে শুনি নাই। এই শব্দগুলি ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু কোনরূপ ধ্বনিত কখনও শুনিতে পাওয়া যায় না। আপাততঃ উহাদের

কোনই সার্থকতা নাই, অথচ উহারা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে অর্থ ব্যঞ্জনা করে। কন্‌কনে শীত বলিলে যেমন শীতের তীব্রতা বুঝায়, চক্‌চকে দুয়ানি বলিলে যেমন দুয়ানির ঔজ্জ্বল্য বুঝায়, রাঙা-টুক্‌টুকে বলিলে সেই রাঙার তীক্ষ্ণতা যেমন চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আর কোন বিশেষণ তেমন স্পষ্টভাবে সেই সেই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। 'চক্‌চকে' শব্দটির অন্তর্গত তালব্য বর্ণ 'চ' আর কণ্ঠ্যবর্ণ 'ক' এই দুইবর্ণের ধ্বনিতে এমন কি আছে, যাহাতে চক্‌চকে জিনিষের 'চাক্‌চিক্য' বা উজ্জ্বলতা বুঝাইয়া দেয়? উজ্জ্বল জিনিষ হইতে যদি বাস্তবিকই কোনরূপে 'চকচক্' ধ্বনি বাহির হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত, তাহা হইলে ঔজ্জ্বল্যের সহিত চাক্‌চিক্যের সম্পর্ক বুঝিতাম। কিন্তু সেরূপ ত কিছুই দেখি না। ঔজ্জ্বল্য দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়, আর চাক্‌চিক্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়; উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হইল কি সূত্রে? রবিবাবু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে ধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইচারিটা কথা বলা আবশ্যক।

বাঁশীতে ফুঁ দিলে তাহা হইতে ধ্বনি বাহির হয় ও সেই ধ্বনি শুনিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করি। কোন কোন ধ্বনি শুনিলেই আনন্দ হয় ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক—ভগবান্ কদমতলায় বাঁশী বাজাইতেন আর গোপীরা জ্ঞানহারা হইয়া সেইদিকে ছুটিত। ধ্বনির সঙ্গে এই আনন্দের বা উন্মাদনার এই সম্পর্ক কিরূপে আসিল, তাহার উত্তর কোন পণ্ডিতে দিতে পারেন না; তবে ধ্বনির সহিত আনন্দের সম্পর্ক আছে ইহা ঠিক্। কেবল আনন্দের কেন, ক্লেশেরও সম্পর্ক আছে। কোন ধ্বনি যেমন আনন্দ দেয়, কোন কোন ধ্বনি তেমনি ক্লেশের হেতু, ইহা সর্ব্বজনবিদিত—যেমন ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্ট হয়। কোন্ ধ্বনি চিত্তে কি ভাব কিরূপে জাগায় বা কেন জাগায়, পণ্ডিতেরা তাহা বলিতে পারেন না, তবে কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি মধুর হইবে আর কোন্ ক্ষেত্রে কর্কশ হইবে, তাহার মোটামুটি একটা ভেদ্ করিতে পারেন। বাঁশী বাজাইলে বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসটা কাঁপিয়া উঠে ও বাহিরে বায়ুরাশিতে ঢেউ সৃষ্টি করে। সেই ঢেউগুলি কাণে আসিয়া লাগে ও সেখানকার স্নায়ুযন্ত্রে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনি বোধ হয়। সেকণ্ডে কতগুলি ঢেউ আসিয়া কাণে আহুত হয়, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর নহে। সংখ্যা গণিয়া দেখা গিয়াছে, সেকণ্ডে দু'শ পাঁচশ দু'হাজার দশ হাজার বাতাসের ঢেউ আসিয়া কাণে ধাক্কা দিলে ধ্বনি জ্ঞান হয়। সেকণ্ডে দু' দশটা মাত্র ঢেউ কাণে লাগিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না, আবার লাখ খানেক ঢেউ লাগিলেও হয় না। সংখ্যাভেদে ধ্বনি কোমল বা তীব্র হয়। সেকণ্ডে পাঁচশ ঢেউ কাণে লাগিলে যে ধ্বনি শুনা যায়, হাজার ঢেউ লাগিলে ধ্বনি তার চেয়ে তীব্র হয়; স্বরটা একগ্রাম উচুতে উঠে। সংখ্যা যত বাড়ে, ততই তীব্র হয়, আর যত কমে, ততই কোমল হয়।

বাঁশীর ভিতর যে ঢেউগুলি জন্মে, উহারা কোন বাধা না পাইয়া বাহিরে আসে ও

বাহিরের বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হয়। যতক্ষণ ধরিয়া এই ঢেউগুলি আটক না পাইয়া আসিতে থাকে, ততক্ষণ ব্যাপিয়া আমরা বংশীধ্বনি শুনিতে পাই।

তানপুরার তারে ঘা দিলেও ঐ রূপ হয়। তারটা যতক্ষণ কাঁপে, চারিদিকের বায়ুরাশিতে ততক্ষণ ঢেউ জন্মে ও ততক্ষণ ধরিয়া আমরা ধ্বনি শুনিতে পাই। লম্বা তারে সেকণ্ডে যত ঢেউ জন্মায়, খাট তারে তার চেয়ে বেশী জন্মায়। কাজেই তার যত লম্বা হয়, ধ্বনি ততই নীচে নামে বা কোমল হয়।

এই সকল ধ্বনি মধুর ধ্বনি; মধুর বলিয়াই বাঁশী আর তার সঙ্গীতের যন্ত্রগঠনে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশিয়া স্বরমাধুর্য্যের উৎকর্ষ বাড়ায়। লম্বা তারে ঘা দিলে গোটা তারটাই কাঁপে, আবার গোটা তারটা আপনাকে দুই, তিন, চারি বা ততোধিক সমানভাগে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগ পৃথক্‌ভাবে কাঁপে। এক এক ভাগের কম্পে এক এক রকম ধ্বনি বাহির হয়। দুই হাত লম্বা তারে যে ধ্বনি বাহির হয়, একহাত লম্বা ভাগ হইতে তার চেয়ে উচু, আধহাত লম্বা ভাগ হইতে আরও উচু ধ্বনি বাহির হয়। এই সকল ধ্বনি একত্র মিশিয়া ধ্বনির মাধুর্য্যের ইতরবিশেষ জন্মায়। বাঁশীর ভিতরে আটকান বাতাসেও ঐরূপ ঘটে। সমস্ত বাতাসটা কাঁপে, আবার ঐ বাতাস আপনাকে দুই তিন চারি সমান স্তরে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগ আপন আপন ধ্বনি জন্মাইয়া কাঁপে; কোন ধ্বনিটা কোমল, অন্যটা তার চেয়ে তীব্র; কোমলে তীব্রে মিশ্রিত হইয়া ধ্বনির মাধুর্য্য বাড়াইয়া দেয়; অথবা ধ্বনির প্রকৃতি বদলাইয়া ফেলে।

টেবিলের উপর কাঠে ঠক্ করিয়া ঠোকর দিলে কাঠখানা কাঁপিয়া উঠে; কাষ্ঠফলকটা আপনাকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া লয় ও এক এক ভাগ আপন ধ্বনি উৎপাদন করিয়া কাঁপিতে থাকে। কিন্তু বাঁশীর ভিতরে বাতাস বা তন্ত্রীযন্ত্রের তার যেমন আপনাকে সমান সমান ভাগ করিয়া লয়, কাষ্ঠফলক তেমন করিয়া বিভক্ত হয় না। উহার ভাগগুলি এলো-মেলো হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল ভাগ হইতে যে সকল ধ্বনি জন্মে, তাহারা একযোগে একটা কর্কশ শব্দ উৎপাদন করে, উহা কর্ণজ্বালা জন্মায়। কাঠের ঠক্‌ঠকানি কাহারও মিষ্ট লাগে না। সুখের বিষয় উহার স্থিতিকাল অল্প। ঠক্ করিয়া ঠোকর দিবামাত্র কাঠখানা এখানে সেখানে কাঁপিয়া উঠে ও ক্ষণেকের মধ্যে থামিয়া যায়। তাই কর্ণজ্বালাটাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

পিতলের ঘড়িতে হাতুড়ির আঘাত দিলে ঢং করিয়া শব্দ হয়। ঐ 'ঢং' এর 'ঢ' টুকুতে কোন মাধুর্য্য নাই। কঠিন ধাতুফলকে কঠিন কাঠের হাতুড়ির আঘাতে যে এলোমেলো কাঁপুনি ক্ষণেকের মত জন্মে, এই কর্ণজ্বালাকর 'ঢ'টা তাহারই ফল। তবে এই এলোমেলো অনিয়মিত কম্প থামিয়া গেলে ধাতুফলকটা আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া বেশ নিয়মিত ভাবে কাঁপিতে থাকে; তখন 'ঢং' এর 'ঢ' টুকু চলিয়া গিয়াছে, উহার 'অং' টুকু তখনও চলিতেছে। এই 'অং' টুকু বেশ মধুর।

শব্দশাস্ত্রে বলে, ঐ 'ঢং' শব্দটার মধ্যে দুইটা বর্ণ আছে; একটা ব্যঞ্জন আর একটা স্বর।

'ঢং' এর অন্তর্গত ক্ষণস্থায়ী 'ঢ' টুকু ব্যঞ্জন বর্ণ, আর স্থায়ী 'অং' টুকু স্বরবর্ণ। কঠিন দ্রব্যের সংঘট্টে ঐ অচিরস্থায়ী ব্যঞ্জনটার জন্ম; উহার স্থিতিকাল এত অল্প, যে পরবর্ত্তী 'অং' টুকু উহাতে যুক্ত না হইলে উহা শুনিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। 'ঢ' বর্ণটা ঘড়ির পিঠে হাতুড়ির স্পর্শ-কালে উদ্ভূত; ঐ স্পর্শকালেই উহার উৎপত্তি; এইজন্য উহাকে স্পর্শ বর্ণ বলা যাইতে পারে।

আমাদের বাগ্‌যন্ত্রটাও অনেকটা বাঁশীর মত। ফুসফুস হইতে প্রশ্বাসের বায়ু মুখকোটরে আসিবার সময় কণ্ঠনালীর পেশী নির্ম্মিত তারে আঘাত দিয়া ঐ তারকে কাঁপাইয়া দেয় এবং তারের কম্পে মুখকোটরের বায়ুমধ্যে ঢেউ জন্মে। সেই ঢেউগুলি মুখকোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কর্ণগত হইলে ধ্বনি জন্মে। বাহির হইবার সময় কোথাও কোন বাধা বা আটক না পাইয়া বাহির হইলে উহা স্বরবর্ণের উৎপত্তি করে; আর কোন স্থানে আটক পাইলে ব্যঞ্জনবর্ণের উৎপত্তি করে। মুখ ব্যাদান করিয়া বা 'বিবৃত' করিয়া আমরা স্বরবর্ণের উচ্চারণ করি, আর ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বহির্গমনোন্মুখ বায়ুকে বাগ্‌যন্ত্রের কোন একটা স্থানে আটকাইয়া ফেলি। কণ্ঠতন্ত্রী কাঁপাইয়া কণ্ঠনালী হইতে বাতাস বাহিরে আসিতেছে; এমন সময়ে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোঁড়াটা উপরে তুলিয়া কণ্ঠের দুয়ার আটকাইয়া দিলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল 'ক'; উহা ব্যঞ্জনবর্ণ; জিহ্বামূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি, কাজেই উহা জিহ্বামূলীয় স্পর্শ বর্ণ। অথবা জিহ্বার মধ্যভাগ তালুতে স্পর্শ করিয়া বাতাস আটকাইলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল "চ"; উহা তালব্য স্পর্শ বর্ণ। অথবা জিহ্বার ডগাটা উল্টাইয়া উপরে তুলিয়া তালুর পশ্চাতে যেখানটাকে মূর্দ্ধা বলে, সেইখানে এক ঠোকর দিলাম, আর বাহির হইল 'ট'; উহা মূর্দ্ধন্য স্পর্শবর্ণ। অথবা জিহ্বার অগ্রভাগ উপর পাটির দাঁতে ঠেকাইয়া বাতাসটা আটকাইবামাত্র ধ্বনি জন্মিল 'ত'; উহা দন্ত্য স্পর্শ বর্ণ। আর দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িলে জন্মিল 'প'; উহা, ওষ্ঠ্য স্পর্শবর্ণ।

নরকণ্ঠে যে যে ধ্বনি নির্গত হয়, অন্যত্রও সেই ধ্বনিগুলি আমাদের পরিচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরকণ্ঠ অনেকটা বাঁশীর মত; বাঁশীর ভিতর হইতে বাতাস অব্যাহত ভাবে অর্থাৎ কোথাও আটক না পাইয়া বাহির হইলে যে বহুক্ষণ স্থায়ী ধ্বনি জন্মে, উহা স্বরের ধ্বনি; সেই বাতাসের পথ রোধ করিলে ক্ষণস্থায়ী ব্যঞ্জনের উৎপত্তি হয়। কঠিন বস্তুর পরস্পর স্পর্শ বা সংঘট্ট এই ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনের অনুকূল। যথা, কাঁচি দিয়া তার কাটিলে শব্দ হয় 'কট'; মসৃণ বস্তুর গায়ে আঙুল টানিলে শব্দ হয় 'চক'; কাঠে আঘাতে শব্দ হয় 'ঠক'; পথের উপর পদ শব্দ 'দপ্‌' ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন ধ্বনির একটা লক্ষণ এই যে উহা ক্ষণস্থায়ী; এত অল্প সময় ব্যাপিয়া উহার স্থিতি, যে পূর্ব্বে বা পরে স্বরধ্বনি না থাকিলে উহার উচ্চারণ চলে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঘড়ি পিটিলে যে 'ঢং' শব্দ হয়, উহার 'ঢ' ক্ষণস্থায়ী; পরবর্ত্তী স্বর "অং" যোগে উহা বুঝা যায়। আমরা কা, কি, কু ইত্যাদি স্বরান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পারি; আবার অক্‌, ইক্‌, উক্‌ এইরূপে

আদিতে স্বর বসাইয়া ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিতে পারি; কিন্তু স্বরবর্জ্জিত ব্যঞ্জনটুকু উচ্চারণ করিতে পারি না। হাওয়া কণ্ঠনালী হইতে মুখকোটরে বাহির হইবার সময় যদি বাধা পায়, সেই বাধার সমকালে বাহির হয়—ব্যঞ্জনের ধ্বনি; বাধাটা সরিয়া গেলে যাহা বাহিরে আসে তাহা স্বর।

খাঁটি স্বরের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা থাকে বা 'বিবৃত' থাকে। হাওয়া অবাধে বাহির হয়। তবে মুখকোটরটার আকৃতি অনুসারে ঐ স্বরের বিকার উপস্থিত হয়। 'আ' উচ্চারণের সময় আমরা একবারে বদন ব্যাদান করিয়া হা করিয়া থাকি; তখন জিহ্বাটা মুখগহ্বরের নীচে নামিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 'ঈ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া তালুর নিকটবর্ত্তী হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের কোটর তখন অনেকটা ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখ কোটর আরও ছোট হয়; দুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে, দুই ঠোঁটের মাঝে একটি ছোট বিবর উৎপন্ন হয়, ঐ বিবরের দ্বার দিয়া হাওয়া বাহির হয়। মুখ গহ্বরের আকার ও আয়তনের ভেদানুসারে স্বরের এইরূপ ভেদ হয়। বাঁশীতে যেমন একটা মূলধ্বনির সহিত অন্যান্য ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া ধ্বনিকে বিকৃত করে, সেইরূপ মুখকোটরেও কণ্ঠোদ্গত মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ও মিশিয়া গিয়া ধ্বনির এইরূপ বিকার উৎপাদন করে।

কোন্ কোন্ ধ্বনি মিশিয়া কি কি স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, হেলম্‌ হোলৎজ্‌ প্রথমে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন: 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের মধ্যে কোন্‌টার ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বিশ্লেষণে যে যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়া 'অ' 'ই' উ প্রভৃতি স্বর যন্ত্রযোগে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ সকল পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। ব্যাকরণ শাস্ত্রে এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের খোঁজ লওয়ার দরকার হয় না। এখানে মোটামুটি হিসাব চলে। এই মোটা হিসাবে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় তিনটি বিশুদ্ধ স্বর আছে। 'অ' 'ই' 'উ'; এই তিন স্বরের প্রত্যেকের আবার মাত্রাভেদে হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই তিনটি করিয়া রূপ আছে। উচ্চারণের স্থিতি কালানুসারে মাত্রার নির্ণয় হয়।

এইরূপে ঐ তিন স্বরের নয়টি রূপ যথা—অ, আ, আ; ই, ঈ, ঈ; উ, উ উ। প্লুতত্ব নির্দ্দেশের জন্য আমরা নীচে একটা কষি দিলাম। এই নয় স্বরের প্রত্যেকের আবার দুইটি করিয়া ভেদ আছে; নাক দিয়া কতক হাওয়া বাহির করিয়া প্রত্যেক স্বর আমরা নাকিসুরে উচ্চারণ করিতে পারি; যথা—অঁ (অং); অথবা কণ্ঠনালী হইতে জোরের সহিত হাওয়া বাহির করিতে পারি যথা—অঃ। এই দুই ভেদ 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' এই দুই লিপি চিহ্নদ্বারা লিখিয়া দেখান হয়। 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ ইহা লইয়া একটা তর্ক আছে; উহা স্বরও নহে ব্যঞ্জনও নহে; উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি বুঝাইবার চিহ্নমাত্র। উল্লিখিত নয়টি স্বরের প্রত্যেকটিরই এই দ্বিবিধ বিকার হইতে পারে; যথা—অঁ অঃ;

অঁা আঃ; অঁা আঃ। এইরূপে সমুদয়ে সাতাশটি স্বর উৎপন্ন হয়। এই সাতাইশটি স্বরধ্বনি (অ, ই, উ) তিনটি মূল ধ্বনিরই রূপভেদ মাত্র।

আমরা সংস্কৃতভাষার লিপি বাঙলাভাষার জন্যে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু বর্ণগুলির পুরাতন উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। 'অ'কারের উচ্চারণ অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে; উহার প্রকৃত উচ্চারণ হ্রস্ব 'আ'। বাঙলা দেশের বাহিরে অকারের প্রাচীন উচ্চারণ এখনও আছে। একটি বেহারী পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠের সময় পড়িতেছিলেন 'মম'; আমার ভ্রম হইয়াছিল, তিনি যেন পড়িতেছেন 'মামা'। আবার বহুস্থলে আমরা অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব 'ও'কারের মত করিয়া লইয়াছি। কথাবার্ত্তার ভাষায় আমরা কোন স্বরেরই হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করি না; খাঁটি বাঙলায় 'ঈ', 'ঊ' আছে কি না সন্দেহ। আবার বাঙলায় প্লুত উচ্চারণ নাই, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। দূরে হইতে 'রাম' 'হরি' প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিবার সময় রামের 'রা'য়ের আকার ও হরির 'রি'য়ের ইকার বোধ করি তিনমাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

'অ' 'ই' 'উ' ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে সন্ধ্যক্ষর কয়টি উৎপন্ন হয়; যথা—

অ+ই=এ;　　　অ+এ=ঐ

অ+উ=ও;　　　অ+ও=ঔ

পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্র এই চারিটি বর্ণের মধ্যে 'এ' এবং 'ও'কে অন্ততঃ তাহাদের বাঙলায় প্রচলিত উচ্চারণকে সন্ধ্যক্ষর বলিতে চাহিবেন না। শব্দশাস্ত্রে সন্ধ্যক্ষর বলিলে হানি নাই। সংস্কৃত ভাষায় এই চারিটি স্বর স্বভাবতঃ দীর্ঘ; উহাদের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙলায় কিন্তু একার ও কারের হ্রস্ব উচ্চারণই প্রসিদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত বর্ণমালায় 'ঋ' ও '৯' এই দুইটি বর্ণ স্থান পায়। উহারা স্বরমধ্যে গণিত হইলেও খাঁটি স্বর নহে। 'ঋ' উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় মূর্দ্ধা স্পর্শ করে; '৯' উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় উপরপাটীর দাঁত স্পর্শ করে। প্রায় করে;—একটু ফাঁক থাকিয়া যায়; হাওয়া সেই ফাঁক দিয়া বাহিরে আসে। হাওয়াটা একবারে আটকায় না বলিয়া উহাদিগকে ব্যঞ্জন মধ্যে না ফেলিয়া স্বরের মধ্যে রাখা হইয়াছে। সংস্কৃতভাষায় ঋকারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় প্রয়োগই আছে; দীর্ঘ প্রয়োগের সংখ্যা তত অধিক নহে। ৯কারের দীর্ঘ প্রয়োগ দেখা যায় না। প্লুতের ত কথাই নাই।

'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' এই স্পর্শ বর্ণ কয়টি মুখকোটরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্পর্শের ফলে উচ্চারিত হয় দেখা গিয়াছে। প্রত্যেকের আবার রূপভেদ আছে। স্পর্শের সময় একটু বেশী চাপ দিলে হাওয়াও একটু জোরে বাহির হয়; তখন 'ক' পরিণত হয় 'খ'য়ে; 'চ' পরিণত হয় 'ছ'য়ে, ইত্যাদি। ক চ ট ত প এই পাঁচটি বর্ণ অল্পপ্রাণ; আর খ ছ ঠ থ ফ এই পাঁচটি মহাপ্রাণ। প্রাণ শব্দের অর্থ হাওয়া; হাওয়া জোরে বাহির হয় বলিয়া মহাপ্রাণ। আবার হাওয়ার পরিমাণটা বেশী হইলে, প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ আরও গম্‌গমে জম্‌জমে গম্ভীর হইয়া পড়ে; তখন ক চ ট ত প যথাক্রমে গ জ ড দ ব য়ে পরিণত হয়। ধ্বনির এই গাম্ভীর্য্যের

পারিভাষিক নাম 'ঘোষ' ; 'ক' য়ে ঘোষ নাই ; কিন্তু 'গ'য়ে ঘোষ আছে। ঐরূপ 'খ'য়ে ঘোষ নাই ; কিন্তু 'ঘ' য়ে ঘোষ আছে। ক ও খ উভয়েই ঘোষহীন ; উহার মধ্যে আবার ক অল্প-প্রাণ, খ মহাপ্রাণ। গ ও ঘ ঘোষবান্ ; উহার মধ্যে গ অল্পপ্রাণ, ঘ মহাপ্রাণ। এইরূপে প্রাণের ও ঘোষের তারতম্যে ক বর্গ 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' এই চারি রূপ গ্রহণ করে ; আর উচ্চারণকালে নাক দিয়া কতক হাওয়া আসিলে উহার অনুনাসিক রূপ হয় ঙ। কাজেই জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ ক বর্গের অন্তর্গত পাঁচটি বর্ণ ক, খ, গ, ঘ, ঙ। ঐ রূপ তালব্য চ বর্গের অন্তর্গত চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; মূর্দ্ধন্য ট বর্গের অন্তর্গত ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; দন্ত্য ত বর্গের অন্তর্গত ত, থ, দ, ধ, ন। বর্ণ-মালার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি এইরূপে সাজান যাইতে পারে।

স্পর্শবর্ণ

	ঘোষহীন		ঘোষবান্		অনুনাসিক		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ		সন্ধ্যক্ষর	উষ্ম
জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	—	—
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য়	শ
মূর্দ্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	ব	—

ছেলেদিগকে ক খ শেখাইবার সময় আমরা 'ঙ'কে 'উঙা' বা 'ওঙা' এবং 'ঞ'কে 'ইঞা' বলিতে শেখাই ; উহাদের উচ্চারণ কেন এরূপে বিকৃত করা হয় জানি না। আদিতে স্বর না বসাইয়াও এই দুই বর্ণের উচ্চারণ চলে। আর উহাদের অকারান্ত উচ্চারণ না করিয়া আকা-রান্ত করিবারও প্রয়োজন দেখি না। বাঙ্‌লা ভাষায় 'ণ'য়ের উচ্চারণ লোপ পাইয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু উহা সর্ব্বত্র লুপ্ত হয় নাই। 'কণ্ঠ' 'অণ্ড' 'ঢুণ্ঢি' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময় ণকারের প্রকৃত মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে।

সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ 'হ', ইহাকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলা চলে। 'অ' যেন মহাপ্রাণ হইয়া 'হ'য়ে পরিণত হয়। ইংরেজিতে h এর উচ্চারণ হ ; ইংরাজি লিপিতে কোনস্থানে মহাপ্রাণ উচ্চারণ দেখান আবশ্যক হইলে অল্পপ্রাণ বর্ণের চিহ্নে h যোগ করা বিধি আছে। যথা—k=ক, kh=খ।

'য়' (y) 'ব' (w) 'র' 'ল' এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণকে এক রকম সন্ধ্যক্ষর রূপে গণ্য করা চলিতে পারে।

য়=ই+অ ব=উ+অ

র=ঋ+অ ল=ঌ+অ

উহাদের উচ্চারণে মুখ সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃতও থাকে না, আবার হাওয়া একবারে আটকানও

পড়ে না। কাজেই উহারা না-স্বর না-ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে y ও w পদমধ্যবর্ত্তী হইলে vowel বলিয়াই গণ্য হয়।

সংস্কৃত অন্তঃস্থ য ও অন্তঃস্থ ব বাঙ্গালায় আসিয়া বর্গীয় জ ও বর্গীয় ব হইয়া পড়িয়াছে। 'বাক্য' 'নাট্য' 'দ্বার' 'ত্বরা' প্রভৃতি শব্দে পুরাতন উচ্চারণ কতকটা পাওয়া যায়।

শ, ষ, স আর তিনটি বর্ণ আছে; জিহ্বা ঘেঁষিয়া বায়ু বাহির হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে এই এই ধ্বনি জন্মে; ইহাদের নাম উষ্মবর্ণ। যাঁহারা বলেন, বাঙলায় তিনটি উষ্মবর্ণের প্রয়োজন নাই, এক 'শ'য়েই কাজ চলিতে পারে, তাঁহাদের কথা ঠিক নহে। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে আমরা প্রকৃত উচ্চারণ বাহাল রাখিয়াছি, না রাখিয়া উপায় নাই। যথা—নিশ্চয়, পশ্চাৎ, এস্থলে তালব্য উচ্চারণ; কষ্ট, ওষ্ঠ, এস্থলে মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ; হস্ত, মস্তক, এস্থলে দন্ত্য উচ্চারণ।

নরকণ্ঠনিঃসৃত যে সকল ধ্বনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি মোটামুটি দেখান গেল। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল ধ্বনি আছে, অন্যান্য ভাষাতেও তাহার অনেক গুলি আছে; কোথাও গোটাকতক কম, কোথাও বা গোটাকতক বেশী আছে মাত্র। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজান হইয়াছে, অন্য কোন বর্ণমালা সেরূপ সাজান হয় নাই। আমরা বাঙ্‌লা ভাষায় ঐ বর্ণমালাই গ্রহণ করিয়াছি, তবে সকল বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ স্থির রাখিতে পারি নাই, এবং বাঙ্‌লা ভাষায় অতিরিক্ত দুই একটা ধ্বনি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার স্থান ঐ বর্ণমালায় নাই।

স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে মনুষ্যের ভাষার কিয়দংশ নির্ম্মিত হইয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। বাঙলা ভাষার নির্ম্মাণকার্য্যে এই অনুকরণ কতদূর চলিয়াছে, তাহাই বিচার্য্য। কতিপয় ধ্বনির একযোগে এক একটি শব্দ গঠিত হয়, এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্থ আরোপ করা হয়। সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিল? শব্দের গঠনে যে যে ধ্বনি উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কি না তাহা দেখান আবশ্যক; তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কেন ঐ শব্দ ঐ রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বলা বাহুল্য অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শব্দশাস্ত্রের পক্ষে বর্ত্তমানে অন্য উপায় নাই।

প্রথমে আ ই উ এই স্বরত্রয়ের ভেদ কোথায় দেখা যাউক। 'আ' উচ্চারণে আমরা বদন ব্যাদান করি; মুখকোটরের পরিসর ও আয়তন যথাশক্তি বাড়াইয়া লই। 'ই' উচ্চারণে মুখকোটরের আয়তন ছোট হইয়া পড়ে, 'উ' উচ্চারণে আরও ছোট হয়। 'আ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বরের মধ্যে আ বড় বুঝায়; ই তার চেয়ে ছোট, উ আরও ছোট বুঝায়।

বাঙলায় টা, টি, টু, এই তিনটি প্রত্যয় আছে। যথা—একটা, একটি, একটু। একটা বলিলে যতবড় জিনিষ বুঝায়, একটি বলিলে তার চেয়ে ছোট বুঝায়, একটু বলিলে আরও

ছোট, অর্থাৎ অতিঅল্পমাত্র বুঝায়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন না কি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজাটি নও, রাজাটা ; আমিও পণ্ডিতটি নই, পণ্ডিতটা ।"

'চক্‌চকে' জিনিষ বলিলে উজ্জ্বল জিনিষ বুঝায় ; 'চিক্‌চিকে' জিনিষের ঔজ্জ্বল্য তার চেয়ে কম ; 'চুক্‌চুকে' জিনিষের ঔজ্জ্বল্য বোধ করি আরও কম।

'কড়কড়ে' বলিলে কর্কশ বুঝায় ; 'কিড়কিড়ে' জিনিষের কার্কশ্য তার চেয়ে অল্প। রাঙা 'টক্‌টকে' রঙের তীব্রতার চেয়ে রাঙা 'টুক্‌টুকে' রঙের তীব্রতা অল্প।

'পট্‌পটে' জিনিষ হালকা ও ভঙ্গপ্রবণ ; 'পিট্‌পিটে' জিনিষ আরও হালকা ; 'পুটপুটে' জিনিষ এত ভঙ্গুর, যে বোধ করি স্পর্শ সহিতে অক্ষম।

'চন্‌চনে' রৌদ্র চেয়ে 'চিন্‌চিনে' রৌদ্রের দীপ্তি কম।

আর উদাহরণ বাড়াইয়া দরকার নাই। এই কয়টি দৃষ্টান্তেই বক্তব্য স্পষ্ট হইয়াছে আশা করি। আ, ই, উ এই তিনস্বর একই ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাব জ্ঞাপন করে, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। এখন ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লইয়া আলোচনা করিব। ক বর্গ হইতে প বর্গ পর্য্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন খাঁটি স্পর্শবর্ণ। ঐ গুলির আলোচনা প্রথমে। একটু উল্টাইয়া লইব। ক বর্গে আরম্ভ না করিয়া আমরা প বর্গে আরম্ভ করিব ও ক বর্গে শেষ করিব।

প বর্গ

প ফ ব ভ এই চারিবর্ণের উচ্চারণে মুখকোটরের বায়ু দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া বাহির হয় ; দুই ঠোঁট জোড়া হইয়া বায়ুর পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে ; বায়ু ঠোঁট দুইখানিকে পৃথক্ করিয়া তাহাদের মাঝে পথ করিয়া লইয়া একটু জোরের সহিত বাহির হয়। ফাঁপা জিনিষের কঠিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেই এই শ্রেণির ধ্বনি জন্মে।

বাঁশী বাজাইবার সময় দুই ঠোঁটের চাপ দিয়া মুখের বায়ু বাঁশীর ভিতরে ঠেলিয়া দিতে হয়— বাঁশীতে যে ধ্বনি বাহির হয়, তাহার অনুকরণে আমরা বলি 'পোঁ' শব্দে বাঁশী বাজিল। আগুন জ্বালিবার জন্য আমরা এইরূপে 'ফুঁ' দিয়া থাকি ; মহাদেব গাল বাজাইতেন, তাঁহার মুখের বায়ু বাহির হইবার সময় 'ববম বম' শব্দ হইত ; মহাদেবের শিঙা 'ভভম্ভম্' শব্দে বাজিত। এই কয়টি উদাহরণেই দেখিতেছি প বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপূর্ণ ফাঁপা জিনিষের সম্পর্ক রহিয়াছে ; অভ্যন্তর হইতে বাতাস বাহির হওয়ার সময় এই ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আরও উদাহরণ—

প

হাঁসে 'প্যাঁক প্যাঁক্' শব্দ করে। উহার দুই ঠোঁটের ভিতর হইতে ঐ শব্দে বাতাস বাহির হয়। পাঁক বা কর্দ্দমের ভিতর বাতাসের বুদ্‌বুদ আবদ্ধ থাকে ; হাতে টিপিলে

উহা বাহির হইয়া যায়; এই হেতু পাঁকের মত জিনিষ 'প্যাক্ প্যাক' করে; উহা 'প্যাক্-পেঁকে'। সংস্কৃত পঙ্ক (বাঙলা পাঁক) শব্দের সহিত এই ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি?

হালকা ভঙ্গপ্রবণ কঠিন জিনিষ কাটিবার সময় বায়ু সেই কাট দিয়া বাহির হইলে 'পট্' শব্দ হয়; কাটিবার শব্দ পট্পট্ পিট্পিট্ পুট্পুট্ ইত্যাদি; হালকা ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্যের বিশেষণ পট্-পটে, পিট্পিটে, পুট্পুটে। পয়ের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্য বর্ণ ট কাঠিন্যব্যঞ্জক [পরে দেখ]। কাপড় ছেঁড়ার শব্দ 'পড় পড়'—উহা কর্কশ শব্দ; এখানে ড় কার্কশ্যবোধক।

মুখের ভিতর হইতে থুথু ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা বাতাসও বাহির হয়; 'পচ্' 'পিচ' 'পিৎ' থুথু ফেলার শব্দ। 'পিচ্' শব্দ সহ 'পিচকারি' হইতে জল বাহির হয়। মুখ হইতে নিঃসৃত তাম্বূলরসের নাম পানের 'পিক'। থুথুর মত যাহাতে ঘৃণা জন্মায়, তাহা 'পিৎ পিৎ' করে, 'পিচ পিচ' করে, 'পিল পিল' 'প্যাল' 'প্যাল' করে। ঐ সকল শব্দে পয়ের সহিত যুক্ত চ, ত, ল বর্ণগুলি তারল্যের ব্যঞ্জক [পরে দেখ]।

ফ

পয়ের তুলনায় ফবর্ণ মহাপ্রাণ; ফ উচ্চারণে হাওয়া আর একটু জোরে বাহির হয়। ফাঁপা জিনিষের ভিতর হইতে বাতাস বাহির হইলেই শব্দ হয় 'ফস্' 'ফিস্' 'ফুস'; ফয়ের পরবর্ত্তী উষ্মবর্ণ সকার বায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সাপের ঠোঁটের ভিতর হইতে বাহির হয় 'ফোঁস্'। শেয়ালে সময় অসময়ে 'ফেউ' ডাকে। আগুনে 'ফুঁ' দেওয়া হয়; উহার সংস্কৃত নাম 'ফুৎকার'। লোকে 'ফুসফাস' করিয়া বা 'ফিসফিস' করিয়া কথা কহে বা গোপনে পরামর্শ করে। গোপনভাবে কাণের কাছে 'ফুসফাস' করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিপথে চালাইবার চেষ্টার নাম 'ফুসলান'। দেহমধ্যে যে যন্ত্র হইতে শ্বাসবায়ু বাহির হয়, তাহার নাম 'ফুসফুস'। যে জাদু-বিদ্যা—ডাইনের বিদ্যা জানে, সে ফুসফাস করিয়া মন্ত্র পড়িয়া অন্যকে বশীভূত করে—সেই জাদুকরের নাম 'ফোকস'।

হাওয়ার বেগে পাতলা কাপড় 'ফরফর' করিয়া উড়ে; যে কাপড় যত পাতলা, বাতাসে তাহা তত কাঁপিয়া উঠে; অধিক পাতলা হইলে সে কাপড় হয় 'ফুরফুরে'। পাতলাকাপড় যেমন হাওয়ায় চঞ্চল, সেইরূপ চঞ্চল প্রকৃতির মানুষও 'ফরফরে'।

'ফিক্' করে হাসিলে মুখের কিঞ্চিৎ বাতাস বাহিরে আসে। সে হাসি হো হো হাসি নয়, উহা মৃদু হাসি, হালকা হাসি। কোন রঙ যখন হালকা হয়, তখন তাহাকে 'ফিকে' বলে; 'ফিকে' রঙের গাঢ়তা নাই, অত্যন্ত ফিকে হইলে উহা প্রায় সাদাটে হইয়া 'ফ্যাকসা'তে পরিণত হয়।

মুখে হইতে জল ফেলানর বা থুথু ফেলানর শব্দ 'ফচ্'। যেখানে সেখানে জল ফেলা বা থুথু ফেলা সভ্যসমাজে গর্হিত; ঐ কার্য্য তরল চিত্তের লক্ষণ; লঘুপ্রকৃতি তরলচিত্ত লোকের চলিত বিশেষণ 'ফচ্কে'। গাড়ির ঘোড়া হঠাৎ ভয় পাইয়া তরল ও চপল হইয়া উঠে বা 'ফচকিয়া' উঠে। যে লঘুপ্রকৃতি শিশু কথায় কথায় কাঁদে, সে 'ফেঁচ্-কাঁদুনে'।

যে সকল দ্রব্য শূন্যগর্ভ, ভিতরে বায়ুপূর্ণ, তাহা 'ফাঁপা' ; চামড়ার উপর 'ফোস্‌কা' পড়িলে উহা বায়ুপূর্ণ বুদ্‌বুদের মত দেখায় ; ছোট ফোস্‌কার নাম 'ফুস্‌কুরি' 'ফুস্কুরি'। যাহা ফোস্‌কার মত ফাঁপা, তাহা 'ফসকা'। উহাকে চাপিয়া ধরিতে গেলে 'ফসকিয়া' যায়। 'ফুস্কুরি'র প্রকারভেদ 'ফোড়া'। 'ফোঁফল' 'ফোঁপড়া' 'ফ্যাঁপড়া' জিনিষ আকারে প্রকারে এই শ্রেণির।

ফাঁপার প্রকারভেদ 'ফোলা', যেন ভিতরে বাতাস ঢুকিয়া ঐরূপে ফুলাইয়া রাখিয়াছে। যাহাকে বাতাসে ফুলাইয়া রাখে, তাহা 'ফুলকো'। পুষ্পকোরক 'ফুলিয়া' উঠিয়া 'ফুলে' পরিণত হয়।

'ফাঁকের' ভিতর বাতাস থাকে, ঐ ফাঁক শূন্যগর্ভ স্থান মাত্র। যে কাজের ভিতরে কিছু নাই তাহা 'ফাঁকি' বা 'ফক্কিকারি' বা 'ফক্করি'। যাহা 'ফাঁকি' তাহার ভিতরে শূন্য ; উহা মিথ্যা জিনিষ ; ফাঁকি দেওয়া যাহার ব্যবসায় সে 'ফিঁচেল'। বন্দুকে গুলি না ভরিয়া কেবল মিথ্যা আওয়াজ করিলে উহা 'ফাঁকা' আওয়াজ হয়। 'ফুঁ' দিয়া যে কাঁচের শূন্যগর্ভ শিশি তৈয়ার হয়, তাহা 'ফুঁকো' শিশি।

কঠিন পদার্থ,—যেমন কাঁচ, পাতর—'ফট্' শব্দ করিয়া 'ফাটে' ; মূর্দ্ধন্য টবর্গ কাঠিন্যবোধক। 'ফাটা' জিনিষের মাঝে যে ফাঁক থাকে, তাহা বায়ুপূর্ণ, উহার নাম 'ফাট'। ছোট ফাটের নাম 'ফুটা' ; এখানে ফাটের আকার ফুটার উকারে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেয়। মাটির বাসন 'ফুট' শব্দ করিয়া ফুটিয়া যায় বা 'ফুটো' হয়। গরম জলও 'ফুট্ ফুট্' শব্দে বুদ্বুদ জন্মাইয়া 'ফুটিয়া' থাকে। হাতের আঙুলে চাপ দিলে আঙুল 'ফুট' করিয়া 'ফোটে'। দেওয়ালের মধ্যে বৃহৎ 'ফাটের' বা দুয়ারের নাম কি 'ফটক' ?

জল 'ফুটিবার' সময় যে জলকণিকা উদ্গত হয়, তাহা জলের 'ফোঁটা' ; সামান্যতঃ জলকণিকামাত্রই জলের ফোঁটা। ভ্রাতৃললাটে ভগিনী জলবিন্দুর মত তিলকবিন্দু পরাইলে উহাও হয় ভাই-'ফোঁটা'।

এক ফোঁটা জলের ভিতর বাতাস ঢুকিয়া উহাকে ফাঁপাইয়া ফোলাইয়া তোলে ; জলবিন্দু বিস্তৃতি লাভ করে ; অতএব বিস্তৃত জিনিষের নাম 'ফয়লা'। কোন ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিলে তাহা হয় 'ফালাও' কারবার। উহা অল্প স্থান হইতে অধিক স্থানে, নিকট হইতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে ; নিকট হইতে দূরে ছড়ানর নাম 'ফেলা'। যাহার দৃষ্টি দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, অথচ তাহার ভিতরে কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, যাহা একরকম শূন্যগর্ভ দৃষ্টি—সে 'ফ্যাল ফ্যাল' করিয়া তাকায়। ফাটার প্রকারভেদ 'ফাঁসা'—তেলের কলসী 'ফাঁসিয়া' গেলে তেল ছড়াইয়া পড়ে ; তেলের সঙ্গে বাতাস মিশ্রিত হইয়া 'ফাঁসার' ফয়ের পরবর্ত্তী উষ্মবর্ণ স ধ্বনির সৃষ্টি করে। তেমনি উহাকে 'ফাড়িয়া' দ্বিখণ্ড করা চলে। কাপড়ের মত 'ফরফরে' বা 'ফুরফুরে' জিনিষকে 'ফাড়িয়া' ছিঁড়িতে হয়।

মানুষ যখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়, তাহার ভিতরটা 'ফাঁকা' হয় ; তাহার মনের ভিতর কর্ত্তব্যবুদ্ধি আসে না, ভিতরটা শূন্য হয় ; তখন সে 'ফাঁফরে' পড়ে।

'ফসকা' বা 'ফোঁপড়া' জিনিষে পরিণত করা 'ফরকান'। যাহার ভিতরে জোর নাই, বাহিরে ফুলিয়া তেজ দেখায়, সে 'ফরকায়'।

জলবুদ্বুদের নামান্তর 'ফেনা'; ফেন শব্দটি কিন্তু সংস্কৃতমূলক। ফেনার মত যাহা দেখিতে, তাহা 'ফ্যান্‌ফেনে' বা 'ফনফনে'; উহার বাহিরটা জমকাল, ভিতরটা শূন্য। মিহি ধুতি যাহার বিস্তৃতি আছে, কিন্তু যাহা টান সহে না, যাহার জোর নাই, উহা 'ফিন্‌ফিনে'।

দেখা গেল এই সকল শব্দে একটা সাধারণ ভাব ব্যক্ত করে। বায়ুপূর্ণ, শূন্যগর্ভ, স্ফীতোদর, লঘু—এই ভাবটাই প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত প্র-স্ফুরিত, প্র-ফুল্ল, বি-স্ফারিত, স্ফীতি, স্ফোটন, ফণ, ফেন প্রভৃতি শব্দগুলিতেও এই ভাব আছে। উল্লিখিত বাঙলা শব্দের মধ্যে কতকগুলি এই সকল সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন, ইহা বলা বাহুল্য।

ব

প ও ফয়ে যে বাতাসের চলাচল দেখিয়াছি, 'ব'য়েও সেই বাতাসের চলাচল ব্যাপার আরও স্পষ্ট।

আমরা বিস্মিত হইয়া মুখের বাতাস জোরে বাহির করি ও বলি "বাঃ"; ইহা বিস্ময়সূচক ধ্বনি; 'বাঃ' হইতে 'বাহবা'। বাতাস যখন জোরে বহে তখন 'বোঁ' 'বোঁ' শব্দ হয়; জোরে বাতাস ঠেলিয়া কোন জিনিষ ঘুরিতে থাকিলে বাতাসে 'বন্‌বন' শব্দ হয়, জিনিষটা 'বন্ বন্' করিয়া ঘোরে। এই জন্যই কি বাতাসের নাম 'বায়ু'?

পায়রার মুখের শব্দ 'বক্ বকম্'। মানুষেও মুখের বাতাস প্রচুরপরিমাণে খরচ করিয়া 'বক্ বক্' করিয়া কথা কয় অর্থাৎ 'বকে'। ইহার সংস্কৃত রূপ 'বচন' বা 'বাক্য'। অধিক বকিলেই 'বকাবকি' হয়। যে বেশী বকে, সে 'বখা'—কাজকর্ম্ম না করিয়া কেবল 'বাক্য-বাগীশ' হইলে 'বখিয়া' যায়। যে নির্ব্বোধ যথাসময়ে বাক্য প্রয়োগ করিতে বা 'বলিতে' জানে না, সে 'বোকা'। একেবারেই বকিতে না পারিলে সে হয় 'বোবা'। অধিক কথা কহিলে বা জোরে কথা কহিলে 'বকা' হয়, আর যেমন তেমন কথা কহিলেই 'বলা' হয়। যাহা বলা যায়, তাহা 'বোল' বা 'বুলি'; উহা কি সংস্কৃত 'বদ্' ধাতু হইতে আসিয়াছে? অতি নিকট আত্মীয় পিতা ঠাকুরকে শিশু যখন মুখ ফুটিয়া প্রথম আধস্বরে সম্ভাষণ করে, তখন তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকাই স্বাভাবিক; বাবার প্রকারভেদ 'বাবু'। 'বক' পাখীর নাম কি তাহার ডাক হইতে? 'বুলবুল' পাখী মিষ্ট 'বুলি' বলে। 'বোলতা' উড়িবার সময় 'বোঁ বোঁ' শব্দ হয়, উহা বাতাসে ডানা সঞ্চালনের শব্দ।

বকিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে 'বুকবুকনি' হয়; ইহা অন্তঃকরণের একটা ভাব। কর্কশ বাক্য, যাহা কাণে বাজে, তাহা 'বড় বড়' বা 'বড়র বড়র'; উহা আরও নিম্নস্বরে অস্পষ্টভাবে হইলে 'বিড় বিড়' বা 'বিড়ির বিড়ির' হইয়া পড়ে। বয়ের পরবর্ত্তী বর্ণ 'ড়' কার্কশ্যব্যঞ্জক।

ভ

'ব'য়ের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ভ। জানোয়ারের মধ্যে 'ভেড়া' 'ভ্যা ভ্যা' করিয়া 'ভ্যাবায়';

কুকুরে 'ভেউ ভেউ' করিয়া ডাকে; মাছি 'ভ্যান্ ভ্যান্' করে, মশা 'ভন্‌ভন্' করে, 'ভিমরুল' 'ভোঁ ভোঁ' শব্দে উড়ে; 'ভোমরা' (সংস্কৃতে ভ্রমর) 'ভ্যানর ভ্যানর' করিয়া উড়ে। যে বাদ্যযন্ত্রে 'ভ্যা ভ্যা' করে, তাহা 'ভেরী'। ছোট বাঁশীর নাম ঐ কারণে 'ভেঁপু'।

জলমগ্ন কলসীর বাতাস জলভেদ করিয়া 'ভক ভক' 'ভুক্ ভাক' 'ভুক ভুক্' 'ভড় ভড়', 'ভুর ভুর' শব্দে বাহির হয়। বাতাস বাহির হইবার সময় যে বুদ্বুদ জন্মে, তাহার নাম 'ভুড়ভুড়ি'; পাত্রমধ্যে আবদ্ধ বায়ু সঞ্চলনের সময় 'ভট ভট' 'ভুট ভাট' শব্দ করে।

বাতাস ভেদ করিয়া কোন জিনিষ বেগে ঘুরিলে যেমন 'বন্ বন্' বা 'বোঁ বোঁ' শব্দ হয়, সেইরূপ বাতাস ভেদ করিয়া বেগে দৌড়িলে 'ভোঁ' দোড় হয়। 'ফ'য়ের ধ্বনি যেমন শূন্য-গর্ভতা বুঝায়, 'ভ'য়ের ধ্বনিতেও সেইরূপ শূন্যতার বা রিক্ততার ভাব আসে, যথা মনুষ্যহীন গৃহ 'ভাঁ ভেঁা' বা 'ভোঁ ভাঁ' করে। যাহার ভিতরে কিছুই নাই, তাহা 'ভুয়া'; স্থূলকায় অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি, যাহার ভিতরে পদার্থ নাই, তাহার বিশেষণ 'ভোমা; অন্তঃসারশূন্য লোকের বাহিরে আড়ম্বর 'ভিটকেলি'; ভিতরে বায়ু বা 'ভাপ' (সংস্কৃতে 'বাষ্প') পুরিয়া স্ফীতি সাধনের নাম 'ভাপান'। উদ্দেশ্যহীন মিথ্যা অনুকরণ 'ভেঙান' বা 'ভেঙচান'। শস্যের ভিতরের সার বাহির করিয়া লইলে সারহীন ত্বক্ অবশিষ্ট থাকে, উহা 'ভুষি'। অন্তঃসারহীন আড়ম্বর প্রকাশের নামান্তর 'ভড়ঙ'; যে জিনিষের ভড়ঙ্ আছে, তাহা 'ভড়কাল'। 'ভড়ক্' দেখান অর্থে 'ভড়কান'। বহু জনতার আড়ম্বর 'ভিড়'। ভ্রান্ত মিথ্যা দৃষ্টির নাম 'ভেল্‌কি'।

শূন্যগর্ভ বায়ুপূর্ণ জিনিষ হালকা, হালকা; জিনিষ জলে 'ভাসে', যাহা ভাসে, তাহা অস্থির এবং চঞ্চল; 'ভাসা ভাসা' কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। হালকা জিনিষ—যাহার ভিতরটা সচ্ছিদ্র ও বায়ুপূর্ণ—যেমন চিনির বাতাসা—উহা 'ভস্‌ভসে'। উহা ভুস্ ভুস্ করিয়া সহজে ভাঙিয়া যায় বা গুঁড়া হয়। ঐরূপ জিনিষই 'ভুস্ ভুসে' বা 'ভুরভুরে'। ইক্ষুরসজাত গুড় যখন ঐরূপ হালকা গুঁড়ায় পরিণত হয়, তখন তাহা 'ভুরা'। মনের ভিতর হইতে স্মৃতি যখন বাহির হইয়া আসিয়া মনকে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন 'ভুল' হয়। ভুল করা যাহার স্বভাব, সে 'ভোলা'।

ভ বর্গ মহাপ্রাণ ও ঘোষবান্; উহাতে স্থূলতা জ্ঞাপন করে। 'ভোমা' শব্দে এই স্থূলত্বের ভাব আসে দেখিয়াছি। 'ভোম'ার অর্থ মোটা অকর্ম্মণ্য মানুষ। 'ভেঁাদা' 'ভ্যাদা' 'ভেঁাসা' 'ভোঁদড়' 'ভদভদে' 'ভুঁড়ি' প্রভৃতি শব্দও ঐরূপ অর্থ সূচনা করে। হাতিয়ারের ধার মোটা হইয়া ঐ হাতিয়ার অকর্ম্মণ্য হইলে 'ভোঁতা' হয়।

ম

প হইতে ভ পর্য্যন্ত ধ্বনিতে আমরা বাতাসের খেলা দেখিয়াছি—ওষ্ঠ্যবর্ণের বিশিষ্টতাই এই বাতাসের খেলা লইয়া। কোনস্থানে বাতাস নিষ্ক্রমণ কালে শব্দ হইতেছে, কোথাও বাতাস ঠেলিয়া চলিতে শব্দ হইতেছে, কোথাও বাতাস ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া রাখিতেছে। প বর্গের পঞ্চম বর্ণ 'ম'য়ের ধ্বনিতে এ ভাবটা আর তেমন প্রবল

থাকে না ; 'ম'য়ের অনুনাসিকত্বই প্রবল হইয়া 'পবর্গে'র বিশিষ্ট ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনুনাসিক বর্ণের বিশেষ লক্ষণ মৃদুতা সম্পাদন—উহা কঠোরকে মৃদু করে, কঠিনকে মোলায়েম করে।

মকারাদি কতিপয় শব্দ স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে জাত। যথা—বাঁশের লাঠি 'মচ্' করিয়া ভাঙে ; 'মচ' শব্দে বাঁকানর নাম 'মচ্কান' ; মচ শব্দ খাট হইয়া 'মুচ' হয়, ছোট কঞ্চি 'মুচ্' করিয়া ভাঙে। এইরূপ জিনিষ 'মুচমুচে'। মুচ্ শব্দ করিয়া মৃদুস্বরে হাসি 'মুচকিয়া' হাসি। 'মচকান'র প্রকারভেদ 'মোচড়ান'। ইংরেজি bending ও twisting উভয়ে যে ভেদ, মচকান ও মোচড়ান মধ্যে সেই ভেদ ; কোন জিনিষে পাক-লাগানর নাম 'মোচড়' দেওয়া। মোচড়ানর রূপভেদ 'মোশড়ান' ; প্রবল চাপে 'মুশড়িয়া' দেওয়া হয় ; মানুষের আত্মা পর্য্যন্ত আকস্মিক বিপদের চাপে 'মুশড়িয়া' যায়।

বাঁশ চেয়ে কাঠ কঠিন জিনিষ ; বাঁশ 'মচ' শব্দে মচকায়, কাঠ 'মট্' শব্দে 'মটকায়'। তালব্য চ যোগে কোমলতা বুঝায়, আর মূর্দ্ধন্য ট যোগে কাঠিন্য বুঝায়। আঙুল 'মটকাইলে' 'মট্মট্' শব্দ হয়। শব্দ তার চেয়ে মৃদু হইলে 'মুটমুট' হয়। পুঁইশাকের ছোট ছোট ফলগুলিকে গ্রাম্যভাষায় পুঁই-'মুটমুটি' বলে—উহা মুটমুট করিয়া ভাঙে। কলাইশুটির ভিতরের বীজ 'মটর'। যাহা ভাঙিলে মট্ শব্দ হয়, অর্থাৎ যাহা ভাঙিতে জোর লাগে, তাহা 'মোটা' অর্থাৎ স্থূল। মোটা কাঠ মট মট, কখন কখন আরও কর্কশ 'মড় মড়' শব্দে ভাঙে ; হঠাৎ একটা প্রবল চাপে ভাঙিলে শব্দ হয় 'মড়াৎ'। বশিষ্ঠ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমের বাছুরটিকে 'মড়মড়ায়িত' করিয়াছিলেন। মড়মড়ের চেয়ে ছোট মৃদু শব্দ 'মুড় মুড়' ; ছোট ছোট ভঙ্গপ্রবল জিনিষ 'মুড়মুড়' করিয়া ভাঙে বলিয়া 'মুড়মুড়ে' হয়। 'মুড় মুড়' শব্দে যাহা চিবান যায়, তাহা 'মুড়ি' ; উহার প্রকারভেদ 'মুড়কি'। বনমধ্যে গাছের পাতা নাড়িয়া বাতাসে কবি-প্রিয় শব্দ 'মর্ম্মর' শব্দ জন্মায়।

'ম' ধ্বনির মৃদুতার পরিচয় অনেক জানোয়ারের ডাকে পাওয়া যায় ; ভেড়ার ভ্যা ভ্যা শব্দ কর্কশ ; ছাগলের 'ম্যা ম্যা' শব্দ তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ ও মৃদু ও মোলাম। বিড়ালের ছানার 'মিউ মিউ' শব্দ বড় মৃদু ; বড় বিড়ালের গম্ভীর গলায় উহা 'ম্যাও ম্যাও' হইয়া পড়ে। যাহার স্বভাব কোমল, সে যেন বিড়ালছানার মত 'মিউ মিউ' করে—তাহাকে বলা যায় 'মিউ মিউয়ে' বা 'মি-মিয়ে' বা 'মিন মিনে'। শুকনা মাটির চেয়ে ভিজা মাটি মোলাম, উহা 'ম্যাজ ম্যাজ' করে, ভিজা ঘর 'ম্যাজমেজে'। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যখন কোমল জ্যোতি বিস্তার করে, তখন উহা 'মিট মিট' করে ; 'মিট্ মিট' করিয়া তাকাইবার সময় চক্ষু হইতে মৃদু জ্যোতি বাহির হয়। নরম চামড়ার জুতার পায়ে চলিলে 'মশ মশ' শব্দ হয়। কাপড়ের মধ্যে যাহা অত্যন্ত কোমল, তাহার নাম 'মলমল'। আলো চক্ষুতে আঘাত করে ; আঁধার চোখে আঘাত করে না, উহা কোমল জিনিষ ; আলোকহীন কৃষ্ণবর্ণ 'মিশ-মিশে' কাল।

ত বর্গ

প বর্গ ছাড়িয়া ত বর্গে আসিলে অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এখানে বাতাসের কারবার একেবারে নাই। কোমল দ্রব্যে কোমল দ্রব্যের আঘাতে বা কোমলে কঠিনে আঘাতে ত বর্গের ধ্বনির সৃষ্টি। মানুষের কোমল করতলদ্বয়ের পরস্পর আঘাতের শব্দ 'তাই তাই'। শিশুর কোমল চরণতলে ভূমিস্পর্শ ঘটিলে 'তাই তাই' শব্দের তালে তালে 'থেই থেই' নৃত্য ঘটে। কোমল দ্রব্য উপর হইতে মাটিতে পড়িলে আঘাতের শব্দ থপ্, দপ্, ধপ্। এই কোমল ভাব 'ত' বর্গের ধ্বনির বিশিষ্ট ভাব।

কোমল করতলের 'তালি'র শব্দ 'তাই তাই' যথা—'তাই তাই তাই,—মামার বাড়ি যাই'। দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগের স্পর্শজাত শব্দ 'তুড়ি'। কোমল জিনিষ 'তলতলে'; আরও কোমল—'তুলা'র মত কোমল হইলে হয় 'তুলতুলে'। উহা সচ্ছিদ্র ও ভঙ্গপ্রবণ হইলে হয় 'তুসতুসে'। কোমল দ্রব্যের চিক্কণ পৃষ্ঠদেশ 'তক্তকে'—কোমল দ্রব্যে প্রতিফলিত হইয়া আলোটাও যেন কোমল হইয়া আসে। চিক্কণ জিনিষ নির্ম্মল ও পরিচ্ছন্ন; সেই জন্য পরিচ্ছন্ন জিনিষ 'তরতরে'।

কোমল জিনিষের অকস্মাৎ ভূপতনের শব্দ 'তক্'; তাহাতে মৃদু বিস্ময় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ 'তাক্' লাগে। বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চাহনির নাম 'তাকান'। ছোট খাট মন্ত্রতন্ত্র—যাহাতে অল্পে কাজ উদ্ধার হয়, কাহারও বিশেষ ক্ষতি করে না,—তাহা 'তুক্‌তাক'।

ধাতুনির্ম্মিত তারে কোমল অঙ্গুলিসংঘাতে 'তুম্ তাম্' 'তান নানা' শব্দ হয়—'তানা নানা' সঙ্গীতের উপক্রমণিকা মাত্র, কেবল 'তানা নানা' করিয়া সারিলে ফাঁকি দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ তাহার কোমল চরণপল্লবে ভূমিপৃষ্ঠ ঠেলিয়া এক একটা বৃহৎ লাফ দেয়—'তড়াক্' 'তড়াক' করিয়া। কবিকঙ্কণ মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাতের বর্ণনা করিয়াছেন 'বেঙ-তড়কা' পড়ে বাজ। 'তড়াক্' 'তড়াক' বা তাড়াতাড়ি কাজের নাম 'তিড়বিড়' বা 'তিড়িং বিড়িং' বা 'তিড়িং বিড়িং' কাজ। তাড়াতাড়ি লাফালাফি করিয়া জীবনের কাজ সম্পাদন করিয়া গেলে জ্ঞানীলোকের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না কেননা 'তুম তড়াকা ধুম ধরাকা সকলই হয় ফাকা'।

থ

থয়েও সেই কোমলতা, তবে 'থ' মহাপ্রাণ বলিয়া 'ত'য়ের তুলনায় ইহার ভার কিছু অধিক। কোমল ওষ্ঠদ্বয়ের আঘাতে 'থু' শব্দে 'থুথু' ফেলা হয়। বালকের কোমল পদশব্দ 'থৈ থৈ' সহিত নাচের কথা উপরে বলা গিয়াছে। দাঁড়ান মানুষ হঠাৎ 'থপ্' করিয়া বসিয়া পড়ে; থপ হইতে ভেদ 'থপাস্' ও 'থপাং'। মোটামানুষই থপ্ করিয়া বসে; কাজেই মোটা-দেহ অক্ষম মানুষ 'থপথপে'; 'তলতলে'র মোটা 'থলথলে'; 'তুসতুসে'র চেয়ে মোটা জিনিষ 'থুসথুসে'; উহা আকারে ছোট; আকারে বড় হইলে হয় 'থসথসে'।

পৃষ্ঠদেশে করতলপাতের শব্দ 'থাবড়' বা 'থপ্পর'। 'থাবড়' শব্দে করাঘাত 'থাবড়ান'। মুষ্ট্যাঘাতে বা শিলাঘাতে জিনিষ 'থেঁতলান' হয়; মর্দ্দনপ্রয়োগে 'থাঁসা' হয়।

কোমল বৃক্ষশাখা 'থরথর' করিয়া কাঁপে : নরদেহও 'থর থর' করিয়া বা 'থরহরি' কাঁপিয়া থাকে। যে বৃদ্ধের শীর্ণদেহ বাতাসের ভরে কাঁপে, সে 'থুরথুরে' বুড়ো।

কাঠ পাতরের মত কঠিন জিনিষ উপর হইতে বেগে মাটিতে পড়িয়া ঠক্ শব্দ করে ও পরে ঠিক্‌রিয়া অন্যত্র যায় ; কিন্তু বিছানা বালিশ পুঁথি পত্রের মত নরম 'থপথপে' জিনিষ মাটিতে 'থপ্' করিয়া পড়িয়া 'থামিয়া' যায় ও সেইখানেই থাকে। সংস্কৃত 'স্থা' ধাতুর সহিত এই 'থপ্' ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি? তাহা হইলে 'থাকা' 'থোয়া' 'থির' 'থিত' 'থলি' 'থালি' 'থয়লা' প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক শব্দও এই শ্রেণির মধ্যে আসিয়া পড়িবে। 'থামা'র কোন সংস্কৃত মূল আছে কি না জানি না, কিন্তু 'থম' করিয়া 'থামে' এরূপ বর্ণনা চলিত আছে। যাহা থামিয়া আছে, তাহা 'থমথমে'। পুষ্করিণীর জল যখন 'থামিয়া' থাকে, তখন উহা 'থমথম' করে অথবা 'থই থই' করে ; বিরহী যক্ষের বাড়ীর পাশের দীঘির জল 'থই থই' করিত, কবিতায় পড়িয়াছি। 'থামথুম' দিয়া আমরা অনেক জিনিস 'থামাইয়া' রাখি ; এবং 'থাপথুপ' বা 'থুপ-থাপ' দিয়া গোপ্য বিষয় গোপনে স্থির রাখি। থপ শব্দে আঘাতের নাম 'থপ্পড়' বা 'থাবড়'। জঞ্জাল একত্র জড় হইয়া 'থক্ থক্' করে ; উহা আবর্জ্জনায় পরিণত হইলে 'থিক্‌থিক্' করে।

দ

'ত' 'থ' ধ্বনি ঘোষহীন, কিন্তু 'দ'য়ের ধ্বনিতে ঘোষ আছে ; উহা গম্ভীর, জমকাল। 'দামামা' 'দগড়' এবং (সংস্কৃত) 'দুন্দুভি'র বাদ্যেই তাহার পরিচয়। 'দুরমুশে'র শব্দও বোধ করি ঐ প্রকৃতির। 'থপ্' করিয়া পড়া ও 'থুপ' করিয়া পড়ার সহিত 'দপ্' করিয়া পড়া ও 'দুপ' করিয়া পড়ার তুলনাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। মেজের উপর যে জিনিষ পড়িলে 'থুপ' করে, ছাদের উপর তাহা পড়িলে 'দুপ্' করে। ছাদের নীচে ঘরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ বায়ুরাশি ধ্বনিত হইয়া শব্দটাকে জমকাইয়া দেয়। কাজেই ছাদের উপরে জমকাল শব্দ 'দুপদাপ' 'দুমদাম' 'দড়বড়' 'দুড়দুড়'। যে ঘরের ছাদে ঐ রূপ 'দমদম' শব্দ হয়, সেই ঘরের নাম 'দমদমা'। বন্দুকের আওয়াজও গম্ভীর 'দুম্'। কিল মারার শব্দও 'দুম্'।

আগুন যখন লেলিহান শিখা আন্দোলন করিয়া দাহ্য পদার্থের স্তূপ গ্রাস করিতে থাকে, তখন উহা 'দপ দপ' করিয়া বা 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলে। প্রদীপের ছোট শিখা 'দিপ দিপ' করে। ত্বকের উপর আগুনের মত জ্বালাকর ফোড়ার 'দপদপানি' বা 'দবদবানি' ভুক্ত-ভোগীর পরিচিত। উহার জ্বালার মধ্যে অগ্নিশিখার স্পন্দন পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন আছে। 'দড়বড' শব্দে দ্রুত গতিতে পথ চলার নাম 'দৌড়ান' ; সংস্কৃত দ্রু ধাতুর মূল কি এইখানে? লাঠি তুলিয়া কাহাকেও 'দাবড়াইলে' অর্থাৎ তাড়াইলে সে 'দুরদার করিয়া' 'দৌড়' দেয় ; আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইলে বুক 'দুর দুর' করে। 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর—উত্তর পবনে মেঘ করে দুরদুর'—এখানে মেঘ বায়ুবেগে 'দুর দুর' শব্দে দ্রুত চলিতেছে।

'তলতলে' 'থলথলে' জিনিষের সজাতীয় 'দলদলে'। 'দলদলে' জিনিষ 'দলাইয়া' (সংস্কৃতে 'দলিত' করিয়া ?) তৈয়ার করা চলে। গ্রাম্যভাষায় ঐরূপ জিনিষ 'দকর-কোদো'।

ধ

দয়ের মত ধ ঘোষবান্, উপরন্তু মহাপ্রাণ। হালকা জিনিষে যেখানে 'দপ্' করে, ভারী জিনিষে সেখানে 'ধপ্' শব্দ করিয়া পড়ে। 'দপদপ' 'দুপদাপ'এর চেয়ে 'ধপ ধপ' 'ধুপ ধাপ'এর গুরুত্ব বেশী। 'থেই থেই' নাচের চেয়ে 'ধেই ধেই' নাচের গুরুত্ব বেশী। পৃষ্ঠোপরি 'দুমদাম' কিলের চেয়ে 'ধমাধম' বা 'ধপাধপ' কিলের 'ধুমধাম' বা 'ধুমধরাক্কা' অর্থাৎ গুরুত্ব অধিক। আগুন যেমন 'দাউ দাউ' জলে, তেমনি 'ধূ ধূ' বা 'ধাঁ ধাঁ' করিয়া জলে; দোদুল্যমান বহ্নিশিখা হইতে 'ধক্ ধক্' শব্দ বাহির হয়। নির্ব্বাণপ্রায় বহ্নিও 'ধিকি ধিকি' জলে। স্পন্দন-গতির এই 'ধকধকানি' মৃদু হইয়া 'ধুক্‌ধুকনি'তে পরিণত হয়; মৃত্যুর পরে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকির সহিত "রাত্রিদিন 'ধুক ধুক' তরঙ্গিত দুঃখসুখ" একবারে থামিয়া যায়। দড়বড় দৌড়ানির পর বুক 'ধসধস' করে; দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে বুক 'ধড়ফড়' করে। কাটা পাঁঠা যখন 'ধড়ফড়' করিয়া তাহার হাতপা আছড়ায়, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারা ঝলকে ঝলকে থামিয়া থামিয়া কর্ত্তিত গ্রীবা হইতে বেগে নিঃসৃত হয়। শিশুর কণ্ঠে দোদুল্যমান সোণার 'ধুকধুকি' তাহার ছোট হৃদয়ের ধুকধুকনির সহিত দুলিতে থাকে।

উপরে বলিয়াছি 'ধ'য়ের ধ্বনিতে গুরুত্ব ও স্থূলত্বের অর্থ টানিয়া আনে। 'ধেড়ে' মিন্‌সের স্থূলত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। উহা স্ত্রীলিঙ্গে 'ধাড়ী'—জানোয়ারের পক্ষে প্রযোজ্য। ধেড়ে মিন্‌সে, যার ইন্দ্রিয় গুলাও মোটা, তাহার সকল কাজই 'ধ্যাবড়া', সে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা 'ধ্যাড়ায়'। 'ধেড়ে' মিন্‌সেকে জোরে 'ধাক্কা' না দিলে তাহার ইন্দ্রিয় সজাগ হয় না; তাহাতেও তাহার 'ধোকা' লাগে, অথবা 'ধাঁধাঁ' লাগে মাত্র; সে কি করিবে ঠাহর পায় না। তাহার কাজ কর্ম্মের 'ধাকধিচ' নাই। সকল কাজই এলো-'ধাবড়ি' গোছের। মোটা মানুষের নাচ 'ধিন্ ধিনি' নৃত্য। বাতাসে ধাক্কা দিয়া বেগে চলার নাম 'ধাঁ' করিয়া চলা।

তুলা ধুনিবার সময় 'ধুনধান্' শব্দ হয়; যে 'ধোনে' তাহার উপাধি 'ধুনুই'। 'ধুসো' (কাপড়) 'ধুচুনি' 'ধুকুড়' 'ধামা' প্রভৃতি গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য বস্তু টেকসই অল্প মূল্যের মোটা জিনিষ। মোটা জিনিষের উপর 'ধখল' পড়ে বেশী।

ন

ত বর্গের ধ্বনি কোমলতাব্যঞ্জক; তাহার উপর অনুনাসিকত্ব যোগ হইলে উহা আরও কোমলের, এমন কি কাঠিন্যবর্জ্জিতের লক্ষণ টানিয়া আনে। নকারাদি শব্দে আমরা তাহা স্পষ্ট দেখি। এরূপ শব্দ বড় বেশী নাই; যাহা আছে, তাহার অধিকাংশেই ঐ ভাব প্রবল।

যাহা কাঠিন্যবর্জ্জিত, মেরুদণ্ডহীন, তাহা 'নড় নড়' করে, 'নড় বড়' করে; সহজে 'নড়িয়া' যায়; এমন কি লতাইয়া গিয়া 'নড়র বড়র' করে। যাহা একবারে এলাইয়া লতাইয়া পড়ে, তাহা 'নিড়বিড়ে' 'নিশপিশে' 'নিংনিঙে'। যাহা সহজে নড়ে, তাহাকে অনায়াসে 'নাড়া' বা 'নেকড়ান' যায়, তাহা 'নেকড়া'। 'নেকড়া'কে বা কাপড়মাত্রকে অনায়াসে 'নিঙড়াইয়া' জল বাহির করা যায়। এই শ্রেণির জিনিষ সহজেই 'নোঙড়া' হয়; নোঙড়া জিনিষ

দেখিলে 'নেকার' (সংস্কৃত ন্যক্কার) আসে। নেকড়া যেমন মুঠায় লইয়া সঙ্কুচিত করা হয়, ঐ রূপে কোন বস্তুকে নিপীড়নের নাম 'নেকড়ান' বা 'নেকড়,নেকড়ি'। শিকারকে ধরিয়া নেকড়ায় বলিয়া কি বাঘের নাম 'নেকড়ে' বাঘ? ডানি হাতের মত বাম হাত আমাদের বশে থাকে না; উহা যেন নড়নড়ে;—'ন্যাওরা' লোকে ঐ বামহাত ব্যবহার করে। 'নুলো' পঞ্চাননের হাত কিরূপ ছিল? যাহার মেরুদণ্ড দুর্ব্বল, তাহাকে 'নড়ি' (যষ্টি) হাতে 'নড়িতে' চড়িতে হয়। যে আপনাকে ধরিতে ছুইতে দেয় না, মেরুদণ্ডহীনের মত হাত হইতে পিছলাইয়া যায়, সে 'ন্যাকা' সাজে। কঠিন ভূমির কোমল ঘাস নাড়িয়া উপড়ানর নাম 'নিড়েন'; জমির ঘাসের মত মাথার চুল যার 'নিড়েন' হইয়াছে, সেই কি 'নেড়া'?

টবর্গ—ট

ত বর্গের ধ্বনির সহিত তারল্যের সম্পর্ক, আর ট বর্গের সহিত সম্পর্ক কাঠিন্যের। টক্ ঠক্, টুকটাক, ঠুকঠাক, টক্কর, ঠোকর প্রভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যে কঠিন দ্রব্যের সংঘট্টের পরিচয় দেয়। সানুনাসিক টুং টাং শব্দে ধাতব তন্ত্রীর কাঠিন্য স্মরণ করায়; কলিকাতার রাস্তায় টন্ টন্ শব্দ উড়িষ্যাবাসিবাহিত কাংস্যফলকের বার্ত্তা ঘোষণা করে।

যে কোন অভিধান খুলিলেই দেখা যাইবে, টকারাদি, ঠকারাদি, ডকারাদি, ঢকারাদি সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অতি অল্প; যে সকল শব্দ অভিধানে রহিয়াছে, তাহাদেরও অনেকগুলি ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ। দেশজ শব্দ কালে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা আরও কম। ইহাতে অনুমান হইতে পারে, প্রাচীন আর্য্য ভাষায় হয় ত এককালে ট বর্গের ধ্বনির অথবা মূর্দ্ধন্য ধ্বনির অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপের ভাষাগুলিও বোধ হয় এই অনুমান সমর্থন করে।

টকারাদি বহু শব্দ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণজাত; তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। টং, টং টং, টুং টাং, টাং টুং প্রভৃতি ধ্বনি সর্ব্বজনপরিচিত; উহাদের অনুনাসিক অংশ ধাতুপদার্থে অন্য কঠিন দ্রব্যের আঘাত সূচনা করে। ধনুকের ছিলাতে 'টং' শব্দে 'টঙ্কার' দেওয়া হয়। 'টিক্‌টিকি' সময়ে অসময়ে 'টিক্ টিক্' করিয়া বিরক্তি জন্মায়; কাজেই কাণের কাছে 'টিক্ টিক্' করার অর্থ বিরক্তি উৎপাদন। কাঠের উপরে পাথরের বা ইটের আঘাতে 'টক্' শব্দ হয়, ঐ শব্দ পুনঃ পুনঃ ঘটিলে 'টক্ টক্' হয়; 'টক্ টক্' ছোট হইয়া হয় 'টুক্ টুক' এবং 'টুক্ টাক'। রাস্তায় ইটকাঠে পায়ের আঘাতের নাম 'টক্কর'। রৌপ্য মুদ্রার (রূপেয়ার) ভূমিতে আঘাতের শব্দ 'টং'—উহার নাম 'টঙ্ক' (সংস্কৃত) বা 'টাকা' (বাঙলা)। সম্ভবতঃ ঐরূপ ধ্বনি হইতে সোহাগার নাম 'টঙ্কন'। পৌষমাসের প্রাতে ঠাণ্ডা জল যেন ত্বগিন্দ্রিয়ে আঘাত করিয়া হাতে 'টাকুই' ধরায়।

কোন একটা জিনিষ আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাই; তাহাতেও সন্দেহ থাকিলে একটা যষ্টির স্পর্শ দ্বারা বা আঘাতের দ্বারা দেখাইলে আর সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কাঠির আঘাতের শব্দ 'টক্' বা 'টা'। অঙ্গুলি নির্দ্দেশেও যখন বলি 'এইটা' বা ঐ জিনিষ 'টা', তখন

ঐ 'টা' প্রত্যয়ে সেই যষ্টির আঘাতের কাজ করে। বড় জিনিষের বেলায় 'টা', ছোট জিনিষের বেলায় 'টি'—যথা মহিষটা, আর বাছুরটি। 'টি' মাত্রা কমিয়া 'টু'তে বা 'টুকু'তে পরিণত হয়; যথা জলটুকু, তেলটুকু। 'টি' ও 'টুকু' ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞাপক—তাহা হইতে উৎপন্ন 'টুকরা' ও 'টিকলি"। কেশমধ্যে লম্বমান 'টিকি' এবং তামাকুসেবার 'টিকা' যথা অর্থে উহার ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক কি না বিবেচ্য। মানুষের যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কাজ ভ্রমণ, সেই ইন্দ্রিয়ের নাম 'ঠ্যাং'—উহা সকল জিনিষেই 'টক্কর' দিতেছে। কঠিন ভূপৃষ্ঠের উপর ইতস্ততঃ বিনা কাজে বেড়ানর নাম 'টো' টো' করিয়া বেড়ান। শিলাখণ্ড যেমন পদতলে আঘাত দিয়া 'টক্কর' উৎপন্ন করে, তেমনি তীব্র অম্লরস রসনায় আঘাত দেয়, উহাতে 'টক' শব্দ না হইলেও জিনিষটা 'টক'। অথবা অম্লরসের তাড়নায় জিহ্বা অনেক সময় মূর্দ্ধা স্পর্শ করিয়া'টক্' শব্দও করিয়া থাকে; এইজন্য অম্লরস 'টক'। তীব্র লোহিতবর্ণ চক্ষুতে আঘাত দেয়—যেন 'টক্' 'টক'করিয়া আঘাত দেয়—এইজন্য উহা 'টকটকে'; জ্যোতি একটু কম হইলে হয় লাল 'টুকটুকে'। রাঙা জিনিষ চোখে আঘাত করে, আবার অনেক সময় সুন্দরও লাগে; কাজেই সুন্দর শিশুকে 'টুকটুকে' ছেলে বলা যায়। কুঠারের আঘাতের শব্দ হইতে উহার নাম 'টাঙি'। ছোট ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতে কি উহার নাম 'টাটু' ? ঘোড়ার 'টাপে' চলাও কি উহার পদশব্দ হইতে উৎপন্ন ? মাথায় যেখানে চুল থাকে না, সেখানে 'টক্' শব্দে আঘাত আঘাতকারীর পক্ষে আনন্দজনক—সেই স্থানটা 'টাক'। সংস্কৃতে 'তর্কু' শব্দ থাকিলেও, 'টাকু'র ভূপতন শব্দ 'টক্'। বাঁশের কিংবা বেতের তৈয়ারি 'টোকা'ও 'টুকড়ি' এবং তালপাতার তৈয়ারি ছোট 'টুকুই' গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হয়,উহাদের গায়ে 'টোকা' মারিলে 'টুক' শব্দ হয়।

'ট'য়ের ধ্বনি সাধারণতঃ কাঠিন্যব্যঞ্জক হইলেও তরল পদার্থে ঐ ধ্বনি আসে না এমন নহে। 'টগ বগ' শব্দে জল ফুটে; এস্থলে 'টগের' পরবর্ত্তী 'বগ্'টা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। বৃষ্টি পড়ে 'টপ্ টপ্' 'টুপ্ টাপ'; পুকুরের জলের উপর বৃষ্টি পতনের শব্দ 'টাপুর' টুপুর'। এই শব্দের সহিত বাতাসের সম্পর্ক আছে, সেইজন্য 'ট'য়ের পর 'প'। বৃষ্টিবিন্দু, যাহা 'টপ' করিয়া ভূমিস্পর্শ করে, তাহার নাম 'টোপ্'; বড়শিতে বিদ্ধ মাছের 'টোপ'ও জলে 'টুব' শব্দ করিয়া পড়ে। গুরুভার জিনিষ জলে 'টবাং' করিয়া পড়ে। বৃষ্টি আরম্ভে মোটা মোটা জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ বা টুপ্ টাপ' করিয়া পড়ে; বৃষ্টি থামিয়া গেলেও বৃষ্টির ক্ষীণ ধারা 'টিপ্ টিপ্' করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া পড়িতে থাকে অর্থাৎ 'টিপোয়'। বারিবিন্দুর মত যে কোন ছোট জিনিষ 'টুপটাপ' করিয়া পড়িতে পারে; সুর্য্যির মা বুড়ি কাট কুড়াইতে গিয়া কলাগাছের আড়ে উপস্থিত হইলে 'টুপটাপ' করিয়া কলা পড়িত। 'ট'য়ের পর 'প' বসিলে স্বভাবতঃ বায়ুপূর্ণতা বা শূন্যগর্ভতার ভাব টানিয়া আনে। গরুর গাড়ির উপরের শূন্যগর্ভ আচ্ছাদনের নাম 'টপ্পর'; বিবাহোন্মুখ বরের মাথার উপরের আচ্ছাদন 'টোপর'; মস্তকের ছোটখাট আচ্ছাদন মাত্রের নাম 'টুপি'। যে কার্য্যের বা বাক্যের ভিতর ফাঁপা, তাহার নাম 'টপ্পা'। থালা ঘটি বাটি আঘাত পাইয়া 'টোপসা' খায়, অথবা 'টোল' খায়। অধ্যাপকের 'টোলের' সহিত ইহার কি সম্পর্ক ?

'টবকা' লুচির ভিতরটা ফাঁপা। আঙুলের ডগা দিয়া জোরে 'টিপিলে' বা 'টেপাটিপি' করিলেও 'টোপসা' খাইতে পারে। কাঁচা ফল, যাহা পাকিবার পূর্ব্বে নরম হইয়াছে মাত্র, যাহার গায়ে আঙুলের দাগে টোপসা পড়ে, উহা গ্রাম্য ভাষায় 'টোসো'। কপালের ঘাম 'টস টস' করিয়া 'টুসিয়া' পড়ে—এস্থলে উষ্মবর্ণ সয়ের যোগে তারল্যের ভাব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিরার ভিতরে তরল রক্ত বেগে বহিলে উহা 'টিপ টিপ' করিয়া 'টিশেয়' ও যাতনা দেয়। এখানেও উষ্মবর্ণ শ তারল্যসূচক। 'টনটনানি' যে যাতনা বুঝায়, উহা তীক্ষ্ণ যাতনা; অনুনাসিক নকার এই তীক্ষ্ণতা আনে। 'টাটানি'র যাতনায় দুটা 'ট' পর পর বসিয়া আঘাতের পর আঘাত সূচনা করে। মাথায় আকস্মিক তীব্র বেদনায় 'টনক' পড়ে। 'টিমটিমে' জ্যোতির মৃদুতা অনুনাসিক মকারের লক্ষণযুক্ত।

'টলটল' 'টুলটুল' 'টলমল' করিয়া যাহা 'টলিয়া' বেড়ায়, তাহার তারল্য ও চাঞ্চল্য 'ট'য়ের পর কোমল দন্ত্যবর্ণ 'ল'য়ের যোগে আসে। 'টহল' দেওয়াতেও কি এইরূপ চঞ্চল গতির সূচনা করে?

ঠ

টয়ের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ঠ; উহাতে কাঠিন্য ও কঠোরতার ভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঠক্, ঠকঠক, ঠুক ঠাক, ঠক্কর, ঠোকর, ঠোকরান, ঠোঁকা, ঠুকরান, ঠুক্রো (ভঙ্গপ্রবণ), ঠিক্রে প্রভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের 'ঠকাঠকি'র কথা বলে। 'ঠকঠকি' তাঁত হইতে কাঠ-'ঠোকরা' পাখী পর্য্যন্ত এই আঘাতের ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। করতল কোমল হইলেও উহা যখন বেগে গণ্ডদেশে পতিত হয়, তখন চপেটাঘাতের 'ঠাঁ' শব্দ কঠিনের আঘাতের অনুকৃতি। ধাতুফলকে হাতুড়ি পেটার শব্দ 'ঠং ঠং', 'ঠুং ঠাং'। রামাভিষেকে মদবিহ্বলা তরুণীদিগের কক্ষচ্যুত হেমঘট সোপানে আরোহণ করিয়া 'ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং ঠং শব্দ করিয়াছিল, তাহা হনূমান্ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। 'ঠুনকো' জিনিষ ভাঙিবার সময় 'ঠুন' শব্দ করে। কঠিন দ্রব কঠিন ভূমিতে আঘাত করিয়া 'ঠিকরিয়া' পড়ে। ঠক শব্দ কঠিন আঘাতের শব্দ; 'ঠগ' যাহাকে 'ঠকায়', সেও একটা কঠিন আঘাত পায় সন্দেহ নাই। 'ঠমকে' চলা কঠিন ভূপৃষ্ঠে চলারই রূপভেদ। কঠিন বাক্য যখন অন্তরিন্দ্রিয়ে জোরে আঘাত দেয়, তখন উহা 'ঠাট্টা'য় পরিণত হয়। 'ঠাট' ও 'ঠার' এর সহিত 'ঠাট্টার' নিকট সম্পর্ক। 'ঠেলা' 'ঠাসা' 'ঠোসা' ক্রিয়ার কর্ম্মকারকের স্থলে প্রায় গুরুভার কঠিন দ্রব্য বসিয়া থাকে। চোখের 'ঠুলি' ঐ আচ্ছাদনের কাঠিন্যসূচক কিনা তাহা বিচার্য্য। মিষ্টান্নের 'ঠোঙা' অবশ্য ঠুলির চেয়ে আকারে বড়। মাটির ছোট কলসীর 'ঠিলি' নামে উহার কাঠিন্য সূচনা করিতেছে। 'ঠেঁটা' মানুষের প্রকৃতি এত কঠিন, উহাতে দাগ বসান শক্ত। চোখ যখন 'ঠল ঠল' করে, তখন লকারের তারল্য ঠয়ের কাঠিন্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

ড

ড ও ঢ টবর্গের অন্তর্গত ঘোষবান্ ধ্বনি; ঘোষবান্ ধ্বনির একটা গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব আছে,

যাহা ঘোষহীন ধ্বনিতে থাকে না। বস্তুতই ডকারের ও ঢকারের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য উহাদের কাঠিন্য সূচনার ভাবকে একবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ঢাক ঢোলের মত বাদ্যযন্ত্রের চামড়ার নীচে অনেকটা বাতাস আবদ্ধ থাকে, চামড়ায় আঘাত করিলে সেই বাতাসটা ধ্বনিত হইয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজের উৎপত্তি করে। এই আওয়াজটার নামই 'ঘোষ'। দামামা দগড় দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের দকারাদি নামে আওয়াজের সেই গাম্ভীর্য্য বুঝায় দেখা গিয়াছে; ঢাকের শব্দ 'ড্যাং ড্যাং', ঢোলের শব্দ 'ডুগডুগ' প্রভৃতিতেও আওয়াজের গম্ভীরতার পরিচয় দেয়। 'ডুগডুগি' 'ডুবকি' 'ডঙ্কা' 'ডম্বুর' (ডমরু) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নামেই উহাদের আওয়াজ ঘোষণা করিতেছে। বন্দুকের 'ডেংড়ের' শব্দে এই গম্ভীরত্ব আছে। 'ডাহুক' বা 'ডাবুক' পাখীর নামের সহিত উহার ডাকের কোন সম্পর্ক আছে কি? দূর হইতে উচ্চকণ্ঠে 'ডাক' দিয়া কাহাকেও যখন 'ডাকি'; তখন সেই ডাকের সহিত কণ্ঠধ্বনির গম্ভীর্য্যের সম্পর্ক অস্বীকার করা কঠিন। 'ডাইন্' বা 'ডাকিনী' এইরূপ 'ডাক' হইতে তাহার নাম পাইয়াছে কি না? বাঙলার গ্রাম্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ 'ডাকে'র সহিত অনেকে 'ডাকিনী'র সম্পর্ক অনুমান করেন। সে সম্পর্ক থাক না থাক, 'ডাকাইতে'র সহিত 'ডাকাডাকি'র সম্পর্ক থাকা অসঙ্গত নহে। 'ডাকাডাকিতে' অন্তঃকরণে 'ডর' উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'ডামাডোলের' শব্দের গুরুত্বে কোন সন্দেহ নাই। 'ডাংপিটে'র সঙ্গে 'ডাকাইতে'র ও 'ড্যাকরা'র চরিত্রগত অনেকটা মিল আছে।

ফাঁপা বাদ্যযন্ত্রে ডুং ডাং, ড্যাং ড্যাং শব্দ হয়; ডকারাদি অনেকগুলি শব্দ এইরূপে শূন্যগর্ভতার জ্ঞাপন করে। যথা 'ডাব' (নারিকেলের) 'ড্যাবরা' "ডবডবে" 'ডাবর' 'ডহক' 'ডোল' 'ডুলি' 'ডালা' 'ডালি' 'ডোঙা' 'ডিঙি' 'ডাগর' 'ডাব্বর' 'ডাকরান' 'ডোবা' (খাল অর্থে), 'ডুব' 'ডুবুরি' 'ডায়া'।

ঢ

ড মহাপ্রাণ হইয়া ঢ হয়। ডয়ের সমুদায় লক্ষণ বৰ্দ্ধিতবিক্রমে 'ঢ'য়ে বর্ত্তমান। 'ঢ'য়ের' ধ্বনি 'ড'য়ের চেয়ে মোটা—'ধ' যেমন স্থূলত্বের ভাব আনে, 'ঢ'ও সেইরূপ স্থূলত্ব বোঝায়। যথা 'ঢাক' 'ঢোল' 'ঢেঁড়রা' প্রভৃতি অতি স্থূল বাদ্যযন্ত্রের নামে উহাদের গুরুগম্ভীর আওয়াজ মনে পাড়ায়। 'ঢং ঢং' শব্দ কাঁসার ঘড়ির শব্দ; ধাতুপদার্থের ধ্বনিতে অনুনাসিকত্ব বর্ত্তমান। ফাঁপা জিনিষ মোটা হয়; অতএব 'ঢেকুর' উদ্গারের ধ্বনির শূন্যগর্ভ উৎপত্তি স্থান স্মরণ করায়। আচ্ছাদনার্থক 'ঢাকা' আচ্ছাদনের শূন্যগর্ভতা সূচনা করে। 'ঢাল' 'ঢিলা' 'ঢিপ' 'ঢিবি' 'ঢেঁড়ি' 'ঢেড়া' 'ঢেউ' 'ঢাপুশ' এই সমুদয় শব্দ স্থূলত্ববোধক। 'ঢনঢনে' মাছি মাছির মধ্যে মোটা। 'ঢুন্টি' গণেশ গণেশের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে মোটা। স্থূলত্বের সহিত জড়তার নিশ্চেষ্টতার আলস্যের ভাব জড়িত—যথা 'ঢিলা' 'ঢিমা' 'ঢোলা (তন্দ্রা), গ্রা 'ঢিস ঢিস' করা। 'ঢোঁড়া' সাপ ও 'ঢ্যামনা' সাপ মোটাসোটা বটে অধিকন্তু নির্ব্বিষ ও নিবীর্য্য। 'ল'য়ের কোমলতা 'ঢ' য়ে তারল্য ভাব দেয়; 'ঢলঢলে' জিনিষ 'ঢালিতে' পারা যায়। তন্দ্রার বা নিদ্রার 'ঢুলুঢুলু'

আঁখিতে তারল্যের সহিত আলস্যের ভাব মিশ্রিত। শিথিল ও তরল দ্রব্যের নামান্তর 'ঢিলা'। কপালে 'ঢু' দেওয়া ও 'ঢুসো' দেওয়া তুল্যমূল্য ; ঐ আঘাতও মোটা আঘাত। অকর্ম্মা লোকে যেমন মিছা কাজে 'টো' 'টো' করিয়া বেড়ায়, তেমনি 'ঢু ঢু' করিয়া 'ঢুরিয়া' বেড়ায়। 'টিপেন' ও 'ঢেকান' ক্রিয়া মোটা মানুষের উপর প্রযোজ্য। 'ধাক্কা'র সঙ্গে 'ঢোকার' বোধ হয় সম্পর্ক আছে ; যেখানে ফাঁক অবকাশ বা শূন্যতা আছে সেই খানেই ঢুকিতে পারা যায়, এই হিসাবে ইহার সহিত শূন্যতারও সম্পর্ক।

চ বর্গ—চ

রামাভিষেকে যে হেমঘট তরুণীর কক্ষচ্যুত হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন, উহা সোপান হইতে পড়িবার সময় 'ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং' শব্দ করিয়া শেষে 'ছঃ' শব্দ করিয়াছিল। এই 'ছঃ' শব্দ হেমঘটের জলে পতনের শব্দ ; উহাতে ঘটের সহিত তরল জলের স্পর্শ ঘটনা সূচনা করিতেছে। চ বর্গের ধ্বনির লক্ষণই তারল্য। প বর্গের সহিত যেমন বায়ুর, ত বর্গের সহিত যেমন কোমলের, ট বর্গের সহিত যেমন কঠিন পদার্থের সম্পর্ক, চ বর্গের সহিত তেমনি তরল পদার্থের সম্পর্ক। স্বভাবজাত 'চিঁ চিঁ' শব্দে এই তালব্য ধ্বনির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। 'চঁ চিঁ' হইতে 'চীৎকার' (সংস্কৃত), 'চেঁচান' 'চেঁচামেচি' প্রভৃতি আসিয়াছে। তরল জল চোঁয়ানর সময় 'চোঁ চোঁ' শব্দ হয়। তপ্ত কটাহে গরম জল বা তেল 'চুঁ চুঁ' করে। 'চিঁ চিঁ' শব্দ করে বলিয়া কি পাখীর নাম 'চিল'? উপরন্তু অল্পপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী চ-ধ্বনি একটা ক্ষণস্থায়িত্ব ও আকস্মিকত্ব সূচনা করে। 'চোঁ চোঁ' শব্দে একটা তীক্ষ্ণতা আছে, উহা কাণে যেন আঘাত করে। অল্পপ্রাণ বর্ণে অনুনাসিক বর্ণ যোগে এই তীক্ষ্ণতা আনে। 'চন্ চন্' 'চিন চিন' প্রভৃতি শব্দে সেই তীক্ষ্ণতা স্পষ্ট ; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটায় যে বেদনা হয়, উহা 'চিনচিনে' বেদনা ; রৌদ্র যখন তীক্ষ্ণ ছুরির মত আঘাত দেয়, তখন উহাও 'চিনচিনে' হয়। 'চুমো' দেওয়া (সংস্কৃত চুম্বন) কি 'চুঁ' শব্দের অনুকৃতি জাত। 'চুমোর সহিত 'চুমকরির' সম্পর্ক স্বীকার্য্য। মূর্দ্ধন্য বর্ণের কাঠিন্য বা কার্কশ্য পাইলে উহা 'চর চর' 'চির চির' 'চুর চুর' 'চিড় বিড়' প্রভৃতি কঠোর বেদনাজনক শব্দে পরিণত হয়। 'চচ্চড়ি' নামক পদার্থের রান্নার সময় কি চরচর ধ্বনি জন্মে ?

'চিমটি' কাটার তীব্র বেদনা প্রসিদ্ধ। লোহার 'চিমটা' যন্ত্র অন্য জিনিষকে 'চিমটিয়া' ধরিবার জন্য। 'চপ্' শব্দেও এই তীব্রতা আছে ; তীক্ষ্ণধার দায়ে চপ শব্দে আঘাতের নাম 'চোপান'। তীব্র বাক্যের নাম 'চোঁপা'। চাবুকের তীব্র আঘাতে চপ্ শব্দ হয় বলিয়া কি উহা 'চাবুক'? 'চপ' করিয়া কোন জিনিষ 'চাপিয়া' ধরিলে উহার চাঞ্চল্য হঠাৎ নিবারিত হয় ; বাগিন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থামাইবার জন্যও 'চুপ' বলিতে হয়। চাঞ্চল্য থামাইয়া স্থির থাকার নাম 'চুপ' করিয়া বা 'চুপচাপ' করিয়া থাকা। 'চাপড়' অর্থাৎ চপেটাঘাতের আকস্মিক তীব্রতা প্রসিদ্ধ। 'চপেট'-আঘাত দ্বারা 'চাপ' দিয়া যাহা 'চ্যাপটা' করা যায় তাহাই 'চিপিটক' বা 'চিড়া'। 'চওড়া' কি 'চ্যাপটা'রই উচ্চারণ ভেদ ? কাঠ 'চিড়িয়া' চ্যাপটা তক্তা হয়। পাটের সূতার

যে 'চট' তৈয়ারি হয়, উহাও চ্যাপটা জিনিষ। তালপাতের 'চাটাই' ঐরূপ 'চ্যাটলা' আসন। চট ছোট হইলে 'চটি' হয়। চটি বই আর চটি জুতা উভয়ই পাতলা 'চ্যাটলা' জিনিষ। চটেরই অল্পার্থে 'চিট', যথা চিট কাগজ বা কাগজের 'চিঠি'। 'চট' করিয়া কাজে যে আকস্মিকতা আছে, উহা 'চপ' করিয়া চাপনের আকস্মিকতার অনুরূপ। 'চটপট কাজের আকস্মিকতা বা দ্রুততা অত্যন্ত অধিক। চট্ পট বা 'চোটপাট' করিয়া 'চৌচাপটে' কাজ শেষ করিলেই 'চটক' জন্মে; 'চুটকি' কবিতার বা গল্পের ক্ষুদ্রতা ও তীব্রতা স্পষ্ট; উহার উদ্দেশ্য 'চটক' লাগান। চট্ শব্দে জিনিষ সহসা ফাটিয়া 'চটিয়া' যায়; যে ব্যক্তি চট্ করিয়া সহসা রাগ করে, তাহার মেজাজ 'চটা'। চট্ করিয়া অকস্মাৎ আঘাতের নাম 'চোট'। আঘাত ক্রিয়ার নাম 'চোটান'। 'চটরপটর' খাঁটি ধ্বনিমূলক শব্দ।

উল্লিখিত উদাহরণ গুলিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনির ক্ষণস্থায়িতা, আকস্মিকতা, তীব্রতা যত স্পষ্ট বুঝাইতেছে, চ বর্গের তারল্যসূচনা তেমন স্পষ্টভাবে নাই। তবে তারল্যসূচক চকারাদি শব্দের অভাব নাই। তরল পদার্থের মধ্যে আবার দুধ তেল ঘি প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যের সহিত 'চ'য়ের সম্পর্ক কিছু অধিক। বিড়াল 'চকচক' শব্দে দুধের বাটিতে জিভ দিয়া 'চাখে' বা আস্বাদন লয়। ধাতুপদার্থের পিঠে তেল মাখাইয়া মসৃণ করিয়া ঐ পিঠে আঙুলের ঠেলা দিলে 'চক্' শব্দ হয়। ঐরূপ জিনিষকে তেল-'চক্চকে' বা তেল-'চুক্চুকে' জিনিষ বলা যায়। তেল মাখাইলে যখন মসৃণ হয়, তখন উহার আলোক প্রতিফলন ক্ষমতা জন্মে। তেলমাখান মসৃণ জিনিষে মুখ দেখা যায়, প্রতিবিম্ব পড়ে, উহা আলো ছড়ায়। কাজেই 'চক্চকে'র মুখ্য অর্থ,যাহাতে চক্ চক্ শব্দ করে, কিন্তু গৌণ অর্থ যাহা আলো ছড়াইয়া উজ্জ্বল দেখায়; এই অর্থ 'চক্চকে' 'চুক্চুকে' 'চিক্চিকে' 'চিক্কণ' (সংস্কৃত) 'চকমকে' 'চিকমিকে' 'চকমকি' (পাতর—যাহা আলো উদ্গিরণ করে) 'চাক্‌চিক্য' প্রভৃতিতে বর্ত্তমান। যাহা ঔজ্জ্বল্যে 'চকমক্' করে, তাহা 'চমক' জন্মায়, উহা 'চমৎকার'; চমক লাগিলে লোকে 'চমকিয়া' উঠে বা চৈতন্য লাভে 'চাঙ্গা' হয়। 'চোকা চোকা' বাণে বোধ করি বাণের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণতা স্পষ্টতর। বঁশের মসৃণ ত্বক্ তীক্ষ্ণ ছুরিতে 'চাঁছিয়া' 'চাঁছ' ও 'চোঁছ' তৈয়ার হয়।

তরল রস গাঢ় হইলে উহা আটায় পরিণত হয়, উহাতে কঠিন দ্রব্য পরস্পর জোড়া লাগে। 'চ'য়ের তারল্য ও 'ট'য়ের কাঠিন্যসূচনা একত্র মিলিয়া আটার মত জিনিষ 'চট্‌চট্' করে— উহা 'চট্‌চটে' 'চ্যাটচেটে' 'চিটচিটে' হয়। 'চিটা' গুড় চটচটে আটার মত গাঢ়; 'চিটেল' মানুষ আপন কাজে আটার মত লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়ে না। 'চিমড়া' জিনিষ দাঁতে ছাড়ান যায় না। গাঢ় চট্‌চটে পানীয় দ্রব্য পান করা দুঃসাধ্য, উহা জিব দিয়া 'চাটিতে' হয়। যাহা চাটিতে হয়, তাহা 'চাট' বা 'চাটনি'। 'চ্যাটাং চ্যাটাং' কথা যেন গাঢ় ভাবে শ্রোতার অন্তঃকরণে সংলগ্ন হয়।

জলাশয়ের তরল জলে ঝাঁপ দিলে 'চব' শব্দ হয়; জলে 'চুবাইলে'ও 'চব' শব্দ জন্মে।

'চবচবে' জিনিষ আর্দ্র জিনিষ। উহা জলে 'চবচব্' করে। ব্লটিং কাগজ কালিতে ভিজিয়া 'চবিয়া' যায়। ভিজা কাগজ কাজে লাগে না, উহা 'চোতা' কাগজ। 'চোপসা' কি 'টোপসার' প্রকারভেদ ?

চ কার তারল্যব্যঞ্জক, আর 'ল' কারও তারল্যব্যঞ্জক ; উভয়ের যোগে অতিশয় চাঞ্চল্যের ভাব আসে। সংস্কৃত গত্যর্থক 'চল' ধাতুর সহিত ইহার কিছু সম্পর্ক আছে কি ? অন্ততঃ 'চঞ্চলের' চাঞ্চল্য উপেক্ষা করিতে পারি না। সংস্কৃত 'চপল' শব্দও চঞ্চলের অনুরূপ। সংস্কৃতে যাহাই হউক, বাঙলায় 'চলচল' করিয়া চলা, 'চুলচুল' করা, 'চুলবুল' করা, 'চুলকান্' প্রভৃতির গত্যর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। কেশার্থক 'চুল' শব্দটির সংস্কৃত মূল আছে কি ? না থাকিলে উহার নামের সহিত চাঞ্চল্যের সম্পর্ক আনা চলে না কি ?

তরল পদার্থ কখন কখন 'চুষিতে' হয়—চোষার মূল সংস্কৃতে থাকিলেও উহাতে কি তরল দ্রব্যের পানক্রিয়ার ধ্বনির অনুকরণ জ্ঞাপন করে না ?

ছ

'চ'য়ের লক্ষণ 'ছ'য়ে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে, তবে চয়ের চেয়ে 'ছ'য়ের জোর বেশী, কেননা উহা মহাপ্রাণ। কুকুর তাড়নর সঙ্কেত 'ছেই'। জোরপূর্ব্বক ঘৃণাপ্রকাশে মুখ হইতে বাহির হয় 'ছিঃ' বা 'ছোঃ' বা ছ্যাঃ'। সাপের 'ছোঁ' অনুকরণজাত শব্দ ; কাজেই সাপের কামড় 'ছোবল' চিলেও ছোঁ দিয়া মাছ লইয়া যায় ; 'ছোঁ' দিয়া চিলে 'ছুঁইয়া' লয়। স্পর্শার্থক 'ছোওয়া' কি চিলের ছোঁ দিয়া ছোঁয়ার সহিত অভিন্ন ? তপ্ত কটাহে তেল 'ছেঁক' শব্দ করে ; গরম জিনিষের স্পর্শ 'ছেঁকা' ; গরম জিনিষই 'ছেঁকছেঁকে'। তরল পদার্থই কাপড়ে 'ছাঁকে'। 'ছেঁক্' শব্দে যে রান্না হয়, তাহা 'ছেঁচকি'। গরম তেলে পাঁচ ফোরং দিয়া "ছঁও কাইতে' হয়। যাহার 'ছুতা' বাই (বায়ুরোগ) আছে, সে কোন জিনিষ 'ছুইতে' চাহে না, আর সকল কাজে 'ছুত' ধরে।

'ছুঁ ছুঁ' শব্দ করে বলিয়া জানোয়ারের নাম 'ছুঁচা' ; ছুঁচার মত ঘৃণ্য মানুষও 'ছুঁচো'। কথায় অকথায় 'ছিঁচ্' করিয়া যে কাঁদে, সে 'ছিঁচ'-কাঁদুনে।

'চপ্' জোরাল হইলে 'ছপ' হয়। 'ছপ ছপ' 'ছিপ ছিপ' বৃষ্টিপাতের শব্দ। হালকা পাতলা বেতের মত জিনিষের সঞ্চালনের শব্দ 'ছিপ ছিপ' ; হালকা জিনিষ—হালকা মানুষ পর্য্যন্ত 'ছিপছিপে'। 'চাপ' জোরে দিলে 'ছাপ'এ পরিণত হয়। 'ছাপা'-যন্ত্র, যাহার ইংরেজি নাম press—তাহার খাঁটি অনুবাদ 'চাপা'-যন্ত্র। কাপড়ের উপর রঞ্জনার্থ তরল রঙের ছাপের নাম 'ছোপ'। ছোপ দেওয়ার নাম 'ছোবান'। 'ছাপে'র সঙ্গে 'ছাঁচে'র অর্থসাদৃশ্য আছে। 'ছপ্পর' খাট ও চাল—'ছপ্পর' কিরূপে ঐ নাম পাইল ? ফাঁপা বলিয়া নহে ত ?

চনচনে যে তীক্ষ্ণ বেদনা বুঝায়, 'ছনছনে'ও তাহাই বুঝায়। 'ছিনে' জোঁক গায়ে কাটিয়া ধরে। আতঙ্কে, বিশেষতঃ ভূতের ভয়ে—গা 'ছমছম' করে।

মসৃণ ভূপৃষ্ঠের উপর কোন গুরুভার দ্রব্য টানিয়া 'ছেঁচড়াইতে' হয়। এক একটা লোকের

স্বভাব এমনি যে তাহাকে ক্রমাগত নাড়া না দিলে বা না ছেঁচড়াইলে কাজ আদায় হয় না, সেইরূপ লোক '[illegible]'। 'ছেকড়া' গাড়ী বা 'ছক্কর' আরোহীকে ছেঁচড়ায় বলিয়া কি নাম সার্থক করিয়াছে? 'ছোকরা' বালকের সহিত তাহার কি সম্পর্ক?

চিমড়া জিনিষের রূপভেদ 'ছিবড়া'। 'ছিবড়া' জিনিষ স্থূলত্ব পাইলে 'ছোবড়া' হয়। 'ছ'য়ে 'ট' যোগ হইলে ট বর্গের কাঠিন্য আসিয়া 'ছ'য়ের তারল্যকে ঢাকিয়া দেয়। ইটের মত শক্ত জিনিষ 'ছট্' করিয়া 'ছটকিয়া' পড়ে। 'ছটকান'র রূপভেদ 'ছিটকান'। ছাঁটিবার সময় টুকরা 'ছাঁট' সকলও দূরে ছটকিয়া পড়ে। একপ্রান্তে ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকিলে উহা 'ছিটকানি'তে পরিণত হয়। ঢিল যখন 'ছিটকিয়া' পরে, তখন দূরে গিয়া পড়ে। দূরে প্রক্ষেপের নাম 'ছোড়া'—'ছুড়িয়া' ফেলার ও 'ছটকিয়া' পড়ার সমান ফল। দূরদেশ লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবনের নাম 'ছোটা'। 'ছুটি' পাইলে ছেলেরা 'ছুট' দিয়া রাস্তায় 'ছুটে'। ছট্ করিয়া যাহা বন্দুকের ভিতর হইতে ছোড়া যায়, তাহা 'ছটড়া' বা 'ছররা'। কাঠিন্যহেতু উহার শব্দ কর্কশ; উহা ফেলিলে 'ছরছর' শব্দ জন্মে। 'ছড়ছড়' শব্দে ফেলার নামান্তর 'ছড়ান'। শস্যের বীজ জমিতে ছড়ানর নামান্তর 'ছিটেন'। 'ছেঁড়া' ও 'ছেনা'র মূল অবশ্য সংস্কৃতে পাওয়া যায়।

চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া 'ছলছল' করে; এখানে তারল্যের ভাব অতি স্পষ্ট; তারল্যের সহিত চাঞ্চল্যও একটু আছে। কঠিন দ্রব্যের কোমল ত্বক্‌কে 'ছাল' বলে। ছুরি দিয়া ছাল 'ছিলিতে' বা 'ছুলিতে' পারা যায়। তালব্য ছকারের পর দন্ত্যলকার বসিয়া এই তরলতা ও কোমলতা স্পষ্ট করিয়া দেয়। 'ছ্যাবলা' ও 'ছিবলে' মানুষের চরিত্র তরল। 'ছাওয়াল' ও 'ছেলে' কি তাহার কোমলতা হইতে নাম পাইয়াছে?

জ

চ ও ছয়ের তুলনায় 'জ'য়ের জাঁক বেশী; উহা গম্ভীর ভাবের ব্যঞ্জনা করে। 'জাঁক' শব্দটাতেই তাহার পরিচয়।

'জগজগা'তে চকচকে জিনিষের চাকচিক্য আরও জাঁকাইয়া আছে; 'জগজগ' করা বা 'জুগজুগ' করার অর্থ দীপ্তি বিকাশ করা। 'চমক' চেয়ে 'জমক' বেশী 'জমকাল' বা 'জাঁকাল'। 'জাঁকের' উপর 'জমক' বসাইলে উহা 'জাঁকজমকে' পরিণত হয়। 'চমচম' 'ছমছম' চেয়ে 'জমজমা'র গাম্ভীর্য্য বেশী।

উজ্জ্বল জিনিষকে 'জলজলে' বা 'জিলজিলে' বলিয়া থাকে।

চবচবে জিনিষ আর্দ্র বটে; স্থূল জিনিষ আর্দ্র হইলে উহাকে 'জবজবে' বা 'জ্যাবজেবে' বলা হয়।

'জুজু' নামক জীবের দীপ্তি আছে কি না বলা কঠিন, কিন্তু শিশুদের নিকট উহার গুরুত্বের ইয়ত্তা নাই।

ঝ

'ঝ'য়ের ঝোঁক জয়ের মত ; অধিকন্তু উহার বল জয়ের চেয়ে বেশী।

'ঝিঁঝি' পোকা তাহার ডাক হইতে নাম পাইয়াছে ; 'ঝঙ্কারে'র উৎপত্তি তন্ত্রীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে। 'ঝন্ ঝন্' বা 'ঝাঁ ঝাঁ' শব্দ করে বলিয়া কাংস্যময় করতালের নাম 'ঝাঁঝ'। ঝাঁঝের শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিঁধে। তীব্রধর্ম্মাত্মক অন্যান্য জিনিষেরও ঝাঁঝ থাকে। বৈশাখমাসের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের ঝাঁঝ স্পর্শেন্দ্রিয়ের এবং আমোনিয়ার ঝাঁঝ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর। ছয়টা রসের মধ্যে যে রসটার 'ঝাঁঝ' বেশী, তাহা 'ঝাল'।

'ঝঞ্ঝা' বায়ু প্রবল বাত্যার ধ্বনির অনুকরণে নাম পাইয়াছে। ঝঞ্ঝার মত যে কাজে বিপদে ফেলে, তাহা 'ঝঞ্ঝাট'। 'চিন্‌চিনে'র তীব্রতা 'ঝিন্ ঝিনে'এ আছে ; পা 'ঝিন্ ঝিন্' করিলে এই বেদনা অনুভূত হয়। পায়ে মলের শব্দ 'ঝমঝম্' ; বৃষ্টিপাতের শব্দ 'ঝমঝম' 'ঝিমঝিম' স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন।

চকচকে জিনিষই 'ঝকঝক' করে। 'ঝিকঝিকে' বেলা ও 'ঝিকিমিকি' রৌদ্রে আমরা চিক্‌চিকে ও চিক্‌মিকির ঔজ্জ্বল্য আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাই। 'ঝিনুকের' খোলার গায়েও ঐ উজ্জ্বলতা রহিয়াছে।

'চট্' শব্দে যে দ্রুততা ও আকস্মিকতা আছে, 'ঝট্' শব্দেও তাহা বিদ্যমান। চট্ বা চট্‌পট কাজ করা এবং 'ঝট্' বা 'ঝট্‌পট্' কাজ করা প্রায় তুল্যার্থক। এই ঝট্ হইতে সংস্কৃত 'ঝটিতি' উৎপন্ন তাহাতে সংশয় নাই। 'ঝাট' শব্দের প্রয়োগও বাঙলা কবিতায় পাওয়া যায়—উহার অর্থ শীঘ্র। ঝট অনুনাসিকত্ব পাইয়া ঝাঁটার শব্দে পরিণত হয়, 'ঝাঁটান'র অর্থ ঝাঁটার প্রয়োগ করা। 'ঝড়' (সংস্কৃত 'ঝটিকা') উহার বেগবত্তা বা উহার ধ্বনি হইতে নামে পাইয়াছে কি না বিচার্য্য।

'ঝপ' শব্দ ঊর্দ্ধ হইতে বেগে লম্ফ প্রদানের শব্দ। 'ঝুপঝাপ' শব্দে নিম্নে অবতরণ প্রসিদ্ধ। ঝপ্ শব্দে লম্ফের নামান্তর ঝাঁপ' বা ঝম্প'। বৃষ্টিপাতেও 'ঝপঝপ' শব্দ হয় ; ঐ রূপ 'ঝপঝপ' শব্দে বেগে বৃষ্টির নাম 'ঝাপটা'। ফলাদি পতনে যখন তখন ঝুপঝাপ শব্দ হয় বলিয়াই কি জঙ্গলের নাম 'ঝোঁপ'? অথবা 'ঝুপশি' আঁধার উহার ভিতর ঘণীভূত থাকে বলিয়া 'ঝোঁপ'?

'ঝর ঝর' শব্দে 'ঝরণা'র জল 'ঝরিয়া' পড়ে ; উহার সাধুভাষা 'নির্ঝর'। 'ঝির্‌ঝির' বা 'ঝুর ঝুর' করিয়া বালি পড়ে ; বালুকার কার্কশ্য বুঝাইতে ঝয়ের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্য বর্ণ 'র' বিদ্যমান। 'ঝরঝর' শব্দে যে সকল জিনিষ ঝরিয়া পড়ে, তাহাকে বাছিয়া লইতে হইলে 'ঝারিতে' হয়। 'ঝারিবার' বা 'ঝাড়িবার' যন্ত্রের নাম 'ঝাড়ন'। ধূলা ঝাড়িয়া বিছানা পরিচ্ছন্ন করে ; ডালপালা 'ঝুরিয়া' সেইরূপ বৃক্ষশাখাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। রাগের মাথায় গালাগালি দিয়া মনের মলামাটি সাফ করার নাম 'ঝুরিয়া' দেওয়া। ঐ কাজে একবার প্রবৃত্ত হইলে 'ঝোরা' অনেক সময় 'ঝগড়া'য় পরিণতি পায়। ঝগড়া কর্ম্মটা 'ঝকমারি' ব্যাপার।

'জলজলের' চঞ্চল দীপ্তি 'ঝলমলেও' আছে। 'ঝিলমিলে'র কাঠের গায়ে ঢেউ খেলার

চাঞ্চল্য আছে। 'ঝুলন' দড়িতে দোল খাওয়া বা 'ঝোলা'তে কেবলই চাঞ্চল্য আছে। মাকড়সার জাল আপন ভারে ঝুলিয়া 'ঝুল' হইয়া পড়ে। তারল্যবশে যাহা আপনা হইতে ঝুলিয়া পড়ে তাহা 'ঝোল'; তরল গাঢ় রক্ত 'ঝলকে ঝলকে' নির্গত হয়। মহাদেবের কাঁধে সিদ্ধির 'ঝুলি' ঝুলিত। স্ত্রীলোকের চুল বেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিলে কি উহা 'ঝুঁটি' হয়? ষাঁড়ের পিঠের 'ঝুঁটের' সহিত স্ত্রীলোকের মাথার ঝুঁটির সাদৃশ্য আছে কি? 'ঝুরি'র সহিত 'ঝুলি'র অনেক বিষয়ে মিল আছে। 'ঝাঁকাড়' দেওয়া বা 'ঝাঁকড়ান' ও চঞ্চল আন্দোলনের নামান্তর; ভারী জিনিষকে 'ঝাঁকড়াইয়া' লইতে হয়। ঘোষযুক্ত বর্ণ 'ঝ'য়ের ভার এস্থলে 'ধ'য়ের ভার ও 'ঢ'য়ের ভার স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ঝিমান' (তন্দ্রা) কার্য্যে 'ঢিমা' অর্থাৎ আলসে মানুষের ঢুলুঢুলু আঁখি মনে আনে। 'ঝোঁক' শব্দ—ইংরেজিতে যাহাকে impulse বলা যাইতে পারে,—তাহাতে বেগবত্তার ও গুরুত্বের ভাব আসে। দায়িত্বের গুরুভারের নাম 'ঝুঁকি'। ভারী বোঝা বহিবার জন্য 'ঝাঁকা'র সৃষ্টি। পাখী যখন বৃহৎ দল বাঁধে, তখন সেই দলের বৃহত্ত্বা বুঝাইবার জন্য বলি পাখীর 'ঝাঁক'।

ক বর্গ

প বর্গ হইতে চবর্গ পর্য্যন্ত চারি বর্গের অন্তর্গত চারিশ্রেণির ধ্বনি যেমন এক একটা বিশেষ লক্ষণের সহিত যুক্ত, ক বর্গের বর্ণগুলিতে সে রকম সাধারণ লক্ষণ বাহির করা কঠিন। উহার প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ক

কাক, কোকিল, কুকড়া (কুক্কুট), কুকুর প্রভৃতির নাম উহাদের স্বাভাবিক ডাক হইতে আসিয়াছে। কোকিলের 'কূজন' (সংস্কৃত) উহার কুহু ধ্বনি হইতে। কা কা, ক্যাঁকাঁ, কোঁকোঁ, কেঁই-কেঁই, কেঁউ-কেঁউ, কক্কক্ প্রভৃতি স্বাভাবিক ধ্বনি নানা স্থানে আমাদের পরিচিত। সংস্কৃত 'কাকু' ও বাঙলা 'কাকুতি' (কাকুক্তি?) অনুকরণজাত সন্দেহ নাই। 'কক্ কক্' শব্দ করার নাম 'ককান'। 'কিচ্‌মিচ্' 'কিচির কিচির' 'কিচির মিচির' শব্দ বিবিধ জন্তুর পক্ষে প্রযোজ্য। কুকুরের বাচ্চাকে 'কুৎ কুৎ' করিয়া ডাকিলে সে মহানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অগ্রসর হয়; সে কিন্তু জানে না যে, 'কুত্তা' কা বাচ্চা বলিলে গালি দেওয়া হয়।

কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইবার সময় জিহ্বামূল ক্ষণেকের জন্য উহার পথ রোধ করিলে ধ্বনি জন্মে 'ক'। উহা অল্পপ্রাণ বর্ণ এবং অল্প প্রাণ বর্ণের মধ্যে বোধ করি 'ক' উচ্চারণে সময় লাগে সকলের চেয়ে কম। দ্রুততা ও আকস্মিকতা অল্পপ্রাণ বর্ণ মাত্রেরই প্রধান লক্ষণ; সর্ব্বত্র ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'পট্' করে কাজ করা, 'টক্' করে কাজ করা. 'চট্' করে চলা, 'চপ' করে ধরা। ককারাদি 'কচ্' 'কট্' 'কপ্' প্রভৃতি শব্দেও ঐ দ্রুততা (quickness) অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে।

'কচ' করিয়া কাটা ও 'কট' করিয়া কাটাতে আবার অর্থের ভেদ আছে; কাগজের মত

নরম জিনিষ কাটিলে 'কচ' হয়, আর তারের মত কঠিন ধাতব দ্রব্য কাটিলে 'কট্' হয়। 'ক'য়ের পর তালব্য বর্ণ বসিয়া কোমলতা ও মূর্দ্ধন্য বর্ণ বসিয়া কাঠিন্যের সূচনা করে।

কচ্, কচকচ, কচর কচর, কুচকুচ, কুচুর কুচুর, কঁ্যাচ কঁ্যাচ প্রভৃতিতে কাগজ, কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতি কোমল জিনিষ কাটার ধ্বনি আসিতেছে। 'কঁ্যাচ' শব্দে যে যন্ত্রে কাটা যায়, উহা 'কাঁচি'। যাহা কাটিবার সময় কঁ্যাচ শব্দ হয় তাহা 'কাঁচা'। ছোট নরম জিনিষকে 'কচি' বলে; 'কচু'র কচুত্ব কি উহার কোমলতা হইতে? কাপড়ের মত নরম জিনিষ 'কোঁচান' যায়; বস্ত্রের যে অংশ কুঞ্চিত হয় তাহা 'কোঁচা'; কোঁচার এক অংশ কুঞ্চিত হইয়া 'কোঁচর' হয়। বেতের মত স্থিতিস্থাপক জিনিষও 'কোঁচান' বা 'কোঁচকান' চলে; চলে বলিয়া বাঁশের কোমল শাখার নাম 'কঞ্চি'। 'কচলান' ক্রিয়াও কোমলতা বা তারল্যের সূচক; কঠিন দ্রব্য কচলান হয় না। বালি যদি খুব সরু হয় এবং ভিজা হয়, তবেই 'কিচকিচ' করে, অন্যথা 'কিচিড় কিচিড়' করে। কুচ করিয়া কাটিয়া যে ছোট টুকরা পাওয়া যায়, তাহাকে 'কুচি' বা 'কুচো' বলে, যেমন কাঠের 'কুচো'। 'কুচিকুচি' ক'রে কাটার অর্থ ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটা। কুচকুচ করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করার নাম 'কুচোন'। 'কুঁচ'এর ছোট বীজ সংস্কৃত 'গুঞ্জা' হইতে আসিয়াছে, কি 'কুঁচ' সংস্কৃত হইয়া গুঞ্জায় পরিণত হইয়াছে বিচার্য্য বটে।

তালব্য 'চ'য়ের মত 'দন্ত্যবর্ণ 'ত'ও কোমলতাসূচক। 'কয়ের' সহিত 'ল' যুক্ত হইয়া আবার কোমলতা ও তরলতার সহিত চাঞ্চল্য সূচনা করে।

হোঁদল-'কুৎকুতে'র 'কুৎকুৎ' শব্দ ঐ জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে কি পরিচয় দেয় তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। বগলে 'কুতু কুতু' দিলে সর্ব্বশরীরে যে আক্ষেপ ও তরল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। খাদ্যদ্রব্য গিলিবার কালীন 'কোঁৎ' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'কুন্থনের' সম্পর্ক থাকিতে পারে। সংস্কৃত কুর্দ্দন (কোঁদা) শব্দের সহিত ঐ আক্ষেপের সম্পর্ক আছে কি?

'কলকল' 'কুলকুল' চঞ্চল জলপ্রবাহের ধ্বনি। কালিন্দী জলের 'কল্লোলে' যে 'কোলাহল' উৎপন্ন হইত, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত উপাসক পর্য্যন্ত কুতূহলী ছিলেন ও আছেন। সংস্কৃত নাটকের নেপথ্যে 'কলকল' ধ্বনির সহিত বাঙলা কিলকিল ও সংস্কৃত 'কিলকিলা'র প্রচুর সম্পর্ক আছে। 'কল' ধ্বনির মাধুর্য্য কালিন্দীজলের 'কল্লোলের' মধুরতার সমান। পাখীর 'কাকলি'ও ঐরূপ মধুর। 'কোকিলের' কূজন ত মধুর বটেই। 'কুলকুচো' করিবার সময় মুখের ভিতর জল কুলকুল করে। চঞ্চল আন্দোলনপরতা হইতে কি সর্পের বাঙলা নাম 'কুলো'?

অল্পপ্রাণ 'প' বর্ণ 'ক'য়ের পরে বসিয়া উহার দ্রুতগতিকে দ্রুততর করিয়া তোলে। 'কপ্' ক'রে, 'কপকপ' ক'রে, 'কুপকাপ' ক'রে খাওয়াতেই তাহার পরিচয়। এক 'কোপে' পাঁঠা কাটিবার সময় খাঁড়াখানা নিমেষের মধ্যে পাঁঠার গলা ছেদন করিয়া চলিয়া যায়। 'কোপ' দিয়া কাটার নাম 'কোপান'।

দন্ত্যবর্ণের যোগে যেমন কোমলতা বুঝায়, মূর্দ্ধন্য যোগে তেমনি কাঠিন্য আনে। লোহার তার 'কট্' শব্দে ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া যায়। ইঁদুর তাহার ছোট শক্ত ধারাল দাঁতে যখন কাঠ কাটে তখন 'কুটকুট' 'কুটকাট' শব্দ হয়। ধারাল দাঁতের তীক্ষ্ণতাও ঐ 'কুটকুট' ধ্বনিতে প্রকাশ করে। পিপীড়ায় 'কুট' করিয়া কামড়ায়, এখানে বস্তুতঃ কোন শব্দ হয় না, কামড়ের তীব্র বেদনা 'কুট' বুঝাইতে শব্দের প্রয়োগ। গায়ে বিছুটি লাগিলে গা 'কুটকুট' করে. উহাও সেই বেদনার তীক্ষ্ণতার পরিচয় দেয়। 'কুট কুট' কামড়ের প্রকারভেদ 'কুটুশ কাটুশ' কামড়। স্নায়বিক বেদনায় 'কটকটানি' যন্ত্রণা জন্মে। কটের বিকার 'কটাং' ও 'কটাশ'। সরু সূতা বা সরু তার দিয়া আঙ্গুল বাঁধিলে উহা কট্ করিয়া কাটিয়া বসিয়া 'কটকটানি' জন্মায়; সরু অথচ কঠিন জিনিষকে 'কটকটে' বলে। সংস্কৃত 'কটু' আস্বাদের 'কটুত্ব' কি সেইরূপ কোন বেদনা-জ্ঞাপক? 'কোটা' (কুট্টন)—যথা চিড়ে কোটা,—এই ক্রিয়ার নাম কি ঢেঁকিযন্ত্রের অবয়বের কাঠিন্যজ্ঞাপক? 'কাঠের' (কাষ্ঠের) ঠকার উহার কাঠিন্যজ্ঞাপক করে না, কিরূপে জানিব? তাই যদি হয়, তবে 'কাষ্ঠ' 'কঠোর' 'কঠিন' 'কুঠার' 'কঠিনী' (খড়ি) 'কটাহ' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলির অন্তর্গত মূর্দ্ধন্য ধ্বনি উহাদের কাঠিন্য সূচনা নিশ্চয় করিতেছে। কঠিনার্থক 'কড়া' 'কড়ি' 'কাঠি' 'কুড়ুল' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতমূলক হইলেও এই হিসাবে কাঠিন্যব্যঞ্জক হয়। এমন কি 'কূট' ও 'কুটিল' ও 'ক্রূর' প্রভৃতি শব্দেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃৎ' ধাতু—যাহার অর্থ 'কাটা' এবং যাহা হইতে কর্ত্তন, কর্ত্তরী (কাটারি) প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন, তাহাও বুঝি বা এই দলে পড়ে।

সংস্কৃত শব্দের মূল যাহাই হউক, 'করকর' 'কিরকির' 'কুরকুর' প্রভৃতি শব্দ কঠিন কর্কশ দ্রব্যের বার্ত্তা বহন করে। 'কড়কড়' 'কিড়কিড়' প্রভৃতি শব্দও উহারই রূপান্তরমাত্র। 'কিড়-মিড়' দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণের শব্দ। 'কর্কশ' 'কর্কর' (কাঁকর) 'কর্কট' (কাঁকড়া) 'কর্পট' (কাপড়) 'কর্পর' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দেও কি সেইভাব আসিতেছে না?

সোণার 'কঙ্কণ' (কাঁকনি) তাহার নামের অনুনাসিক ধ্বনিতে উহা যে ধাতুনির্ম্মিত তাহার পরিচয় দিতেছে। ধাতুনির্ম্মিত সরু তারের শব্দ 'কন্‌কন্', ঐ ধ্বনির তীব্রতা এবং ঐ তারের তীক্ষ্ণতা 'কনকনানি' 'কুনকুননি' প্রভৃতি বেদনাজ্ঞাপক শব্দে বিদ্যমান। 'কন্‌কনে' শীতে যে বেদনা বুঝায়, উহা সরু তারে চামড়া কাটিয়া গেলে তদুৎপন্ন বেদনার বা যাতনার অনুরূপ। কাল রঙের 'কিশকিশে' বিশেষণ ককারাদি কেন?

খ

'খ' বর্ণ কয়ের মত জিহ্বামূলীয়—উহার জোর 'ক'য়ের চেয়ে অধিক। 'খক্' 'খকখক্' প্রভৃতি কাশির শব্দ কণ্ঠ হইতে জিহ্বামূল সহযোগে উৎপন্ন—কাশির নাম 'খকি'। হাঁসির শব্দও জিহ্বামূলে উৎপন্ন, যথা 'খিক্ খিক্' 'খুকখুক',—'ল'কার যোগে উহা চঞ্চল হইয়া 'খলখল' 'খিলখিল' ইত্যাদি হাস্যতরঙ্গে পরিণত হয়। খুকখুক হাসে বলিয়া কি শিশুর আদরের নাম 'খোকা'? 'খেউ খেউ' 'খেঁকখেঁক' ডাক হইতে 'খেঁকি'কুকুর ও 'খেঁকশিয়ালি' তাহাদের

বিশেষণ পাইয়াছে। 'খেউ খেউ' শব্দ বিরক্তিকর ও অশ্রাব্য—অশ্রাব্য গানের নাম 'খেউড়'। 'খ্যাকখেঁকে' মানুষ সর্ব্বদাই বিরক্ত থাকিয়া যেন খেঁক খেঁক করিতেছে।

'কচ্' শব্দ জোরে উচ্চারিত হইয়া 'খচ্' 'খচখচ' 'খ্যাচ' 'খ্যাচ খ্যাচ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ছোট কাঁটা চামড়ায় প্রবেশ করিয়া 'খচখচ' 'খুচ খুচ' করে। জোরে টানার শব্দ 'খ্যাচ'; 'খেঁচান'র অর্থ জোরে টানা; দাঁত 'খেঁচান'র অর্থ ওষ্ঠাধরের আচ্ছাদন জোরে টানিয়া লইয়া বা খেচিয়া দন্ত বিকাশ। বেত বা বাঁশ চিড়িয়া তন্নির্ম্মিত 'খাঁচা' 'খাঁচি' 'খুঞ্চি' ঐ ঐ স্থিতিস্থাপক পদার্থের 'খেঁচান' জ্ঞাপক। 'খুচ' শব্দে যে কাঁটা বিধিয়া যায়, তাহার নাম 'খোঁচা'। বল্লমে বেঁধার নাম 'খোঁচান'।

'কুচো' 'কুচি' প্রভৃতি বিশেষণে খণ্ড খণ্ড জিনিষের ছোট টুকরা বুঝায়; 'খুচরা' শব্দেও ঐ খণ্ডতার ভাব আনে।

ধূলা ও বালির কিচকিচি যেমন বিরক্তকর, তেমনি কাজকর্ম্মে 'খিচখিচি' 'খিচিবিচি' 'খিচমিচি' ঘটিলে উহাও বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

'খট' 'খটখট' 'খিটখিট' 'খটমট' 'খুটখাট' 'খুটমুট, খুটখুট প্রভৃতি শব্দ কাঠিন্যের ব্যঞ্জক। 'কট্' ও 'টক্' এই দুই শব্দের অনুরূপ শব্দ 'খট্'। 'খিটখিটে' মানুষের মেজাজ কঠিন বা কর্কশ। 'খাট' বা 'খড়ির' নামের সহিত তাহার কাঠিন্যের সম্পর্ক আছে। 'খাট' (খট্বা) উহার কঠিন কাষ্ঠময় উপাদান হইতে নামকরণ পাইয়াছে কিনা বিবেচ্য। খাটের 'খুড়ো' ত কঠিন কাষ্ঠময় বটেই। 'খড়ম' উহার কাষ্ঠময়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, সন্দেহ করিবার হেতু নাই। চলিতে চলিতে 'খট' শব্দে চরণদ্বয় কঠিন বাধায় আহত হইলে থামিতে হয়। 'খটকা' লাগার অর্থও ঐরূপে আহত হইয়া থামিয়া যাওয়া। 'খাট' জিনিষের খর্ব্বত্বের সহিত কাঠিন্যের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি? 'খুঁটি' জিনিষটাও কঠিন কাষ্ঠের উপাদানে নির্ম্মিত; উহা ছোট হইলে 'খুঁটো' হয়; 'খুঁটো' মোটা হইয়া মুদ্গরে পরিণত হইলে 'খোঁটা' হয়। খুটখুট শব্দের মত বিরক্তিকর কর্ম্ম 'খুঁটোনি'। 'খুটিনাটি' কাজও তদ্রূপ। খটাং খটাস্ প্রভৃতি 'খট' শব্দেরই বিকার। কলঙ্কসূচক 'খিটকাল' মনুষ্য চরিত্রে খট শব্দে আঘাত দেয়।

খটখটের কাঠিন্য কার্কশ্যে পরিণত হইলে 'খরখর' 'খুরখুর' 'খটরখটর' 'খুরখার' 'খুটুরখুটুর' 'খুটুরখাটুর' 'খররখরর' 'খুরুরখুরুর' শব্দে পরিণত হইয়া থাকে। 'খরখরে' জিনিষের অর্থই কর্কশপৃষ্ঠ জিনিষ।

'কপ্' শব্দের জোরে 'খপ্' হয়। খপ, খপখপ, প্রভৃতি শব্দ ক্রিয়ার দ্রুততা ও আকস্মিকতা বুঝায়। খপ্ করিয়া আমরা 'খাবল' দিয়া 'খাবলাই'। অধিকার্থক 'খুব'এর সহিত 'খপ্'এর সম্পর্ক আছে কি? তাড়াতাড়ি কোন কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার ঔৎসুক্য 'খপখপানি'।

পোড়া মাটির শব্দ 'খন্খন্'। হাঁড়ি কলসী, মালসা প্রভৃতি পোড়ামাটির জিনিষে আঘাতের শব্দই খন্ খন্। 'খ'য়ের ধ্বনি ঐ সকল জিনিষের বিশেষত্ব। খাপড়া (খর্পর) খাপরোল, খোলা (কপাল) খুলি, খোল (বাদ্যযন্ত্র) প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত 'খ' কি ঐ সকল

দ্রব্যের শূন্যগর্ভত্ব সূচনা করিতেছে? কলসীর বায়ুপূর্ণ গর্ভদেশ প্রতিধ্বনিতে খাঁ খাঁ শব্দ করে; 'খাঁ খাঁ' ধ্বনি কি এইজন্য শূন্যতাসূচক? জনশূন্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে রুদ্ধবায়ু প্রতিধ্বনিতে 'খাঁ খুঁ' করে সন্দেহ নাই। যাহার ভিতরটা শূন্য, তাহা 'খাঁকে' পরিণত হয়। অঙ্গার ভস্মে পরিণত হইলে 'খাঁক' হয়। কুলাঙ্গারকে সেকালের কবিগণ কুলের 'খাঁকার' অভিধান দিতেন। কোন কর্ম্মের অভ্যন্তরে উপযুক্ত হেতু না থাকিলে ঐ শূন্যগর্ভ কাজটা 'খামখা' হয়। যে খন্‌খন্ করিয়া নাকিসুরে কথা কয় সে 'খোনা'। 'খঞ্জনীর' নাম তাহার ধাতুময়ত্বের পরিচয় দিতেছে।

'খুঁতখুঁতে' 'খুতমুতে' লোক যেন সর্ব্বদাই খুঁতখুঁত করে, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই। 'খুঁত' ধরার অর্থ ছল গ্রহণ। 'খস্‌খস্' শব্দ হইতে বেনামূলের নাম খসখস। গলার 'খুসখুস' শব্দ কি 'খুসীর' বা 'খোস' মেজাজের পরিচায়ক? সম্ভবতঃ নহে।

গ

'জ'য়ের যেমন ঝাঁক, 'গ'য়ের তেমনি গাম্ভীর্য্য। উভয়েই বর্গের তৃতীয় বর্ণ কিনা!

গোঁ গোঁ, গাঁগাঁ, গন্ গন্, গমগম প্রভৃতি গুরুগম্ভীর শব্দ। বাঘের শব্দ 'গাঁক্'। যন্ত্রণায় নরকণ্ঠ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইলে 'গোঙানি' 'গেঙানি' 'গোঙরানি' হয়। 'গোঁ' ধরার ভাবটাই গাম্ভীর্য্যসূচক। 'গুম' ধরাতেও ঐ ভাব আসে। 'গুমট' 'গুমর' 'গুমগুনি' প্রভৃতি শব্দ গাম্ভীর্য্য সূচনা করে। মধুকরের 'গুনগুন' (গুঞ্জন) শব্দে ততটা গাম্ভীর্য্য না থাকিতে পারে, সে উকারের গুণে। কিন্তু মানুষ যখন রাগে 'গন্‌গন্' করে, অথবা আগুন যখন 'গমগম্' করে, তখন উহার গাম্ভীর্য্যে সন্দেহ থাকে না। সন্দেহ জন্মে যে 'গুরু' 'গভীর' 'গম্ভীর' প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দের আদিস্থিত 'গ'কার হয়ত ঐ ভাব আনিতেছে। 'গুন্ গুন্' শব্দেই যখন গানের আরম্ভ, ও নরকণ্ঠের ধ্বনি যখন জিহ্বামূল স্পর্শে সহজেই 'গ্যাগোঁ'তে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত গানের মূল 'গৈ'ধাতুর 'গ'ও কি ঐ মূল হইতে আসিয়াছে। 'গ্রীবা', 'গল', 'গণ্ড' প্রভৃতির আদিস্থিত 'গ'কারও সন্দেহজনক।

'গোঁ' সমেত যে আঘাত, তাহার নাম 'গুঁতা'। 'গট' হইয়া বসিয়া থাকায় একটা কঠিন অথচ গম্ভীর ভাব আছে; যে ঐ ভাবে বসে, সে যেন আপনার দেহটাকে কাষ্ঠপ্রতিমার মত কঠিন করে, উহাকে সহজে নেয়োন যায় না; ঐ কাঠিন্য অবশ্য গয়ের পরবর্ত্তী ট হইতে। 'গট্-গট' করিয়া চলা কাঠের উপর দিয়া শব্দ করিয়া যেন দম্ভের সহিত চলা। উকার যোগে 'গটগটের' ঝাঁক কমিয়া 'গুটগুট' হয়। 'গিরগিটি' জন্তু 'গিটগিট' করিয়া চলে না গিটগিট করিয়া ডাকে?

গরগর, গুরগুর, প্রভৃতি শব্দ কার্কশ্যসূচক; ঐ কার্কশ্যেও যেন গম্ভীর আওয়াজ আছে। জলের ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চালনেও ঐ শব্দ হয়; ধূমপায়ীর 'গড়গড়া' ও 'গুড়গুড়ি' ঐ ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। ঐ রূপ শব্দের সংস্কৃত নাম 'গর্জ্জন'—মেঘের 'গরগর' 'গুরগুর' শব্দ মেঘগর্জ্জন। গড়গড় শব্দে 'গড়াৎ' করিয়া গতির নাম কি 'গড়ান'? গড়গড় শব্দে যাহা হইতে জল পড়ে, তাহাই কি 'গাড়ু'?

রাগে যেমন গা গন্‌গন্‌ করে, তেমনি 'গশগশ' করে, 'গিশগিশ' করে। রাগে গশগশ করার নাম কি 'গোশা' করা? না উহা পার্সী শব্দ?

খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের শব্দ 'গপ' বা 'গব'; তাড়াতাড়ি অভদ্রভাবে খাওয়া 'গবগব' খাইয়া 'গেলা'।

লকার যোগে অন্যত্র যেমন, এখানেও সেইরূপ তরলভাব উপস্থিত হয়। 'গলগল' 'গিলগিল' করিয়া তরল দ্রব্যের ধারা বহে। 'গলিত' হওয়া সংস্কৃত শব্দ, উহার মূলও কি এখানে?

ঘ

'ঘ'য়ের ধ্বনি যে গম্ভীর ও ঘোষবান্‌, তাহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত—"ঘর্ঘরঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ"। রথচক্রের 'ঘর্ঘর' শব্দের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষের কথা মহাকবির উক্তি। সংস্কৃত ঘন, ঘোর, ঘোষ, ঘর্ম্ম, ঘট্ট, ঘরট্ট প্রভৃতি শব্দের আদিতে ঘকার কেন? 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ 'খেউ খেউ'য়ের তুলনায় গম্ভীর। গেঙানির চেয়ে 'ঘেঙানি' গম্ভীর। 'ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌' 'ঘিন' ঘিন' প্রভৃতিতে একটা গভীর 'ঘৃণা'র ভাব আসে। 'ঘানি' গাছের শব্দ 'ঘ্যানর ঘ্যানর' বুনো শূয়োর গম্ভীর ভাবে 'ঘোঁত ঘোঁত' শব্দ করিয়া চলে।

গলার ঘরঘর শব্দ দুর্ব্বল হইয়া 'ঘুরঘুর' শব্দে দাঁড়ায়। ঘটঘট, ঘটমট, ঘুটঘাট, ঘুটঘুট, ঘটর ঘটর শব্দে কঠিন দ্রব্যের আঘাত সূচনা করে।

'ঘণ্টা' ও 'ঘুণ্টি' এই দুই শব্দের মধ্যস্থ নকার ধাতুময় যন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইতেছে।

ঘুরঘুর ধ্বনির জন্য কি ঘূর্ণন গতির বাঙলা 'ঘোরা'? 'ঘুরঘুরে' পোকা ঘুরঘুর শব্দ করে না ঘুরঘুর করিয়া 'ঘোরে'? 'ঘুরঘুর' করিয়া ঘোরা এবং সর্ব্বদা কাণের কাছে 'ঘুসুর ঘুসুর' করা সমান বিরক্তিজনক। কাণের কাছে ঘুসুর ঘুসুর করিয়া অপরের নিন্দাবাদের গ্রাম্য নাম 'ঘোচর'। ঘষঘষ শব্দের সহিত সংস্কৃত 'ঘর্ষণের' (ঘষার) কোন সম্পর্ক নাই, ইহা মনে করা দায়। কঠিন দ্রব্যের গায়ে ঘষার নাম 'ঘসটান'। গা 'ঘেষিয়া' চলিলে গায়ে গায়ে ঘর্ষণ হয়। 'ঘাঁটা' আর 'ঘষা' বা 'ঘসটা' প্রায় তুল্যার্থক। সিদ্ধি 'ঘুঁটিবার' সময় ঘুটঘাট শব্দ হয়। 'ঘোঁট' পাকাইবার সময় মানুষে মানুষে ঘর্ষণ অসম্ভব নহে। ঘষঘষ ছোট হইয়া ঘুষঘুষ হয়; 'ঘুষঘুষে' জ্বর অল্পমাত্রার জ্বর, কিন্তু সহজে ছাড়িতে চায় না। 'ঘষর ঘষর' শব্দ বন্ধুর দ্রব্যে ঘর্ষণ বুঝায়।

খোঁচা গুরুত্ব পাইয়া 'ঘোঁচা' হয়। 'ঘোঁচানি' আর 'ঘেঁতানি'—প্রায় তুল্যার্থক।

'ঘুপশি' বা 'ঘুপচি' বা 'ঘুরঘুট্টি' অন্ধকার গভীর অন্ধকার। তরল দ্রব্য গলগল করিয়া পড়ে, গাঢ় হইলে 'ঘলঘল' করিয়া পড়ে। জলে কাদা গুলিয়া উহাকে গাঢ় করিলে জল 'ঘোলা' হয়। দুধের 'ঘোল' তরল ঘোলা জিনিষ। সবল ব্যক্তি জোরে আঘাত পাইলে 'ঘাল' হইয়া পড়ে।

অন্তঃস্থ ও উষ্মবর্ণ

য, র, ল, ব এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে 'য' ও 'ব' অনেকটা স্বরের লক্ষণযুক্ত; বাঙলায় ঐ দুইবর্ণ শব্দের আদিতে বসিতে চায় না। বাঙালীর বাগিন্দ্রিয় শব্দের আদিতে অন্তঃস্থ 'য'কে 'জ'য়ে এবং অন্তঃস্থ 'ব'কে বর্গীয় 'ব'য়ে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই

ঐ দুই বর্ণের উদাহরণ মিলিবে না। র ও ল অবশ্য শব্দের আদিতে প্রযুক্ত হয়। রকারাদি উদাহরণও বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। দূর হইত ডাকিতে হইলে আমরা 'রে' 'অরে' 'ওরে' বলিয়া ডাকি। র মূর্দ্ধন্য বর্ণ, অতএব কঠোরতা ও কর্কশতা সূচনা করে। ওরে বলিয়া ডাকা কর্কশ ভাবে ডাকা। 'রৈ রৈ' শব্দ কর্কশ কোলাহল। 'রিরি' শব্দেও ঐ ভাব আছে। 'রিণিঝিনি' 'রুনুঝুনু' প্রভৃতির অনুনাসিক ধ্বনি ধাতুময় অলঙ্কার শিঞ্জিত মনে আনে। 'রগরগ' 'রগড়' 'রগড়ান' 'রপটান' প্রভৃতি কয়টি রকারাদি কাঠিন্যসূচক বা কার্কশ্যসূচক শব্দ পাওয়া যায়, বড় বেশী পাওয়া যায় না।

'ল'য়ে কোমল ও চঞ্চল ভাব আনে। পুরুষ পুরুষকে ডাকে 'ওরে' বলিয়া, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোককে ডাকে 'লো' এবং 'ওলো' বলিয়া। বহুকাল হইতে এই পদ্ধতি বর্ত্তমান; শকুন্তলার সখীরা শকুন্তলাকে 'হলা সউন্তলে' বলিয়া ডাকিতেন। 'লক্‌লক' 'লিকলিক' 'লিকলিকে' প্রভৃতি শব্দে তরল চাঞ্চল্যের পরিচয়। সংস্কৃতে যাহাকে 'লোল' জিহ্বা বলে, উহা 'লেলিহান' হইয়া 'লক্ লক্' করে; তখন উহাতে 'লালা' (সংস্কৃত?) নিঃসৃত হয়। 'লচপচ' তারল্যের ব্যঞ্জক; 'লোচ্চা' অতি তরল প্রকৃতির মানুষ। সংস্কৃত 'লম্পট' শব্দের বাঙলা উহাই। 'লটপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা' এই বাক্যে মহাদেবের জটাজুটের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। লটলট, লটাং, লটঘট প্রভৃতিও ঐ রূপ ভাবের পরিচয় দেয়। 'লিটপিটে' লোকে কাজের শেষ করিতে পারে না, একই কাজে তরল পদার্থের মত আপনাকে জড়াইয়া কাল গৌণ করে বা 'লিটির পিটির' করে। 'লড়লড়' 'লড়বড়' 'লুরলুর' 'লপলপ' প্রভৃতি শব্দ এবং 'লশলশে' 'লিংলিঙে' প্রভৃতি লকারাদি শব্দে তারল্য, চাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্যের ভাব মিশ্রিত হইয়া আছে।

'লাফ' (লম্ফ) দেওয়া, 'লুফিয়া' লওয়া, 'লুকিয়া' থাকা, 'লুটিয়া' চলা প্রভৃতির 'ল'য়ে ঐ ভাবের কোন সম্পর্ক আছে কি না চিন্তার বিষয়। 'লতা'র মত ও 'লূতা'র মত খাঁটি সংস্কৃত শব্দের লকারাদিত্ব সন্দেহজনক। সংস্কৃত বা বাঙলায় যেখানে লয়ের বাহুল্য, সেইখানেই যেন আলুলায়িত কুন্তল অর্থাৎ এলো চুলের মত অথবা ললিত লবঙ্গলতার মত লটপট হইয়া এলিয়া পড়ার ভাব আসে।

বাঙলায় যুক্তবর্ণ ব্যতিরেকে অন্যত্র উষ্মবর্ণের ত্রিবিধ উচ্চারণ (শ, ষ, স) বজায় নাই; এই যুক্তবর্ণের অধিকাংশই আবার সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃতমূলক শব্দ। খাঁটি বাঙলায় ঐ তিন উষ্মবর্ণের পার্থক্য রাখায় বিশেষ হেতু নাই। সেকালের পুঁথিপত্র লেখাতে এক 'স' তিনের কাজই চালাইত। আমরা ইচ্ছামত স ও শ দুই ব্যবহার করিব।

বলা বাহুল্য উষ্মবর্ণ বিশেষতঃ বাতাসের চলাচল স্মরণ করাইয়া দেয়। বায়ুর সহিত উহার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কণ্ঠনিঃসৃত বায়ু জিহ্বার পাশ কাটাইয়া জিহ্বা ঘেঁষিয়া বাহির হইলে উষ্মবর্ণের উচ্চারণ হয়; বর্গীয় বর্ণের মত বায়ুর গতি কোথাও একবারে রুদ্ধ হয় না। অন্য দ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন বাতাসের শব্দই 'সাঁসাঁ' সোঁসোঁ' 'সন্‌সন্‌' 'সাঁইসুঁই' 'সরসর' 'সুরসুর' 'সিরসির' 'সিটসিট' 'সুটসুট' 'সুরসার'। এই শব্দগুলি ভাষায় গৃহীত হইয়া

নানা অর্থ প্রকাশ করে। শ্বাসরোগীর গলা 'সাঁইসুঁই' করে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গা 'সিটসিট' করে, চুলকানির পূর্ব্বে গা 'সুরসুর' করে ইত্যাদি। অল্পপ্রাণ ট যোগে 'স' আকস্মিকতা বা দ্রুততার ভাব আনে, যেমন 'সট' করে চলা, 'সটাসট' বেতমারা। 'সপ্' 'সপসপ' 'সপাসপ' প্রভৃতি শব্দেরও অল্পপ্রাণ প যোগে এইরূপ অর্থ। 'শলশলে' অর্থে 'শিথিল'। এখানে সেই ল আসিয়া শয়ের পরে বসিয়াছে। 'সোঁতা', 'স্যাঁতসেঁতে' অর্থে আর্দ্র। এই তারল্য তকার হইতে 'শো' বা 'শুয়া পোকার 'শুম্' গায়ে লাগিলে গা 'সুংসুং' করে। অনুনাসিক ধ্বনিও তীক্ষ্ণতা ব্যঞ্জক। 'শামশুম' শব্দ 'খাঁখাঁ' ভোঁভোঁ' শব্দের মত শুষ্কতার বা শূন্যতার শান্তিবাচক। 'সীস' দেওয়ার সময় প্রকৃতপক্ষে 'সী সী' শব্দ হয়। কাচের ছোট বোতলের মুখে ফুঁ দিলে 'সীস' দেওয়ার মত শব্দ হয় বলিয়াই কি উহা 'শিশি'?

হ বর্ণটাকে ব্যঞ্জনের মধ্যে না ফেলিয়া মহাপ্রাণ অকাররূপে গণ্য করা চলিতে পারে। কণ্ঠস্বর জোরে বাহির হইলে 'হুঙ্কারে' বা 'হাঁকারে' বা 'হাঁকে' পরিণত হয়। বেদের হিঙ্কারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া বৌদ্ধেরা তাঁহাদের 'মণি পদ্মে হুঁ' মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। 'হাঁ' 'হুঁ' শব্দ কোন বিষয়ে সম্মতি দিবার অতি-সংক্ষিপ্ত উপায়। গানের মজলিশে পাখোয়াজের বাজনার সঙ্গে 'হাঃ হাঃ' শব্দের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য শুনা যায়। দূর হইতে কাহাকে ডাকিতে হইলে 'ওহে' 'হে' বলিয়া ডাকা যায়। 'হা' 'আহা' 'হাঃ' 'হায়' 'হুঃ' 'উহুঃ' 'অহো' 'হো' প্রভৃতি বিস্ময়, খেদপ্রভৃতি প্রকাশের সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়। আনন্দের সময় 'হাঃহাঃ' হিঃহিঃ' 'হুঃহুঃ' প্রভৃতি শব্দ আপনা হইতে বাহির হইলে উহাকে 'হাসি' (হাস্য) কহে। শেয়ালের ডাক 'হুকি হুয়া' 'হুক্কা হুয়া' ও হনুমানের ডাক 'হুপহাপ', গরুর ডাক 'হম্বা', উল্লুকের ডাক 'হুকু হুকু', 'হুতোম'-প্যাঁচার ডাক 'হুঁঃ হুঁঃ' ইত্যাদি স্বাভাবিক ধ্বনিমাত্র। 'হাসির' মত 'হাঁচি হিক্কা 'হাঁপ "হাঁপানি" প্রভৃতি শব্দও স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণোৎপন্ন। মুখব্যাদান করিয়া বা হো করিয়া 'হাঁই' তুলিবার সময় কণ্ঠ হইতে বাতাসটা বাহিরে আসে; কিন্তু কোন কণ্ঠধ্বনি হয় না। নারীকণ্ঠের 'হুলু ধ্বনি হইতে ক্রুদ্ধ জনতার "হল্লা" পর্য্যন্ত অনুকরণোৎপন্ন। জোরে নিশ্বাস পড়িলে "হাঁসফাঁস" শব্দ হয় এবং বেগে দৌড়ের পর 'হাঁই ফাঁই' করিতে হয়। গাড়ির এঞ্জিন "হুসহুস" "হসহস্" করিয়া চলে। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি চেতনালাভ করিলে 'হুস্' শব্দে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে; চেতনালাভের নাম "হুঁস" হওয়া। কামারের 'হাপড়" হসহস্ শব্দে বায়ু উদ্গিরণ করে। ক্রন্দনের শব্দ "হাপুস," আর স্নানের সময় জলে ডোবার শব্দও 'হাপুস",। আকস্মিক "হেঁচকা" টানে কোন জিনিষকে "হেঁচড়িয়া" লইয়া যাওয়া "হোঁৎকা" স্বভাবের কাজ। এই কাজে হকারের মহাপ্রাণতার পরিচয় পাই। "হ্যাঁচ" শব্দে নখপ্রয়োগে জোরে "হাঁচড়" বা "আঁচড়" দেওয়ার নাম "হাঁচড়ান"। "হটমট" "হটমুট" 'হুটুর মুটুর' করিয়া "হাঁটা" :যেন দম্ভের সহিত কঠিন ভূপৃষ্ঠ দলিয়া চলা। "হলহল" করিয়া "হেলা" বা "দোলা" সেইরূপ চাঞ্চল্যের পরিচায়ক। বস্তুর ভূপৃষ্ঠের উপর টানিলে "হরহর" "হুরহুর" "হুরমুর" এইরূপ কর্কশ ধ্বনি হয়। অস্থির বাঙলা নাম "হাড়" কি উহার কাঠিন্যজ্ঞাপক? "হেঁটকা"

"হুড়কো" "হেরফের" "হিমশিম" "হুটোহুটি" "হুটোচুটি" 'হপহপ' "হপাহপ" "হড়ুম হাড়ুম" "হড়ুমধুম" "হনহন" "হানাহানি" "হাঁউমাউ" 'হুমরোচুমরো" 'হুমুরি' প্রভৃতি অগণ্য হকারাদি শব্দ মহাপ্রাণ হবর্ণের বলবত্তা বহন করিতেছে। শিশুরা 'হট্টু হট্টু হটুরি' বলিয়া এক পায়ে নাচে আর লাফায়।

বাঙলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য এই আলোচনায় প্রচুর পরিমাণে অনুমান ও কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে হয়ত কষ্টকল্পনারও অভাব হয় নাই। ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ কল্পনার আশ্রয় না লইলে উপায় নাই। বড় বড় ভাষাতাত্ত্বিকেরাও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া কল্পনাকে উধাও ভাবে উড়িতে ও খেলিতে দিয়া থাকেন। এদেশের প্রাচীন শাব্দিক পণ্ডিতই বল আর পশ্চিমদেশের আধুনিক শাব্দিকই বল, কল্পনার সাহায্য বিনা কাহারও এক্ষেত্রে উপায় নাই। কাজেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে সদাই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সংস্কৃত 'দুহিতা' শব্দ স্পষ্টতঃ দোহনার্থক দুহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন; যে দোহন করে,সেই দুহিতা। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বলিবেন, কন্যা পিতার ধনসম্পত্তি দোহন করেন, সেই জন্য তিনি দুহিতা। পাশ্চাত্য শাব্দিক বলিবেন, ঐ শব্দটি যখন ইংরেজিতেও'daughter'রূপে বিদ্যমান দেখিতেছি, তখন উহা প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষাতেও ছিল; সেকালে কন্যার উপর গো-দোহনের ভার অর্পিত ছিল—যিনি গাভী দোহন করিতেন, তিনিই দুহিতা। বলা বাহুল্য উভয়ত্র দুহিতা শব্দের নির্ব্বাচনে কল্পনার খেলা চলিয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। সংস্কৃত 'ত্রি' শব্দ, বাঙলায় যাহা তিন, ইংরেজিতে উহা three, লাটিনে উহা tri; বলা বাহুল্য উহা প্রাচীন আর্য্যভাষায় বর্ত্তমান ছিল। শাব্দিক পণ্ডিত সেইস লিখিয়াছেন, উহার সহিত লাটিন trans, ইংরেজি through, সংস্কৃত তরণ, তরণি প্রভৃতি শব্দের সম্পর্ক আছে। সংস্কৃত তৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া, অর্থাৎ 'উত্তীর্ণ' হওয়া। তিনি বলেন, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যেরা এক ও দুই ইহার উপরে গণিতে পারিতেন না; তাঁহাদের গণনার শক্তির সীমা ঐ খানে আবদ্ধ ছিল; ঐ সীমা যে দিন উত্তীর্ণ হইলেন ও তিন গণিতে পারিলেন, সেইদিন বলিলেন "এই পার হইলাম" অর্থাৎ দুই সংখ্যা পার হইয়া আমরা তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায় আসিলাম। এইরূপে ত্রি অর্থাৎ তিন শব্দের সৃষ্টি হইল। তিনের পর চারি; সংস্কৃত "চত্বারি"=চ+ত্রি; চ শব্দের সংস্কৃত অর্থ "আরও" অর্থাৎ আর একটা; চত্বারি অর্থে তিনের উপর আর একটা।

এই সকল দৃষ্টান্তে শাব্দিক পণ্ডিতদের কল্পনা কষ্টকল্পনা হইয়াছে কি না সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত হইবে। ফলে ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ কল্পনা ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও যে কল্পনার সাহায্য লইয়া অনেক শব্দের অর্থ জোরপূর্ব্বক আনা হয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। তবে এই কল্পনার খেলার মধ্যেও কিছু না কিছু সত্যের ভিত্তি থাকিতে পারে, এই ভরসায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপনে সাহসী হইয়াছি। বহুস্থলে

আমার অজ্ঞতা ও অনবধানহেতু সংস্কৃত, আরবি ও পারসী প্রভৃতি মূল হইতে উৎপন্ন শব্দকে ধ্বনিমূলক দেশজ শব্দ বলিয়া হয়ত গ্রহণ করিয়াছি; এরূপ ভ্রম অনেক বাহির হইলেও বিস্মিত হইব না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা*

প্রথম অধ্যায়

আয়ুর্ব্বেদের অস্থিসংখ্যা গণনাটী রহস্যময়। গণনা যে মৃতের কঙ্কাল দেখিয়া ঠিক করা হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেলেও এটী যে বেশ সূক্ষ্ম গণনা নহে, তাহাও বলিতে হইবে। অস্থি-গণনা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। তবে অনুমানবলে যাঁহারা ইহার স্বরসত্ব প্রমাণ করিতে যত্ন করেন, আমি তাঁহাদিগের সূক্ষ্মবুদ্ধির ধন্যবাদ করিতে পারি, কিন্তু একমত হইতে পারি না।

আমি এস্থলে স্থূলত দুইটী উদাহরণ দিতেছি। আমরা জানুতে একখানা স্বতন্ত্র অস্থি দেখিতে পাই, আয়ুর্ব্বেদে জঙ্ঘার তুলনায় কূর্পরেও ঐরূপ একখানা অস্থির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কূর্পরে ঐ অস্থিখানা নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক অঙ্গুলীতে ৩ খানা করিয়া অস্থি ও একটী শলাকা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে একখানা যে কম আছে, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তবে শলাকাটীকে যদি অঙ্গুষ্ঠের অঙ্গুল্যস্থি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশখানা অস্থিশলাকার সংখ্যাপূরণে অন্য কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়া থাকে।

ভগবান্ পুনর্ব্বসুর উপদেশে যে অস্থিসংখ্যার উল্লেখ আছে, তাহার সহিত ভগবান্ ধন্বন্তরির মতের ঐক্য নাই। তবে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে পুনর্ব্বসুমতের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। ধন্বন্তরির মতে অস্থিসংখ্যা সমুদায়ে ৩০০ তিনশত ও পুনর্ব্বসুর মতে ৩৬০ খানা।

চরকপাঠসম্বাদী-অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকা-সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

শাখা	শাখা	উত্তমাঙ্গ
২০ নখ পাদনখ ১০	২ হস্তমূলাস্থি	২ গণ্ড
বাম ৫ দক্ষিণ ৫	বাম ১ দক্ষ ১	বাম ১ দক্ষ ১

* জাতীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে কঙ্কাল দেখাইয়া এই প্রবন্ধ পাঠ ১৯শে শ্রাবণ ১৩১৪, শিক্ষা-পরিষদে করা হইয়াছিল।

শাখা

হস্তনখ ১০
বাম ৫ দক্ষিণ ৫
৬০ অঙ্গুলি অস্থি
পাদ ৩০
বাম ১৫ দক্ষ ১৫
হস্ত ৩০
বাম ১৫ দক্ষ ১৫
২০ শলাকাস্থি
পাদ ১০
বাম ৫ দক্ষ ৫
হস্ত ১০
বাম ৫ দক্ষ ৫
৪ শলাকাবন্ধন
পাদ ২
বাম ১ দক্ষ ১
হস্ত ২
বাম ১ দক্ষ ১
৪ জঙ্ঘাস্থি
বাম ২ দক্ষ ২
৪ প্রকোষ্ঠাস্থি (অরত্নি)
বাম ২ দক্ষ ২
৮ কুর্চ্চ
৪ গুল্ফ
বাম ২ দক্ষ ২
৪ মণিবন্ধ
বাম ২ দক্ষ ২
২ পার্ষ্ণি
বাম ১ দক্ষ ১

শাখা

২ উরু-অস্থি
বাম ১ দক্ষ ১
২ বাহুপৃষ্ঠ
বাম ১ দক্ষ ১
২ জানু
বাম ১ দক্ষ ১
২ কূর্পর
বাম ১ দক্ষ ১
১৪০

মধ্য-শরীর

২৪ পার্শ্বক
২৪ „ ফলক
২৪ „ অর্ব্বুদ
৩০ পৃষ্ঠাস্থি
৮ উরঃঅস্থি
২ অক্ষক
দক্ষ ১ বাম ১
২ অংসাস্থি
দক্ষ ১ বাম ১
২ অংসফলক
দক্ষ ১ বাম ১
৪ নিতম্ব
দক্ষ ২
পৃষ্ঠ ১ উদর ১
বাম ২
পৃষ্ঠ ১ উদর ১
১২০

উত্তমাঙ্গ

২ কর্ণ
বাম ১ দক্ষ ১
২ শঙ্খ
বাম ১ দক্ষ ১
১ তালু
১ জত্রু
১৩ গ্রীবা
৪ কণ্ঠনাড়ী
২ হনুবন্ধন
বাম ১ দক্ষ ১
৩২ দন্ত
৩২ দন্তোলূখল
৩ নাসা, ঘোনঅস্থি
৬ শিরঃঅস্থি
ললাট ২ শির ৪
১০০

শাখাচতুষ্টয়	১৪০
মধ্যশরীর	১২০
উত্তমাঙ্গ	১০০
	৩৬০

চরকশারীর

শাখা	মধ্যশরীর	উত্তমাঙ্গ
২০ নখ	২ অক্ষক	৩২ দন্তোলূখল

শাখা		মধ্যশরীর		উত্তমাঙ্গ	
২০ শলাকা	পাণি, পাদ	২	শ্রোণীফলক	৩২	দন্ত
৪	শলাকাধিষ্ঠান	১	ভগাস্থি (স্ত্রী), মেঢ্রাস্থি (পু)	৩২	দন্তোলূখল
৪	পাদপৃষ্ঠ, পাণিপৃষ্ঠ	১	ত্রিক	২	তালু
৬০	অঙ্গুলি-অস্থি	১	গুদ	৪	শিরঃকপাল
২	পার্ষ্ণি	৩৫	পৃষ্ঠগত	২	শঙ্খক
২	কূর্চ্চাধঃ	২৪	পার্শ্বক (দক্ষ)	১৫	গ্রীবা
৪	পাণিমণিকা	২৪	„ (বাম)	২	জত্রু
৪	পাদগুল্ফ	২৪	„ (স্থালিক)	১	হনু
৪	অরত্নি	১৭	বক্ষঃঅস্থি	২	হনুমূলবন্ধন
৪	জঙ্ঘা	১৩১		২	ললাট
২	জানু			২	অক্ষি
২	কূর্পর			২	গণ্ড
২	উরু			৩	নাসিকা, ঘোনাস্থি
২	বাহু			১০১	
১৩৬					

অবিনাশ কবিরত্ন সঙ্কলিত
ও
দেবেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত
চরক

চরকের এই নির্দ্দেশানুসারে ৩৬০, অতিরিক্ত আরও ৮ খানা অস্থি অধিক হইতেছে। অথচ মহর্ষি বলিতেছেন—ইতি "ত্রীণি ষষ্ট্যাধিকানিশতান্যস্থ্নাং"। বলিতে পারি না কোনরূপ কল্পিত পাঠ ইহাতে সমাবিষ্ট হইয়াছে কি না।

শাখাসমূহে	১৩৬	
মধ্যশরীর	১৩১	৩৬৮
উত্তমাঙ্গ	১০১	

সুশ্রুত-শারীর

শাখা		মধ্যশরীর		উত্তমাঙ্গ	
পাদতল, কূর্চ্চ, গুল্ফ	১০	৫ শ্রোণী		৯	গ্রীবা
		গুদ	১	৪	কণ্ঠনাড়ী
		ভগ	১	২	হনু

শাখা			মধ্যশরীর			উত্তমাঙ্গ	
	পার্ষ্ণি	১		নিতম্ব	২	৩২	দন্ত
	জঙ্ঘা	২		ত্রিক	১	৩	নাসা
	জানু	১			৫	১	তালু
	উরু	১	১২	পার্শ্বক		২	গণ্ড
	অঙ্গুলী	১৫		দক্ষ	৩৬	৬	মস্তক
		৩০		বাম	৩৬	২	শঙ্খক
৬০	সক্থিঅস্থি		৩০	পৃষ্ঠাস্থি		২	কর্ণ
	বাম	৩০	৮	উরঃ অস্থি		৬৩	
	দক্ষ	৩০	২	অক্ষক			
৬০	বাহুঅস্থি		১১৭			শাখাসমূহে	১২০
	বাম	৩০				মধ্যশরীর	১১৭
	দক্ষ	৩০				উত্তমাঙ্গ	৬৩
১২০							৩০০

আমি আপনাদিগকে কোনরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহি না। আপনারা এখন প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। এই কঙ্কালের কতক অংশ লোপ পাইয়াছে। যে গুলি শাস্ত্রে তরুণাস্থি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলির অধিকাংশই এখন নাই। যেগুলি উপাস্থি বা অস্থি প্ররোহ বলিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মত অস্থি নহে সেই নখগুলিও ইহাতে নাই।

যাঁহারা নখগুলিকে অস্থিপর্য্যায়ে স্থানদান করিয়া অস্থিসংখ্যা গণনা করিয়া গিয়াছেন, এই কঙ্কাল হইতে সেই নখগুলি ও সর্ব্ববাদিসম্মত তরুণাস্থিগুলি বাদ দিলে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মধ্যে ৩৬০ খানার ৪৫ খানা নাই; এবং ৩০০ খানার মধ্যে ২০ খানা নাই। বাকি ৩১৫ বা ২৮০ খানা অস্থি এই কঙ্কালে আছে কি না তাহাই এখন গণনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমে শাখাচতুষ্টয়ের কথা বলিতেছি। সুশ্রুত একমাত্র সক্থির বর্ণনা করিয়াই বলিলেন, "এতেন ইতরসক্থিবাহূচ ব্যাখ্যাতৌ" চরক তাহা করেন নাই। তিনি সক্থি ও বাহুর বিভিন্ন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে গুণবাহুল্য থাকিলেও দোষ পরিত্যক্ত হয় নাই।

সুশ্রুতের মতে		চরকের মতে		অষ্টাঙ্গহৃদয়মতে	
প্রত্যেক সক্থিতে		সক্থি	বাহু	সক্থি	বাহু
পাদতল	} ১০	নখ ৫	নখ ৫	নখ ৫	নখ ৫
কূর্চ্চ		শলাকা ৫	শলাকা ৫	শলাকা ৫	শলাকা ৫
গুল্ফ		ঐ অধি ১	ঐ অধি ১	অঙ্গুলী ১৫	অঙ্গুলী ১৫
পার্ষ্ণি	১	পাদপৃষ্ঠ ১	পাণিপৃষ্ঠ ১	শলাকাবন্ধন ১	শলা-ধি ১
জঙ্ঘা	২	অঙ্গুলী ১৫	অঙ্গুলী ১৫	জঙ্ঘা ২	প্রকোষ্ঠ ২

প্রত্যেক সক্‌থিতে		সক্‌থি		বাহু		সক্‌থি		বাহু	
জানু	১	পার্ষ্ণি	১	কূর্চ্চাধঃ	১	কূর্চ্চ	২	কূর্চ্চ	২
উরু	১	পাদগুল্‌ফ	২	পাণিমণিকা	১	গুল্‌ফ	২	মণিবন্ধ	২
অঙ্গুলী	১৫	জঙ্ঘা	২	অরত্নি	২	পার্ষ্ণি	১	হস্তমূল	১
	৩০	জানু	১	কূর্পর	১	উরু	১	বাহুপৃষ্ঠ	১
		উরু	১	বাহু	২	জানু	১	কূর্পর	১
			৩৪		৩৪		৩৫		৩৫

১ম	উরু-অস্থি	এইখানা ঠিক আছে	১
২য়	জানু-অস্থি	" " "	১
৩য়	জঙ্ঘাস্থি	" দুই " "	২
৪র্থ	শলাকাস্থি	এই পাঁচখানা ঠিক আছে	৫
৫ম	অঙ্গুল্যস্থি	অন্য চারি অঙ্গুলে ঠিক আছে	১২
		অঙ্গুষ্ঠে একখানা কম আছে	২

পার্ষ্ণি, গুল্‌ফ, প্রভৃতি অবশিষ্ট ৬ খানা (চরকমতে ৫ খানা) অস্থির স্থলে ৭ খানা অস্থি আছে।　　৭

　　৩০

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেক সক্‌থিতে যে ৩০ খানা অস্থির উল্লেখ আছে, তাহা সংখ্যানুসারে ঠিক হইলেও নির্দ্দেশানুসারে ঠিক হয় না। তবে অঙ্গুষ্ঠের শলাকাস্থিখানাকে অঙ্গুলী পর্ব্বমধ্যে গণনা করিয়া লইলে তৎসংলগ্ন শলাকাস্থিখানাকে অঙ্গুষ্ঠের শলাকাস্থি বলিলে ঋষিবাক্য ঠিক থাকে বটে; কিন্তু কষ্টকল্পনা ও নিন্দুকের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এরূপ স্থলে বৃথা জল্পনা না করিয়া বরং প্রত্যক্ষের প্রতি আস্থা প্রকাশ করাই উচিত। চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৪ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মতে ৩৫ হইলেও নখগুলি বাদ দিলে ২৯ ও ৩০ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং গণনানুসারে আগম ও প্রত্যক্ষে কোন বিশেষ বিরোধ দেখা যাইতেছে না। এই উভয় সক্‌থিতে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং উভয়ে মিলিয়া ৬০ খানা অস্থি হইল।

এখন বাহুর কথা বলিব। বাহুতে অস্থিসংখ্যা সুশ্রুতের মতে ৩০, চরকের মতে ৩৪ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মতে ৩৫ খানা। এস্থলেও নখগুলি বাদ দিলে ২৯ ও ৩০ থাকে। এখানে আগম ও প্রত্যক্ষে একটু বিসম্বাদ হইবে।

১ম	বাহুপৃষ্ঠ বা প্রগণ্ড	এই অস্থিখানা আছে	১
২য়	কূর্পর, কফোণি—	জানুর মত এখানে একখানা অস্থি নাই। সুশ্রুত ইহার কথা বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই, কিন্তু চরক ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ে ইহার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং আগম ও প্রত্যক্ষে এখানে বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে।	০

৩য়	অরত্নি বা প্রকোষ্ঠ	এই দুইখানা অস্থিই বর্ত্তমান আছে	২
৪র্থ	মণিবন্ধ ও পাণিমণিকা	এই দুইখানা অস্থি বিদ্যমান আছে	২
৫ম	হস্তমূল		১
৬ষ্ঠ	শলাকা	৫টী আছে	৫
৭ম	অঙ্গুষ্ঠ	অঙ্গুষ্ঠের অস্থি ৩ খানা স্থলে	২
৮ম	অন্যান্য অঙ্গুলী	প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনখানা করিয়া	১২
৯ম	শলাকাবন্ধন	বিদ্যমান আছে	১
১০ম	কূর্চ্চ		২
			২৮
	ইহার অতিরিক্ত আরও দুইখানা ছোট অস্থি বিদ্যমান রহিয়াছে		২
			৩০

সুতরাং মোটে ৩০ খানা হইতেছে। এখানেও গণনানুসারে ঠিক হইলেও সন্নিবেশানুসারে ঠিক নাই।

এতাবতা বুঝা যাইতেছে, শাখাচতুষ্টয়ের মোট অস্থিসংখ্যা যে ১২০ খানি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ঠিক হইলেও ইহার সন্নিবেশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংস্কারের প্রয়োজন।

মধ্যশরীরে অস্থিগণনার পূর্ব্বে কয়েকটী কথা আছে। শ্রোণীফলক ও অংসফলকদ্বয় কার্য্যসূত্রে অধঃ ও উত্তর শাখাদ্বয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইলেও অধিষ্ঠানজন্য ইহাদের উল্লেখ মধ্য-শরীরাস্থির সহই হইয়াছে। কশেরুকাস্থিসমূহে রূপসাম্য থাকিলেও গ্রীবা ও মধ্যশরীর ভেদে ইহাদের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

কশেরুকার তিনটী নাম যথা—১। কশেরু বা কশেরুকা। ২। পৃষ্ঠবংশ। ৩। মেরুদণ্ড।

এতদ্ব্যতীত ইহার আর একটী অংশ আছে। তাহার নাম ত্রিক। পৃষ্ঠবংশাধরে ত্রিকং, (অমর) আমরা মেরুদণ্ডটীকে তিনটী ভাগ করিয়া অস্থিসংখ্যা গণনা করিব। যথা—
১। গ্রীবাস্থি। ২। পৃষ্ঠবংশ। ৩। ত্রিক—উত্তরত্রিক ও অধরত্রিক।

মধ্যশরীরের অস্থিগণনার আগমপ্রমাণ

সুশ্রুত			চরক		কণ্ঠাভরণদর টীকা	
৫	শ্রোণী		২	অক্ষক	২৪	পার্শ্বক
	গুদ	১	২	শ্রোণীফলক	২৪	„ ফলক
	নিতম্ব	২	১	মেঢ্রাস্থি, ভগাস্থি	২৪	„ অর্ব্বুদ
	ভগ	১	১	ত্রিক	৩০	পৃষ্ঠাস্থি
	ত্রিক	১	১	গুদ	৮	উরঃঅস্থি
৭২	পার্শ্বকাস্থি		৩৫	পৃষ্ঠগত	২	অক্ষক
	দক্ষ	৩৬	২৪	পার্শ্বক (দক্ষ)	২	অংসাস্থি

সুশ্রুত			চরক		অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকা
	বাম	৩৬	২৪	„ (বাম)	২ অংসফলক
৩০	পৃষ্ঠ		২৪	„ স্থালিক	৪ নিতম্ব
৮	উরঃ		১৭	বক্ষঃঅস্থি	১২০
২	অক্ষক		১৩১		
১১৭					

এখন আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিব। প্রথমে এই বক্ষঃভাগের অস্থি গণনা করা যাউক।

১ম—অক্ষক অস্থি দুই খানা ইহাতে দেখিতে পাইতেছেন— ২

২য়—বক্ষঃ-অস্থি ৮ খানার মধ্যে মাত্র ৩ খানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কের বক্ষোঽস্থি ছয় খানা থাকে এবং তাহার সহিত এক খানা তরুণাস্থির অস্তিত্ব সকলের দেহেই অনুভূত হয়। এই অস্থি খানার সাধারণ নাম বুকের কড়া। সুতরাং বক্ষোঽস্থি মোট—৭

মোট বক্ষঃভাগের অস্থি—৯

দ্বিতীয়তঃ পৃষ্ঠাস্থি—

১ম—অংশ ফলক দুই খানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে— ২

২য়—পৃষ্ঠবংশে সতর খানা— ১৭

৩য়—ত্রিক বা পৃষ্ঠবংশাধরে দুই খানা অস্থি দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেন কয়েক খানা অস্থি সংযোগে উত্তর ত্রিক এবং কতিপয় অস্থি সংযোগে অধর ত্রিক নির্ম্মিত হইয়াছে। অপরিণতবয়স্কের উত্তরাধর ত্রিকের অস্থিসংখ্যা যথা— উত্তর ত্রিক—৫ ও অধর ত্রিক—৪ = ৯

২৮

তৃতীয়তঃ শ্রোণীফলক—

শ্রোণীফলক } নিতম্বাস্থি } দক্ষ ও বামভেদে দুই খানা ২

চতুর্থতঃ পার্শ্বকাস্থি,—পর্য্যায় শব্দ—১। পার্শ্বক; ২। পর্শুক; ৩। পঞ্জর।

পঞ্জরাস্থি বা পর্শুক মোটে ২৪ খানা দেখা যাইতেছে, সুতরাং প্রতিপার্শ্বে ১২ খানা। আর্য্য ঋষিগণ পর্শুকার স্থূল গণনায় ২৪টী স্বীকার করিয়া ও এগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন।

(ক) পঞ্জর—অর্ব্বুদ—২৪ }
(খ) পঞ্জর—স্থালী—২৪ } সুতরাং এই মতে মোট পঞ্জরাস্থির সংখ্যা ৭২ খানা ঃ
(গ) পঞ্জর ২৪ }

এই মতটী প্রাচীন হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত নহে। অস্থির বৃদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে বস্তুতই পর্শুকাস্থি এক এক খানায় তিন খানা করিয়া হয়। তবে (ক) (খ) এই দুই খানা পঞ্জরাস্থিতে স্থালিকের অভাব থাকিলেও স্থূলগণনায় ইহা নিতান্ত দূষণীয় হয় নাই। এতাবতা পার্শ্বকাস্থির সংখ্যা ৭২ (বা ২৪) হইতেছে ; সুতরাং মধ্যশরীরে প্রত্যক্ষো-পলব্ধ অস্থি সংখ্যা—

অক্ষক	২		অক্ষক	২
বক্ষঃঅস্থি	৭		বক্ষঃঅস্থি	৪
অংশফলক	২		অংশফলক	২
পৃষ্ঠবংশ	১৭		পৃষ্ঠবংশ	১৭
ত্রিক	৯		ত্রিক	২
শ্রোণীফলক	২		শ্রোণীফলক	২
পর্শুক	৭২		পর্শুক	২৪
	১১১	বা		৫৩

উত্তমাঙ্গের অস্থিগণনার আগমপ্রমাণ

সুশ্রুত		চরক			অষ্টাঙ্গহৃদয়	
গ্রীবা	৯	...	১৫	...	১৩	...
কণ্ঠনাড়ী	৪	...	...	...	৪	...
হনু	২	...	১			...
দন্ত	৩২	...	৩২	...	৩২	...
নাসা	৩	...	৩	...	৩	...
তালু	১	...	২	...	১	...
গণ্ড	২	...	২	...	২	...
মস্তক	৬				৬	...
শঙ্খক	২	...	২	...	২	...
কর্ণ	২	দন্তোলূখল	৩২	...	৩২	...
	৬৩	শিরঃকপাল	৪	...	২	কর্ণ
		ললাট	২	...		
		জত্রু	২	...	১	...
		হনুবন্ধন	২	...	২	...
		অক্ষি	২	...	১০০	
			১০১			

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সুশ্রুতে গ্রীবাস্থি নয় খানা চরকে ১৫ ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে ১৩ খানা গণনা করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীবাস্থির পরিমাণ চরকে ৬ ও অষ্টাঙ্গে ৪ খানা অধিক। সুশ্রুতে কণ্ঠনাড়ী ৪ খানা, চরকে উল্লেখ নাই, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে ৪ খানা। হনু, সুশ্রুতে—২, চরকে—১, অষ্টাঙ্গে নাই। তালুঅস্থি সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে ১ খানা, চরকে ২ খানা, মস্তকের অস্থি বলিয়া চরকে উল্লেখ না থাকিলেও ললাটাস্থি সহ শিরঃ কপালাস্থি যোগে ৬ খানাই হয়। সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গে কর্ণাস্থি দুই খানার উল্লেখ আছে, চরকে নাই। সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গে অক্ষি কোটরাস্থির উল্লেখ নাই। সুশ্রুতে দন্তোলূখল, জত্রু, হনুমূলবন্ধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

সুতরাং চরকে ৩৮ খানা ও অষ্টাঙ্গে ৩৫ খানা অস্থির আধিক্যের উল্লেখ আছে। চরকে জত্রুগত অস্থি ২ খানা, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে এক খানা।

আগমপ্রমাণের মতদ্বৈধ পরিবর্ণিত হইল। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিতেছি।

ক—খ=শঙ্খকাস্থি দুই খানাই আছে ২

গ—ঘ=অক্ষিপ্রকোষ্ঠাস্থি দুই খানাই আছে ২

ঙ=ঘোনাস্থি (নাসিকার অস্থিবিশেষ নাম) এই তিন খানাই আছে ৩

চ—ছ, জ—ঝ — গণ্ডাস্থি প্রাচীন শাস্ত্রে দুই খানার কথা আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে ৪ খানা দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক গণ্ড দুই খানা অস্থির দ্বারা গঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই অতিরিক্ত দুই খানা অস্থি ও গণ্ডাস্থি মিলিয়া ৪ খানা অস্থি হইল। ৪

ঞ—হন্বস্থি সুশ্রুতের মতে দুই খানা, কিন্তু চরকের মতে এক খানা বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও চরকের বাক্যই সমর্থন করিতেছে। ১

ট—কণ্ঠনাড়ী অস্থি ৪ খানা, কণ্ঠনাড়ীর প্রথমসংখ্যক অস্থিখানা কঠিন; কিন্তু অন্য তিন খানা তরুণাস্থি। কণ্ঠনাড়ীর অস্থিসংখ্যা মোট ৪ খানা। ৪

ঠ=গ্রীবাস্থি ৮ খানা। গ্রীবাস্থি কশেরুকার অংশ হইলেও ইহা স্থানানুসারে গ্রীবাস্থি বলিয়া সংখ্যাত হইয়াছে। গ্রীবাস্থি কখন কখন ৭ খানাও দেখিতে পাওয়া যায়। ... ৮

১, ২ ললাটাস্থি—কপালাস্থি এখন এক খানাই দেখা যাইতেছে। শৈশবে এখানে দুই খানা অস্থি স্বতন্ত্র থাকে। তৎপর বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত ক্রমে জুড়িয়া যায়। আমরা প্রাচীন রীতি অনুসারে ইহার সংখ্যা ২ খানাই স্বীকার করিয়া লইতেছি। ২

৩, ৪, ৫, ৬, — শিরঃ কপাল=৪ খানা। ২ পার্শ্বে দুই খানা। পশ্চাদ্ভাগে অন্য দুই খানা অস্থি রহিয়াছে। তবে এই অস্থিদ্বয়ের সংখ্যার স্থিরতা থাকে না। কাহারও কাহারও শিরঃ কপালের পশ্চাদ্ভাগে অস্থি একখানা, কাহারও দুইখানা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এরূপ বিকল্প স্থলে প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিতেছি। ৪

৭, ৮—তাম্বস্থি—চরকের মতে ২ খানা, সুশ্রুতের মতে ১ খানা; প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে চরকমত গ্রহণ করিলাম। ২

দন্তগুলি যে অস্থি জাতীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহাদের নির্ম্মাণ ও প্রয়োজনানুসারে অস্থিশ্রেণী হইতে বাদ দিলে, বিশেষ ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু ইহাদিগকে অস্থিসংখ্যার সহিত গণনা করিলে বিশেষ দোষ হয় না। সুতরাং প্রাচীনমতে আমরা ইহাদিগকে অস্থি সংখ্যার সহিত গণনা করিলাম। ৩২

দন্ত উলূখল = সুশ্রুতে ইহার বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। চরক ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ে এইজন্য ৩২ খানা অস্থি অধিক সংখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে, হন্বস্থি অধর দন্তপংক্তির অধিষ্ঠান, উত্তর দন্তপংক্তির অধিষ্ঠান দুই খানা গণ্ডাস্থি। সুতরাং এস্থলে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে সুশ্রুতের মতই অবলম্বন করিতেছি।

কর্ণ অস্থি = কর্ণদ্বয় তরুণাস্থি নির্ম্মিত। এইজন্য এখন আর কঙ্কালের সহিত তাহা দেখা যাইতেছে না। তবে তরুনাস্থি যখন অস্থিরই অংশ, তখন ইহাদিগকে গণনা করাই উচিত।

কর্ণ অস্থি = দুইখানা ২

হনুমূলবন্ধন ও জত্রুতে অস্থি সংখ্যা ৪ খানা ইহা চরকের মত। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে এই মতের সমর্থন আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে সেই চারিখানা অস্থির অস্তিত্বে সন্দেহ হইতেছে বলিয়া এইস্থলে সংখ্যা নির্দ্দেশে পরিত্যক্ত হইল।

উত্তমাঙ্গের প্রত্যক্ষোপলব্ধ অস্থি-সংখ্যা

যথা—

শঙ্খক	২	২
অক্ষি	২	২
ঘোনা	৩	৩
গণ্ড	৪	৪
হনু	১	১
কণ্ঠনাড়ী	৪	১
গ্রীবা	৮	৮
ললাট	২	২
কপাল	৪	৪
তালু	২	২
দন্ত	৩২	০
কর্ণ	২	০
	৬৬	২৯

অস্থিসংখ্যা সমষ্টি

	চরক	অষ্টাঙ্গ	সুশ্রুত	প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ
শাখা	১৩৬	১৪০	১২০	১২০	১২০

	চরক	অষ্টাঙ্গ	সুশ্রুত	প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ
মধ্যশরীর	১৩১	১২০	১১৭	১১১	৫৩
উত্তমাঙ্গ	১০১	১০০	৬৩	৬৬	২৯
মোট	৩৬৮	৩৬০	৩০০	২৯৭	২০২

অস্থি সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দসংগ্রহ

১ম সূত্র।—বঙ্গভাষায় অস্থি সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদের সংহিতা গ্রন্থই প্রথম আলোচনা করিতে হইবে।

২য় সূত্র।—প্রাচীন অভিধানসমূহ আয়ুর্ব্বেদের অবিরুদ্ধ হইলে তৎ সংগৃহীত শব্দ ও প্রমাণ্য হইবে।

৩য় সূত্র।—বৈদিকসংহিতা, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, প্রাচীন স্মৃতি, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অয়ুর্ব্বেদের অবিরুদ্ধ শব্দ সংগৃহীত হইলে, তাহাও প্রামাণ্য হইবে।

৪র্থ সূত্র।—সঙ্কলন দ্বারা শব্দ না পাওয়া গেলে শব্দ গঠন করিতে হইবে।

৫ম সূত্র।—শব্দ গঠন করিতে হইলে প্রাচীন ধাত্বর্থের সহিত ভাষান্তর প্রচলিত শব্দের ধাত্বর্থ মিলাইয়া শব্দ গঠন করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ সূত্র।—ইহার অভাবে প্রচলিত বঙ্গভাষায় যদি সম্পূর্ণ ভাবব্যঞ্জক শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই শব্দ প্রামাণ্য হইবে।

৭ম সূত্র।—এই সমুদায়ের অভাবে অক্ষরান্তরিত করিয়া শব্দ গ্রহণ করিলে তাহাও প্রামাণ্য হইবে। অক্ষরান্তরিত শব্দ নাম ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইবে। এই কয়টী সূত্রানুসারে শব্দ সঙ্কলিত ও গঠিত হইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ভাষায় একই শব্দ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমূহে প্রযুক্ত হইতে পারিবেক।

আমি এই কয় সূত্রানুসারে শব্দ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

1 (ক) Upper Extremity = বাহু = (উত্তর শাখা)

(ক) Carpusbone = করমূলাস্থি *

(ক) Carpus = wrist মণিবন্ধ, পাণিমণি, করমূল, (পর্য্যায়) মণিবন্ধ ও পাণিমণি দুই খানা বিশেষ অস্থির নামকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। করমূল শব্দটী এই আট খানা অস্থির বাচকত্বে সুষ্ঠু প্রযুক্ত হইতে পারে।

(a) Do 1st Row (Upper) = উত্তরশ্রেণী

(b) Do 2nd Row (Lower) = অধরশ্রেণী

(a) (খ) Semiluner = মণিবন্ধ

(খ) Semiluner = (অর্দ্ধচন্দ্র) ইংরাজীতে নামটী অস্থির আকৃতি অনুসারে গৃহীত

* মণিবন্ধ (সুশ্রুত শা) পাণিমণি (চরক শা) হস্তমূল (অষ্টাঙ্গ শা)

হইয়াছে এই অস্থির বিশেষ নাম পাওয়া যায় না সুতরাং স্থান অনুসারে মণিবন্ধ গৃহীত হইল এই শব্দটী আয়ুর্ব্বেদের বহুস্থলে ব্যবহৃত আছে।

(a) (গ) Scaphoid = পাণিমণি ১

(গ) Scaphoid = (boat like) ইংরাজীতে আকৃতি অনুসারে। এখানে ও (খ) অনুসারে শব্দ সংগৃহীত হইল।

(b) (ঘ) Cuneiform = কূর্চ্চ †

(ঘ) Cuneiform(কীলকবৎ) আমরা এই অস্থির নামকরণে কূর্চ্চ শব্দ গ্রহণ করিলে কুচীর হাতল হইতে কতকটা সাদৃশ্য পাইতে পারি।

(b. 2) (3) Piseform = করভাস্থি ‡

(ঙ) Piseform ইংরাজী শব্দ আকৃতি অনুসারে গৃহীত। এই স্থানের নাম করভ, তদনুসারে নাম করণ হইল।

b. (চ) 3. Uniform 4. Magnum 5. Trapizoid, 6. Trapezeum

এই গুলি শলাকাধিষ্ঠান * *

(চ) 3. 4. 5, 6. (b) এই চারি খানা অস্থির নাম ইংরাজীতে আকৃতি অনুসারে গৃহীত। কিন্তু ইহারা অবস্থিতি অনুসারে শলাকাধিষ্ঠানরূপে পরিগণিত চরকে শলাকাধিষ্ঠান বলিয়া একটী শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্যাপক, এই জন্ত ১, ২, ৩, সংখ্যা দিয়া ইহার উক্ত নাম করা হইল।

2. Meta carpus = পাণিশলাকা $

Do. Ist
" 2nd
" 3rd
" 4th
" 5th

Dorsal Surface of hand = করপৃষ্ঠ বা পাণিপৃষ্ঠ

Palmar Do. Do. = করতল বা পানিতল

3. Phalanges = অঙ্গুলি-অস্থি

---

† কূর্চ্চ কূর্চ্চশীর্ষ ও কূর্চ্চশিরঃ শব্দ আভিধানিকগণের মতে বিভিন্নার্থবাচী। যথা—কূর্চ্চঃ ভ্রুবোর্ম্মধ্যং (অমর) কুঠিনং, শ্মশ্রু, কেশাদিকৃতমার্জ্জনী (মেদিনী) ক্ষিপ্রোপরিভাগঃ সতু অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মধ্যস্ত উপরি ভাগঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ। শীর্ষং (ধরণী) কূর্চ্চ শিরঃ অস্থি কন্দ (হেম) এতদ্ব্যতীত আরও মত আছে।

‡ মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্ত করভোবহিঃ। (অমর)

** চরক ... ... শারীর

$ হস্তশলা (চরক শা) (অষ্টাঙ্গধা)

Digital Extremities = অঙ্গুলি শাখা (?) = করশাখা

Do Row = অঙ্গুলি পর্ব্ব

Fore arm = প্রকোষ্ঠ বা প্রবাহু

(প্রকোষ্ঠ অমর মনুষ্যবর্গ) প্রবাহু—বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ৫ অধ্যায়।

(ছ) Radius = অরত্নি অস্থি।

(অমর—মনুষ্যবর্গ)

(ছ) Ray = Spoke of a wheel

অরা = Spoke of a wheel এই স্থানের নাম অরত্নি সুতরাং এই শব্দটী গৃহীত হইল।

(জ) Ulna = প্রকোষ্ঠাস্থি।

(অমর—মনুষ্যবর্গ)

(জ) Elbow সন্ধির নামানুসারে Ulna নাম হইয়াছে। প্রকোষ্ঠ শব্দ এই স্থানবাচক এই জন্য এই শব্দটী গৃহীত হইল।

Arm = বাহু

(ঝ) Humerus = প্রগণ্ডাস্থি,

প্রগণ্ড (অমর) বাহু (চরক) বাহুমূল (অষ্টাঙ্গ)

(ঝ) Humerus (Bone of arm) এই স্থানের নাম প্রগণ্ড। তদনুসারে নাম করা হইল। বাহুমূল ও বাহু শব্দ কখন কখন ভিন্নার্থীবাচীও হয়।

(ঞ) Lower Extremity = সক্থি, অধঃশাখা।

1. Tursus. = পাদমূলাস্থি

Do Ist Row = উত্তর শ্রেণী

Do 2nd Row = অধর শ্রেণী

Tursus, lat of the foot = সুতরাং ইহার অর্থ কোন রকমেই গুল্‌ফাস্থি হইতে পারে না, আমরা ইহারও নামকরণে প্রাচীন পাদমূলাস্থি শব্দ গ্রহণ করিলাম।

Ist Row.—Astragalus = পার্ষ্ণি

Astragulus, A Die like bone, ইহার আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া আমরা রাজ-নির্ঘণ্ট মতে "গুল্‌ফস্যাধোভাগে" এই অর্থ গ্রহণ করিয়া নামকরণ করিলাম। বিশেষতঃ চরকে এই নাম স্বীকৃত হইয়াছে।

Os Calsis = গুলক্

Os Calsis = calse the heel = এই অর্থ গ্রহণ করিলে গুলক্ই হয় তদনুসারে শব্দ গৃহীত হইল।

Naviculer = পাদমণিকাস্থি

Naviculer = Resembling a boat in form এইরূপ এক খানা অস্থি হাতেও

আছে। তাহার নাম Scaphoid, তাহার নাম হইয়াছে পাণিমণি। তদনুসারে ইহার নাম পাদমণিকাস্থি।

2nd Row :—Internal Cuniform = ১ম পাদশলাকাধিষ্ঠান।

Middle Cuniform—২য় পাদশলাকাধিষ্ঠান।

External Cuniform—৩য় পাদশলাকাধিষ্ঠান।

Cuboid—৪র্থ পাদশলাকাধিষ্ঠান।

৩ খানা Cuniform একখানা Cuboid Cuniform নাম অপেক্ষা শলাকাধিষ্ঠান নাম অধিক-দ্যোতক।

Metatarsus—প্রপদাস্থি বলিলে বিশেষ কোন দোষ না হইলেও দ্যোতক হয় না। তবে পাদাঙ্গুলীশলাকা বলিলে বেশ দ্যোতক হয়।

Metatarsus—পাদাঙ্গুষ্ঠশলাকা, পাদতর্জ্জনীশলাকা, পাদমধ্যমাশলাকা, পাদ-অনামাশলাকা, পাদকনিষ্ঠশলাকা।

পাদাঙ্গুলীর অস্থির বিশেষ নাম নাই। তাহা করাঙ্গুলীর মত গ্রহণ করিবে।

Femur—উরু অস্থি

Thigh—উরু

Knee—জানু

Patilla—অষ্ঠী (জানু অস্থি) (অমর)

Patilla (a small pan)—অষ্ঠী (আঠী)—বীজ (বীজবৎ) এই নামটী আরও দ্যোতক।

Tibia—জঙ্ঘাস্থি

Tibia (a pipe)—জঙ্ঘাস্থি নামকরণে বিশেষ দোষ হয় না।

Fibula—প্রসৃতি

Fibula (a clasp)—প্রসৃতি—এইটী জঙ্ঘার পর্য্যায়বাচীশব্দ, অথচ ইহার দ্যোতকার্থে জঙ্ঘাস্থির সহিত সম্বন্ধও বুঝা যায়।

মধ্যশরীর

আয়ুর্ব্বেদে Claviclesএর ঠিক প্রতিশব্দ—অক্ষক।

Clavicles—অক্ষক (সুশ্রুত, চরক)।

Sternum—বক্ষোঽস্থি

Sternum—"বক্ষোঽস্থি" (Sternum শব্দের ধাত্বর্থও বক্ষোঽস্থি) এই সংজ্ঞাটী বেশ দ্যোতক হয় নাই। ইহার বিশেষত্ববোধক একটী শব্দও পাই নাই। যদি সাধারণ প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা "শিওর" শব্দটী প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ইহা বিশেষ দ্যোতক হইবে সন্দেহ নাই।

Scapula—অংসফলক (অষ্টাঙ্গ)

Scapula—অংসফলক ; এইটী প্রতি শব্দ।

(a) Dorsal. } Vertibra. কশেরুকা
(b) Lumber. }

Dorsal Vertibra=(Dorsam—tbe back) সুতরাং পৃষ্ঠবংশ নামটী বেশ দ্যোতক হয়।

Lumber Vertibra (loin) এইটীর নাম কটীকশেরুকা বা কটীপৃষ্ঠবংশ করা যায়।

(a) Dorsal Vertibra=পৃষ্ঠবংশ

(b) Lumber—do—কটীপৃষ্ঠবংশ, কটীকশেরুকা (মেরুদণ্ড—দেশজ)

Vertibrum—ইহার প্রতিশব্দ তিনটী—পৃষ্ঠবংশ, কশেরুকা, (দেশজ—মেরুদণ্ড)। পৃষ্ঠবংশ শব্দটী বিশেষার্থবাচী করিয়া যদি কশেরুকা ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ভাল হয়।

Sacrum—ত্রিক বা উত্তরত্রিক (পৃষ্ঠবংশাধরে ত্রিকং—অমর)

Sacrum—ত্রিক, coccyx হইতে বিভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ ইহাতে উত্তর শব্দ যোগ করা যাইতে পারে, তবে Sacrumএর ধাত্বর্থ লইয়া গুহ্যাস্থি নামকরণ ভাল বোধ করিতেছি না।

Coccyx—অধর ত্রিক

Coccyx—coccyxএর ধাত্বর্থ লইয়া ইহার চঞ্চ্বস্থি বা কোকিল চঞ্চবস্থি নাম না দিয়া গঠন ও স্থান অনুসারে, অধরত্রিক বলিলে বিবৃতি ভাল হয় বলিয়া বোধ করি।

Os Innomimetum ইহার প্রতিশব্দ, শ্রোণীফলক বা নিতম্বফলক।

Os. Innominatum or } নিতম্ব ফলক—শ্রোণীফলক (চরক, অষ্টাঙ্গ)
Pelvis bone }

Rib—পঞ্জর, পর্শুকা, পার্শ্বক এই তিনটী প্রতিশব্দ। ইহার মধ্যে পঞ্জর শব্দ প্রচলিত বলিয়া গ্রহণ করা হইল।

Rib—পঞ্জর

Tuberosity of Rib—অর্ব্বুদাকৃতি—আলুসদৃশ বলা হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে।

Tuberosity of Rib—পঞ্জরার্ব্বুদ

Head of Rib—পঞ্জরস্থালী। আয়ুর্ব্বেদে পঞ্জরস্থালী শব্দটীর বিশেষ উল্লেখ আছে।

Head of Rib=পঞ্জরস্থালী

উত্তমাঙ্গ

Cranium—করোটী—শিরোঽস্থি

Occipital (against the head) সুতরাং অন্য বিশেষ নামের অভাবে পশ্চাৎ-করোটী করিলাম।

Cranium Occipital—পশ্চাৎকরোটী।

Cranium Parietal—পার্শ্বকরোটী

কোন কোন কঙ্কালের পশ্চাৎকরোটীর উপরে একখানা অস্থি অধিক থাকে, এই খানার নাম মধ্যকরোটী।

Parietal—(paries—a wall) পার্শ্বকরোটী করা হইল, কারণ অন্য বিশেষ নাম পাওয়া যায় নাই। মধ্যকরোটীর বিশেষ উল্লেখ পাইলাম না তবে কোন কোন কঙ্কালের করোটীতে যখন একখানা অধিক অস্থি আছে এবং আয়ুর্ব্বেদে অস্থিগণনায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন ইহার নামকরণে আবশ্যক। সুতরাং মধ্যকরোটীর উল্লেখ করিলাম।

Frontal—ললাটাস্থি—আয়ুর্ব্বেদে নামটী উল্লিখিত আছে।

Temporal—শঙ্খক প্রতিশব্দ।

Sphenoid—কণ্ঠ্যাস্থি।

Sphenoid (a wedge) কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণের স্থান এই অস্থির নিম্নভাগ, তদনুসারে ইহার নূতন নামকরণ কণ্ঠ্যাস্থি হইল।

Ethmoid—অনুঘোনাস্থি, অনুনাসাস্থি

Ethmoid—অবস্থিতি স্থানানুসারে অনুনাসাস্থি নামকরণ করা গেল।

Nasal—ঘোনাস্থি। আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব বোধক নাম।

Nasal = ঘোনাস্থি। (চরক)

Superior Maxillary—অধরগণ্ডাস্থি।

Superior Maxillary—আয়ুর্ব্বেদে দুই দিকে এক এক খানা করিয়া গণ্ডাস্থির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গণ্ডাস্থি ২ খানা করিয়া। সুতরাং ৪খানা গণ্ডাস্থির উত্তর ও অধর বিশেষণ দিয়া নামকরণ করা হইল। এই বিশেষণ অবস্থিতি স্থানানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।

Lachrymal—অক্ষিকোটরাস্থি, নেত্রাস্থি।

Lachrymal—নেত্রাস্থি বা অক্ষিকোটরাস্থি, আয়ুর্ব্বেদে উল্লেখ আছে। কিন্তু বিশেষত্ব বোধক নাম নাই।

Malar—উত্তরগণ্ডাস্থি।

Malar—উত্তর গণ্ডাস্থি, ইহার অবস্থিতি অধর গণ্ডাস্থির উপরে এবং গণ্ডের গঠনে এই অস্থির প্রয়োজন হয়।

Palate—তাল্বস্থি প্রতিশব্দ।

Inferior Turbinated—ঘোনামূলাস্থি। (মূর্দ্ধন্যাস্থি, অবস্থিতি অনুসারে)

Vomer—মধ্যঘোনাস্থি আয়ুর্ব্বেদে ঘোনাস্থি, তিন খানা—এই খানা পূর্ব্বোক্ত দুই খানার মধ্যবর্ত্তী।

Vomer—মধ্যঘোনাস্থি।

Iuferior Maxillary—হন্বস্থি প্রতিশব্দ।

Hyoid bone and others—আয়ুর্ব্বেদে এই স্থানের চারিখানা অস্থির নাম 'কণ্ঠনাড়ী অস্থি', তদনুসারে নামকরণ হইল।

Hyoid bone Thyroid bone Cricoid bone Epeglottis bone	কণ্ঠনাড়ী অস্থি।

আরও কয়েকখানা তরুণাস্থি আছে।

Cervical Vertibra—গ্রীবাস্থি গ্রীবাকশেরু।

Tooth—দন্ত।

Cartilage of the Pinna—কর্ণ অস্থি। ইহার বিশেষ নাম নাই। সুতরাং এই নামই করা গেল।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

যশোহরের ফৌজদার নূরউল্যা খাঁ ও মির্জ্জানগর*

বঙ্গের শেষ বীর স্বাধীন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে তাঁহার "সোনার যশোহর" মোগল বাদশাহের করতলগত হইল। রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কচুরায় "যশোহরজিৎ" নাম ধারণ করিয়া মোগল-অনুগ্রহ-প্রসাদ ভিখারী রাজস্বরূপে যশোহর রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। কচুরায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় তাঁহার ভ্রাতা চাঁদরায় যশোহর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। চাঁদরায়ের পর তাঁহার পুত্র রাজারাম এবং তৎপর রাজারামের জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ রাজা হইলেন। রাজা নীলকণ্ঠের আমলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামসুন্দর সম্পত্তি বিভাগ জন্য প্রস্তাব করেন এবং তজ্জন্য যশোহর রাজবংশের আত্মীয় কুটুম্ব ও কর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শক্রতা গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন—এই গৃহবিবাদ সূত্রেই যশোহরের রাজবংশ দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। গৃহবিবাদ ব্যতীত রাজবংশের পতনের অন্য কারণও ছিল।

* Stewart's History of Bengal ; A Report of the District of Jessore, by J Westland.

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্; শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর "বঙ্গীয় সমাজ", নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, সেনহাটীর ইতিবৃত্ত ও যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের "রাজা সীতারামরায়"।

সরফরাজ খাঁ নামক এক ব্যক্তি নীলকণ্ঠের পিতা রাজারামের সময় হইতেই যশোহরের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দরের বিবাদ সময়ে সুবিধা পাইয়া এই মুসলমান কালে বিশিষ্ট বিত্তশালী হইয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ অন্নদাতা প্রভুদিগের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ জনশ্রুতি ছিল যে, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কর্তৃক যশোহর প্রতিষ্ঠাকালে শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদের বিস্তর ধনরাশি তাঁহাদের হস্তগত হয়—প্রতাপাদিত্যের সময়েও দেশবিদেশের বহু লুণ্ঠিত ধনরাশি যশোহরের রাজকোষ কুবের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল। এই ধনবত্তার খ্যাতিপ্রযুক্ত যশোহর বঙ্গের তদানীন্তন মুসলমান সুবাদারগণের এবং মগ ও বর্গী দস্যুবর্গের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল।

এই সময়ে সম্রাট্ শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা সুবা বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা টোডরমল্ল বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রথম বন্দোবস্ত ও সুলতান সুজা দ্বিতীয় বন্দোবস্ত করেন। দ্বিতীয় বন্দোবস্তের ফলে যশোহরের রাজারা বিস্তর সম্পত্তিচ্যুত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। যশোহরের শাসনদণ্ড তখন দুর্ব্বলহস্তে পতিত, সুতরাং রাজপুরুষ ও দস্যুগণের অত্যাচার নিবারণ যশোহর রাজাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছিল, খলমতি প্রধান কর্ম্মচারী সরফরাজ খাঁ স্বীয় উন্নতির আশায় দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের সহিত যোগদান করিয়া নানাপ্রকারে যশোহর রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে যশোহরের রাজগণ সুবাদারের উৎপীড়নে, কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় এবং দস্যুর উপদ্রবে দিন দিন নিঃস্ব ও দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন—ইহার উপর রাজা নীলকণ্ঠের সময় কালীগঞ্জ এবং বসন্তপুরের নিকট সাহেবখালী নামক খাল উন্মুক্ত হওয়ায় প্রতাপাদিত্যের সাধের রাজধানী, যশোহরের প্রান্ত-বর্ত্তিনী যমুনা ইছামতী মজিয়া গিয়া লবনাম্বুসমাগমে যশোহরের জলবায়ু নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠায় রাজা নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দর যশোহর পরিত্যাগপূর্ব্বক আধাঁরমাণিকগ্রামে গুরুদেবের আশ্রয়ে গমন করেন। রাজভ্রাতৃদ্বয় যশোহর ত্যাগ করিলে সরফরাজ খাঁ নবাব উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন—সেই সময় তাঁহার নামানুসারে প্রতাপা-দিত্যের লীলাস্থানকে 'পরগণা সর্পরাজপুর' নামে পরিবর্ত্তিত করেন। রাজা নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যশোহর ত্যাগ করায় সেই অঞ্চল প্রধানতঃ নীচশ্রেণীর মুসলমান ও অন্যান্য ইতর জাতীয় কৃষি-জীবীর বাসস্থানে পরিণত হয়—নবাব সরফরাজ খাঁকেও অল্প দিন মধ্যে সেই নগর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ এই সময়ে বঙ্গের সুবাদার ছিলেন—ঢাকায় তাঁহার রাজধানী ছিল। সুবাদার নিজে ঢাকায় থাকিতেন এবং দেশের শাসন-সৌকর্য্যার্থে সুবা বঙ্গদেশকে কতিপয় চাকলায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক চাকলায় এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। ফৌজ-দারগণ সুবাদারের অধীন থাকিয়া নিজ নিজ চাকলা শাসন করিতেন। যত দিন যশোহরের যশোহরের রাজগণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, ততদিন যশোহর চাকলার জন্য ফৌজদারের আবশ্যকতাই ছিল না। যশোহরের রাজগণই যশোহর চাকলার শাসন করিতেন, কিন্তু গৃহবিবাদ ফলে

যশোহরের রাজগণ ক্ষমতা ও বিত্তশূন্য হইয়া যশোহর ত্যাগ করিলে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ নূরউল্যা খাঁ নামক তদীয় একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া যশোহর চাকলায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখন যশোহর নগর নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তিনি তৎপরিবর্ত্তে যশোহরের অদূরে স্বীয় নামানুসারে নূরনগর গ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক তথায় ফৌজদার নূরউল্যা খাঁ নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। জলবায়ু পরিবর্ত্তনই যশোহর পতনের মূল কারণ ছিল। নূরনগরও যশোহরের নিকটবর্ত্তী থাকা প্রযুক্ত ক্রমে তত্রত্য জলবায়ুও দূষিত হইয়া উঠায় নূরনগরও বাসস্থানের অযোগ্য হইয়া পড়িল। এই জন্য নূরউল্যা খাঁ নূরনগরের পরিবর্ত্তে মির্জ্জানগরে তাঁহার এলাকার সদর করিয়াছিলেন। সাধারণে ফৌজদার নূরউল্যাকে নবাব নূরউল্যা খাঁ বলিত। নূরউল্যা খাঁ যশোহরের ফৌজদার নামে অভিহিত হইলেও তিনি কার্য্যতঃ যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত-ফৌজদার ছিলেন।

নূরউল্যা যে সময়ে ফৌজদার হইয়া আসিলেন তাহার পূর্ব্ব হইতেই নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতায় যশোহর সরকারের প্রজাবর্গ বড়ই অশান্তি ও উদ্বেগে কাল কাটাইতেছিল—তাই প্রথমেই নূরউল্যা রাজ্যসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুঁড়ার জমিদারদিগের মূলপুরুষ মন্ত্রণাকুশল রামভদ্ররায় নূরউল্যার দেওয়ান ছিলেন। রামভদ্রের পরামর্শে ও জামাতা লাল খাঁ এবং হিসাবনবিশ রাজারাম সরকারের সহকারিতায় ফৌজদার নূরউল্যা অতি অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নূরউল্যা তিন-হাজারী-মনসবদার ছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধ, বিগ্রহ, সৈন্য, সামন্তের ধার বড় ধারিতেন না—অধিকাংশ সময়ই কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকর ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া শান্তশিষ্টভাবে দিন কাটাইতেন। ফৌজের ভার তাঁহার জামাতা লালখাঁর হস্তেই ছিল, কিন্তু ভগবান্ কাহারও অদৃষ্টেই নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি লিখেন নাই।

১১০৭ হিজিরায় (১৬৯৫-৯৬ খৃঃ) চেতো বরোদার জমীদার শোভাসিংহের সহিত তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের বিবাদ উপস্থিত হইল। শোভাসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণরামের সহিত আটিয়া উঠিতে না পারায় তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর শরণাপন্ন হয়েন। পাঠানেরা চিরদিনই মোগলের শত্রু, সুতরাং রহিম খাঁ এ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হৃদয়ে মোগল রাজ্য-ধ্বংস-বাসনা গুপ্ত রাখিয়া তিনি শোভাসিংহের সাহায্যার্থে সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সম্মিলিত সৈন্য বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে রাজা কৃষ্ণরাম সসৈন্যে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে নিহত করত বিদ্রোহী সৈন্য রাজ-প্রাসাদ অধিকার করিয়া সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করিলেন—রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরায় ব্যতীত রাজপরিবারবর্গের অন্যান্য সকলেই বন্দী হইলেন। রাজকুমার জগৎরায় কোন প্রকারে পলাইয়া ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর নিকট সমস্ত অবগত করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ এই ঘটনা সামান্য মনে করিয়া যশোহরের ফৌজদার

নূরউল্যা খাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের জন্য এক পরোয়ানা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফৌজদার নূরউল্যা যশোহর আসিয়া সৈন্য সামন্ত হইতে ব্যবসা বাণিজ্যেই অধিক মনোনিবেশ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সুবাদারের পরোয়ানা পাইয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। সুবাদারের হুকুম তামিল না করিলেও উপায় নাই—তাই বহুচেষ্টায় যাহা কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়াই সাহসে ভর করিয়া যশোহর হইতে বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু হুগলী পর্য্যন্ত পৌছিয়াই শুনিলেন বিদ্রোহীদল সেই দিকেই আসিতেছে। এ সংবাদে ফৌজদার অন্ধকার দেখিলেন—তাঁহার যেটুকু সাহস ছিল তাহাও লোপ পাইল। তাড়াতাড়ি হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইয়া নূরউল্যা চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। বিদ্রোহিগণ দূরে থাকিয়া ফৌজদারের অবস্থা সমস্ত বুঝিতে পারায় এবং বণিক সেনাপতি হইতে তাহাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই দেখিয়া সতেজে আসিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল। ফৌজদারসাহেব বিষম বিপদ গণিয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করিবার জন্য বড়ই ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,—হুগলীর কেল্লায় থাকাও নিরাপদ মনে করিলেন না—অবশেষে রাত্রিকালে গোপনে নৌকা যোগে গঙ্গা পার হইয়া যশোহর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহিগণ হুগলী অধিকার করিল।

হুগলীর ব্যাপারে ফৌজদার নূরউল্যা বুঝিতে পারিলেন যে এখন আর অন্যের হস্তে সৈন্য সামন্তের ভার থাকিলে তাঁহার ফৌজদারী গদি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁ অধীনস্থ সৈন্যগণের সাহায্যে দেশ মধ্যে অবাধ অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার করিতে থাকায় ফৌজদার সাহেব পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন, তাই হুগলীর পরাজয়ে সৈন্যগণের অকর্ম্মণ্যতা হেতু ধরিয়া লালখাঁর হস্ত হইতে সৈন্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

যশোহর—চাঁচড়ার—তদানীন্তন রাজা মনোহররায়ের সহিত নূরউল্যার বিশেষ সখ্যতা ছিল। উভয়ে উভয়ের বিপদ আপদে, সুখে সম্পদে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। বঙ্গের গৌরব রাজা সীতারাম মনোহর ও নূরউল্যার সমসাময়িক। কেহই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না—অথচ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহসও তাঁহাদের ছিল না। দিগ্বিজয় ব্যপদেশে সীতারাম সমুদ্রতীরবর্ত্তী রামপাল নামক স্থানে গমন করিলে সুযোগ পাইয়া নূরউল্যা ও মনোহর তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। সম্মিলিত সৈন্য সবেগে আসিয়া রাজধানীর অদূরবর্ত্তী বুনাগাতি নামক স্থানে ছাউনী করিল। সীতারামের রাজধানী অরক্ষিত ছিল না—দেওয়ান যদুনাথের উপরই সমস্ত ভার ছিল। বিরুদ্ধ পক্ষীয় সৈন্যগণের আগমন সংবাদ পাইয়াই দেওয়ান সসৈন্যে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। দেওয়ানের ক্ষিপ্রকারিতা, কৌশল ও সাহস দেখিয়া রাজা ও ফৌজদার বিপদ গণিয়া রাত্রি যোগেই সসৈন্যে বুনাগাতি ত্যাগ করিলেন। রামপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সমস্ত জ্ঞাত হইয়াই কাল বিলম্ব না করিয়া শত্রুদমনে ধাবিত হইলেন। রাজসৈন্য মনোহরের রাজধানী চাঁচড়ার অনতিদূরস্থিত ভৈরব নদীর তীরবর্ত্তী নীলগঞ্জ আসিয়া পৌছিল। সসৈন্য সীতারামকে

রাজধানীর এত নিকটে দেখিয়া ধন, প্রাণ ও মান ভয়ে অনন্যোপায় হইয়া মনোহর সীতারামের শরণাপন্ন হইলেন। বন্ধুবৎসল মনোহর সম্ভবতঃ ফৌজদার সাহেবের জন্যও সীতারামকে অনুনয় বিনয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখানে সীতারামের সহিত মনোহর ও নূরউল্যার এক সন্ধি হইল—কিন্তু সন্ধি হইলে কি হইবে? ইঁহারা সর্ব্বদাই সীতারামের পতনের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফৌজদার নূরউল্যা কতদিন জীবিত ছিলেন বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। তবে তিনি যে বহুদিন ধরিয়া ফৌজদারী শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন, জনপ্রবাদ ও বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষ অবিসংবাদেই তাহা প্রমাণ করিতেছে।

নূরউল্যার পর তাঁহার পুত্র মীরখলিল যশোহরে ফৌজদার হইলেন। দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যা নামক দুই পুত্র রাখিয়া ফৌজদার মীরখলিল উপযুক্ত সময়ে মানবলীলা সংবরণ করেন। পিতার মৃত্যু সময়ে দায়েমউল্যা ও কায়েমউল্যা উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তৎকালীন রাজবিধানানুযায়ী তাঁহারা কেহই ফৌজদারী গদী পাইবার অধিকারী হয়েন নাই। ভ্রাতৃদ্বয় সাবালক হইলে অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ লইয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদের ফলে ভ্রাতৃযুগল পরস্পর পরস্পরের হস্তে নিহত হন। দায়েমউল্যা হিদায়তউল্যা ও কায়েমউল্যা রহমৎউল্যা নামক এক একটি পুত্র রাখিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে ভ্রাতৃযুগল বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে আহূত হইয়াছিলেন। বঙ্গের তদানীন্তন সুলতান সুজা খাঁ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করায় বা সম্যক্ মনোযোগ না দেওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ভ্রাতৃযুগল মির্জ্জানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা কিছু দিন সংসার চালাইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া চাঁচড়ার রাজগণও অনেকদিন তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে চাঁচড়ার রাজপরিবারের অবস্থা হীন হওয়ায় তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মমত ভ্রাতৃযুগলের খরচ চালাইতে অক্ষম হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। অবশেষে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আপনাদের অবস্থা জানাইয়া পেনসনের প্রার্থনা করিয়া ভ্রাতৃযুগল যশোহরের তদানীন্তন কালেক্টার সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সহৃদয় কালেক্টার সাহেবের অনুরোধে ও চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট ভ্রাতৃযুগলের প্রত্যেককে মাসিক ১০০৲ টাকা পেনসন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—কিন্তু দুঃখের বিষয় পেনসন মঞ্জুর হইয়া আসিতে না আসিতে হতভাগ্য হিদায়তউল্যা মানবলীলা সংবরণ করেন; তাঁহার অদৃষ্টে আর পেনসন ভোগ হইল না। রহমৎউল্যা জীবনের শেষ চারি বৎসর মাত্র পেনসন ভোগ করিয়া কতকটা শান্তিতে থাকিতে পারিয়াছিলেন। হিদায়তউল্যা ও রহমৎউল্যার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

মির্জ্জানগর।

নূরনগরের জল বায়ু দূষিত হইলে ফৌজদার নূরউল্যা মির্জ্জানগরে তাঁহার সদর বাসস্থান

নির্দ্দেশ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই মির্জ্জানগর এবং ইহার অনতিদূরস্থিত আধুনিক ত্রিমোহানী গ্রামে ফৌজদারের বাসস্থান, কেল্লা, বন্দীশালা ও ইমামবাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নবাব বাড়ী।

ত্রিমোহানীর অর্দ্ধমাইল দূরে—কেশবপুর যাইবার রাস্তার পার্শ্বে—বহুদূরব্যাপী ইমারত ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ আছে। লোকে ইহাকেই নবাব বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। নবাব বাড়ীর ভিতর সম-চতুষ্কোণ দুইটী চত্বর বা প্রাঙ্গণ আছে। প্রাঙ্গণদ্বয় একটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত। উত্তরপ্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণপ্রাঙ্গণের দক্ষিণেও উত্তরপ্রাচীর বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণদ্বয়ের পূর্ব্বদিকে দুই সারিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়—গৃহ গুলির ছাদ খিলান করা, খুব সম্ভবতঃ এই গৃহগুলিতে ফৌজদার সাহেবের ভৃত্যবর্গ বাস করিত। এই সমস্ত গৃহের ভিতর ব্যতীত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। উত্তর প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকেই ফৌজদার সাহেবের নিজের বাসগৃহ—ইহার ছাদে তিনটী গম্বুজ আছে। গৃহের স্থাপত্যসম্পদ জীর্ণ হইলেও গম্বুজশোভিত ছাদটী এখনও বর্ত্তমান। ফৌজদার সাহেবের বাসগৃহের সম্মুখেই প্রাঙ্গণে একটী চৌবাচ্চা আছে—চৌবাচ্চাটী ইষ্টক ও প্রস্তর দিয়া বাঁধান। এই চৌবাচ্চার জলে ফৌজদার-পুরমহিলাগণ স্নানাদি করিতেন। নগরপ্রান্ত-বাহিনা ভদ্রানদী হইতে যে, কৌশলপূর্ব্বক জল উত্তোলন করিয়া ভৃত্যবর্গের বাসগৃহের ছাদের উপর দিয়া চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হইত এবং স্নান অবগাহনান্তে ঐ জল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীযোগে বাহির করিয়া দেওয়া হইত, তাহার অনেকটা নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।*

গোরস্থান।

দক্ষিণ প্রাঙ্গণে কয়েকটী কবর দৃষ্ট হয়—বহির্ব্বাটীতেও কয়েকটী কবর আছে।

কিল্লাবাড়ী।

নবাব বাড়ীর এক মাইল দক্ষিণে নূরউল্যার কিল্লাবাড়ী বা গড়। এই স্থানটী ৬।৭ হাত উচ্চ। সম্ভবতঃ গড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত "মতিঝিল" নামক গড়খাই হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া এই স্থানটী উচ্চ করা হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস এই উচ্চ ভূমিখণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্নই নাই। গড়টী দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিম মুখী এবং পূর্ব্ব দিকেই ইহার সদর দরজা ছিল। গড়ের মুখ তিনটী কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া শুনা যায়—ইহার দুইটী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোফোর্ট (Mr. Beaufort) লইয়া গিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকে বলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী কামান দ্বারা কতকগুলি বেড়ি প্রস্তুত করেন এবং অন্যটী দ্বারা রাস্তা মেরামতের সময় রোলারের [Roller] কাজ করান হইত। শুনিয়াছি শেষোক্ত কামানটী যশোহরের একটী ভদ্রলোক মাত্র তিন টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় কামানটি এখনও নাকি গড়ের নিকটবর্ত্তী কোন এ—

* ভদ্রানদী বর্ত্তমান মজিয়া গিয়াছে, কিন্তু নূরউল্যার সময়ে উহার বহতা ছিল।

ধান্তক্ষেত্রে পতিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এ কামানটী "দেবঅংশী" হইয়াছে. এক সময়ে তিনশত কয়েদী ও একটী হস্তী বহুচেষ্টা করিয়াও নাকি কামানটী উত্তোলন বা স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। কামানটী লৌহনির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ৩॥০ হস্ত পরিমাণ।

বন্দীশালা।

কিল্লাবাড়ীর সদর দরজার অনতিদূরে বাহির দিকে সারি সারি কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত আঁধার কোঠা আছে—ইহাই ফৌজদারের জেলখানা। জেলখানা সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের ভিতর দিক্‌টা এত মসৃণ যে কয়েদিগণের কোন প্রকারেই দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিয়া পলাইবার সুযোগ বা সাধ্য ছিল না।

ইমামবাড়ী।

ত্রিমোহানী বাজারের নিকটেই ফৌজদারের ইমামবাড়ী বা উপাসনালয়। এই উপাসনালয়ে কখনও ছাদ ছিল কিনা সন্দেহ। একটী উচ্চ জমীর উপর একটী দেওয়াল এবং দেওয়ালের পূর্ব্বদিকেই একটী লম্বা বেদী ছিল, স্থান দেখিলে এই রূপই অনুমান হয়। ভগবদ্ভক্ত ফৌজদার বেদীতে উপবেশন করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া নমাজাদি করিতেন, দেওয়ালের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়।

উপরি বর্ণিত ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে নানালোক নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলে মুর্শিদাবাদের জনৈক নবাব সাময়িক বাসের জন্য এই স্থানে প্রাসাদ ও কিল্লাদি নির্ম্মাণ করিয়া অবসর সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা নবাববাড়ী ও কিল্লাবাড়ী ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলে, কিশোর খাঁ নামক একজন অতি দুর্দ্দান্ত মুসলমান জমীদার এখানে ছিলেন—এ সমস্তই তাঁহার বাড়ীঘর কিল্লা ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র। যশোহর আদালতে সরকারি নথী-পত্র দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে এ প্রদেশে বাস্তবিকই কিশোর খাঁ নামক একজন মুসলমান জমীদার ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জমীদারী যশোহরের দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলে এই কিশোর খাঁ নূরউল্যা খাঁর জামাতা লাল খাঁর বংশধর।

মির্জ্জানগরে আসিয়া নূরউল্যা খাঁ ফৌজের ভার তাঁহার জামাতা লালখাঁর হস্তে দিয়া তিনি নিজে ব্যবসা বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নবীন যুবক লাল খাঁ অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড়ই অত্যাচারী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িলেন—ক্রমে তাঁহার নৈতিক চরিত্রও কলুষিত হইয়া উঠিল। লাল খাঁর উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারে গৃহস্থ বধুগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ফৌজদারের কাণে একথা পৌছিল, কিন্তু তিনি প্রথমে তাহাতে বড় মনোযোগ করিলেন না, কিংবা দুর্দ্দান্ত লালখাঁকে শাসন করার ক্ষমতা ও সাহসও তখন বুঝি তাঁহার ছিল না। কোন বাধা না পাইয়া লাল খাঁর অত্যাচার চরমে উঠিল। অবশেষে ফৌজদারের প্রিয় ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাজারাম সরকারের বিধবা কন্যা সুন্দরীর উপর লাল খাঁর পাপদৃষ্টি পড়িল। ছলে বলে সরকার ঝিকে বাধ্য করিবার জন্য পিশাচ লাল খাঁ বিধিমতে চেষ্টা পাইল'

কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। দুর্দ্দান্ত পশু লাল খাঁর ক্রোধ ও জেদ বাড়িয়া গেল এবং অবশেষে সুন্দরীর বৃদ্ধ পিতা রাজারামকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে লাগিল। এইবার ফৌজদার সাহেবের আসন টলিল, তিনি বিশেষ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পশু-প্রকৃতি লালখাঁকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। লালখাঁর ঔরসে নূরউল্যার কন্যার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। লালখাঁর নির্ব্বাসনের পর ফৌজদার সাহেব নিজ শিশু দৌহিত্র বহরাম খাঁকে কিছু জমীদারী দিয়া ঐখানেই রাখিয়াছিলেন—ক্ষুদ্র জমীদার কিশোর খাঁ এই বহরাম খাঁরই পুত্র। আমরা একে একে ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং স্থানীয় ও দূরবর্ত্তী জনপ্রবাদ এবং কিম্বদন্তী অবলম্বনে নূরউল্যা খাঁ ও মির্জ্জানগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ইতিহাসের কতটুকু সত্য কতটুকু কল্পিত, জনশ্রুতির কতটুকু গ্রহণীয় সে মীমাংসা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, যাহা দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি, অবিকৃতভাবে এস্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। শেষ বিচারভার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের হস্তে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

বরিশালের গ্রাম্য-গীতি

বরিশাল জেলার গ্রাম্য লোকেরা তৎপ্রদেশীয় গ্রাম্য ভাষায় রচিত গীতাদি অনেকেই গাইয়া থাকে। এই সকল গান তাহাদেরই স্বরচিত। এই সকল গানে গ্রাম্য ভাষা স্ফুরিত হইতেছে। এ জেলায় খেয়াল, কবি, জারী, সাইর (সারি), রয়ানী (পদ্মাপুরাণ), গাজি কীর্ত্তন প্রভৃতি গীত হইয়া থাকে। এই সকল বিশুদ্ধ ভাষায় হয় না, গ্রাম্য ভাষায়ই হয়। মুসলমানেরাও পদ্মাপুরাণ গাইয়া থাকে। হিন্দুর দেব দেবীচরিত্র বিষয়ক গীতাদিও অনেক মুসলমান কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের গৃহে গাজি-কীর্ত্তন ও মহম্মদ-কন্যা ফতেমা বিবি ও জামাতা হজরত আলি প্রভৃতির দেব-চরিত্রবিষয়ক গীতাদিও হইয়া থাকে। নৌকা-দৌড়ের সময় এ জেলায় জারী, সারি বা সাইর নামক গীত শুনা যায়। পদ্মাপুরাণ গানকে এ প্রদেশে রয়ানী বলে। পদ্মাপুরাণ আষাঢ়ের সংক্রান্তি হইতে শ্রাবণের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহই গীত হয়, তা ছাড়া ইহা সময় বিশেষেও হইয়া থাকে।

"হোড়ি" বা "হোলি" নামক এক প্রকার গান প্রচলিত আছে। উহা কেবল দোলের সময়ই হইয়া থাকে। দোল-পূর্ণিমার মাসাধিক পূর্ব্বে হইতে আরম্ভ হইয়া দোলের কিছুদিন পর পর্য্যন্তও গীত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু এবং মুসলমানেরা বড় প্রীতির সহিত গাইয়া থাকে। এই সকল গীত সকলই কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক। উপস্থিতবক্তা কবিগণ এই সকল গান যখন তখন প্রস্তুত করিয়া দেয়। দুই দল বাঁধিয়া গানেতেই সওয়াল জবাব হইয়া থাকে। আধুনিক

সভ্যতা বা বর্ত্তমান অন্নচিন্তায়, কর্ম্মচিন্তায় মানুষের অবসর মাত্র নাই, তজ্জন্য গ্রাম্য কবি ও গ্রাম্য গীতিসমূহের বাহুল্য ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

এই সকল গান ব্যতীত উদাসীনদিগের গানও আছে। তাহা কৃষ্ণপ্রেম বা কালীবিষয়ক। এতদ্ব্যতীত মেয়ে মহলে মেয়েদের কর্ত্তৃক কতকগুলি গান গীত হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই পুরুষ রচয়িতা, কোন কোনটী বা মেয়ে রচয়িত্রী।

গ্রাম্য গীত।

তোমেজদ্দিরে মুল্লুকে মোরে রেইখনা।

লালমতির খাড়ু পায়,
ঝামুর ঝুমুর বাজে,
তাহা দেখ্যা তোমেজদ্দি
ফাকুর ফুকুর আসে।
(তোমেজদ্দিরে)

লালমতি রান্ধে ভাত,
কলার ফাতরা দিয়া;
তোমেজদ্দি চাইয়া রইছে
বেড়ার ফাকা দিয়া।
(তোমেজদ্দিরে)

লালমতি ভাত খায়
গলায় বাজল কাঁড়া,
তাহা দেখ্যা তোমেজদ্দি,
কালীরে মানে পাডা।
(তোমেজদ্দিরে)

শব্দার্থ।

তোমেজদ্দি—তমিজদ্দি, একজন মুসলমানের নাম। মুল্লুকে—পৃথিবীতে
রেইখনা—রাখিওনা। লালমতি—স্ত্রীলোকের নাম। খাড়ু—পায়ের অলঙ্কার।
ঝামুর ঝুমুর—অলঙ্কারের শব্দ। বাজে—বাদ্য হয়।
দেখ্যা—দেখিয়া। ফাকুর ফুকুর—ফেক্ ফেক্। আসে—হাসে।
রান্ধে—রন্ধন করে। ফাতরা—শুষ্ক পাতা। চাইয়া—চাহিয়া।
ফাকা—ফাক। বাজলো—বিন্ধিল। কাঁড়া—কাটা।
মানে—মানস করে। পাডা—পাঁটা।

এই গানটী সাধারণ মুসলমান পরিবার বিষয়ের ঘটনা অবলম্বনে মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত। মুসলমানেরা হিন্দুর দেবতাকে পূজা দিত, এ গানে তাহারও বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। এখনও অনেক স্থানের মুসলমানেরা হিন্দুর দেবতাকে পূজা দিয়া থাকে। মুসলমানের দেবতাকে হিন্দুগণের পূজা দেওয়া বিরল নহে। মুসলমান ও হিন্দুতে সদ্ভাব চিরপ্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ গ্রাম্য-

দিতে সে সদ্ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কুচক্রীর কুমন্ত্রণায় সে ভাবের অসদ্ভাব হইয়া আসিতেছে। উপরের লিখিত গানটীর সুর দিতে পারিলাম না, ইহা গ্রাম্য সুরে গীত হইয়া থাকে।

শিব-বিবাহ

দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়ক গীত।

১

নারদ মণি বীণা করেতে,
বীণায় হরিগুণ গান করিতে,
উপনীত হয় গিরি পুরেতে,
বলে ধন্য ধন্য ধন্যা রাণী এককন্যা
ধরেছ গর্ভেতে ;
জামাই এনেছি তোমার সাক্ষাতে।
সে যে দেবের দেব ভব মৃত্যুঞ্জয়,
ইচ্ছা হয় কি মনেতে।

২

শুনে গিরি রাণী মুখে দেয় বসন
বলহে ওহে তপোধন,
জামাই এনেছ অতি সুলক্ষণ,
(ও) তার পাকা দাড়ী চুল
নিশাতে আকুল,
ঢুলু ঢুলু করে দুই নয়ন।
চান্ বদনে নৈরা গিছে দশন।
হৈল সতীর ভাগ্যে জামাতা যুগ্য
অতি নব্য পঞ্চানন।

৩

তার সর্ব্ব অঙ্গে ছাই মাখিছে
গলেতে দিছে ফণিহার।
কটি ভরা ব্যাঘ্র চর্ম্ম
মাথায় জটা ভার।
(ও) তার বয়েস হয়েছে
শতেকের উপরে,
(ও) হেটে যেতে ঢুলে পড়ে
বৃষোপরে আরোহণ করে।
(ও) তার হস্ত পদ ক্ষীণ শরীর জীর্ণ,
যেন গুলুম হয়েছে উদরে
জামই দেখে প্রাণ কান্দে ডরে
যখন আলাম বলে ভাবলে কি হবে
যার যার কপালে করে।

শব্দার্থ।

মণি—মুনি। গর্ভেতে—গর্ত্তে। তপধন—তপোধন। লৈয়া গেছে—লয়ে গিয়াছে।

বয়েস—বয়স। 　　গুলুম—গুল্মরোগ, উদরস্ফীততারোগ।

আলাম মুসলমান-রচয়িতার নাম।

এই গানটী আলাম নামক মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত। মুসলমানেরা হিন্দুর দেবদেবীসংক্রান্ত গান প্রস্তুত করিত ও তাহা গান করিত, আলামের গানে প্রমাণিত হইতেছে। আলাম বরিশালবাসী। এখনও অনেক্ স্থানের মুসলমানেরা ঐরূপ গীতাদি রচনা করিয়া গান করে। এখনও বরিশালে এরূপ অবস্থা বিরল নহে। উক্ত গানটী দক্ষ যজ্ঞবিষয়ক। এই আলাম কর্ত্তৃক রচিত কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক আর একটী গান প্রদত্ত হইল। এই গানটীতে যেখানে "যার যার" শব্দ আছে, সে স্থলে "যার তার" হইলে যেন ভাল হয়। যেমন পাইয়াছি তেমনই লিখিলাম।

কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক গীত

কুটিলে কয় আয়ান দাদা,
তোমার কাছে কই :
(ও) বউর কুচরিত্র জানাব কই,
দুঃখের কথা কার কাছে কই,
কাল গুণেতে সই।
তাতে লাগ্‌ল ঘটক, বিষম ঘটক,
চোরের ঘটক, কুট্‌না ঘটক
ওই দেখ ওই।
ললিতা বিশাখা বিন্দার সঙ্গেতে,
(ও) বউ পাতিয়া লইছে সই।
বউ রান্না ঘরে কান্না করে
কথায় কথায় রাগ ,
উহার চোখেতে রাগ, মুখেতে রাগ,
ধর্ম্মেতে রাগ, কর্ম্মেতে রাগ,
প্রতি কাজে রাগ,
আমার প্রার্থনা কিছু কিছু রাখ্‌
(ও) বউর কাটিয়া দে গিয়া নাক্‌।
আমি ভাল বাসি মন্দ বাসি,
অন্ত—(অ) রে বাসি,
জানে সব নগরবাসী (ই)
করে বাঁশি।
(ও) বউ বাসিকর্ম্ম করে বাসি,
কোন্ খানে ফুকরে বাঁশি,

যবন আলাম বলে এ গকুলে
সেই বাঁশি
(ও) রাইর কলঙ্কের বাঁশি।

কই—কহি, বলি। জানাব কই—জানাব কোথায়। সই—সহ্য করি।
লাগল—লাগিল। কুটনা—কুমন্ত্রী। গড়িয়া—ঘটনা করিয়া।
লইছে—লইয়াছে। সই—স্ত্রী বন্ধু। রাগ—ক্রোধ, কোন স্থলে অনিচ্ছাও হইবে।
বাসি—পূর্ব্ব দিনের। গকুলে—গোকুলে।

এই কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক গানটীও আলাম নামক মুসলমান কর্ত্তৃক রচিত। আলাম কর্ত্তৃক রচিত এই উভয় গানই বেশ ভাবব্যঞ্জক। এই গান দুইটীতে গ্রাম্য ভাষা বড় বেশী লক্ষিত হয় না। বহুল গ্রাম্য শব্দবিমিশ্রিত গীতাদি বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

পরিষদ্-গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাতে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৬৫০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাকে প্রকৃতি করিয়াই বিজয়পণ্ডিতী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১৷৷০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১৷০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা—৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বক্তৃতা—৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগ ৷০

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর যক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীপর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

৺রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৷৷০ বার আনা মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন।

৮। গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রাচীন পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পলতিকায় ভগবল্লীলা সম্বন্ধে মহাজন পদাবলী যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে গৌরাঙ্গলীলাসম্বন্ধে মহাজন ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে যতগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে, সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জগদ্বন্ধু বাবু এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিদূর্দ্ধ, পঞ্চদশ শত প্রাচীন পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৮০।৮৫ জন পদকর্ত্তার পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে আছে। ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকাংশে পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় ব্যতীত মহাজন পদ-সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু এই পুস্তক সঙ্কলনের জন্য বীরভুম, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক অপ্রকাশিত পদ এবং অনেক কীর্ত্তনীয়া এবং টহলদারের নিকট শুনিয়া অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ উপায়ে সংগৃহীত পদাবলী গায়ক পাঠকের সুবিধার জন্য ভগবল্লীলার ন্যায় গৌরাঙ্গলীলার বিবিধ অবস্থাভেদে তরঙ্গে এবং প্রতি তরঙ্গে বিবিধ উল্লাসে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৭৫০ এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবল মাত্র ২৲ টাকা। গুরুদাস বাবুর দোকানে ও মজুমদার লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

(পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অভাব-মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষা আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুঁথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পরিষৎ-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্দ্দশ ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

শ্রী[illegible] মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৪

পরিষদ্-গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাতে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালায় বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৮৫০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাকে প্রকৃতি করিয়াই বিজয়পণ্ডিতী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১৷০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা—৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বক্তৃতা—৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। — প্রতি ভাগ ৷৹

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর যক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীপর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

৺রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৷৹ বার আনা মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন

বঙ্গদেশের ভূমিকম্প

(প্রথম ভাগ)

অনেকের বিশ্বাস যে, যে সমস্ত কারণে ভূকম্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে, আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু ইটালিতে ও জাপানে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে জনসাধারণের এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। যে সমস্ত নৈসর্গিক উপায়ে ভূকম্প সংঘটিত হয় তন্মধ্যে গঠন সম্বন্ধীয় ও ক্ষয় সম্বন্ধীয় কারণ অত্যন্ত বলবান্।

কোনও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষের লিপিবদ্ধ যাবতীয় ভূকম্প আলোচনা করিয়া ভূকম্প হিসাবে ইংরেজশাসিত ভারত-সাম্রাজ্যকে নিম্নলিখিত দ্বাদশটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছেন[১] :—

১। আফগানিস্থান ও উত্তর বেলুচিস্থান
২। উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ (কাশ্মীর, কুমায়ুন ও নেপাল)
৩। পঞ্চনদ
৪। যুক্তপ্রদেশ
৫। পশ্চিমভারত
৬। ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপ
৭। সিংহল প্রদেশ
৮। পূর্ব্ব হিমালয়, আসাম ও নিম্নবঙ্গ
৯। আরাকান ও ব্রহ্মপ্রদেশ
১০। মালয় উপদ্বীপ
১১। বঙ্গোপসাগর
১২। ভারত মহাসাগর

আমরা সাধারণতঃ বঙ্গদেশ বলিলে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের যে অংশকে বুঝিয়া থাকি, তাহা উপরোল্লিখিত চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম প্রদেশ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিশেষভাবে অষ্টম প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী। এই দ্বাদশ প্রদেশের মধ্যে অষ্টম প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং পৃথিবীস্থ ভূকম্পোপযোগী যাবতীয় স্থানের অন্যতম একটী। নিম্নের তালিকাতে দেখা যায় যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৭১৪২ টি ভূকম্পের উল্লেখ আছে এবং এই সমস্ত কম্প ৪৫৭টি কেন্দ্রে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই ৭১৪২টি কম্পের মধ্যে এক অষ্টম প্রদেশই ৫৯৭১টি কম্পের জন্য দায়ী ও ৪৫৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭৬টি কেন্দ্র এই প্রদেশে অবস্থিত। আয়তন

(১) Mem. G. S. I vol xxxv pt 4.

অনুসারে ধরিতে গেলে ষষ্ঠ প্রদেশেই ভূকম্পের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বলা বাহুল্য যে এই দুই প্রদেশের গঠনের বিভিন্নতাই ভূকম্পের এই অসমান বিস্তৃতি সম্বন্ধে সহায়তা করিতেছে।

ভূকম্পের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

প্রদেশের ক্রমিক সংখ্যা	কেন্দ্রোর্দ্ধস্থান	ভূকম্পের সংখ্যা
১	৯	২৫০
২	২৯	২৬০
৩	৭	১৯
৪	১৩	১৮৫
৫	৩৩	১২২
৬	৪০	৯০
৭	৬	১১
৮	২৭৬	৫,৯৭৩
৯	১৯	৬৫
১০	৩	১৪
১১	৬	১২৫
১২	৪	৫
অনির্দ্দিষ্ট	১২	২৩
	৪৫৭	৭১৪২

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার টি, ওল্ডহাম কর্ত্তৃক লিখিত যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে প্রায় ৪০০ শত কম্পের উল্লেখ আছে।[২] এই তালিকাতে অপেক্ষাকৃত অত্যল্প ভূকম্পের সংখ্যার কারণ এই যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর অনুকম্পের (aftershock) বিবরণ সংগ্রহের জন্য যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, সেরূপ চেষ্টা আর ইতঃপূর্ব্বে কখনও করা হয় নাই। একটী বৃহৎ ভূমিকম্প হইলে ছোট ছোট অনেক কম্প তৎপশ্চাতে হইয়া থাকে। অনেক সময়ে এই সমস্ত অনুকম্প অতি দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ১৮১১-১২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রিদে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, এপর্য্যন্ত সেই ভূমিকম্পজাত অনুকম্পের নিবৃত্তি হয় নাই।[৩] মধ্যে মধ্যে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখের জগৎ প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের জের এখনও মিটে নাই। সিমলা প্রভৃতি স্থান হইতে আজকাল যে সমস্ত ভূমিকম্পের সংবাদ

(২) A catalogue of Indian earthquakes from the earliest time to the end of A. D. 1869 (Mem G. S. I. vol xix pt 3)

(৩) Earthquake by Dutton, 1904.

পাওয়া যায় সে গুলি কাংড়া উপত্যকা হইতে উৎপন্ন ১০০৫ খৃষ্টাব্দের কম্পের সহিত সংশ্লিষ্ট।[৫] অষ্টম প্রদেশে ৫৯৭৩টি কম্পের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৫৫২৩টি[৫] ১৮৯৭-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ঘটে। বোধ হয় শিলং প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত কম্পলেখক যন্ত্র আছে সেই গুলি যদি অধিকতর কার্য্যোপযোগী হইত এবং ঐরূপ আরও কতিপয় স্থানে কার্য্যক্ষম কম্পলেখক যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে উক্ত কম্প সংখ্যার পরিমাণ আরও অধিকতর রূপে দৃষ্ট হইত।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত ভূকম্প হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত একাদশটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(ক) ১২১০ সনে যে একটি কম্প হয় তাহা বঙ্গদেশেও অনুভূত হইয়াছিল এবং উহাতে কুতবমিনরের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়।[৬]

(খ) ১২২৬ সনে বঙ্গদেশে একটী কম্পের উৎপত্তি হয়। এই কম্পের ফলে আল্লাবাঁধের উদ্ভব হয়।[৭]

(গ) ১২৪০ সনে নেপাল প্রদেশে একটী কম্প হইয়া ঐ প্রদেশের বিস্তর ক্ষতি করে। বঙ্গদেশেও তাহা অনুভূত হইয়াছিল।[৮]

(ঘ) ১২৪৯ সনে সীমান্ত প্রদেশে একটী কম্পের উদ্ভব হয়। এই ভূতরঙ্গ বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।[৯]

(ঙ) ১২৬৫ সনে ব্রহ্মদেশে একটী ভূকম্পের উৎপত্তি হয়। এই কম্প বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এই ব্যাপারে রাম্‌রি ও চেদুবা দ্বীপদ্বয়ের সন্নিকটবর্ত্তী কোনও দ্বীপ এককালে অদৃশ্য হইয়া যায়।[১০]

(চ) ১২৭৫ সনে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামপ্রদেশে একটী ভূকম্প বিশেষভাবে অনুভূত হয়।[১১]

(ছ) ১২৮৫-৮৬ সনে সীমান্তপ্রদেশে একটী কম্প হইয়াছিল। বঙ্গদেশে এই কম্প অনুভূত হয় নাই।

(জ) ১২৮৮ সনে বঙ্গোপসাগর, মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশব্যাপী এক ভীষণ কম্প উত্থিত হয়। ইহাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের বিশেষ ক্ষতি হয়।[১২]

(৪) Rec G. S. I. Vol xxxii pt 4.
(৫) Mem. G. S. I. vol xxx pt I.
(৬) Mem. G. S. I. vol xix. pt 3. p 11.
(৭) Lyell's Principles of Geology.
(৮) J. A. S. B. ii এবং xii.
(৯) J. A. S. B. xii.
(১০) Mem. G. S. I vol xix. pt. 3. p. 37.
(১১) Mem. G. S. I. vol xix. pt 1.
(১২) Rec. G. S. I. vol xviii. pt. 2

(ঝ) ১২৯২ সনে বঙ্গদেশে ও আসামে একটী বেশ বিস্তৃত ভূকম্প হইয়াছিল।[১৩]

(ঞ) ১৩০৪ সনে বঙ্গদেশ ও আসামে একটী জগৎপ্রসিদ্ধ ভূকম্প সংঘটিত হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্পের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কোনটিরই ধ্বংসকার্য্য ও বিস্তৃতি এই ভূমিকম্প অপেক্ষা অধিক ছিল না।[১৪]

(ট) ১৩১১ সনে কাংড়া উপত্যকাতে একটী কম্পের উৎপত্তি হয়। এই কম্পও বঙ্গদেশে অনুভূত হইয়াছিল।[১৫]

ব্রিটিশ এসোসিয়েসন যে ভূমিকম্পের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন[১৬] তাহাতে উল্লেখ আছে যে ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সভ্যজগতের প্রায় সর্ব্বত্র একটী ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাঃ ওল্ডহাম তাঁহার তালিকাতে এই কম্প সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ কি? সেই তালিকাতে ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে (৬৯৬-৬৯৭ সন) প্রায় সমস্ত জগৎব্যাপী একটী কম্পের উল্লেখ দেখা যায়—কিন্তু ডাঃ ওল্ডহাম এ কম্প সম্বন্ধেও কিছুই বলেন নাই। এই দুইটীর বিষয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত ভূকম্পসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল।

১-৩২। ১০৭১-১০৭২ সনে ঢাকা হইতে ৭ দিন ব্যবধান এমন একটী স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই কম্প ৩২ দিন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই ভূমিকম্পের স্থান ও তারিখ সমূহের স্থির নির্দ্দেশ নাই।

৩৩। ১১৪৪ সনের ১৯শে আশ্বিন সোমবার রাত্রিতে কলিকাতা নগরীতে একটী ভূমিকম্প হয়। এই ভূকম্প ও একটী প্রবল ঝটিকা একই সময়ে হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরেজ বণিকদের কাগজ পত্রে এইস্থান Golgotta নামে অভিহিত হইত। প্রবল ঝড় ও ভীষণ ভূমিকম্প এতদুভয়ের একত্র সংযোগে বণিকদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। এই ভীষণ ব্যাপারে ২০০ শত গৃহ এবং ইংরেজ ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ চূড়া ভূমিতে পতিত হয়, কিন্তু ইহা ভাঙ্গে নাই। ইহাতে অনেক জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং শুনা যায় যে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হইয়াছিল।

৩৪। ১১৬৮ সন ১৮ই চৈত্র সোমবার বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে একটী ভূকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পের কেন্দ্রস্থল সম্ভবতঃ বঙ্গোপসাগরে ছিল। ইহাতে চট্টগ্রামের (ইসলামবাদের) বিশেষ ক্ষতি হয়। সূক্ষ্ম বালুকাকণা ও কর্দ্দমযুক্ত জল ফোয়ারার ন্যায় উঠিয়াছিল ও চট্টগ্রামের নিকটে ৬০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান একেবারে সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হয়। এই কম্পের ফলে ২টী আগ্নেয় ফাটের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। লোকের সাধারণ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা

(১৩) Rec. G. I. vol xviii p. 156 এবং p. 200.

(১৪) Rec. G. S. I. vol XXX; Mem G. S. I. vol XXIX. Vol XXX pt I. এবং Vol XXXV pt 2.

(১৫) Rec. G. S. I. vol XXXII pt 4.

(১৬) Brit. Ass. Rep. Vols 22. এবং 23.

এই যে, অপর কোনও প্রাকৃতিক ঘটনায় আগ্নেয়ফাটে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঢাকা ও কলিকাতা এতদুভয় স্থানেও এই কম্পের বিস্তৃতিবিষয়ের উল্লেখ আছে। ঢাকাতে হঠাৎ এত বেগে জল বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতে অনেক নৌকা ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত ও এককালে বহুজীবননষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতাতে এই কম্প ১০ মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। বোধ হয় অনেকগুলি কম্প উপর্য্যুপরি প্রায় ১০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল—একটী মাত্র কম্প ১০ মিনিটকাল স্থায়ী হইলে সে অত্যন্ত ভীষণ অবস্থা। কলিকাতার জলাশয় সমূহের জল ছয় ফিট উচ্চে উঠিয়াছিল।[১১]

৩৫। ১১৬৯ সনের ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময়ে কলিকাতাতে একটী ভূকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পে বিশেষ কোনও অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই।

৩৬। ১১৭১ সনের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার গঙ্গাতীরে একাধিক তীব্র কম্প হইয়াছিল। ইহার ফলে অনেক গৃহ ও অনেক জীবন বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, স্থান বিশেষের উল্লেখ নাই।

৩৭। ১২০৭ সনের ৫ই কার্ত্তিক রবিবার আসামে একটী ভীষণ ভূকম্প হয়। এই কম্প একমিনিট স্থায়ী হইয়াছিল।

৩৮। ১২১০ সনের ১৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ১ ঘটিকা ৩৫ মিনিটের সময় কলিকাতায় একটী ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল। মথুরা, কুমায়ুন, শিরমুর, গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থলেও এই কম্প অনুভূত হয়। দিল্লীর কুতবমিনরের উর্দ্ধাংশ এই কম্পে নষ্ট হয় বলিয়া সকলে অনুমান করেন। জেনারেল কানিংহামের মতে এই তারিখের একমাস পূর্ব্বের কোনও কম্পে কুতবমিনরের সেই অংশ নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই শেষোক্ত তারিখে কোনও কম্পের উল্লেখ নাই।

৩৯। ১২১৫ সনের ২রা বৈশাখ বুধবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে একটী ভূকম্প হইয়াছিল।

৪০। ১২১৫ সনের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা ৪০ মিনিটের সময় দিনাজপুরে একটী ভূকম্প অনুভূত হয়।

৪১। ১২১৬ সনের ২৯ চৈত্র রবিবার কলিকাতা, দমদম, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে ছয় সেকেণ্ড কাল স্থায়ী একটী কম্প হয়।

(মন্তব্য—ডাঃ ওল্ডহাম্ এই সময়ে ২টী কম্পের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটির গতি উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং অপরটির গতি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব্বে। ইহাদের প্রথমটি ছয় সেকেণ্ডকাল ও দ্বিতীয়টি ৩০ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী ছিল। আমাদের বোধ হয় দ্বিতীয় কম্প প্রথমটির প্রতিফলিত কম্প ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।)

১১) Rec G. S. I. vol XI p. 190 এবং J. A. S. B. vol X p. 433.

৪২-৪৪। ১২১৭ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি ৯ ঘটিকা ৪৫ মিনিটের সময়ে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ৩ বার কম্প হইয়াছিল।

৪৫। ১২১৭ সনের ২০শে মাঘ শুক্রবার রাত্রি ২ ঘটিকা ২০ মিনিটের সময় কলিকাতাতে অনেকগুলি কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

৪৬। ১২২৩ সনের ২৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার কলিকাতায় কতিপয় মৃদুকম্পের আবির্ভাব হইয়াছিল।

৪৭। ১২২৩ সনের ২৯শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার রঙ্গপুরে ভীষণ আকারের কম্প দৃষ্ট হয়।

৪৮। ১২২৬ সনের ৩রা আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৬-৪৫-৫০ সেকেণ্ডের সময় কচ্ছপ্রদেশে একটী ভীষণ ভূতরঙ্গের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি ভূকম্প হইয়াছে এটী তাহাদেরই অন্যতম। এই কম্প কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের লোকেও অনুভব করিয়াছিল। আল্লাবাঁধ এই ভূকম্পের ফল।[১৮]

৪৯। ১২২৬ সনের ২০ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার দারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে একটী ভূকম্প হয়।

৫০। ১২২৭ সনের ১৮ই পৌষ রবিবার নোয়াখালিতে একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

৫১। ১২২৮ সনের ২২ শে চৈত্র বুধবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা, যশোহর বহরমপুর, ভাগলপুর, গয়া প্রভৃতি স্থানে একটী কম্প দৃষ্ট হয়।

৫২—৫৩। ১২২৯ সনের ১লা ভাদ্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতাতে উপর্য্যুপরি ২টি ভূমিকম্প হইয়াছিল। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতয়টি অধিকতর ভীষণ এবং উভয়টাই ৩০ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী ছিল।

৫৪। ১২২৯ সনের ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতাতে অনেকগুলি ভূমিকম্প হয়।

৫৫। ১২৩০ সনের ১২ই অগ্রহায়ণ বুধবার দিবা ১২ ঘটিকা ১০ মিনিটের সময় কলিকাতাতে একটী কম্প দৃষ্ট হইয়াছিল।

৫৬-৫৭। ১২৩১ সনের ২৩ শে পৌষ বুধবার ময়মনসিংহে ২টী কম্প দেখা গিয়াছিল। প্রথমটি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা ও দ্বিতীয়টি রাত্রি ১২ ঘটিকার সময়ে ঘটে।

৫৮-৬১। ১২৩১ সনের ২৬শে পৌষ শনিবার ময়মনসিংহে ১টী ও কুমিল্লাতে ৪টী কম্প হয়।

(মন্তব্যঃ—ডাঃ ওল্ডহাম্ ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার কম্প পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় একই কম্প উভয়স্থানে অনুভূত হইয়াছিল)

(১৮) Lyell's Principles of Geology ; The Face of the Earth (das Antlitz der Erde) translated by Sollas ; Mem. G. S. I. vol XXV111 pt 1.

৬২। ১২৩৩ সনের ৭ই মাঘ শুক্রবার ১১ ঘটিকা ২২ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডের সময় কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে একটী কম্প উত্থিত হয়।

৬৩-৬৬। ১২৩৫ সনের ২৬ শে আষাঢ় মঙ্গলবার ময়মনসিংহে ৪ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। প্রায় সেই সময়ে কলিকাতাতেও ৩টী কম্প হইয়াছিল।

(মন্তব্যঃ—ডাক্তার ওল্‌ডহাম ময়মনসিংহ ও কলিকাতার কম্প পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—বোধ হয় ইহা ঠিক হয় নাই)

৬৭-৬৮। ১২৩৫ সনের ৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকা ১৫ মিনিটের সময় কলিকাতাতে ২টী কম্প দৃষ্ট হয়।

৬৯-৭২। ১২৩৫ সনের ২৪ আশ্বিন বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে ঢাকা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে উপর্য্যুপরি ৪টী কম্প হইতে দেখা গিয়াছিল।

৭৩। ১২৩৬ সনের ৩রা আশ্বিন শুক্রবার কলিকাতাতে একটী কম্প হইয়াছিল।

৭৪-৭৬। ১২৩৭ সনের ১লা পৌষ বুধবার বৈকাল ৪ ঘটিকা ৫০ মিনিটের সময় চট্টগ্রামে উপর্য্যুপরি ৩ বার ভূমিকম্প হয়।

৭৭-৭৮। ১২৩৭ সনের ২রা পৌষ দিবা ১০ ঘটিকার সময়ে চট্টগ্রামে ২টী কম্প হইয়াছিল।

৭৯-৮৩। ১২৩৭ সনের ৩রা পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭ই পৌষ শুক্রবার পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে ৫ বার কম্প অনুভূত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৭ই পৌষ যে কম্প হয় সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম।

৮৪-৮৬। ভারতবর্ষে যে কয়েকটী অতি বিস্তৃত ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে ১২৪০ সনের ১১ই ভাদ্রের কম্প তাহাদের অন্যতম; বোধ হয় নেপালরাজ্য এই কম্পের কেন্দ্রস্থল। এই সময়ে কলিকাতা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থলেও ৩ বার করিয়া কম্প হইতে দেখা যায়।

৮৭। ১২৪০ সনের ১৯শে আশ্বিন শুক্রবার নেপালরাজ্য হইতে উদ্ভূত একটী কম্প মুঙ্গের, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে।[১৯]

৮৮। ১২৪০ সনের ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার মুঙ্গের, কলিকাতা ও চট্টগ্রামে একটী কম্প অনুভূত হয়।

৮৯-৯০। ১২৪১ সনের ২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার ও ৭ই শ্রাবণ সোমবার রঙ্গপুরে ২টী কম্প হয়। কম্পের ফলে মাটিতে ফাট হইয়াছিল, ঐ ফাট হইতে ধূম নির্গত হয় এবং তৎপরে ফাট বন্ধ হইয়া যায়।

৯১। ১২৪২ সনের ১২ই মাঘ রবিবার চন্দননগর, শুকসাগর প্রভৃতি স্থানে একটী কম্প দৃষ্ট হইয়াছিল।

---

(১৯) J. A. S. B. vol II p. 364.

৯২। ১২৪৬ সনের ২৯ শে বৈশাখ রবিবার প্রাতে জামালপুর (ময়মনসিংহ), কুমার-খালি প্রভৃতি স্থানে একটী কম্প দেখা গিয়াছিল।

(*মন্তব্য—১২৪৮ সনের ফাল্গুন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে একটী ভীষণ ভূকম্প হইয়াছিল—কিন্তু বঙ্গদেশে সে কম্পের তরঙ্গ আসে নাই।)

৯৩। ১২৪৯ সনের ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে ৯ ঘটিকা ১০ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প হয়। তদানীং পাটনাতেও একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।[২০]

৯৪। ১২৪৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বঙ্গদেশে একটী ভূমিকম্প হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে স্থান বিশেষের কোন উল্লেখ নাই।

৯৫। ১২৪৯ সনের ৩রা আশ্বিন রবিবার (দিবা) ৪½ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প হইয়াছিল।

৯৬। ১২৪৯ সনের ৮ই কার্ত্তিক রবিবার চট্টগ্রামে একটী ভূমিকম্প হয়।

৯৭-৯৯। ১২৪৯ সনের ২৭শে কার্ত্তিক শুক্রবার শিবপুর কোম্পানির বাগানে ৩ বার কম্প হইতে দেখা যায়। ইহাদের একটী কলিকাতা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে।

১০০। ১২৫০ সনের ২৬শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ৪।৩০ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিঙ্গ, পাটনা, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থলে একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।[২১]

১০১-৩। ১২৫২ সনের ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যূষ ৪।৩০ মিনিটের সময় শ্রীরামপুর ও কলিকাতাতে ৩টী ভূমিকম্প হয়।

১০৪। ১২৫২ সনের ১২ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময়ে শ্রীরামপুরে একটী কম্প হয়। এই কম্প উত্তরদিক হইতে আসিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

১০৫। ১২৫২ সনের ২৩শে শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ১১।৩০ মিনিটের সময় শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুরে একটী কম্প হয়। কথিত আছে যে এই কম্পের পর মেদিনীপুরের কসাই নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১০৬-১২৫। ১২৫৩ সনের ২রা কার্ত্তিক শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে অন্যূন ২০ বার ভূকম্প হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ৩রা কার্ত্তিক দিবা ২।১৫ মিনিটের সময় একটী অতি ভীষণ কম্প হয় এই কম্প ঢাকা, কলিকাতা এবং শ্রীরামপুরে অনুভূত হইয়াছিল। ঢাকাতে সমস্ত ইষ্টক গৃহগুলি ফাটিয়া গিয়াছিল।

১২৬। ১২৫৪ সনের ২৩শে বৈশাখ বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে কলিকাতায় একটী ভূমিকম্প হয়।

(২০) J. A. S. B. vol xii. p 277.

(২১) J. A. S. B. vol xiv. p. 605.

১২৭। ১২৫৫ সনের ৯ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে কলিকাতাতে ভূমিকম্প হয়।

১২৮। ১২৫৫ সন ১৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় একটী কম্প হইয়াছিল।

১২৯। ১২৫৫ সন ১০ই মাঘ সোমবার প্রাতে ৮-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতায় মৃদু-কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

১৩০। ১২৫৫ সন ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার দার্জ্জিলিঙ্গে বেশ একটী বড় রকমের কম্প হইয়াছিল।[২২]

১৩১। ১২৫৭ সন ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কম্প হইতে দেখা যায়। এই কম্পের ফলে উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কিয়ৎ পরিমাণ জমি বসিয়া গিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

১৩২। ১২৫৭ সনের ২৫শে পৌষ বুধবার চট্টগ্রামে ২০ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী একটী কম্প হইয়াছিল। এই কম্প ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং কলিকাতাতেও সকলে অনুভব করিয়াছিল।

১৩৩। ১২৫৭ সনের ২৮শে মাঘ রবিবার কলিকাতাতে একটী কম্প হইয়াছিল।

১৩৪। ১২৫৭ সনের ৬ই ফাল্গুন সোমবার কলিকাতাতে একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

১৩৫। ১২৫৮ সনের ২৮শে মাঘ সোমবার বেলা ১।৫৫ মিনিটের সময় কলিকাতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে মৃদুকম্পন হয়।

১৩৬। ১২৫৯ সনের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে দার্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প অনুভূত হয়।

১৩৭। ১২৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রাতে ৪।৩৭ মিনিটের সময় ঢাকাতে ১৫ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী একটী কম্প হইয়াছিল।

১৩৮। ১২৬৪ সনের ৪ঠা চৈত্র মঙ্গলবার বাকেশ্বরে একটী কম্প অনুভূত হয়।

১৩৯-৪১। ১২৬৫ সনের ১০ ভাদ্র বুধবার ব্রহ্মদেশে একটী ভীষণ ভূকম্পের উৎপত্তি হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অনেকস্থানেই এই কম্পের অনুভূতি হয়। এই সময়ে চট্টগ্রামেও ৩ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল।

১৪২। ১২৬৭ সনের ৬ই ফাল্গুন কলিকাতা, বালিগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে একটী কম্প হয়। এই সমস্ত স্থানে দীঘির জল পূর্ব্বদিকে এক ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল ও পশ্চিমদিকে সেই পরিমাণে নিম্নে নামিয়া গিয়াছিল।

১৪৩। ১২৬৮ সন ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মৃদুকম্প হয়।

১৪৪। ১২৬৯ সন ৫ আষাঢ় বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মৃদুকম্প হইয়াছিল।

১৪৫। ১২৬৯ সন ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে দার্জ্জিলিঙ্গে মৃদুকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

১৪৬। ১২৬৯ সন ১৭ই চৈত্র রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে দার্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প সংঘটিত হইয়াছিল।

---

(২২) Hooker's Himalayan Journal, i p. 376.

১৪৭-১৪৮। ১২৭০ সন ২৫শে আষাঢ় বুধবার দার্জিলিঙ্গে ২ বার কম্প হয়।

১৪৯। ১২৭০ সন ২৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার দার্জ্জিলিঙ্গে কম্প হইয়াছিল।

১৫০। ১২৭০ সন ৬ই ভাদ্র শুক্রবার দার্জ্জিলিঙ্গে কম্প হইয়াছিল।

১৫১। ১২৭০ সন ১লা কার্ত্তিক শনিবার দার্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

১৫২। ১২৭০ সন ২২শে পৌষ মঙ্গলবার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে একটী কম্প দৃষ্ট হইয়াছিল।

১৫৩। ১২৭১ সন ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার পাটনা ও দার্জ্জিলিঙ্গে একটী কম্প অনুভব করা গিয়াছিল।

১৫৪। ১২৭২ সন ২৫শে ভাদ্র শনিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় দার্জিলিঙ্গে একটী কম্প হয়।

১৫৫। ১২৭২ সন ২রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দার্জিলিঙ্গে একটি ভূমিকম্প ঘটে।

১৫৭। ১২৭২ সনের ২রা পৌষ শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে দার্জ্জিলিঙ্গে একবার কম্প হইয়াছিল।

১৫৮-১৬২। ১২৭২ সন ৫ই পৌষ মঙ্গলবার চট্টগ্রামে ৫ বার ভূমিকম্প হয়। প্রথম কম্প ভীষণও ২½ মিনিট কালস্থায়ী ছিল। ইহা কুমিল্লা, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ভাগলপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৬৩-১৬৪। ১২৭২ সন ৬ই পৌষ বুধবার রামপুর-বোয়ালিয়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও মালদহে কম্প হয়।

১৬৫। ১২৭২ সনের ২৩শে পৌষ শনিবার চট্টগ্রামে একটী মৃদুকম্প হয়।

১৬৬। ১২৭২ সনের ১১ই মাঘ মঙ্গলবার কাঁথিতে একটী কম্প হয়।

১৬৭-৬৮। ১২৭৩ সনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার দার্জ্জিলিঙ্গে ২টী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

১৬৯-৭১। ১২৭৫ সনের ১৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার দিনাজপুরে ৩ বার ভূমিকম্প হয়। রামপুর-বোয়ালিয়া, নাটোর, বগুড়া, পাবনা, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও এই কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

১৭২। ১২৭৩ সনের ১৭ই শ্রাবণ শুক্রবার হাজারিবাগ, রাণীগঞ্জ, গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে একটী ভূমিকম্প উত্থিত হইয়াছিল।

১৭৩-৭৫। ১২৭৩ সনের ১৫ আশ্বিন বুধবার হাজারিবাগে ৩ বার কম্প হইয়াছিল। ইহাদের একটী মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি স্থলেও বিস্তৃতি লাভ করে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত।

রাঢ়-ভ্রমণ

(গত ১২ই ফাল্গুন, ১৩১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

বিগত শিল্পপ্রদর্শনীতে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষাসংক্রান্ত বিবিধ দ্রব্য প্রদর্শন করিবেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আহ্বানপূর্ব্বক বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত কতকগুলি পুঁথি ও প্রাচীন চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঐ সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, পরিষৎ স্থানে স্থানে লোক পাঠাইয়া বঙ্গভাষার প্রাচীন গ্রন্থকার ও কবিগণের হস্তাক্ষর ও বাস্তুভূমির চিত্র সংগ্রহপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, এক জন ফটোগ্রাফার সঙ্গে পাইলে আমি দাশরথি রায় ও কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবিগণের বাস্তুচিত্র সংগ্রহ করিয়া দিব। কারণ বাঙ্গালার কবিওয়ালাগণের জীবন চরিত ও সঙ্গীত-সংগ্রহ উপলক্ষে আমি পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের কোন স্থলে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন আমি ভাবিয়াছিলাম সহজেই উক্ত স্থানে গমন করিতে পারিব, তদনুসারে সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহোদয় আমাকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়া রাঢ় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল নিম্নে তাহার আভাস দিলাম।

১। বীরভূমি জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ, মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ পরগণা, বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ ও ইন্দ্রাণী পরগণা এবং নদীয়ার কিয়দংশ নানাবিষয়ে ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক ঘটনার লীলাক্ষেত্র।

২। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মধ্যে ৫২টী মহাপীঠের ৫টী এবং তদ্ভিন্ন ৪টী উপপীঠ বিদ্যমান। তন্মধ্যে (১) অট্টহাসের ফুল্লরাদেবী ও বিশ্বেশ ভৈরব। এই স্থানে সতীর অধঃওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। দেবীর শিলামূর্ত্তি প্রসিদ্ধ।

(২) নলহাটী—এই স্থানে সতীর 'নলা' পতিত হয়। এখানে কালিকা দেবী ও যোগীশ ভৈরব বিদ্যমান।

(৩) গঙ্গাতীর সমীপে কিরীট গ্রামে বিমলা দেবী ও সম্বর্ত্ত-ভৈরব বিদ্যমান আছেন। এই স্থানে সতীর কিরীট পতিত হইয়াছিল।

(৪) বহুলায় (বা কেতুগ্রামে) সতীর বামবাহু পতিত হয়। এখানে বহুলা দেবী ও ভীরুক ভৈরব বর্ত্তমান আছেন।

(৫) ক্ষীর গ্রামে সতীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়। এখানে যুগাদ্যা দেবী ও

ক্ষীরক ভৈরব আছেন। পৌরাণিকী দশভুজার ন্যায় যুগাত্মা মূর্ত্তি অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যবিভূষিতা এবং বাঙ্গালার অদ্বিতীয় প্রস্তরশিল্পী দাঁইহাট-নিবাসী নবীনচন্দ্র ভাস্করের স্বহস্ত-নির্ম্মিত।

(৬) বক্রেশ্বরে সতীর ভ্রূমধ্য পতিত হয়। এখানে মহিষমর্দ্দিনী দেবী এবং বক্রনাথ ভৈরব আছেন। প্রবাদ এই, মহামুনি অষ্টাবক্র এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন।

(৭) নন্দীপুরে সতীর হার পতিত হয়। এখানে নন্দিনী দেবী ও নন্দিকেশ্বর ভৈরব বিদ্যমান আছেন।

উপরোক্ত ৭টী তীর্থের মধ্যে (১), (২), (৪), (৫), (৬), এই পাঁচটী মহাপীঠ এবং (৩) ও (৭) এই দুইটী উপপীঠ।

এতদ্ব্যতীত (৮) দ্বারকানদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী চণ্ডীপুর গ্রামে তারা দেবীর মন্দিরের কথা অনেকেই জানেন। প্রবাদ এই, মহামুনি বশিষ্ঠ এই স্থানে সিদ্ধ হন। (৯) কনকপুরের অপরাজিতা দেবীর পাষাণময়ী (কালিকা) মূর্ত্তিও প্রাচীন কাল হইতে উপপীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাহা হউক, সমগ্র ৫২টী মহাপীঠের মধ্যে বঙ্গদেশের যে ক্ষুদ্র ভূভাগ ৫টী মহাপীঠ এবং ৪টী উপপীঠের দাবী করিতে পারে, সে পবিত্র ভূখণ্ড বঙ্গে কেন, সমস্ত ভারতে মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উল্লিখিত ভূভাগ এক সময়ে শাক্ত উপাসকগণের শক্তিপূজার লীলাক্ষেত্র ছিল। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব বিপ্লবেও সেই শক্তিপূজার অতীত গৌরব বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীনতার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

তদ্ভিন্ন বৌদ্ধযুগের নিদর্শন স্বরূপ ধর্ম্মপূজা এবং ধর্ম্মের গাজন এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান।

তৎপরে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তৎপরবর্ত্তী অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রেমভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বঙ্গদেশকে এবং বাঙ্গালাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের কথা উল্লিখিত হইবে।

ধনধান্যভূয়িষ্ঠ এই অঞ্চলে অনেক কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, যাত্রাওয়ালা এবং কীর্ত্তন-ওয়ালা জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন।

ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত সীমানিবদ্ধ ভূখণ্ডে শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীন ক্রীড়া-ক্ষেত্র বলিয়া তথায় অনেক অতীততত্ত্ব নিহিত আছে। এই সমস্ত কারণে সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শানুসারে আমি প্রথমতঃ বহরমপুর ও কান্দিতে গমন করি। প্রবন্ধে প্রত্যেক স্থানেরই প্রাচীন কীর্ত্তি শিল্প, সাহিত্য, দেবায়তন, দেববিগ্রহ প্রভৃতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিগত ১২ই অগ্রহায়ণ (১৩১৩ সাল) সন্ধ্যার পরে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া আমরা মুরশিদাবাদের গাড়ীতে আরোহণ করিলাম এবং প্রাতঃকালে বহরমপুরে পৌঁছিলাম। বহরমপুরে নামিয়াই প্রথমে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম এবং

নিখিল বাবুর সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ রামদাস সেন মহাশয়ের ভবনে গমন করিলাম। শ্রীযুক্ত মণি-মোহন সেন ও শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় সেন ভ্রাতৃদ্বয় আমাদিগকে ভবিষ্যাগাণ প্রদর্শনীতে পরিষৎ কি প্রদর্শন করিবেন, তদ্বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিখিল বাবু ও হিরণ্ময় বাবু আমাদিগকে ব্যাসপুরীর কেশবেশ্বরাখ্য শিবমন্দিরের ফটোগ্রাফ লইবার কথা বলিলেন। তদনু-সারে আমরা বেলা ৮টার সময় কাশিমবাজার ষ্টেশনের সন্নিহিত ব্যাসপুরীতে গমন করিলাম। দেখিলাম মন্দিরটী প্রায় ৩৫ হাত উচ্চ এবং ১০০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। নিখিল বাবু তাঁহার মুর্শিদাবাদকাহিনীর ৬৪ পৃষ্ঠায় ইহার কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। মন্দিরের বহি-র্দ্বারের খিলানের কিছু উপরে খোদিত লিপিযুক্ত এক খানি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে তাহা পাঠের নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তজ্জন্য নিখিল বাবু নিকটস্থ এক কৃষক বালককে এক খানি সিঁড়ি আনাইবার আদেশ করিলেন। এ দিকে ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত তপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ স্থান হইতে ফটোগ্রাফ লইবার সুবিধা হইবে তাহা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। কারণ একটা প্রকাণ্ড কপিত্থবেলের গাছ মন্দিরের কিছুদূরে অবস্থিত ছিল। তিনি বলিলেন, ইহাতে ফটোগ্রাফ লইবার বিশেষ অসুবিধা।

ইত্যবকাশে আমি ও নিখিল বাবু দুই জনে পর্য্যায়ক্রমে সিঁড়িতে উঠিয়া লিপিপাঠের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সিঁড়ি খানি জীর্ণ এবং সুসংবদ্ধ নহে বলিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইয়া নাগরাক্ষরের খোদিত লিপি পাঠ করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। হিরণ্ময় বাবু ইতিমধ্যে দোয়াত ও কলম আনাইলেন। তখন আমরা উভয়ে প্রত্যেক বারের পঠিতাংশ কাগজে লিখিতে লাগিলাম। এইরূপে ৫।৬ বার সিঁড়িতে উঠিয়া নিখিল বাবু ও আমি উভয়ে নিম্নো-ল্লিখিত পাঠ স্থির করিলাম।

"শাকে রামগবীশাক্ষিধরণীধরভূমিতে। মুক্তিং প্রার্থয়তাহশ্রান্ত পুনর্জন্মবিনাশিনীং॥
কেশবেশ্বরসংজ্ঞস্য শম্ভোর্ম্মন্দির মুত্তমং। রামকেশববিপ্রেণ শ্রীযুতেন বিনির্ম্মিতং॥"

অর্থাৎ—অবিশ্রান্ত পুনর্জন্মবিনাশকারিণী মুক্তির প্রার্থনাকারী শ্রীযুত রামকেশব বিপ্র-কর্তৃক কেশবেশ্বর শিবের এই উত্তম মন্দির ১৭৩৩ শকে বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

তৎপরে আমি শিবমন্দিরের চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে প্রায় ২ হাত উচ্চ এক সুন্দর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। মন্দিরের সম্মুখালিন্দের ভিতর দিকে চূণকামের উপর নানা দর্শকের নাম ও দর্শনের তারিখ অঙ্কিত ছিল।

সমগ্র মন্দিরটী ইষ্টকবিরচিত এবং কারুকার্য্যময় ইষ্টকে খোদিত নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্র-অলঙ্কৃত।

তন্মধ্যে মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে—

(১) মহিষাসুরমর্দ্দিনীর চিত্র—ইনি দশভূজা, কিন্তু দুই খানি হস্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণাযায়ী অপর ৮ খানি হাত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভাবে ইষ্টকে উৎকীর্ণ। মহিষমর্দ্দিনীর দুই পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা এবং রামচন্দ্রের মূর্ত্তি।

তন্নিম্নে তাড়কাবধের অপরূপ চিত্র। অদূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক ভয়ত্রস্ত বিশ্বামিত্র দণ্ডায়মান।

(২) কালীমূর্ত্তি। (৩) দুই হস্তীর উপর চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি।

(৪) ষোড়শী রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি—ইহার নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্রমূর্ত্তি।

(৫) মহিষের মস্তকে দণ্ডায়মান অসুরমূর্ত্তি। (৬) কমলামূর্ত্তি।

(৭) পদ্মোপরি উপবিষ্টা চতুর্ভুজামূর্ত্তি।

(৮) পদ্মাসনাসীনা চতুর্ভুজামূর্ত্তি।

ইহা ভিন্ন দুই পার্শ্বে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ফললোলুপ পক্ষী খোদিত রহিয়াছে।

সম্মুখ দৃশ্যের বাম দিকে (১) কালীমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান কার্ত্তিকেয় ও গণেশমূর্ত্তি, (২) কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চিত্র।

(৩) মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্ত্তি। কেবল ইহার বিশেষত্ব এই যে, বুদ্ধ মূর্ত্তির স্থলে জগন্নাথ খোদিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে খিলানের নিকটে বিবিধ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে খোদিত। দশানন আকর্ণ গুণ টানিয়া শরক্ষেপ করিতেছেন। বানরগণ রামের পার্শ্বে আশ্রয় লইয়াছেন।

মন্দিরে পশ্চিমপার্শ্বের সম্মুখদিকে গরুড়াসন বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্ত্তিই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দিকে গর্ভমন্দিরের বহির্দ্দিকে কয়েকটী স্ত্রীপুরুষের কুরুচির বদ্ধ চিত্র ছিল—তাহা কর্দ্দম প্রলেপে আবৃত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরালিন্দের নানাস্থানে কৃষ্ণলীলার বিবিধ দৃশ্য ইষ্টকে খোদিত রহিয়াছে।

এই স্থানে দুই খানি ফটোগ্রাফ গৃহীত হইল। প্রথম খানি দূর হইতে সমস্ত মন্দির দৃশ্যের, দ্বিতীয় খানি অলিন্দ হইতে মন্দির মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের। তৎপরে আমরা হিরণ্ময় বাবুর অশ্বযানে তাঁহাদের গৃহে আগমন এবং আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

আহারান্তে মণিমোহন বাবু শিল্পমেলায় প্রদর্শনের জন্য পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত একটী লৌহগোলক এবং কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীতে প্রাপ্ত পুঁথির এক পৃষ্ঠায় লিখিত ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় আমাদের নিকট আনয়ন করিলেন এবং নিখিল বাবু ঐ দিন কলিকাতায় যাই-বেন বলিয়া দ্রব্যগুলি তাঁহার সহিত প্রেরিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

নিখিল বাবুর অগ্রজ মহাশয়ের সহিত বহরমপুরের হস্তিদন্তশিল্প এবং খাগড়ার পিত্তল-কাঁসার কারুকার্য্য পরিদর্শন করিলাম। তৎপরে ১৪ই অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে মণিমোহন বাবু আমাদের কান্দি যাইবার জন্য গাড়ী নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং বেলা দশটার মধ্যে আমরা আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলাম। এই বার গঙ্গাপার হইয়া রাঢ়ভূমিতে বিচরণ করিতে হইবে এবং রাত্রিতে নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়া অসহায় ভাবে চলিতে হইবে ভাবিয়া আমি বহরম-পুরে নিখিল বাবুর বাসার নিকটে দুই গাছি বৃহৎ লাঠী ক্রয় করিলাম। বাল্যকালের শিক্ষা-

নৈপুণ্যে আমি লাঠীর প্রতি চির দিন ভক্তিমান্ এবং সেই জন্যই আজি পুরা ৫ হাত লম্বা মোটা বাঁশের লাঠী পাইয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম।

অবশেষে বিষণ্ণমনে মণিমোহন বাবুদিগের নিকট বিদায় লইয়া নিখিল বাবুর বাসায় আসিলাম। নিখিল বাবুর অগ্রজ মহাশয়ের সৌজন্য ও অমায়িকতা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। বেলা দেড়টার সময় আমরা রাধার ঘাটে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া রাঢ়ভূমিতে পদার্পণ করিলাম। এখানে খেয়াঘাটের ব্যবস্থা তত ভাল নহে। প্রতি ঘণ্টায় আমরা এক মাইল পথ চলিতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টা গাড়ীতে থাকিয়া সম্মুখ রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আমরা জলপানের জন্য গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তার উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ তেল্‌কার বিল—মধ্যে মধ্যে পক্ক ধান্যের ক্ষেত্র। আমরা এক স্থলে পথ পার্শ্বস্থ বিল হইতে করপুটে জলপান করিলাম। এই তেল্‌কার বিলের জল জীবন্তী নদী দ্বারা গঙ্গায় পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে আমরা জীবন্তী নদী তীরবর্ত্তী জীবন্তী নামক একটী ক্ষুদ্র বাজারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে শীর্ণতোয়া জীবন্তীর উপরে একটী সাঁকো নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম তেল্‌কার বায়ুকোণে জীবন্তী দেবী বিদ্যমান আছেন।

রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় আমরা নবগ্রাম বা নোয়াগাঁয় পৌঁছিলাম।

নবগ্রাম হরিকৃষ্ণপুরের কাত্যায়নী দেবী প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছেন। ইঁহার মাহাত্ম্য এই অঞ্চলে বহু দিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাত্যায়নী অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি। প্রাচীন কালাবধি এখানে প্রবাদ এই যে, কাত্যায়নী দেবী ঠক্ ঠক্ শব্দ সহ্য করিতে পারেন না। তজ্জন্য এই গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার, স্যাকরা এবং কলু বাস করিতে পারে না। এই কয় জাতি ভিন্ন অন্যান্য অনেক জাতি এই গ্রামে বাস করিয়া থাকে।

অতঃপর গোকর্ণে পৌঁছিলাম।

গোকর্ণ প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ প্রাচীন স্থান। প্রবাদ এই যে, এই স্থানে এবং ইহার সন্নিহিত গোবরহাটী নামক স্থানে রাঙ্গামাটীর রাজগণের গোশালা ছিল। কেহ বলেন, এই স্থান কর্ণরাজার রাজধানী ছিল। যাহা হউক, এ স্থানে রাঙ্গামাটীর নরপতিগণের গোশালা থাকা বিচিত্র নহে। কারণ রাঙ্গামাটী এ স্থান হইতে ৫।৬ মাইল মাত্র। তবে কোন্ রাজার গোশালা এখানে ছিল তাহা কে বলিবে? আমার মনে হয় কর্ণ সুবর্ণের সহিত গোকর্ণের কেবল শব্দগত 'কর্ণ' সাদৃশ্যে কোন গূঢ় ঐতিহ্য নিহিত আছে। কর্ণসুবর্ণ বর্ত্তমান রাঙ্গামাটীর প্রাচীন নাম। যখন বৌদ্ধদ্বেষী শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব পুনরুজ্জীবিত করিতেছিলেন—তৎকালাবধি এই অঞ্চলে শাক্তভাবের পুনরুভ্যুদয় হইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, মহাশয়ের পিসা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, 'গোকর্ণ' এই নাম সম্বন্ধে একটী কৌতুকের কিম্বদন্তী আছে। কর্ণসুবর্ণের কোন রাজার খুব বড় বড় কাণ ছিল। তজ্জন্য রাজা লজ্জাবশতঃ সেই দীর্ঘ কর্ণ সর্ব্বদা পাগড়ীতে ঢাকিয়া রাখিতেন। যে রাজকীয় নাপিত রাজার দৈনিক ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এক দিন পীড়িত হওয়ায় রাজার শ্মশ্রুবপনের

জন্য অন্য এক নাপিতকে ডাকাইয়া আনা হইল। রাজা নির্জ্জনে পাগড়ী খুলিয়া ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করাইলেন এবং নাপিতকে তাঁহার দীর্ঘ কর্ণের কথা গোপন করিতে হুকুম দিলেন। নাপিত প্রাণভয়ে লোকের নিকট সে কথা গোপন করিল বটে, কিন্তু সেই কথা তাহার পেটে অব্যক্ত থাকায় ক্রমে তাহার পেট ফুলিতে লাগিল। তখন পেট ফাটিবার ভয়ে, নাপিত মধ্যে এক গর্ত্তে মুখ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাজার "গো-কাণ, গো-কাণ"—এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে সেই কথা ব্যক্ত হওয়ায় নাপিতের পেটফোলা কমিয়া গেল। তদবধি ঐ স্থান গোকর্ণ বা গো-কাণ এই নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

গোকর্ণে প্রায় ৩০ হাত উচ্চ একটী নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। তন্মধ্যে সুন্দর শিলাময়ী নৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। প্রত্যহ নূতন হাঁড়িতে ১৬ সের দুগ্ধের পায়সান্নে নৃসিংহদেবের ভোগ সম্পন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন গোবরহাটীর কারুকার্য্যসম্পন্ন পঞ্চচূড় বৃন্দাবনচন্দ্রের উচ্চ মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষণে এই মন্দিরে মদনমোহন বিগ্রহ আছেন। গোবরহাটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অচলাক্ষী বিশেষ প্রসিদ্ধ। গোবরহাটীর গঙ্গানারায়ণ সরকার চট্টগ্রামস্থ চন্দ্রনাথের সিঁড়ি বাঁধাইয়া দিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গোকর্ণ পাতাওয়ার প্রস্তরখোদিত কুশাদিত্য সূর্য্যমূর্ত্তি বঙ্গের সৌরোপাসকগণের প্রাচীন নিদর্শন। জেমোর রাজবাড়ীতেও সুন্দর সূর্য্যমূর্ত্তি নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। কুশাদিত্য সূর্য্যমূর্ত্তি অরুণ-সারথি এবং সপ্তাশ্বযোজিত রথারূঢ়, এই মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপাথরের আশ্চর্য্য কারুনৈপুণ্যে খোদিত।

রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে আমরা দ্বারকানদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম এবং পারের দুর্গতি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। দেখিলাম,চারিখানি বোঝাই গোরুরগাড়ী কান্দি হইতে বহরমপুর আসিতে দ্বারকানদীর কর্দ্দমে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় অপরিসীম কষ্ট পাইতেছে। নদীর জল অতি অল্প। কিন্তু দুইহাত গভীর কর্দ্দম অতিক্রম করিয়া উচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহণ করা একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। তখন সেই চারিজন গাড়োয়ান একত্র হইয়া অত্যন্ত কষ্টে প্রত্যেকের গাড়ী পাহাড়ের উপর তুলিল। তাহারা আমাদের কাতরোক্তি শ্রবণে আমাদের গাড়ী খানিকে পার করিয়া অপর পারে পাহাড়ের উপর তুলিয়া দিয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে রাস্তা হইতে আমরা দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম রাত্রি ৪টা বাজিল—সুতরাং শীঘ্রই কান্দিতে পৌঁছিব। গাড়ী শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর (ইনি ত্রিবেদী মহাশয়ের পিসা) বাড়ীর নিকট পৌঁছিলে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীর পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন এবং প্রত্যূষে আমরা জেমোর নূতন বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবু তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সমাদরে আমাদিগকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় এই অঞ্চলের অনেক তথ্য আমাকে লিখিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—বাঙ্গালার প্রাচীন প্রস্তর-শিল্প সম্বন্ধে দাঁইহাটের শ্রীযুক্ত নবীন ভাস্কর অনেক তত্ত্ব অবগত আছেন। জগদানন্দপুরের রাধা-

গোবিন্দজীর প্রস্তর-মন্দির এবং মেটেরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী শিলাময়ী রামসীতা মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ্ লওয়া কর্ত্তব্য।

গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থলের সান্নিধ্যে প্রাচীন শাঁখাইচণ্ডীর স্থানে বর্ত্তমানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং একটি নীলকুঠীর ভগ্ননিদর্শন আছে। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে বেরা গ্রামে রামানন্দের পাট বিদ্যমান আছে।

কাশীরাম দাসের জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামের ৺ বুড়াশিবের মন্দির ও প্রেমানন্দপ্রতিষ্ঠিত কাঁটোয়ার রাধামাধব মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের পাট আছে।

মন্তেশ্বর থানায় মণ্ডল গ্রামে জগদ্‌গৌরী মূর্ত্তি অতীব সুন্দর, আষাঢ়ী নবমীতে ইঁহার পূজায় খুব সমারোহ হয়। ঐ দিনে পুষ্করিণী স্নান সময়ে পথের দুই পার্শ্বে এক সহস্র ছাগের বলিদান হয়। এখানে বর্দ্ধমানের মহারাজের ঠাকুর-সেবার ব্যবস্থা আছে। নবমী হইতে এক মাস পর্য্যন্ত পূজা ও উৎসবাদি চলিতে থাকে।

শুষ্‌না গ্রামের তারিখ্যা দেবী শক্তির মূর্ত্তিভেদ। মহাষ্টমীতে এবং পূর্ণিমায় পূজা ও উৎসবাদি হয়। গোগ্রামে লক্ষ্মীদেবী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ বহুকালাবধি প্রচলিত আছে।

ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা দেবীর কথা অন্যত্র লিখিলাম। অন্যান্য দেবমূর্ত্তির মধ্যে পিলাগ্রামের সন্নিহিত জামালপুরের ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি, রাউত গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মূর্ত্তি, এবং বাব্‌লা ডিহি শঙ্করপুরের নেংটেশ্বর শিবের মূর্ত্তিই প্রধান।

এতদ্ভিন্ন মজুমদার মহাশয় গোকর্ণের নৃসিংহদেব, গোবরহাটীর অচলাক্ষী দেবী, বঙ্গানের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টকরচিত সোমেশ্বর শিবের মন্দির ও সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির, কলেশ্বরের প্রকাণ্ড শিবমন্দির, নবগ্রামের কাত্যায়নী দেবী, তেলকাঁর জীবন্তী দেবী প্রভৃতি অনেক দেবমূর্ত্তি ও প্রাচীন মন্দিরের উল্লেখ করিলেন। এতদ্ব্যতীত মজুমদার মহাশয়ের নিকট কান্দি অঞ্চলের ও ইন্দ্রাণী পরগণার অনেক গীতরচক কবিওয়ালা ও প্রসিদ্ধ ঢুলিগণের বিষয় অবগত হইলাম।

অবশেষে শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় আমরা কোন্ পথে কিরূপে কোথায় যাইব, তাহার একটা অবধারণপূর্ব্বক পথ পরিচয় প্রদান করিলেন। মজুমদার মহাশয়ের এরূপ সাহায্য না পাইলে আমরা কেবল জেলা মানচিত্রের সাহায্যে পথনির্ণয় করিতে পারিতাম না।

বেলা ৪টার সময় আমরা সকলে কান্দির বাইচণ্ডী দেবীর ফটোগ্রাফ লইবার জন্য যাত্রা করিলাম। বাইচণ্ডী দেবীর সেবাইত মহাশয় সমস্ত বিবরণ লিখিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হওয়ায় আমি কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চণ্ডীমূর্ত্তি এক খণ্ড এক হস্ত প্রমাণ শিলাখণ্ড খোদিত। চন্দন ও সিন্দূর লেপ ধৌত করিলেও অবয়ব সংস্থান ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হইল না। বাইচণ্ডী দেবী একটী ক্ষুদ্র চালাঘরে অবস্থিত। তাহার পশ্চাদ্দিকে বৃহৎ বাঁশবন। শুনিলাম দেবী মূর্ত্তি অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদপরম্পরাও বিদ্যমান আছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ত্রিবেদী মহাশয়দিগের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

৩০শে নবেম্বরের রাত্রি সুষুপ্তিতে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে দুর্গাদাস বাবু আমাদিগকে জেমোর রাজবাড়ীতে লইয়া গেলেন। তৎপূর্ব্বে কান্দির শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত সিংহ মহাশয় প্রদর্শনীর জন্য অনেক গুলি প্রাচীন পুস্তকাদি আনয়ন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, রাজবাড়ীতে অনেক প্রাচীন দলিলাদি পাওয়া যাইতে পারে এবং রাজা মহোদয়েরা ব্যবস্থা না করিলে ভরতপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ্ লওয়া কঠিন হইবে। বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। রাজবাড়ীতে প্রবেশ কালেই দেখিলাম পরোক্ত সালারে দৃষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির সদৃশ একটি নাসিকাভগ্ন সুন্দর মূর্ত্তি রাজবাটীর বহিরঙ্গনস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে শায়িত রহিয়াছে। শুনিলাম প্রতিমূর্ত্তিটী সালার হইতে আনীত।

পরিষদের পাঠকদিগের জন্য আমি অতি সংক্ষেপে জেমোরাজবংশের পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিলাম। এই রাজবংশ কান্যকুব্জের জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। ইহাঁরা যজুর্ব্বেদী এবং পুণ্ডরীক গোত্রোদ্ভব, কিন্তু সামবেদী শাণ্ডিল্য গোত্রের অসিত ও দেবল এই দুই প্রবর ইহাঁদের প্রবরের শেষে দৃষ্ট হয়। ফতেসিংহ রাজ্যস্থাপয়িতা সবিতাচাঁদ দীক্ষিত মানসিংহের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। দক্ষিণ ভারতে দীক্ষিত উপাধিধারিগণ শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব।

আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে এই অঞ্চলে ফতেসিংহ নামক একজন হাড়িরাজা একটী রাজ্য সংস্থাপন করিতেছিলেন। সেই হাড়ি রাজার নাম ফতেসিংহ। ইনি কান্দির ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে স্বীয় নামানুসারে ফতেপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই স্থানে হাড়ি রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং এ অঞ্চলের ইতর ভদ্র সকলেই হাড়ি রাজার কীর্ত্তিকলাপ আজিও বিস্মৃত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সবিতাচাঁদ দীক্ষিত মানসিংহের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। মানসিংহ উড়িষ্যার পাঠানবিদ্রোহদমনের পরে হাড়িরাজাকে বিনষ্ট করিয়া সবিতাচাঁদকে ফতেসিংহ ও পলাশী পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। বাঙ্গলার হাড়ি রাজা ফতেসিংহ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। যে স্থলে ফতেসিংহ মুসলমান বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জ্জনপূর্ব্বক রণক্ষেত্র মুণ্ডমালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই স্থান "মুণ্ডমালা" নামে দর্শকের হৃদয়ে পূর্ব্ব স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া থাকে। সবিতাচাঁদ দীক্ষিত এবং তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ নানাপ্রকার সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং অধীনস্থ প্রজাবর্গের কল্যাণার্থ নানা লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

জেমো রাজবাটীর বর্ত্তমান রাজা মহোদয়গণ সবিতাচাঁদ হইতে ১৪শ পুরুষ অধস্তন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পূর্ব্বপুরুষ হইতেই এই জেমোর রাজবংশের সহিত অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহাঁরাও কান্যকুব্জের জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ এবং বত্মূল গোত্রোদ্ভব ভরদ্বাজগোত্রের সহিত ইহাঁদের প্রবরের বিশেষ সাদৃশ্য। ত্রিবেদী মহাশয়দিগের পূর্ব্বনিবাস পরবর্ণিত টেঁয়া গ্রাম। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবু আমাদিগকে মধ্যম রাজা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়ের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ন রাজা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পরিষদের প্রদর্শনীর জন্য প্রাচীন দ্রব্যাদির

সন্ধানার্থ কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ভরতপুরের পণ্ডিত গোস্বামী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বলদেব গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রবাবুর পত্রসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাদাস বাবু কহিলেন, অদ্যকার শুভযাত্রা, কারণ শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্ত আর কোন ভাবনার কারণ নাই। গোস্বামী মহাশয়গণ জেমোর রাজগণের অনুগৃহীত এবং শ্রীযুক্ত বলদেব গোস্বামী ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্। তিনি বলিলেন এতাবৎ-কাল আমরা মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ্ তুলিতে দেই নাই। ঐ পুঁথি নিত্য পূজিত হয়। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় আদেশ করিলে আমরা মূল পুঁথিও প্রদর্শনী ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারি, কারণ তিনি এদেশের অলঙ্কার স্বরূপ এবং জ্ঞানধর্ম্মের আকর। রাজা মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে তৎপরদিন ফটোগ্রাফ্ তুলিবার আয়োজন করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্থানের পরে রাজা মহাশয়দিগের সহিত প্রত্নতত্ত্ব ঘটিত অনেক কথা হইল। ইতিমধ্যে ন-রাজা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহাশয় একটি লাক্ষানির্ম্মিত প্রাচীন চোঙ্গায় অনেকগুলি প্রাচীন দলিল এবং এক খানি প্রাচীন তরবারী আনয়ন করিলেন। তরবারি খানির মুষ্টিদেশে সম্রাট্ ফেরোকসেয়ারের নাম খোদিত। অনেকগুলি প্রাচীন পারসী দলিল দেখিলাম। রাজসহোদরদ্বয়ের সৌজন্য এবং অমায়িকতায় আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইলাম। বেলা ২টার সময় রুদ্রদেব এবং দক্ষিণকালিকা দেবীর ফটোগ্রাফ্ তুলিবার জন্য যাত্রা করিলাম। দুর্গাদাস বাবু এবং অন্যান্য ৩।৪টী ভদ্রলোক সঙ্গে চলিলেন।

জেমো গ্রামের উত্তরপশ্চিমাংশে ময়ূরাক্ষীর একটী ক্ষুদ্র খালের ধারে প্রকাণ্ডকায় ২।৩টী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে রুদ্রদেবের মন্দির অবস্থিত।* পূর্ব্বোক্ত জেমোর রাজগণ রুদ্রদেবের সেবাইত। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক এই বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সিংহবংশের আদিপুরুষ অনাদিবর সিংহ সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। সিংহ ময়ূরাক্ষী তীরে বন কাটিয়া কান্দি গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। বনমালীর বংশধর রুদ্রকণ্ঠ সিংহের সময় কামদেব ব্রহ্মচারী নামক একজন সিদ্ধপুরুষ যোগবলে শূন্যমার্গে বৃক্ষারোহণে কামরূপ হইতে শ্রীক্ষেত্র যাইতে ছিলেন। তিনি ময়ূরাক্ষী তীরে কান্দিগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি ময়ূরাক্ষী তীরে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার নিকট কালরুদ্র এবং অগ্নিরুদ্র নামে দুইটী বিগ্রহ ছিল। তিনি এই দুই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনা করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত রুদ্রকণ্ঠ সিংহ কামদেব সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী মৃত্যুকালে রুদ্রকণ্ঠকে বিগ্রহপূজার ভারার্পণ করেন। পরবর্ত্তীকালে জেমোর রাজবংশীয়গণ রুদ্রকণ্ঠের বংশধরদিগের নিকট উক্ত বিগ্রহদ্বয় কাড়িয়া লয়েন। তদবধি রুদ্রদেবদ্বয় জেমো[illegible]মিদার-

* বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "গ্রামদেবতা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত এবং আমাদের গৃহীত ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে

দিগের গৃহ দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে মধ্যভাগের মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে যদি রুদ্রদেবের প্রতিষ্ঠাকাল ধরা যায়, তাহা হইলে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক কাল রুদ্রদেব স্থাপিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, উহার বয়স সাড়ে তিনশত হইতে চারিশত বৎসর হইতে পারে। আমার মনে হয় এই বৃক্ষটী রুদ্রদেবের সমসাময়িক।

রুদ্রদেব-দ্বয়ের প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একবার চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে রুদ্রদেবের উপাসকগণ উভয় বিগ্রহকে কান্দি হইতে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গাতীরে জলসন্ন্যাসের দিন গঙ্গাস্নান করাইবার জন্য লইয়া যায়। স্নানের সময় অগ্নিরুদ্র অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটী উপাসক-দিগের হস্ত স্খলিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয় এবং তৎপরদিন ঐ বিগ্রহ কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে উদ্ধরণপুরের জালজীবিগণের জালে বদ্ধ হইয়া উত্থিত হন। তদবধি তিনি উদ্ধরণপুরে কালাগ্নিরুদ্র নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন এবং কান্দির রুদ্রদেবের গঙ্গাস্নান বন্ধ হইয়াছে। কান্দির রুদ্রদেবের মূর্ত্তি ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১০ ইঞ্চি প্রস্থ পাষাণখণ্ডে খোদিত। বিগ্রহ ধ্যানমগ্ন, পদ্মাসনাসীন এবং ত্রিনেত্র। ইনি নাগযজ্ঞোপবীতি। ইহাঁর দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুতে সংলগ্ন। বাম হস্ত উত্তান ভাবে অঙ্ক মধ্যে নিবিষ্ট। পদ্মাসন ৫টী পদ্মকলিকায় গঠিত। নাগযজ্ঞোপবীত ব্যতীত অন্য এক যজ্ঞসূত্র বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত। অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি রুদ্রদেবের উপরে পার্শ্বে এবং নিম্নে অঙ্কিত। তন্মধ্যে মস্তকে একটী শয়ান মূর্ত্তি। পুরোহিত বলিলেন এটী জটাকলাপবিহারিণী সুরধুনীর চিহ্ন। শিরঃ সমীপে দুই পার্শ্বে দুইটী বদ্ধাঞ্জলি মূর্ত্তি। স্কন্ধসান্নিধ্যে দুইটী মূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন নিম্নে ৭টী এবং পার্শ্বে ৬টী অন্য প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রদেবকে কালাগ্নি-রুদ্রের ধ্যানেই পূজা করেন।

সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে ১৩১৩ সালের ১২ই ফাল্গুনে যৎকালে আমি এই প্রবন্ধের স্থূলাংশ পাঠ করি এবং ফটোগ্রাফ্ গুলিকে বর্ণনাসহ প্রদর্শন করি, তৎকালে সোদর-প্রতিম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রদেবের মূর্ত্তিকে বুদ্ধ মূর্ত্তিভেদ বলিয়া দৃষ্টান্তের উদ্ধার করেন।

আমি মদীয় পূজনীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কান্দির রুদ্রদেবকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়া আমাকে একটী লিখিত মন্তব্য প্রদান করেন। গ্রাম্যদেবতা প্রবন্ধেও উক্ত মন্তব্যটী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। আমার ধারণা এই যে, প্রাচীন যুগের রুদ্র মূর্ত্তিই বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বুদ্ধ মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার কারণ পশ্চাল্লিখিত হইবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, জেমোর রুদ্রদেব শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব, পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট। পার্শ্বে বোধিসত্ত্বগণ ও দেবগণ বিদ্যমান। পদ্মাসনের নিম্নে উপাসকগণ

অবস্থিত। শিরোদেশে পর্য্যঙ্কের উপরে মহাপরিনির্ব্বাণোন্মুখ অর্থাৎ মৃত্যুন্মুখ বুদ্ধদেবের শয়ান মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত রাখাল ভায়া লিখিয়াছেন যে মূর্ত্তির মস্তকের উপর যে বৃক্ষশাখা দেখা যায়—ইহা মহাবোধিদ্রুম। বৃক্ষশাখার উপরে পর্য্যঙ্করূঢ় বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ। মূর্ত্তির মস্তকের দুই পার্শ্বে পদ্মের উপর উপবিষ্ট ধর্ম্মচক্রমুদ্রান্বিত দুইটী বুদ্ধ মূর্ত্তি। স্কন্ধসমীপে পদ্মোপরে দণ্ডায়মান অপর দুইটী মূর্ত্তি। দক্ষিণে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ও বামে লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব অবস্থিত। ইহা বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধদেবের সম্বোধি লাভ কালের মূর্ত্তি, এই সময়ে তিনি বোধিদ্রুম তলে বজ্রাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

ফরাসী পণ্ডিত অগস্ত ফুসে (Auguste Foucher) নেপালে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে নিম্নলিখিত বজ্রাসনস্থ বুদ্ধের সাধনা আবিষ্কার করিয়াছেন—

বজ্রাসন-সাধনা।

শ্রীমদ্ বজ্রাসন বুদ্ধ ভট্টারকম্ আত্মানং ঝট্ ইতি নিবেদয়েৎ। দ্বিভুজৈক মুখং পীতং চতুর্ম্মারসংঘটিত মহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিতবামকরং ভূমিস্পর্শমুদ্রা দক্ষিণকরং বন্ধুকরাগরুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনু সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচণকবিগ্রহং (সেবনক বিগ্রহং) বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্মধাতুস্বভাবাত্মকোহং ইত্যস্বয়াহংকারং কুর্য্যাৎ। তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়বোধিসত্ত্বং সুবর্ণগৌরং দ্বিভুজ জটামুকুটধারিণং গৃহীতচামর দক্ষিণকরং নাগ কেশরপল্লব-ধরবামকরং। তথা বাম লোকেশ্বরবোধিসত্ত্বং শুক্লং জটামুকুটিনং চামরধারি-দক্ষিণ ভুজং কমলধারি বামকরং এতদ্ বয়ং ভাবন্মুখং অভিবীক্ষ্যমাণং পশ্যে।"

সাধনা-বর্ণিত মূর্ত্তির সহিত রুদ্রদেবের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে—কিন্তু কতক বিষয়ে সাদৃশ নাই।

রুদ্রদেবের বামকর বামোৎসঙ্গে স্থাপিত এবং দক্ষিণকর জানুর নিম্নে ভূমিস্পর্শ করিয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ সাদৃশ্য দেখিনা।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন যে রুদ্রদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণের নিম্নে বহু নর মুণ্ড প্রোথিত আছে।

ফটোগ্রাফ্ গৃহীত হইলে রুদ্রদেবের মন্দির গুলি দেখিয়া লইলাম। রুদ্রদেবের মন্দির উত্তর দিকে অবস্থিত—এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পরস্পর সম্মুখীন দুইটী করিয়া মোট চারিটী মন্দির আছে। পশ্চিম দিকের উত্তর পার্শ্বস্থ মন্দিরগাত্র ব্যাসপুরীর মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্যযুক্ত ইষ্টকগ্রথিত। তাহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং কৃষ্ণলীলার দুই একটী চিত্র উৎকীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ চিত্রই অদৃশ্য প্রায়।

এই মন্দির গুলি রুদ্রদেবের সমকালিক হইতে পারে। দুইটী মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের সময় রুদ্রদেবের মন্দিরে উৎসবের সীমা থাকে না। এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া আমরা দক্ষিণ-কালিকার মন্দিরে যাত্রা করিলাম। ময়ূরাক্ষীর

খালের ধারে ধারে ইক্ষুক্ষেত্র ও সরিষার ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমরা 'ফোর্টের' দিকে চলিলাম। ক্রমে কান্দি দক্ষিণে রাখিয়া আমরা কান্দি স্কুলের ঠিক দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূরে অবস্থিত দক্ষিণ-কালিকার মন্দিরে পৌঁছিলাম। এ স্থান একেবারে প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত এবং কান্দি হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। দক্ষিণ-কালিকার পীঠ অতি মনোরম নিভৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকে কেবল বিস্তীর্ণ ধান্য ক্ষেত্র। নগরের কলকোলাহল এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। এই স্থান দর্শনে গম্ভীর পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা হইয়া থাকে। কালিকা দেবীর পীঠস্থান চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রাদি হইতে অনেকটা উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত। শুনিলাম পূর্ব্বে এই স্থান দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত ছিল—এক্ষণে সেই নিবিড় অরণ্য নাই। এই ভূখণ্ডে ২টী পুষ্করণী আছে। একটী অত্যন্ত প্রাচীন—অনুমান ৪০০।৫০০ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী। যদিও এই পুষ্করিণীতে অধিক জল নাই—তথাপি এই পুষ্করিণীর জল অতীব নির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষক-কুলললনাগণ বহু দূর হইতে এই পুষ্করিণীর জল লইয়া যাইতেছেন। আমরা রৌদ্রে বড় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই জলে নামিয়া করপুটে জলপান করিয়া লইলাম। অন্য পুষ্করিণী দক্ষিণ-কালিকা-মন্দিরের সন্নিহিত উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার নাম নির্ম্মাল্য পুষ্করিণী। দেখিলাম মন্দির মধ্যস্থ চরণামৃত-জল পুষ্করিণীতে পতিত হইবার প্রণালী রহিয়াছে। পুষ্করিণীটী কালীমাতার চরণামৃতপানে পবিত্র হইলেও দৃশ্যতঃ জল নির্ম্মল বলিয়া বোধ হইল না।

দক্ষিণ-কালিকার পীঠ স্থান অতি প্রাচীন। এই স্থানে রুদ্রদেবের প্রতিষ্ঠা-কালের বহু পূর্ব্বে শক্তিমন্ত্রের বীজ উপ্ত হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার পরিচয়ের অভাব নাই।

মন্দিরটী অধিক পুরাতন নহে। ইহার উচ্চতা ৩০।৩৫ হাত হইবে। মন্দির-শীর্ষে পিত্তলময় পঞ্চমুণ্ডের বৈজয়ন্তী—পঞ্চমুণ্ডী আসনের বিজ্ঞাপন করিয়াছে। বোধ হয় পুরাকালে—এই স্থান কোন অজ্ঞাত নামা ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠ ছিল। আমার মনে হয় সেই ব্রহ্মচারী কান্দিতে বৌদ্ধ প্রভাবের সময় নির্জ্জন প্রান্তরে নিবিড় অরণ্যে শক্তি উপাসনার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-কালিকা-মন্দির উত্তরাংশে অবস্থিত। পূর্ব্বে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে পরস্পর সম্মুখীন পাঁচটী করিয়া ১৩টী মন্দির ছিল। এক্ষণে পশ্চিমদিকের ৫টী জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান, পূর্ব্বদিকের ৫টীর মধ্যে কেবল উত্তর দিকের ২টী মাত্র অভগ্নাবস্থায় আছে। অন্য ৩টী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র মন্দির গুলির যৎকিঞ্চিৎ শিল্পকার্য্যের অবশেষ ও গঠনাদর্শ বিদ্যমান আছে, তদ্দৃষ্টে সে গুলি রুদ্রদেবতার পার্শ্ব-মন্দিরের অনুরূপ বলিয়া বোধ হইল। এই পার্শ্ব মন্দির গুলি ৪০০ বৎসরের অধিক নহে। দক্ষিণ কালিকার মূর্ত্তি সাধারণ কালীমূর্ত্তির ন্যায় নহে। একটী অমাদিলিঙ্গের উর্দ্ধদেশে কেবল চক্ষু কর্ণের সংস্থান অঙ্কিত। মুখাকৃতি ভৈরবভাবের উদ্বোধক। এই প্রকারের কালীমূর্ত্তি বহুপ্রাচীন। দক্ষিণ-কালিকার মহিমা সম্বন্ধে ২।১টী আখ্যানও শুনিতে পাওয়া যায়। ফতেসিংহের জমিদারগণই এই মন্দিরে পুরোহিত—তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পূজা উৎসবাদি সম্পন্ন হয়। দক্ষিণ-কালিকাদেবী এরূপ সিন্দুর মণ্ডিত যে, তাঁহার পাষাণ-দেহ কিছুতেই নয়নগোচর হয় না।

চিত্র ১।

বাইচণ্ডী দেবী—কান্দী (১৪৫ পৃঃ)।
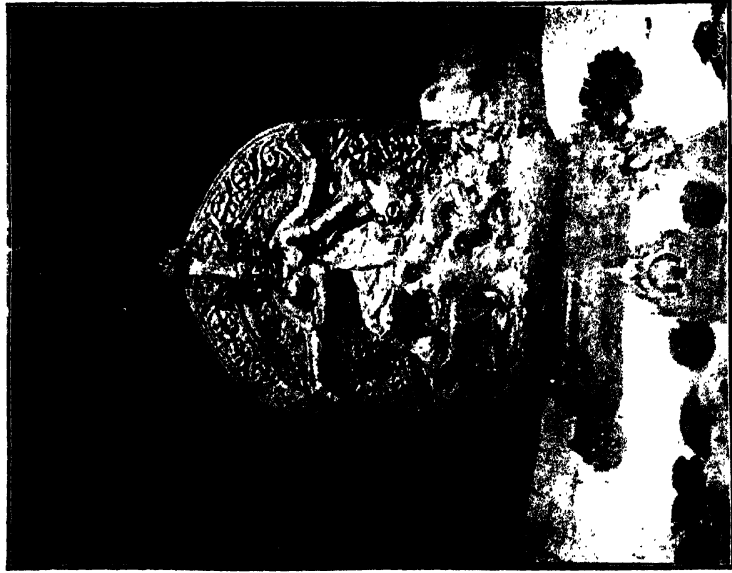
চিত্র ২।

দেবী প্রতিমার ফটোগ্রাফ্ গৃহীত হইল। ইতিমধ্যে আমি স্থানটীর চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম নৈর্ঋত কোণে এক মহাকায় মহীরুহ অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান একটী বকুল ফুলের গাছ। দুর্গাদাস বাবু ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে আমাদের গাত্র বস্ত্রমিলিত করিয়া বৃক্ষকাণ্ডের পরিধির একটা পরিমাণ লইলাম। বৃক্ষের পরিধি ১২ হাত এবং উচ্চতা ৭৫।৮০ হাত হইবে। এত বড় বকুলগাছ আমি ভারতবর্ষের কোন স্থানে দেখি নাই। শুনিলাম ঐরূপ আর একটী বৃক্ষ কান্দিতে আছে। এতবড় গাছের বয়সের 'গাছ পাথর' নির্ণয় করা দুরূহ। তবে এ বৃক্ষ ৫০০।৬০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন মন্দিরের ঠিক সম্মুখে ইষ্টকবেদিগ্রথিতমূল—আর একটী বকুল গাছ আছে। ইহার কাণ্ড পরিধি ৫½ হাত। এতদ্ভিন্ন এস্থলে প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক ২টী স্যাওড়া গাছ আছে। শুনিলাম এই বৃক্ষতলে ত্রিমূর্ত্তির পূজা হয়। দেখিলাম স্যাওড়া গাছে সিন্দুরের মণ্ডল বিদ্যমান আছে। আমি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিকটে একটী প্রকাণ্ড স্যাওড়া গাছ দেখিয়াছিলাম। এ দুইটী বৃক্ষ সেই প্রাচীন গৌড়ের বৃক্ষ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। এই পীঠস্থানের দক্ষিণাংশে বহুসংখ্যক কলিকা ফুলের গাছও দেখিলাম। একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে, যদি দক্ষিণ-কালিকা মন্দির হইতে কিছুদূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানা যায়, তবে অদূরবর্ত্তী যজান গ্রামের সোমেশ্বর শিবমন্দির এই সরল রেখার উপরে পড়ে। সোমেশ্বরমন্দির উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের ঘোষবংশের আদি সোম ঘোষের স্থাপিত। কেহ বলিলেন,—সোমেশ্বর শিবই দক্ষিণ-কালিকার ভৈরব। শুনিলাম কান্দিতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সভার অধিবেশন এই দক্ষিণকালিকার পবিত্র পীঠের পূর্ব্বদিকে একস্থানে সম্পন্ন হইয়াছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা কার্য্য শেষ করিয়া কান্দি যাত্রা করিলাম। অতঃপর সোজাসুজি জেমোতে না যাইয়া আমরা কান্দির দুই একটী দর্শনীয় স্থান দেখিতে গেলাম। দর্শনীয় স্থান-সমূহের মধ্যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ও সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর কীর্ত্তিচিহ্নই প্রধান। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ঠাকুরবাড়ীর কথা সকলেই জানেন। ইহা এক বিরাট কাণ্ড। যে স্থানে গঙ্গাগোবিন্দসিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে দুগ্ধহ্রদ, ঘৃতহ্রদ ও দধিহ্রদ প্রভৃতি খনিত হইয়াছিল—একজন তাহা দেখাইয়াছিলেন। আমার প্রার্থনামতে একজন কবিওয়ালাকে ডাকাইয়া আনা হইল। আমি তাহার নিকট হইতে অনেকগুলি কবির নাম লিখিয়া লইলাম।

পরদিন সৌজন্যের আধার অতিথিবৎসল দুর্গাদাস বাবুর নিকটে বিদায় লইতে আমাদের পরস্পরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধুময় স্মৃতি ভুলিবার নহে।

কান্দি হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে কান্দি সম্বন্ধে দুই-এক কথা না বলিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মভূমি জেমো কান্দি—বিবিধ তত্ত্বে পরিপূর্ণ।

ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে নিত্য পূজা, আরতি এবং পর্ব্বোপলক্ষে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের আলয় অতিথি অভ্যাগতের আশ্রয় স্থল।

আমি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু জেমো-কান্দি আমার নিকটে অত্যন্ত মনোরম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। নিসর্গের কাম্য কানন কান্দির কাননকুন্তলা তরুরাজিনীল শস্তশ্যামলা প্রকৃতির মনোহারিত্বই তাহার এক মাত্র কারণ। উত্তররাঢ়ে উত্তরাংশে এরূপ সরস ভূখণ্ড থাকিতে পারে, ইহা আমার ধারণা ছিল না। ময়ূরাক্ষী নদীর দুইটী ক্ষুদ্র শাখা যথাক্রমে কান্দি ও জেমোর অবাহিকা এবং সেসনি পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এই সরিৎ শাখাদ্বয় বক্রগতিতে প্রায় প্রতি গৃহস্থের গৃহপার্শ্ব দিয়া ও অনেক পুষ্করণীর মধ্য দিয়া অবশেষে প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক পুষ্করিণী কান্দিতে দৃষ্ট লইল। কান্দির ভূমি দক্ষিণ বঙ্গের ন্যায় সলিল-সম্পত্তিভূষিতা; অল্পদূর খনন করিলে জল পাওয়া যায়। কান্দিতে দক্ষিণ বঙ্গের ন্যায় তাল নারিকেলের প্রাচুর্য্য, মধ্য বঙ্গের ন্যায় রবিশস্যের বৈচিত্র্য, এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়ের ধান্য-সমৃদ্ধির পূর্ণতা পরিদৃষ্ট হইল। ইহাই কান্দির বিশেষত্ব। জলবায়ু প্রায় সাঁওতাল পরগণার ন্যায় স্বাস্থ্যকর। উৎপন্ন সামগ্রী অন্যান্য স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত সুলভ। কান্দি অঞ্চলে প্রত্যেক গৃহস্থের বহির্দ্বারে শঙ্খ চক্র কিম্বা পদ্মাদির ন্যায় এক প্রকার আলিপনা চিত্র থাকায় দ্বারোপান্তে লিখিত শঙ্খ-পদ্ম চিহ্নমণ্ডিতা যক্ষপুরীর কথা মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কান্দিতে কালক্রমে শাক্ত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অতীত নিদর্শন আজিও নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। বর্গীর অত্যাচার হইতে এস্থান রক্ষা পায় নাই। কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে "রাতারাতি পঁহুছিল গিয়া"—দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ কান্দির একটা অনন্যসুলভ মনোমোহন ভাব দর্শকের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়।

২রা ডিসেম্বর প্রাতঃকালে জেমো হইতে হরেকৃষ্ণ দাসের গো-শকটে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ লইবার জন্য ভরতপুর যাত্রা করিলাম। তখন নারিকেল-তরুকুন্তলা জেমোর প্রকৃতিসুন্দরী বালার্ককিরণে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অনতিবিলম্বে হরেকৃষ্ণের গাড়ী বাঘডাঙ্গার রাজবাড়ীর উত্তরাংশে একসারি শ্রেণী-সন্নিবিষ্ট দেবদারু তরু অতি সুশোভন দৃশ্যে বিরাজিত ছিল। এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিকে সমবয়স্ক সমশীর্ষ শ্রেণী বদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ সকল মনোহর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। গরুরগাড়ী ধীরগতিতে ন-পাড়ার মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে রসোড়ার দিকে চলিতে লাগিল। পথ একেবারেই সুগম নহে, রসোড়ার সান্নিধ্যে একটী বড় দহ বা গভীর সঙ্কীর্ণ জলাশয় আছে। স্থানীয় লোকের ধারণা এই দহ অতলস্পর্শ।

রসোড়া হইতে বাহির হইয়া ধান্যপূর্ণ মাগুরার বিলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম। পথের দুই পার্শ্বে কেবল নয়ন-মনোলোভন সুপক্ক ধান্য সকল মৃদু সমীরণে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। ইতিমধ্যে হরেকৃষ্ণের গাড়ী চেঁয়োতলার কাঁদড় পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখী হইল। এই স্থানের ৪র্থ মাইল ষ্টোন বা অষ্টশৈল অতিক্রম করিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা আধকোমড়ার জলপূর্ণ অনতিপ্রসর খালের ধারে আসিয়া পড়িলাম। এই সকল খালের স্থানীয় নাম কাঁদড়।

আধ কোমড়ার কাঁদড় ময়ূরাক্ষী নদীর একটী ক্ষুদ্র শাখানদী। বর্ষাকালে এই সকল নদী অত্যন্ত বেগবতী হয়; তখন নৌকা ব্যতিরেকে এই সকল নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। আধ কোমড়ার খালের জল হরেকৃষ্ণর গাড়ীর ধুরা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল; আমরা গো-যানেই এই কাঁদড় পার হইলাম। এইস্থানে গাড়ী পূর্ব্বাভিমুখী হইল, সম্মুখ-রৌদ্রে আমার একটু কষ্ট হইলেও প্রান্তরসুলভ মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে আমার সে কষ্ট উপশমিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী শীর্ণতোয়া কুয়ে নদীর নিকটবর্ত্তী হইল। ময়ূরাক্ষী ও কুয়ে বাব্‌লা নদীতে প্রমিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত ও পরোক্ত দ্বারকা নদী বাব্‌লা নামে গঙ্গাসঙ্গতা হইয়াছে। কুয়ে উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিলাম, চতুর্দ্দিকে কেবল দিগন্তব্যাপী সুপক্ক ধান্যক্ষেত্র; এই সময় হরেকৃষ্ণর গাড়ী ৬ষ্ঠ অধ্বশৈল অতিক্রম করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বেলা ১১টার সময় আমরা ভরতপুরে উপস্থিত হইলাম।

ভরতপুর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির অন্তর্গত হইলেও নৈসর্গিক সীমারেখার হিসাবে ইহাকে রাঢ়ভূমি বলা যাইতে পারে। এখানকার প্রকৃতি কোন অংশেই বহুবিধতরুরাজি-নীলা শস্যশ্যামলা তাল নারিকেলকুন্তলা বিচিত্রতাময়ী কাঁদির সমতুল নহে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোন স্থানেই একটী নারিকেল বা কলাগাছ দেখিতে পাইলাম না।

আমাদের গাড়ী ভরতপুরের গোস্বামিগণের বাটীর নিকটবর্ত্তী এক দোচালা ঘরের সম্মুখে আসিয়া বিশ্রাম করিল। গোস্বামিগণ ফটোগ্রাফ তোলা হইবে বলিয়া সকলে ঠাকুর সাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মন্দিরের দালানে বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে গাঁদা ফুলের মালায় বিভূষিত করিলেন। প্রতি বাড়ী হইতে এক এক খানি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির চিত্র মন্দিরালিন্দে বিলম্বিত হইল। বিগ্রহ সজ্জিত করিতে গোস্বামিগণের ২ ঘণ্টা বিলম্ব হইল। পল্লীস্থ বালকবালিকা এবং স্ত্রীলোকে মন্দির প্রাঙ্গণ লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ফটোগ্রাফ তোলা দেখিতে কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গোস্বামিগণের অনেকেই মন্দিরের দালানে বসিলেন। দালানের একপার্শ্বে মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরাঙ্কিত পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি খানি রক্ষিত হইল। আমি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ সহকারে পুঁথি খানিতে মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর দেখিতে লাগিলাম। গোস্বামী মহাশয়গণ কথিত মহাপ্রভুর লিখিত একটী অনুষ্টুপ্ বৃত্তের শ্লোক ও তন্নিম্নে তাঁহার নাম স্বাক্ষর একেবারেই অস্পষ্ট। কিছুতেই তাহা পড়া যায় না। অধিকন্তু গোস্বামী মহাশয়গণ আজ ৫০০ বৎসর ঐ দুই ছত্র লেখা দেখাইয়া যাত্রিদিগের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত সম্প্রদায় মহাপ্রভুর উক্ত হস্তাক্ষর দেখিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যাত্রিদিগকে দেখাইতে দেখাইতে উপরের তাল-পত্র খানি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরও তৎসহ বিলুপ্তপ্রায়, কেবল একটী 'শ্রী' এবং 'শর্ম্মা' শব্দের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইল। যাহা হউক সেই অংশটুকু পুঁথিতে সংযুক্ত করিয়া তাহার ফটোগ্রাফ গৃহীত হইল। মূল পুঁথিখানি গদাধর গোস্বামী মহাশয়ের

স্বহস্ত লিখিত গীতা। একদিন মহাপ্রভু গদাধর গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হন এবং উপরোক্ত গীতার মুখপত্রে "ষট্শতানি সবিংশানি" ইত্যাদি একটী শ্লোক লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া গদাধর গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্রকে প্রদান করেন। তদবধি মহাপ্রভুর হস্তাক্ষরভূষিত উক্ত গীতা গোস্বামিগণের গৃহে পুরুষানুক্রমে পূজিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত সন্ধান পাইয়া সাধারণের গোচরার্থই উহার ফটোগ্রাফ আনাইবার ব্যবস্থা করেন। হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ লইবার পরে গদাধর গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। এই মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণের ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে খোদিত। পরে গোস্বামীগণ উক্ত মন্দিরে এক দারুময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বে গদাধর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিলামূর্ত্তি রাখিয়া তাহার ফটোগ্রাফ গৃহীত হইল। গোস্বামিগণের দুই একজন মূর্ত্তির নিকট উপবিষ্ট হইলেন।

বেলা ২টার সময় কার্য্য শেষ হইল। আমি তখন স্নানার্থে এক পুষ্করিণীতে গমন করিলাম। পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম ভরতপুরবাসিনী কৃষকরমণীরা এই ফটোগ্রাফ তোলা লইয়া অত্যন্ত শঙ্কিত ও দুঃখিত। মুগ্ধা জানপদমহিলারা আমাকে সশঙ্ক ভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—এতদিনে গোপীনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন; অনেক বৃদ্ধা সাশ্রুনেত্রে বলিলেন "আমরা পুরুষানুক্রমে শোক দুঃখেতে কাতর হইয়া গোপীনাথের শরণাপন্ন হইতাম, এক্ষণে আমরা কাহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইব।" আমি বুঝাইয়া দিলাম যে, গোপীনাথের কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, তিনি যেমন ছিলেন এক্ষণেও তেমনি থাকিবেন। কিন্তু দুই একজন বলিলেন, "কোম্পানীর লোকে গোপীনাথের মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কলে ধরিয়া লইয়া গেল।"

যাহা হউক বেলা ৩॥০ টার সময় আমরা গোস্বামিদিগের গৃহে গোপীনাথের প্রসাদ পাইলাম। গোপীনাথ কচুর মুখীর ডাল্‌না এবং মিষ্টবিরহিত আম্‌সীর অম্ল বড় ভাল বাসেন। তজ্জন্য ভোগে প্রত্যহ তাহাই প্রদত্ত হয়। ভরতপুর গ্রামে একটী কলাগাছ আছে বলিয়া বোধ হইল না। কারণ ভরতপুর ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের কোন পল্লীতে আমরা শালপাতে আহার করি নাই। হরেকৃষ্ণ গরু দুইটীকে খাব্‌য়ার দিয়া প্রসাদ পাইল। কিন্তু সরলমতি হরেকৃষ্ণ গোপীনাথের আহার রুচির প্রশংসা করিতে পারিল না।

আহারান্তে আমি গোস্বামিদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের কুলজী ও গোপীনাথসম্পর্কীয় তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা প্রথমে কাগজ কলমের আপত্তি করিলেন, কিন্তু আমি ব্যাগ হইতে কাগজ কলম দোয়াত প্রভৃতি প্রদান করিলে তাঁহারা ৩৪ জনে ২।৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও কুলজী নির্ণয় করিতে পারিলেন না এবং কহিলেন গোপীনাথের ইতিবৃত্তাদি সমস্তই সপ্তাহের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইবেন—কিন্তু অদ্যাবধি তাহা আমার হস্তগত হয় নাই। শুনিলাম পঞ্চকোটের রাজা গোপীনাথের সেবার জন্য বহু ভূমি দিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় কয়লার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহার আয় ৮।১০ হাজার টাকা হইয়াছে; কিন্তু সে সম্পত্তি তাঁহাদের

হস্তান্তরিত। অথচ গোপীনাথের এখানে উপবাসের উপক্রম উপস্থিত। যাহা হউক অনেক কৃষকের নিকট যে সুন্দর তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, গোস্বামিগণের নিকট তাহার একাংশ প্রাপ্ত হইলাম না। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত কবিওয়ালাদের সন্ধান করিলাম, এ প্রদেশ কাব্যের উর্ব্বর ক্ষেত্র। শেষরাত্রিতে শক্তিপুরযাত্রা করিলাম। হরেকৃষ্ণর গাড়ী মৃদুগতিতে চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই পূর্ব্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত হইল এবং নবোদিত সূর্য্যকিরণে পক্ক ধান্যক্ষেত্র সকল অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিল। এমন সময় জেমো হইতে শক্তিপুরের পথে ৭ম অধ্বশৈল অতিক্রান্ত হইল। ইহার অনতিদূরে ৬।৭টী আম্র বৃক্ষ ছায়াতলে এক পীরের আস্তানা দেখিলাম। পরে সীজগ্রামের উত্তর দিয়া নোনাই নদী অতি কষ্টে পার হইলাম। এস্থানে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া কিছু দূর পদব্রজে চলিলাম। হরেকৃষ্ণের গাড়ী নোনাইএর জলে ডুবিয়া গেল এবং গরু দুটী বহু কষ্টে কর্দ্দম অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিল। হরেকৃষ্ণ পাকা গাড়োয়ান না হইলে এ স্থান পার হইতে ২।০ ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। আর ২ খানি গাড়ী কাদায় পুতিয়া গেল, কিন্তু হরেকৃষ্ণের বলে ও কৌশলে তাহারা নোনাই পার হইয়া গেল। অন্য গাড়োয়ানদ্বয় বলিল, কোন কোন সময়ে এক এক গাড়ী ৫।৬ ঘণ্টা কাল নোনাইতে কর্দ্দমে পড়িয়া থাকে; পরে অন্য লোকের সাহায্যে উঠিতে পারে। এ স্থানের মাটী লৌহ-কঠিন। নোনাই নদীর দুই তীরেই লোকে ঘুটিং তুলিয়াছে। নদী পার হইয়া আমরা পদব্রজেই চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে ১১শ অধ্বশৈল অতিক্রম করিলাম। এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রাচীন পুষ্করিণী। এক কৃষক কহিল, বহু নরমুণ্ড এই পুষ্করিণীতে আছে। সম্ভবতঃ এই স্থান একটী ডাকাতের আড্ডা ছিল। তৎপরে আমরা লোহাদহ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে দেখিলাম রাস্তা লোকের ঘরবাড়ী হইতে ২০।২৫ ফিট নিম্ন। মথুরায় যেমন বলিরাজার টিলা ও কংসটিলা সকল রাস্তা হইতে ৩০।৪০ হাত উচ্চে স্থিত, এখানকার গৃহাদিও সেইরূপ উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত। বর্ষাকালে ডোঙা ভিন্ন গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাওয়া যায় না। লোহাদহ একটী বড় গ্রাম, পূর্ব্বে এই গ্রামে চন্দ্রা পাটনী নামে এক প্রসিদ্ধ কবিওয়ালী ছিল। ক্রমে গরুর গাড়ী উচ্চ পাহাড় হইতে ৩০ হাত নিম্নে বাবলা নদীর ধারে আসিয়া পৌছিল। জলাঙ্গী নদী ভিন্ন এত উচ্চ পাহাড় আমি কোন স্থানে দেখি নাই। বাব্‌লা নদী এখানে তীব্র বেগশালিনী, শুনিলাম বর্ষাকালে বাব্‌লার স্রোতোরাশি ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হয়। কারণ তখন কুয়ে, ময়ূরাক্ষী, টিলে, ঘাড়মোড়া, কুড়পুতো, ব্রহ্মাণী, দ্বারকা প্রভৃতি নদী এবং ১১টী কাঁদড়ের জল বাব্‌লায় আসিয়া পড়ে। যাহা হউক এখানকার খেয়াঘাটে পারের ব্যবস্থা ভাল, নৌকাযোগে আমরা বাব্‌লা উত্তীর্ণ হইলাম। মাঝিটী অপর পারে আসিয়া সাহায্য করিয়া গাড়ী খানি পাহাড়ের উপর উঠাইয়া দিল। বাব্‌লা নদী পার হইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। কেবল ধান্য-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে ইক্ষু, সরিষা, তিসি, অরহর এবং তুঁতপাতার ক্ষেত্র সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃই শস্যশ্যামলা প্রকৃতি প্রান্তরে সরিষার ফুলের সোনার আঁচল উড়াইতে

লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলা বাগান এবং বহুতর তালেতর বৃক্ষ দৃষ্টিপথের অন্তর্বর্ত্তী হইতে লাগিল। কখন কখন পল্লী সমীপে গাঁদাফুলের ক্ষেত্র নয়নের তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা বাজারশোঁ নামক বৃহৎ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ১৪শ অধ্বশৈল অতিক্রান্ত হইল। ইহার সান্নিধ্যে কোন সাহেবের একটী রেশমের কুঠী অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে হরেকৃষ্ণের গাড়ী শক্তিপুরে প্রবেশ করিল। এখানে বহু সংখ্যক নারিকেল বৃক্ষ ও কলাবাগান দৃষ্ট হইল। বৃহৎ বৃহৎ বানর সকল এখানে চতুর্দ্দিক্ লাফালাফি করিতেছিল। হরেকৃষ্ণ এক বকুল তলায় গাড়ী রাখিয়া দুর্গাদাস বাবুর পরিচিত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সাহার সন্ধানে বাহির হইল এবং ১৫ মিনিট পরে তাঁহার সন্ধান পাইয়া পুনরায় গাড়ী জুড়িয়া গঙ্গাতীরের দিকে লইয়া গেল। নবীন বাবুর বাড়ী ইহার নিকটেই অবস্থিত। গঙ্গাতীরের নিকট ২।৩টী ক্ষুদ্রাকার মন্দির অতিক্রম করিয়া আমরা এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গাড়ী রাখিয়া স্নানের চেষ্টা করিলাম। নবীনবাবুকে দুর্গাদাস বাবুর পত্র দিলাম। তিনি সেদিন বিশেষ ব্যস্ত, কারণ শক্তিপুরের বারোয়ারী পূজা উপস্থিত এবং ঐ বারোয়ারীতে তিনি একজন প্রধান পাণ্ডা।

যাহাহউক আমরা গঙ্গাস্নানাদি সমাপনান্তে কিছু জলযোগ করিয়া কপিলেশ্বরের পুরোহিতের সন্ধান লইলাম। বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেদিনকার মত পূজা শেষ করিয়া বাটীতে আসিয়াছিলেন। তথাপি তিনি আমাদের অনুরোধে প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কপিলেশ্বর মন্দিরে যাইতে সম্মত হইলেন। তখন বেলা ১২॥০ টা। আমরা আহারাদি না করিয়াই কপিলেশ্বর যাত্রা করিলাম। গঙ্গার চড়ার উপরে জই ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম। কিয়ৎক্ষণ উত্তরদিকে গমন করিয়া ডাকুরার খাল পার হইয়া কপিলেশ্বরে গিয়া পৌঁছিলাম।

বেলা ১॥ টার সময় আমরা কপিলেশ্বর পৌঁছিলাম। কপিলেশ্বর শক্তিপুরের এক ক্রোশ দূরে উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কপিলেশ্বর শিবপুর ও শক্তিপুরের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। শীতকালে ভাগীরথী কপিলেশ্বরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে প্রবাহিত ছিলেন। বর্ষাকালে গঙ্গার জল, মন্দিরের পূর্ব্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া থাকে। ঈশান কোণে সিমুলডাঙ্গা গ্রাম। কপিলেশ্বরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে ডাকুরার খাল এবং খাল সন্নিহিত তরনী-পুর। পূর্ব্বে কপিলেশ্বরের পশ্চিমে দ্বারকানদী প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে দ্বারকা প্রায় ১॥ দেড় ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত। দ্বারকার খাতপরিবর্ত্তনে মধ্যস্থলে সরিষার বিলের উৎপত্তি হইয়াছে। ডাকুরার খাল সরিষার বিলের মধ্য দিয়া দ্বারকা ও গঙ্গাকে সংযুক্ত করিয়াছে। বর্ষাকালে কপিলেশ্বরের দক্ষিণেই গঙ্গা ও দ্বারকার সঙ্গম হয়। তখন কপিলেশ্বর শক্তিপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হন। কপিলেশ্বরের অবস্থান পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন দুর্গের ন্যায়। প্রয়াগের দুর্গ যেমন গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত, কপিলেশ্বরের প্রাচীন দুর্গ সেইরূপ পূর্ব্বে গঙ্গা দ্বারকার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় বৃদ্ধগণের নিকট এবং শিবপুরের এক প্রাচীন গোয়ালার নিকট শ্রুত প্রবাদ

এই যে, ইহার প্রাচীন নাম "আঠার বিঘার গড়বাড়ী"। প্রবাদের মূলে সত্য অবশ্যই নিহিত আছে। কিন্তু কোন্ রাজার "গড়বাড়ী" বা দুর্গ প্রাসাদ তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ, মহোদয় "পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা" নামক যে ফতেসিংহ পরগণার প্রাচীনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন কপিলেশ্বরের প্রাচীনতত্ত্ব জানিবার আর উপায় নাই। তদনুসারে কপিলেশ্বর ফতেসিংহের রাজা সবিতারায়ের প্রপৌত্র জয়রাম রায়ের স্থাপিত। সবিতারায় মানসিংহের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার প্রপৌত্র জয়রাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাকে অতি প্রাচীন বলা যায় না। কিন্তু কপিলেশ্বরের অবস্থান দৃষ্টে এই প্রাচীন প্রবাদের আঠার বিঘার গড়বাড়ীকে অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় উক্ত আছে যে,—

"যেনাকারি জগৎপবিত্রতটিনীতীরে শিবস্থাপনং
সৌধং কারুবরৈঃ সুসক্ষমতিনা নির্ম্মায় মেরোঃ সমং।
ঘট্টশ্চাপি কুলস্য তারণবিধৌ গোলোকসোপানকং
সোঽয়ং শ্রীজয়রামসংজ্ঞনৃপতির্যৎকীর্ত্তিরেতাদৃশী॥"

অর্থাৎ—জয়রাম পবিত্র জাহ্নবীতীরে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন, সুদক্ষ শিল্পিদিগের দ্বারা মেরু সদৃশ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বংশোদ্ধারের জন্য গোলোক-গমনের সোপান স্বরূপ ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই শ্লোকে শিব-মন্দির ভিন্ন কপিলেশ্বরের অন্য কোন উল্লেখ নাই। তৎপরে জয়রামের পৌত্র সন্তোষ বা যদুনন্দনের সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কপিলেশ্বরের প্রকৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। যদুনন্দনকে পুণ্ডরীক কুলের তিলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ শ্লোক দৃষ্ট হয় ;—

"ত্বৎকীর্ত্তিঃ কপিলেশ্বরস্য পরিখা সংযুক্তবাটীকৃতি-
স্তত্রৈবাদ্ভুতডাকরাবতরণদ্বারস্থবেদীকৃতিঃ।
প্রাচীরাবৃতমণ্ডপাঃ সিততরা কৈলাসশৃঙ্গোপমা
অন্তর্বেদিরপীষ্টকাসুরচিতা কোঠাচতুষ্কং তথা॥ ৩পঃ ১৬ শ্লোক
দ্বারস্থৌ বকুলৌ পরিষ্কৃততলৌ তত্র স্থিতাঃ সর্ব্বদা
সন্ন্যাসিব্রজবাসিবৈষ্ণবগণা ভিক্ষার্থমভ্যাগতাঃ।
চণ্ডীপাঠশিবার্চ্চনবিধিরতা বিপ্রাস্তদভ্যন্তরে
নিত্যং ভাগবতং পঠন্তি চ তথা কেচিন্মহাভারতং॥১৭
প্রাতর্ব্বিল্বদলৈঃ শিবার্চ্চনবিধিঃ সংস্নাপ্য গঙ্গাজলৈ
র্মধ্যাহ্নেঽপ্যুপচারষোড়শযুতং সংস্নাপ্যপঞ্চামৃতৈঃ

সায়ং পুষ্পচয়েন মাল্যনিচয়ৈ র্বেশং বিধায়াদ্ভুতং
ধূপৈর্দীপচয়ৈর্জপৈঃ স্তুতিচয়ৈঃ শঙ্খাদিবাদ্যোৎসবৈঃ ॥১৮
শম্ভুর্দ্বাদশলক্ষপূজনমভূচ্ছ্রীভীমরায়ৈঃ কৃতং
তৎসংখ্যাদ্বিগুণঞ্চ তৎসুতকৃতং যত্রোপহারৈঃ শুভৈঃ।
বিপ্রাণামযুতঞ্চ ভোজিতমভূৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বং পুরা
তৎসংখ্যাদ্বিগুণঞ্চ তৎসুবিহিতং সন্তোষরায়ৈঃ পরং ॥১৯
শিবোপবনবর্ণনং তদিহ নারিকেলাকুলং
রসালকুলসঙ্কুলং পনসপূগবিম্বৈর্যুতং।
সচম্পকসুদাড়িমং বদরজম্বুরম্ভাশিবা
কদম্ববটপিপ্পলৈর্বকুলতালবংশৈর্বৃতং ॥২০
জবা-টগর-মল্লিকা-তুরগ-শক্র-সেফালিকা-
অগস্ত্য-বক-যূথিকা-কনক-কুন্দমন্দারকাঃ।
কুরণ্টনবমালিকা-তুলসিকাস্তথা কাঞ্চনঃ
সুজাতিরথ কেতকী গিরিশপুষ্পবাটীগতাঃ ॥২১
গঙ্গানন্তফলা শিবস্য নিকটে ক্রোশার্দ্ধমাত্রে স্থিতা
দ্বারি দ্বারিকয়া বিমিশ্রিতনদী সজ্যোঽপি গঙ্গাসমঃ।
দেশোপ্যেষ তথাতি পুণ্যফলদঃ শম্ভুস্বয়ম্ভূর্যতঃ
পুণ্যাঢ্য শিবরাত্রিরত্র বিহিতা পূজোপবাসাদিভিঃ ॥২২
গঙ্গাবঃ শিবমন্দিরাবধি ঘনশ্রেণীনৃণাং রাজতে
দিব্যস্ত্রীবহুভাগতাগততয়া সংঘর্ষণাদাকুলা।
গঙ্গাসঙ্গমতস্তথৈব মিলিতা ঘট্টাপ্রঘট্টান্বিতা
দ্বারি দ্বারি মহাবিমর্দ্দবিহিতা বিস্তারিতাপ্রাঙ্গণে ॥২৩
শম্ভোর্দর্শনলালসা শিববলিব্যাসক্তহস্তাদিবা
দ্বারস্থৈর্নিহতা দ্বিজৈর্দৃঢ়তরৈরাচ্ছাদ্য তাং স্তান্বলীন্।
রাত্রৌ প্রাঙ্গণমঙ্গনাগণযুতং প্রত্যেকদীপান্বিতং
যামং যামমভূচ্ছিবস্য বিধিবৎ পূজা চ নানোৎসবৈঃ ॥২৪
নানাদেশিস্বদেশিলোকনিবহৈঃ সংযুক্ত কোলাহলৈ
র্নানাকৌতুকমঙ্গলৈরপি যুতা সংযুক্ত তৌর্য্যত্রিকৈঃ।
নানার্থক্রয়বিক্রয়ান্বিতবণিক্সংঘশ্চ দীপান্বিতৈ-
র্বাটী শ্রীকপিলেশ্বরস্য শুশুভে লোকাঃ সুখং জাগ্রতি ॥২৫
কেচিৎস্বর্ণবিচিত্রচিত্রমদদুঃ কেচিৎ স্রজং কাঞ্চনীং
কেচিদ্রাজতমুদ্রিকাদিরচিতং চন্দ্রাতপং চামরং।

কেচিন্মাল্যবরং সুপুষ্পনিচয়ং কেচিচ্চ দিব্যাম্বরং
ধূপং দীপমপি প্রদায় শিবয়োঃ কেচিৎস্তুতিং কুর্ব্বতে ॥২৬

বংশীবদন নামক ব্রাহ্মণ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপে কপিলেশ্বরের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন :—অর্থাৎ (ব্রাহ্মণগণ যদুনন্দন বা সন্তোষরায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন) কপিলেশ্বরের পরিখাযুক্ত বাটী, ডাকরা নদীতে অবতরণার্থ দ্বারস্থ বেদী, কৈলাস শৃঙ্গের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রাচীরাবৃত মণ্ডপ, ইষ্টকরচিত অন্তর্ব্বেদী এবং চারিটী কোঠা এই সকল আপনার কীর্ত্তি ॥১৬

কপিলেশ্বর মন্দির দ্বারস্থ দুইটী বকুল তরুর পরিষ্কৃত তলে সন্ন্যাসী, ব্রজবাসী বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্বদা ভিক্ষার্থ উপস্থিত হয়, মন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীপাঠ ও শিবপূজায় রত আছেন, কেহ ভাগবত, কেহ বা মহাভারত পাঠ করিতেছেন ॥১৭

প্রাতঃকালে গঙ্গাজলে শিবকে স্নান করাইয়া শিবপূজা হয়, মধ্যাহ্নে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা হয়, সন্ধ্যাকালে পুষ্পমালায় অপূর্ব্ব (শৃঙ্গার) বেশ বিধান পূর্ব্বক ধূপ, দীপ, জপ, স্তব এবং শঙ্খাদিবাদ্যোৎসবে শিবপূজা হয়।১৮

(জয়রামের পুত্র) ভীমরায় দ্বাদশ লক্ষ শিবপূজা করিয়াছিলেন, এবং সংকল্পপূর্ব্বক দশসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। তৎপুত্র সন্তোষরায় শুভ উপচারে চব্বিশ লক্ষ শিবপূজা এবং বিশসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন ॥১৯

শিবমন্দির সংলগ্ন উপবনে নারিকেল, আম্র, কাঁটাল, গুবাক, বিল্ব, চম্পক, দাড়িম্ব, জাম, রম্ভা, শিবা, কদম্ব, বট, পিপ্পল, বকুল, তাল ও বংশবৃক্ষ সকল বিদ্যমান ছিল।

শিবের পুষ্পবাটিকায় জবা, টগর, মল্লিকা, তুরগ, শক্র, সেফালিকা, অগস্ত্য, বক, যূথিকা কনক, কুন্দ, মন্দার, কুরণ্ট, নবমালিকা, তুলসী, কাঞ্চন, জাতী এবং কেতকী প্রভৃতি বিবিধ ফুলের গাছ ছিল।২১

শিবের অর্দ্ধক্রোশ দূরে গঙ্গা ছিলেন।* দ্বারের নিকট দ্বারিকা নদীর সহিত মিলিত নদীসংঘ ইহাও গঙ্গাসম পুণ্যপ্রদ। এই পুণ্যফলদ দেশে স্বয়ম্ভু শিব বিদ্যমান। এইস্থানে পূজা এবং উপাসনা দ্বারা পুণ্যময় শিবরাত্রি উৎসব সম্পন্ন হইত।২২

গঙ্গাতীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট মনুষ্যশ্রেণী, সুন্দরী স্ত্রীদিগের যাতায়াত সংঘর্ষে আকুল হইয়া বিরাজ করে। গঙ্গাসঙ্গম স্থল হইতে মনুষ্যগণ মন্দিরের দ্বারে সমাগত হইয়া কোলাহল পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে বিস্তৃত হইয়া পড়িত।২৩

স্বদেশী ও বিদেশী নানা লোকের কোলাহল মিশ্রিত বাদ্যসংযুক্ত মাঙ্গলিক কৌতুকযুক্ত এবং দীপমালাপরিশোভিত কপিলেশ্বর মন্দির অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত এবং নানা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ার্থ বণিক্ সকল এবং যাত্রিগণ সুখে রাত্রি জাগরণ করিত।২৪

---

* বর্ত্তমান সময়েও গঙ্গা ঠিক আধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহাতে সন্তোষরায়ের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় কিন্তু কপিলেশ্বর ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরেই বিদ্যমান ছিল.

কেহ স্বর্ণ খচিত বিচিত্র চিত্র, কেহ কাঞ্চনমালা, কেহ রৌপ্যখচিত চন্দ্রাতপ এবং চামর, কেহ পুষ্প, কেহ মাল্য, কেহ সুন্দর বস্ত্র, কেহ ধূপ দীপ প্রদান করিত কেহ বা শিবের স্তব করিত।

বংশীবদন বিরচিত উপরোক্ত বিবরণ স্মরণ পূর্ব্বক কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থা দর্শন করিলে চিত্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া উঠে। কপিলেশ্বরের পূর্ব্বমন্দিরের প্রস্তর ও ইষ্টকস্তূপাচ্ছন্ন উচ্চ ভূখণ্ডে বসিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। এখনও সেই আঠার বিঘায় গড়বাড়ী, আঠার কাঠার পর্য্যবসিত হইলেও মন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গা সৈকতের কৃষিক্ষেত্র হইতে ২৫ ফিট উচ্চ এবং প্রবল প্লাবনেও জলমগ্ন হয় না। অতিদূরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে দাদপুর, বেলডাঙ্গা,রামপাড়া, নলাহাটী প্রভৃতি শ্যামলপাদপকুন্তলা ইক্ষুক্ষেত্রালঙ্কৃতা গ্রামশ্রেণী; অনতিদূরে শীতশীর্ণতোয়া ভাগীরথীর সৌরকরবিম্বিত রজতবিনিন্দিত ক্ষীণস্রোতঃ; মন্দির সান্নিধ্যে গঙ্গা-সৈকতে কলাই, গম, তিসি এবং ঐই ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী বাবলা গাছ; অদূরে কৃষ্টি-ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা-সংস্থাপন-তৎপর তপেন্দ্র বাবু,—আমার মনে যুগপৎ নানা ভাবের অবতারণা করিতে লাগিল। বিবিধ তরুরাজিবিরাজিতা কপিলেশ্বরের সেই উপবনবাটিকা এক্ষণে অন্তর্হিতা। পাদপশ্রেণীর মধ্যে কেবল উত্তরে চরণামৃত কুণ্ড সান্নিধ্যে একটী পনস বৃক্ষ, তৎপরে একটী তেঁতুল গাছ, ঈশান কোণে দুইটী প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ, বায়ুকোণেও একটী বৃহৎ বিল্বতরু, পূর্ব্বদিকে ৺মুক্তকেশী দেবী প্রতিষ্ঠিত মন্দির সান্নিধ্যে আর একটী বেল গাছ। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ৭টী আম্র গাছ। কিন্তু কোন গাছই ১৫০ বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। বংশীবদনের কদম্ব দাড়িম্ব, বকুল চম্পকের চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান নাই।

অশেষ পুষ্পালঙ্কৃতা পুষ্পবাটিকার মধ্যে কেবল কলিকা ফুলের ৫টী গাছ ভিন্ন কোন পুষ্প বৃক্ষ সেখানে নাই।

বর্ত্তমান মন্দির ১২৪১ সালে নির্ম্মিত। মন্দিরালিন্দের দক্ষিণ প্রাঙ্গণের দিকে একখানি ভিত্তি শিলাস্থ প্রস্তরফলকে "ভক্তিহীন শ্রীজগন্মোহন বর্ম্মণ মাহাতা। সন ১২৪১" এইরূপ লিখিত আছে।

পুরোহিত শ্রীবিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানিলাম শক্তিপুর সংলগ্ন মহাতা গ্রামবাসী জগন্মোহন মাহাতা স্বীয় পুত্র কেদার মাহাতার জন্মোপলক্ষে ১২৪১ সালে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশাবলী খাগড়ায় বাস করিতেছেন। কপিলেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ইষ্টক বিরচিত কেবল মন্দিরের প্রবেশদ্বারে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীন দ্বারশিলা বিদ্যমান আছে। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪০ হাত হইবে। মন্দিরের শিখর দেশে পঞ্চমূর্ত্তীর চিহ্ন-জ্ঞাপক পাঁচটী চূড়া; চূড়াগুলি এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। কেবল নৈর্ঋত কোণের চূড়ায় চক্র আছে, তদ্ভিন্ন সব ভগ্ন। মন্দিরের গর্ভদেশ সমচতুর্ভুজাকার, প্রত্যেক বাহু ৮ হাত। মন্দির মধ্য ২৫ হাতের উপর নিরেট গম্বুজাকার খিলান। প্রায় দুই হাত উচ্চ ও তিন হাত ব্যাস বিশিষ্ট অনাদি লিঙ্গ মধ্যস্থলে অবস্থিত। মস্তকে ক্রমাগত জলপতনে গভীর গর্ত্ত হইয়া

চিত্র ৩।

কপিলেশ্বর শিব মন্দির—শক্তিপুর—(১৬০ পৃঃ)।

চিত্র ৪।

হইয়া গিয়াছে। কপিলেশ্বরের এই অনাদিলিঙ্গ কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের ক্ষুদ্রতর ভাব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লিঙ্গমূর্ত্তিতে কোন গৌরীপট্ট বা অন্য চিহ্ন নাই। দেখিলে অন্ততঃ ২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইতে পারে। মন্দির দক্ষিণদ্বারী, বহির্ভাগের সম্মুখে উচ্চদেশে বৃষ মূর্ত্তি খোদিত, তদুপরি দুইপার্শ্বে সিংহ মূর্ত্তি। দক্ষিণের অলিন্দ ১৬ হাত দীর্ঘ ও ৬ হাত বিস্তৃত। অলিন্দে খিলান যুক্ত ৩টী ফুকর। পূর্ব্বের ও পশ্চিমের অলিন্দের পরিমাণ একরূপ, কেবল ৩টীর পরিবর্ত্তে ২টী ফুকর।

কপিলেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন পূর্ব্বদক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে ২০ হাত উচ্চ ৺চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির অবস্থিত। ইহার ভিত্তিপ্রদেশ বর্ষার গঙ্গাস্রোতে পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় ২।১ বার বন্যা আসিলে মন্দির গঙ্গাস্রোতে পড়িয়া যাইবে। ফতেসিংহের রাজবংশের মধ্যে বাঘাডাঙ্গার রাণী মুক্তকেশী দেবীর পিতামহ ৺শম্ভুনাথ এই চন্দ্রশেখর শিবপ্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে উক্ত মূর্ত্তি বিনষ্ট হইলে রাণী মুক্তকেশী দেবী বর্ত্তমান শিব-লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল বলিয়া বিগ্রহ ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই।

এই মন্দিরের ৮ হাত দক্ষিণে রাণী মুক্তকেশীর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রাকার তুলসীমঞ্চ। তুলসী মঞ্চটী ৩ ফুট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিকে পদ্মাকৃতি কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকালঙ্কৃত। বর্ষার গঙ্গাপ্রবাহে তুলসীমঞ্চের পূর্ব্বাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অচিরেই মঞ্চটী গঙ্গাগর্ভস্থ হইবে। তুলসীমঞ্চের একখানি ইষ্টকে "১২৪৫-২৬শে মাঘ বালুদাস" এই কয়টী কথা খোদিত।

তুলসীমঞ্চের দক্ষিণে কয়েকটী কলিকা ফুলের গাছ। ইহার নিকটে একটী ভগ্ন ইষ্টক গৃহ। শুনিলাম এই গৃহে শ্যামাপূজার সময়ে প্রতিবৎসর মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তির পূজা হয়। চন্দ্রশেখর শিবের সেবা এবং কালীপূজার জন্য ফতেসিংহ পরগণায় কিছু দেবোত্তর ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে।

কপিলেশ্বরের প্রাচীন মন্দির কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বিনির্ম্মিত ছিল। উপরোক্ত তুলসী মঞ্চের পূর্ব্বদিকে একটী প্রস্তরস্তম্ভের শিরোদেশ পড়িয়া রহিয়াছে। আর একখানি প্রস্তর খণ্ড মন্দিরচত্বরে পতিত আছে। এতদ্ভিন্ন কপিলেশ্বর হইতে শক্তিপুরে আসিবার পথে আম্র বাগানের মধ্যে ২টী প্রস্তরস্তম্ভের কিয়দংশ পতিত আছে। মন্দিরস্থ ভূখণ্ডের দক্ষিণাংশে বিল্ববৃক্ষ মূলে কারুকার্য্যালঙ্কৃত একটী স্তম্ভশীর্ষ বিদ্যমান আছে। প্রস্তরের অবস্থান ও শিল্পের আদর্শে এই গুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

কপিলেশ্বরের দক্ষিণপশ্চিম দিকে ভাকুরার খালের দিক ইষ্টকনির্ম্মিত সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত সোপানাবলীর মধ্যে ১০টী সোপান এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। সোপানগুলি প্রায় ১০০ ফিট দীর্ঘ হইবে এবং এক একটী সোপান দেড় হাতের অধিক প্রসরবিশিষ্ট। ৪টী সোপানের পরে ৫ম সোপান তিন হাত প্রসরবিশিষ্ট; জল-সন্নিহিত সর্ব্বনিম্ন সোপানে ৪ হাত উচ্চ মৃত্তিকা-স্তর পড়িয়াছে। একস্থানে দক্ষিণাংশে সোপানের একাংশের গাঁথনি ভাঙ্গিয়াছে। সে ভগ্নাংশটী ৮ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ এবং ৪ হাত উচ্চ; কিন্তু সেই ভগ্নাংশের গাঁথনি এমন কঠিন

যে তাহা হইতে একখানি ইষ্টকও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইহার গাঁথনি চুণ-সুরকি-মিশ্রিত নহে। সোপানের মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের বৃহৎ ৫ খানি প্রস্তরখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। বোধ হয় সেগুলি প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরখণ্ড। এই সোপানাবলী পশ্চিমাংশে ডাকরা নদীতে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সোপানে বসিয়া ডাকরার জল স্পর্শ করা যায়। ইহাই জয়রাম বিনির্ম্মিত গোলোকের সোপানসদৃশ ঘাট অথবা সন্তোষরায়ের ডাকরার জলাবতরণিকা। এই অজ্ঞাত সোপানাবলীর অবস্থান দর্শনে ইহাকে অন্ততঃ চারি শত বৎসরের অপেক্ষা প্রাচীন বলাই সুসঙ্গত। কারণ সোপানগাত্রে উৎপন্ন একটী আম গাছের বয়স একশত বৎসরের ঊর্দ্ধ হইবে। এই সোপানাবলীর নিম্নস্থ খালের অপর তীরে সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রয় নিমিত্ত একখানি বৃহৎ আটচালা ছিল। এক্ষণে তাহার ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে।

কপিলেশ্বর মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাইত কৃষ্ণনগরের অধিপতি। বহুপূর্ব্বে শক্তিপুর গ্রাম এবং কপিলেশ্বরের দেবালয় ফতেসিংহ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ফতেসিংহ পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিপুর নদীয়ারাজের পলাশী পরগণার অধিকারভুক্ত হয়। এক্ষণে পুনর্ব্বার উক্ত স্থান পলাশী হইতে খারিজ হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম "পরগণা পলাশীর খারিজা"। কপিলেশ্বরের উত্তরস্থিত শিবপুর গ্রাম শিবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দেবোত্তর। এক্ষণে শক্তিপুরের দেবোত্তর অংশ নদীয়ারাজের অধিকারভুক্ত। কিন্তু মূল শক্তিপুর কাশিম-বাজারের মহারাজের অধিকারে স্থিত। উক্ত দেবোত্তর শিবপুর হইতেই কপিলেশ্বর মহাদেবের সেবা নির্ব্বাহিত হয়। এতদ্ভিন্ন ফতেসিংহস্থ জেমো ও বাঘাডাঙ্গার প্রদত্ত দেবোত্তর হইতেও পূজাদির কিছু সাহায্য হয়।

শিবরাত্রির সময়ে প্রতিবৎসর এখানে ২ মাসব্যাপী একটী মেলা বসিয়া থাকে এবং শিবচতুর্দ্দশীর দিন মহাসমারোহে শিবের অভিষেক ও পূজা হয়। প্রথমে কৃষ্ণনগরের মহারাজ, পরে জেমো ও বাঘাডাঙ্গার ও তৎপরে শক্তিপুরের জমিদারের পূজা হয়। মেলার সময়ে পূর্ব্বে ৩০।৪০ হাজার লোকের সমাগম হইত। এক্ষণে ১০।১৫ হাজারের অধিক যাত্রীর সমাগম হয় না। মেলাস্থলে অনেক সন্ন্যাসীও নানাস্থান হইতে আগমন করেন। ডাকরার খালের দক্ষিণে ৪।৫ শত হাত দূরে একটী প্রাচীন আম্রবাগান আছে। ইহাও কপিলেশ্বরের সম্পত্তি। এই বাগানেই প্রধানতঃ মেলা বসিয়া থাকে।

নদীয়াধিপতির পুরোহিত শ্রীগয়ানাথ চক্রবর্ত্তী ৪০।৫০ বৎসর কপিলেশ্বরের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। ইনি ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ এবং অনেক তত্ত্ব জানেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার শ্যালিকাপুত্র শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পূজা করিতেছেন। ইহার বয়ক্রম ২৪।২৫ হইবে। ইনি আমাদের প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে কপিলেশ্বরের সেবাদির অবস্থা স্মরণ করিলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়। মন্দিরের দক্ষিণপশ্চিমে একটী ছোট ভোগের ঘর আছে মাত্র। প্রত্যহ চারি আনার ভোগ প্রদত্ত হয় এবং সেই প্রসাদ শিবপুরের প্রজাদিগের মধ্যে পালা অনুসারে বিতরিত হয়

প্রজার মধ্যে ১৬ ঘর গোয়ালা এবং ৩ ঘর হাজরা (অর্থাৎ হাড়ি) প্রধান। পুরোহিতের জন্য ১২ বিঘা দেবোত্তর নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার বার্ষিক খাজনা ১৩॥০ সাড়ে তের টাকা মাত্র। এতদ্ভিন্ন শিবরাত্রির সময়ে প্রতিমার দর্শনী প্রণামী প্রভৃতি সমস্ত পুরোহিত পান না। তজ্জন্য পুরোহিতকে ১৬ টাকা কর দিতে হয়। অথচ যদি ১৬ টাকার কম হয়, তথাপি তাহা দিতে হইবে। কেবল লোকের মানসিক পূজার দ্রব্যাদি সমস্তই পুরোহিত পাইয়া থাকেন। মেলাস্থলের খাজনার জন্য রাজবাড়ী হইতে ১০১ টাকা ডাক হয়, তৎপরে তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যে যে কেহ ডাকিতে পারেন। শুনিলাম গতবর্ষে লাভ হয় নাই, মন্দিরের পরিদর্শনের জন্য একটী ভৃত্য আছে। তাহার জন্য দেবোত্তর হইতে ৮ বিঘা চাকরাণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

গত কয়েক বৎসর মেলাস্থলে জমিদারের পক্ষভুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে কালীপূজা এবং তদুপলক্ষে যাত্রাগান প্রভৃতি হইতেছে। শিবরাত্রির দিন একটী চিড়া মহোৎসব এবং তৎপর দিন মধ্যাহ্নকালের অন্ন মহোৎসবে বৈষ্ণব ও কাঙ্গালীদিগকে অন্নভোজন করান হয়। হায়! যে পবিত্র দেবালয় এক সময়ে নিরন্তরনিনাদিত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে মুখরিত ছিল, যে স্থান শত সহস্র নরনারীর সমাগমসুলভ উৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাসে দিবারাত্র কোলাহলময় ছিল, সেই কপিলেশ্বর এখন ধ্বংসোন্মুখ নীরব নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে বিল্ববৃক্ষের পল্লবান্তরাল হইতে কলকণ্ঠ মধু শ্যামার বিষাদসঙ্গীত ভিন্ন কোন শব্দই শ্রুতিপথে প্রবেশ করে না।

তপেন্দ্র বাবুর ফটোগ্রাফ তোলা শেষ হইলে কপিলেশ্বর মহাদেবকে উদ্দেশ করিয়া বংশী-বদনের স্তব হইতে—

"জয় কপিলেশ্বর　　　জয় ভুবনেশ্বর,
জয় বিশ্বেশ্বর বিশ্বপতি।
জয় বক্রেশ্বর　　　জয় কপিলেশ্বর
বৈদ্যনাথ সুরনাথ নমস্তে ॥"

বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক শক্তিপুর যাত্রা করিলাম। তখন বেলা সাড়ে তিনটা। প্রায় চারিটার সময় শক্তিপুরে পৌঁছিলাম। সে দিন শক্তিপুরে বারোয়ারি পূজার অত্যন্ত ধুম। গঙ্গাতীরে গরুর গাড়ীতেই আমরা সে রাত্রি যাপন করিলাম। অতি ক্ষুদ্রস্থানে আমাদের দুইজনের শয়নে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইল। বৈকালে শক্তিপুরে বারোয়ারী পূজা দেখিলাম। শক্তিপুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহা উত্তম ব্যবসায়ের স্থান। শক্তিপুরের বাজারেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। স্কুল গৃহের নিকট হইতে বাজারের চারিপার্শ্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং মধ্যে মধ্যে বিবিধ কৌতুকপ্রদ সঙ। কোথাও কৃষ্ণলীলার নানারূপ বৈচিত্র্য, কোথাও রামলীলা কোনস্থানে শক্তিলীলা ইত্যাদি প্রতিমূর্ত্তি নানা নৈপুণ্যে গঠিত হইয়াছে। কোনস্থলে রাধিকা কৃষ্ণের পা ধরিয়া আছেন, সে স্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা,—"রাধা কলঙ্কিনী নাম, পায়ে ধরিস্ ছোঁচা শ্যাম"—এই প্রকার

নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখিলাম। কিন্তু সকলেই কলিকাতা হইতে সমাগতা বাইজীর গান শুনিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। প্রাতঃকালে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আমরা টেঁয়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হরেকৃষ্ণের গাড়ী পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিল। পথ অত্যন্ত বন্ধুর, তজ্জন্য বড় কষ্ট হইতে লাগিল। এক হাত দেড় হাত উচ্চ আইলের উপর উঠিয়া গাড়ী যখন পড়িতে লাগিল তখন মস্তিষ্কে ঝনঝনি বোধ হইতে লাগিল। প্রায় ৩ ঘণ্টায় দেড় ক্রোশ পথ অতি কষ্টে চলিয়া দ্বারকা বা বাবলা নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। অপর পারে বৈষ্ণপুরের বাবুদিগের প্রকাণ্ড বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইল। বাবলার পূর্ব্বতীর দিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে ২।১টী গোলালুর ক্ষেত্র ভিন্ন মাঠ মরুভূমি সদৃশ। অবশেষে কৈগুড়ির ঘাটে নদী উত্তরণের জন্য উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নদীর পাহাড় বাবলার জলপৃষ্ঠ হইতে ৩০ হাত উচ্চ। তদ্দর্শনে কি প্রকারে এই পাহাড় দিয়া গরুর গাড়ী নামিবে তাহা ভাবিয়া আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। আমরা গাড়ী হইতে পাহাড়ের উপর নামিলাম। দুঃসাহসিক হরেকৃষ্ণ সেই উচ্চ পাহাড় হইতে ভীমবেগে নিম্নাভিমুখে গাড়ী চালাইয়া দিল। আমরা গরু দুইটীর প্রমাদ গণিলাম। কিন্তু হরেকৃষ্ণের গাড়ী-চালন-কৌশলে গাড়ীখানি অভগ্নাবস্থায় বাবলার জল সমীপে উপস্থিত হইল।

এস্থানে নদীতে গরুর গাড়ী পার হয় না, সুতরাং গাড়ী নৌকায় তুলিবার কোন উপায় নাই। মাঝি আমাদিগের বিশেষ অনুরোধে গাড়ী পার করিতে সম্মত হইল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, নদীর পশ্চিমতীরে পৌঁছিয়াও ৩০ হাত পাহাড়ে উঠা মহা কষ্টকর ও অসম্ভব বোধ হইল। মাঝিকে চারি আনার পয়সা দিতে চাহিলে সে অনেক সাহায্য করিল। আমি ও হরেকৃষ্ণ পশ্চাদ্দিক্ হইতে গাড়ী ধরিলাম। মাঝি ও তপেন্দ্র বাবু গরুযোজন স্থলে ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টা পরে গাড়ী উপরে উঠিল। ইতিমধ্যে গরু দুইটী হারাইয়া গেল। তখন হরেকৃষ্ণ প্রায় এক মাইল উত্তরদিকে যাইয়া গরু ধরিয়া আনিল। রামশরণ বাবুর সুন্দর বাগান দক্ষিণে রাখিয়া আমরা অপরাহ্ণে বৈষ্ণপুরে পৌছিলাম। বাম দিকে বাবুদিগের বাটীর বৃহৎ চত্বর দক্ষিণে রামধন দত্ত মুদীর দোকান। আমরা পদব্রজে চলিতেছিলাম। রামধন ভদ্রলোক বোধে, আতিথ্যের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল। ব্যবসায়ী মুদী রামধনের অতিথিপ্রিয়তা দৃষ্টান্তস্থানীয়। এরূপ অযাচিত আতিথ্য এ অঞ্চলে কোথাও দেখি নাই।

বৈষ্ণপুর ছাড়াইয়া ২০ মিনিটের মধ্যেই টেঁয়ায় পৌছিলাম। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুর নির্দ্দেশ মত প্রথমে শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। সেই স্থানে গাড়ী রাখিয়া আমরা বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধব দাসের বাস্তভূমির ফটোগ্রাফ লইবার জন্য চলিলাম। সমাগত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে সকলেই উদ্ধবদাস বৈষ্ণবদাসের বাস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৬০ বৎসর বয়স্ক

শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনেক তত্ত্ব অবগত হইলাম। বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের বাস্তু বা পাট বলিয়া যে ভূমিটুকু নির্দ্দিষ্ট, তাহাতে ২টী বকফুলের গাছ ও একটী নিম্ববৃক্ষ দেখিলাম। তাহার দক্ষিণে শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ বাবুর পিতা ৺গৌরগোপাল সেন গুপ্তের বাসস্থান। ইঁহার মাতামহের নাম ৺রামকৃষ্ণ মজুমদার, তাঁহার সহোদর কৃষ্ণকান্ত মজুমদার ওরফে বৈষ্ণবদাস। এই বংশীয় গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ই উদ্ধবদাস নামে খ্যাত হন। কৃষ্ণ-কান্ত মজুমদার ও গোকুলানন্দ সেন উভয়ে মালিহাটীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর ৺রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করিয়া রাধামোহন অমর হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত মজুমদার ও গোকুলানন্দ সেন উভয়ের নিকট রাধামোহনের হস্তলিখিত পদামৃতসমুদ্র বর্ত্তমান ছিল। টেঁয়ায় শুনিলাম যে, অত্রত্য দ্বিজহরিদাসের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রের সঙ্কলনকর্ত্তা।

ইহাঁর পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহম্মদপুরের সীতারামের কুলগুরু। বঙ্কিম বাবু ইহাঁকেই চন্দ্রচূড় ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর ও সীতারাম সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। অপ্রসঙ্গ বোধে উল্লেখ করিলাম না। গোকুলানন্দ সেন ও কৃষ্ণকান্ত মজুমদার যথাক্রমে উদ্ধবদাস এবং বৈষ্ণবদাস নামে অভিহিত হন। বৈষ্ণবদাসের অট্টালিকা-তেই তাঁহার দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী গৌরগোপাল সেন গুপ্ত বাস করেন। মূল পদামৃত-সমুদ্র পুঁথিখানি গৌরগোপাল বাবুর নিকট হইতে কাঁটোয়ার দক্ষিণস্থ করুই গ্রামের দীনবন্ধু বরাট লইয়া যান। অধুনা তিনি মৃত, তৎপুত্র শ্রীমুরারিপদ বরাট এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, মহাপ্রভুর প্রকৃত হস্তাক্ষর দাঁহুর গ্রামে মহান্ত উপাধিকারী কায়স্থদিগের বাটীতে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। দাঁহুর গ্রাম কাঁটোয়া হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণে। শুনিলাম টেঁয়াবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত মহাশয় টেঁয়া সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধব-দাসের কথা পরিষদের পাঠকগণ অবগত আছেন। বৈষ্ণবদাসের অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে তাঁহার নিখাত পুষ্করিণী বৈষ্ণবকুণ্ড নামে অদ্যাপি গ্রামের মধ্যস্থলে বিদ্যমান আছে এবং উদ্ধব দাস গুরুবংশীয়দিগের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহার নাম ঠাকুর-পুষ্করিণী রাখেন। উহা দ্বিজহরিদাসের বাটীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। দ্বিজহরিদাসের বংশধরেরা অদ্যাপি সেই ভিটায় বাস করিতেছেন। এই বংশীয় শ্রীমুরারিমোহন ঠাকুরের নিকট কোন কোন তত্ত্ব জানিয়াছি। উক্ত ঠাকুর-পুষ্করিণী এক্ষণে ৺বিনোদবিহারী ত্রিবেদীর অধিকারে আসিয়াছে। দ্বিজ হরিদাসের কুলদেবতা মোহনরায়ের মন্দির বৈষ্ণবকুণ্ড পুষ্করিণীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

টেঁয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব পুরুষগণের আদি বাসস্থান। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুর প্রপিতামহ ৺ বলভদ্র ত্রিবেদী মহাশয় টেঁয়া হইতে জেমোতে বাসস্থান করেন। অদ্যাপি ত্রিবেদী বংশের অন্যান্য ব্যক্তিগণ টেঁয়ায় বাস করিতেছেন। টেঁয়া কান্দির অন্তর্গত ভরতপুর

থানার মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম মৌজে গোপালপুর। বৈষ্ণব দাসের ভ্রাতার দৌহিত্র ৺গৌরগোপাল সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীপ্রাণবল্লভ সেন মহাশয়ের সহিত অনেক কথোপকথন হইল। তিনি তৎপর দিন প্রাতঃকালে গৃহস্থিত পুঁথিগুলি দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবু কলিকাতা হইতে বাটী প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইল। তিনি মহা সমাদরে আমাদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরদিন পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদের আহারার্থ প্রচুর আয়োজন করিলেন। আমি প্রত্যূষে উঠিয়াই প্রাণবল্লভ বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করাইলাম এবং পুঁথি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধব দাসের হস্তাক্ষর পাইলাম না। ইহাঁর গৃহে শতাধিক মূল্যবান্ পুঁথি আজিও আছে। পরিষদের নিমিত্ত দুই এক খানি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু প্রাণবল্লভ বাবু, ভবিষ্যতে দিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিলেন।

টেঁয়া বৈদ্যপুর পরস্পর সন্নিহিত গ্রাম। ফতেসিংহ অঞ্চলে ধর্ম্মপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত, তন্মধ্যে বৈদ্যপুরের ধর্ম্মের গাজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বৈদ্যপুরে ধর্ম্মঠাকুরের নিত্য পূজা হয়, ইহা শুনিয়া আমি রাত্রিতেই পুরোহিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করিলাম। তিনি এক ঘণ্টার মধ্যেই মুকুন্দবাবুর বাটীতে আগমন করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন তিনি পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতেছেন। চৌদ্দপুরুষের অধিককাল তাঁহারা উক্ত ধর্ম্ম ঠাকুরের পুরোহিত। তাঁহার বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর হইবে।

বৈদ্যপুরে ধর্ম্মতলায় একখানি চালাঘরে ধর্ম্ম ঠাকুরের স্থান। ধর্ম্ম প্রতিমা তিন পোয়া উচ্চ একখণ্ড পাষাণ মাত্র। বৈশাখী পূর্ণিমায় অত্যন্ত সমারোহে ধর্ম্মের গাজন হয়। সন্ন্যাসীরা মৃতদেহ আনয়ন করে না। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজার মানসিক করিয়া থাকে। প্রায়ই বলিদান হয়। ধর্ম্মঠাকুরের অধিকারী শ্রীক্ষেত্র নাথ পাল, জাতিতে কুম্ভকার। পূজার জন্য ১৫ বিঘা দেবোত্তর আছে। নিত্যভোগ পাঁচ পোয়া আতপ চাউল ও এক পোয়া পাটালি। বিশেষ অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূজার ধ্যান ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন। আমিও তাহা লিখিয়া লইলাম। পাঠকগণ অর্থ করিয়া লইবেন কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিতে সমস্ত কথাগুলি উপস্থিত হয় নাই। ধ্যান :—"ওঁ যস্যান্তো নদিরূপো ন চ করচরণং নাস্তি কায়ানিনাদ নদিরূপো মরণং নাস্তি যোগান্তগমনগম্যো যো নাতু গহসকলসঙ্কল্পো পাতালে ছিন্নমূর্ত্তি:—নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্ম্মরাজায়।"

বৈদ্যপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে শশী হাজরার কবির দল আছে। তাঁহার পিতাও কবির দল রাখিয়া নানা স্থানে গান করিতেন।

৬ই ডিসেম্বর বা ২০শে অগ্রহায়ণ বেলা ১০টার সময় আহারাদি করিয়া আতিথেয় মুকুন্দ বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ঝামটপুর অভিমুখে রওনা হইলাম। টেঁয়া হইতে পশ্চিম

দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। প্রায় এক ক্রোশ আসিয়া হরেকৃষ্ণের গাড়ী গভীর কর্দ্দমপূর্ণ "গাড়ায়" পতিত হইল এবং একেবারে ধুরা পর্য্যন্ত কাদায় বসিয়া গেল। গরুদ্বয়ও আকণ্ঠ কাদায় পুতিয়া গেল। এরূপ ভয়ানক বিপদে কখনও পড়ি নাই। ২।৩ ঘণ্টা টানাটানি করিয়াও গাড়ী সে গাড়া পার হইতে পারিল না। শেষে আমি গরু চালাইতে লাগিলাম। তপেন্দ্র বাবু ও হরেকৃষ্ণ দুইটী চাকা ঠেলিতে লাগিলেন। গাড়ী কিছুদূর চলিয়া অপর পারের নিকটে পৌছিল।

কিন্তু সে খালের পাহাড় ২ হাত উচ্চ, তাহাতে গরু কিছুতেই উপরে উঠিতে পারিল না। রৌদ্রে, কাদামাখিয়া জলপিপাসায় আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিল না। ভাবিলাম হরেকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া মোট ঘাড়ে করিয়া আমরা দুই জনে অগ্রসর হই। কিছুক্ষণ পরে ভাবিলাম টেঁয়ায় ফিরিয়া গিয়া মুকুন্দ বাবুকে বলিয়া ২।৩ জন লোক আনি, তাহা হইলে গাড়ী উঠিবে। ইত্যবসরে এক বাগ্‌দী কোদালি লইয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম, তখন হরেকৃষ্ণ কোদালি দ্বারা খালের পাহাড় কাটিয়া ঢালু করিতে লাগিল। পথ প্রস্তুত হইলে আমি খালের ধারে উঠিয়া বুক দিয়া পদদ্বয় শূন্তে তুলিয়া গাড়ীর মাথ্‌না চাপিয়া ধরিলাম। বাগ্দী ও হরেকৃষ্ণ চাকা ধরিল। তপেন্দ্র বাবু গরু হাঁকাইতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫ মিনিট পরে গাড়ী উপরে উঠিল। ভোজনান্তে রৌদ্রে পরিশ্রমে আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। চতুর্দ্দিকে ধান্তের ক্ষেত্র। পিপাসার জল পাইলাম না। ক্লান্ত কলেবরে হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী, ধীর গতিতে চলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার ছোট বড় ৪।৫টা গাড়া পার হইলাম। অবশেষে তালিবপুরে পৌঁছিলাম। তালিবপুর প্রভৃতি স্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস। একটি পুষ্করিণীতে নামিয়া করপুটে জলপানপূর্ব্বক পিপাসা শান্তি করিলাম। তখন বেলা ৩টা। অথচ টেঁয়া হইতে তালিবপুর এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু আমাদের আসিতে ৫ ঘণ্টা লাগিল—ইহাতে পথের দুর্গমতা অনুমান করিয়া লইবেন।

সালার বা শালগ্রামপুর।

তালিবপুর হইতে ঝামটপুর সরল রেখা পথে ৩ মাইলের অধিক নহে। কিন্তু সকলেই বলিল সে পথে বিলের মধ্যে আজিও ধান কাটা হয় নাই, সুতরাং গাড়ীর নিকট (কুণ্ণ মার্গ) পড়ে নাই। অগত্যা আমাদিগকে ৩ মাইলের স্থলে সালার ঘুরিয়া ৬ মাইল চলিতে হইল। তালিবপুরের পরেই পিলখুণ্ডি অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বগ্রামে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বগ্রামে প্রাচীন অট্টালিকার দুই একটী ধ্বংসস্তূপ নয়ন গোচর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী প্রাচীন মসজিদ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এক কাজি সাহেব সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার নিকট অনেক তত্ত্ব অবগত হইলাম। ইহাঁর নাম কাজি মহম্মদ উসমান—পিতার নাম কাজি আইজা আলি, তস্ত পিতা কাজি ইন্দাদালি তস্ত চাচা দেওয়ান সাজেদ কাজি—তস্ত স্ত্রী, আসেমা বিবি—তিনিই ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই মসজিদের জীর্ণ সংস্কার করেন। মসজিদের বয়ঃক্রম ৫০০

শত বৎসর হইবে। কাজি সাহেব বলিলেন সালারে অনেক প্রাচীন দেবমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে মনুমিয়ার বাটীতে, ও শ্রীকৃষ্ণ দের গাঁজার দোকানের নিকটেই অনেক মূর্ত্তি আছে। কাজি সাহেব অতি সজ্জন। তিনি আরও বলিলেন শুনিয়াছি পূর্ব্ব গ্রামে বিশ্বদেব বলিয়া এক জন হিন্দুরাজা ছিলেন। পূর্ব্ব গ্রামের অনেক স্থানে তাঁহার কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে সালারের অভিমুখে চলিলাম। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া হরেকৃষ্ণকে দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। শীঘ্রই আমরা সালারে পৌছিলাম এবং হরেকৃষ্ণকে পশ্চাতে গাড়ী রাখিতে বলিয়া আমি ও তপেন্দ্র বাবু মনুমিয়ার বাড়ীর দিকে চলিলাম। দেখিলাম মনুমিয়ার বহির্ব্বাটীতে একজন ব্রাহ্মণ খাতা লিখিতেছেন। এমন সময়ে মনুমিয়া বাহিরে আসিলেন—তাঁহাকে মূর্ত্তি দর্শনের কথা বলিবা মাত্র তিনি বিশেষ সৌজন্য সহকারে আমাদিগকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম গোলার তলে ৩টী মূর্ত্তি,—সকলেরই নাসিকা ভগ্ন। আড়াই হাত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। বিষ্ণু চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী, এবং উপবীতী। কোন মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও, সরস্বতী বিরাজিত। এমন সুন্দর কারুনৈপুণ্য দর্শনে আমার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম কোথায় সেই প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পিগণ, যাহারা জড় প্রস্তরখণ্ডে শত সহস্র ভাবের উদ্দীপনায় সমাবেশ করিয়াছিল।

মনুমিয়া কহিলেন—তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী এক পুরাতন পুকুরের গর্ভ হইতে মাটী তুলিবার সময়ে ৬০টী সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি উঠিয়া ছিল। সে গুলি তাঁহারা গরুর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া হিন্দুদিগের গ্রামে গ্রামে বিক্রয় পূর্ব্বক জেমো কান্দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জেমোর রাজবাড়ীতেও বিল্ববৃক্ষ তলে মনুমিয়ার বাড়ীর প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ এক মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। সে মূর্ত্তিটী রাজা মহোদয়দ্বয় আমাদের দিয়া ছিলেন কেবল গাড়ীতে স্থান হইবে না বলিয়া আমরা তাহা আনিতে পারি নাই। যে পুষ্করিণী হইতে প্রতিমা উঠিয়াছিল—সে পুষ্করিণী অন্ততঃ সহস্রবৎসরের প্রাচীন হইবে। পুষ্করিণীটী একেবারে মজিয়া গিয়াছে। পুষ্করিণী হইতে একটী ৬ হাত নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। অনভিজ্ঞগণের ইহা অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা দিল্লীদরবারে জয়পুরের শিবিরে ৬ হাত উচ্চ ২টী লোক দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রহেলিকা হইবে না।

পুষ্করিণীর উত্তরাংশে প্রায় ২০ বিঘা পরিমিত ভূখণ্ড কেবল ইষ্টকস্তূপের ধ্বংসাবশেষ। এখন সে স্থানের কিয়দংশ গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই স্থানে বৃহৎ দেবালয় ছিল। সমস্তই বর্গীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। যাহা হউক এই ভূখণ্ডেও ৫।৬টী প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এখনও সেই ভূখণ্ডে ও পুষ্করিণীগর্ভে বহুমূর্ত্তি নিহিত আছে। এই সমস্ত দেখিয়া বিষণ্ণচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ দের গাঁজার দোকানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণ দের দোকানের দক্ষিণে ৫টী প্রতিমূর্ত্তি, তন্মধ্যে ৩টী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং একটী পরম সুন্দর নৃসিংহমূর্ত্তি।

অপর মূর্ত্তিগুলি অবিকৃত কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে খোদিত এবং নৃসিংহমূর্ত্তিটী শ্রীকৃষ্ণ দে কর্ত্তৃক নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। আমি কৃষ্ণ দেকে কহিলাম—"তুমি রঙ্ মাখাইয়া মূর্ত্তির স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য নষ্ট করিলে কেন?" কৃষ্ণ দে কহিল,—"ঠাকুর, বুঝিতে পারি নাই, তাই ভুলিয়া ওরূপ করিয়াছি।" কৃষ্ণ দের বয়স ৬৫টী বৎসর হইবে। তিনি মূর্ত্তিগুলির পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি জলপূর্ণ চক্ষে কহিলেন, মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। নৃসিংহমূর্ত্তিটীর পাদদেশে দেখিলাম দুই পংক্তি খোদিতলিপি উৎকীর্ণ—কিন্তু সেগুলি চন্দনাক্ত থাকায় ভাল পড়িতে পারিলাম না। অবশেষে দে মহাশয়ের অনুমতি লইয়া চন্দনলেপ ধৌত করিয়া অনেক কষ্টে পাঠ করিলাম।

"শ্রীমন্ নরসিংহস্য মূর্ত্তিরেতা প্রতিষ্ঠিতা।
পূর্ব্বগ্রামবাসিনা শ্রীবিষ্ণুদেবেন ধীমতা॥"

উৎকীর্ণ লিপির বামদিকে "৯১৭" এই ৩টী অঙ্ক উৎকীর্ণ, কিন্তু তাহা অতি অস্পষ্ট। উপরোদ্ধৃত পাঠ ঠিক হইল কি না বলিতে পারি না। আক্ষরিক পণ্ডিতগণ ঠিক করিয়া লইবেন। আমার যে টুকু শক্তি আমি তাহার ব্যবহার করিয়াছি। শ্লোকার্থ এই যে,—পূর্ব্বগ্রামবাসী ধীমান্ বিষ্ণুদেব কর্ত্তৃক এই নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৯১৭ শকাব্দ কি অন্য অব্দ আমি তাহা বলিতে অসমর্থ। ফল এই নরসিংহমূর্ত্তি কারুনৈপুণ্যে অতীব রমণীয়।

নরসিংহমূর্ত্তির দক্ষিণে স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহের একপদ লগ্ন। বামদিকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান। উৎকীর্ণ লিপির উপরে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ দের বাটীর সম্মুখে এক তেলিবাড়ীতে ৪টী অতীব রমণীয় প্রতিমূর্ত্তি আছে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সে গুলি দেখা ঘটিল না। আমাদের সঙ্গী গোকুলচন্দ্র দাস দফাদার কহিল যে, এই গ্রামে লোকের বাটীতে প্রায় শতাধিক প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মণ্ডপতলা বা বকুলতলার মন্দিরমধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহা শুনিয়া মণ্ডপতলায় যাইয়া শিবমন্দিরের মধ্যে অগ্নিকোণে হেলান-দেওয়া ভাবে অবস্থিত সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম। সেরূপ অনবদ্য মূর্ত্তি কখন দেখি নাই। তাহা দেখিলেই বিশ্বকর্ম্মার শিল্পকলা বলিয়া ভ্রম জন্মে। শুনিলাম এই মন্দির জেমোর রাজাদিগের অধিকারে স্থিত। তৎপরে মসিদগড়ের ধারে চণ্ডীগরাইএর বাড়ীর নিকট কালো পাথরের এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ দর্শন করিলাম। শুনিলাম এইরূপ আর একটী স্তম্ভ সালারের মুসলমান-পাড়ায় আছে। এতদ্ভিন্ন রামকৃষ্ণ দের বাটীতে ৫টী প্রতিমূর্ত্তি আছে। গোকুল আরও বলিল যে, কাঁটোয়ার উত্তরে ইলিংপুরের এক কাঁটালতলায় একটী প্রকাণ্ড বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। এই সমস্ত পরিদর্শনপূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলাম। গবর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধারকল্পে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এখানে মাটীর মোহর এবং পাথরের দীপাধার পাইয়া বড় বড় ইতিহাস লিখিয়া ফেলেন—কিন্তু বাঙ্গালার অভ্যন্তরে যে সমস্ত ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের অনন্তস্তর বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কে তাহার উদ্ধার করিবে?

ঝামটপুরের কবিরাজ গোস্বামীর পাটের অধিকারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসের নিকট শুনিলাম যে, তিনি ভিক্ষা ব্যপদেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া অতি বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে সালারের নিম্নোক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে সালারের নাম ছিল শালগ্রামপুর। তথায় শালপানি রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একশত দেবালয় ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। যাহা হউক সালারের বিষয় বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। আমরা ঝামটপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কেহ বলিল, বহড়াণের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঝামটপুর যাইতে হইবে—কেহ বলিল সালার হইতে ঝামটপুর পর্য্যন্ত গাড়ীর "লিক" পড়িয়াছে। যাহা হউক আমরা মাঠের মধ্য দিয়া সোজা পথে চলিলাম। কিছু দূর পরেই দেখিলাম, গাড়ীর লিক্ নাই, কেবল ধূ ধূ ধান্যক্ষেত্র এবং মাঝে মাঝে ২ হাত উচ্চ আইল। একদল কৃষক বলিল—"আপনারা এখনও ফিরিয়া বহরাণের পথে গমন করুন, নতুবা মারা পড়িবেন।" আমরা শুনিয়া বিষম বিপদে পড়িলাম। অন্ধকার রাত্রি উঁচুনীচু বড় বড় আইল—দুইপার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র, দস্যুসঙ্কুল রাঢ়ের বিস্তৃত প্রান্তর—আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। আমি আমার বৃহৎ লাঠী গাছটী ঘাড়ে করিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সময়ে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নামক এক ভদ্রব্যক্তি ঝামটপুর যাইতেছিলেন। তপেন্দ্রবাবুর ব্যাকুলতা দর্শনে তিনি আমাদিগের চালক হইলেন। বুঝিলাম বিপদে ভগবানই উদ্ধার করেন। অন্ত প্রতাপবাবুকে না পাইলে আমরা অনতিবিলম্বে খুন হইতাম। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে একটী খুন হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণ সুদক্ষ গাড়োয়ান এবং বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক তাই সেই পথে গাড়ী চালাইতে পারিয়াছিল। কখনও একখানি চাকা দুই হাত উচ্চ আইলের উপরে উঠে একখানি নীচে পড়িয়া থাকে। প্রতাপবাবু খানিক যাইয়া হরেকৃষ্ণকে জোরে গরু ডাকাইতে (অর্থাৎ চালাইতে) বলিলেন। হরেকৃষ্ণও প্রাণপণে গরু ডাকাইল। কিছুক্ষণ বিষম কষ্টের পর আমরা ঝামটপুরের সন্নিহিত হইলাম। কিছু দূর যাইয়া তালতলে পথিপার্শ্বে দুইটী ছায়াবৎপ্রতীয়মান স্ত্রী-মূর্ত্তি সরিয়া গেল—প্রতাপবাবুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, ওদিকে তাকাইতে নাই—আপনারা শীঘ্র আসুন। ইত্যবসরে গাড়ী ঝামটপুরের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী এক দোকানের সম্মুখীন হইল।

প্রতাপবাবুর সাহায্যেই আমরা সে দিন প্রাণে বাঁচিয়া ছিলাম। ক্রমে আমরা কবিরাজ গোস্বামীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পাটের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মহান্ত পরম সমাদরে আমাদের আতিথ্য করিলেন। ইনিই এই পাটের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী সেবাইত। ইঁহার বয়স ৬৫ বৎসর—পিতার নাম গোঁসাইচরণ দাস, তস্য পিতা সাধুচরণ দাস, তত্পিতা চন্দ্রশেখর দাস—এই পাঁচপুরুষ ইঁহারা এই পাটের সেবা করিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর জীবনচরিত অনেকাংশে অজ্ঞাত। প্রকাশিততত্ত্ব লিখিয়া বিবরণের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। মূল চৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবনধামে রাধা দামোদরের বাটীতে আছে। গোস্বামীর

শিষ্য মুকুন্দদাসের লিখিত পুঁথি ঝামটপুরে আছে। এই সমস্ত পুঁথিঘটিত অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিলামূর্ত্তি অদ্যাপি ঝামটপুরে আছে। মূলমদনগোপাল মূর্ত্তি রাজপাট পুঁটিয়ার গিয়াছে। প্রাচীন মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। পরিদৃশ্যমান ক্ষুদ্র মন্দিরটী দক্ষিণখণ্ডের প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী-কীর্ত্তনাঙ্গের প্রধান গায়ক শ্রীরসিকচন্দ্র দাস ১৩০২ সালে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও জীর্ণপ্রায়। ইহার দক্ষিণে কবিরাজ গোস্বামির ভজনস্থানের ইষ্টকাবশেষ বিদ্যমান আছে। নিত্যানন্দ প্রভু এখানে আসিয়াছিলেন।

মন্দির-সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, শুনিলাম সারদামণি দাসী নামে কোন ধর্ম্মশীলা সদ্গোপমহিলা এই আটচালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আটচালা ও মন্দিরের দক্ষিণাংশে কবিরাজ গোস্বামির পুষ্করিণীটী বাঁশবনে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কবিরাজ গোস্বামির বাস্তু-পরিমাণ একবিঘা ও আট বিঘা ধানের জমি মাত্র আছে। আশ্বিন মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে এখানে মহাসমারোহে মহোৎসব হয়। তখন মনোহরসাহী পরগণার সমস্ত কীর্ত্তনীয়া এখানে সমাগত হইয়া সুমধুর কীর্ত্তনে এবং প্রাণস্পর্শী খোলের মধুর বাদ্যধ্বনিতে ঝামটপুরকে আনন্দধামে পরিণত করেন। উৎসবে প্রায় সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হয়। সমস্ত ব্যয়ই মহান্ত মহাশয়ের ভিক্ষালব্ধ চাউলে সম্পন্ন হয়। ধন্য বঙ্গভূমি! ধন্য বিপিনবিহারী! যেখানে ভিক্ষালব্ধ চাউলে এত বড় উৎসব সম্পন্ন হয়। বিপিনবিহারীর রাধাবল্লভ এবং ব্রজবল্লভ নামে দুই পুত্র। যে রাত্রিতে আমরা তাঁহার গৃহে অতিথি, সে দিন ৪০ জন অতিথি মহান্ত মহাশয়ের গৃহে বাসস্থান ও আহার পাইল। সে দিন কবিরাজগোস্বামির পাটে রামায়ণ গান হইতেছিল। আমরা ঝামটপুরে পৌঁছিয়াই একটু জলযোগান্তে রামায়ণগান শুনিতে উপবিষ্ট হইলাম।

সৌগ্রামবাসী শ্রীরামগোপাল আচার্য্য রামায়ণ গাইতেছিলেন। সে দিন কবিরাজ গোস্বামির পবিত্র পাটে বসিয়া গঙ্গার তরঙ্গমালার কলধ্বনির ন্যায় সুমধুর রামায়ণীকথা আমার কর্ণকুহরে অমৃতের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল। তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। হায় ধনধান্যভূয়িষ্ঠা কবিজননী রাঢ়ভূমির পূর্ব্ব গৌরবরবি অস্তমিত। যেখানে কবিত্বের উর্ব্বরক্ষেত্রে শত শত পদকর্ত্তা, বহুতর কবি-পাঁচালী-চণ্ডী-রামায়ণ প্রভৃতির সঙ্গীতকর্ত্তা সুমধুর সুললিত গীতধ্বনিতে বঙ্গবাসীকে উন্মাদিত করিয়াছিলেন—বসন্তের নিকুঞ্জকানন-সুলভ সেই সমস্ত গায়ক এক্ষণ নীরব। দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভাগ্যের করালছায়া যেন রাঢ়ভূমিকে গ্রাস করিতে উদ্যত। রাঢ়বাসীর সে সঞ্জীবনী শক্তি এখন কোথায়?

প্রাতঃকালে কবিরাজগোস্বামির ব্যবহৃত জীর্ণ পাদুকাদ্বয় এবং ভজনপীঠের ফটোগ্রাফ লইয়া আমরা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে উদ্ধরণপুর যাত্রা করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল বহরাণের প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট অনেক তত্ত্বের সন্ধান লইয়া যাইব। ঝামটপুর মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের সন্ধিস্থলে। ইহার উত্তরে নীলকণ্ঠপুর ও দক্ষিণে অনন্তপুর। ঝামটপুর হইতে

বাহির হইয়া বহরাণের মধ্যে না যাইয়া, বহরাণ দক্ষিণদিকে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম সম্মুখে বহরাণের প্রকাণ্ড বিল। বিলের মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া ২ ঘণ্টা ঘুরিলাম। দক্ষিণে গঙ্গাটিকরীর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা যাইতে লাগিল। অজয়নদের একটী খালের ধারে ধারে ঘুরিয়া দুই তিনটী ঘোরকর্দ্দমাক্ত গাড়া পার হইয়া সোণারুন্দির রাজাদের সাঁকোর সন্নিহিত হইলাম। সে দিন কষ্টের অবধি ছিল না। এইবার মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাল পথ পাইলাম। দুইটী অধবশৈল অতিক্রম করিলে উদ্ধরণপুরের প্রকাণ্ড আম্রবাগানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে কাঁটোয়ার রাস্তা ছাড়িয়া বামদিকে উদ্ধরণপুরাভিমুখে চলিলাম। বেলা ১১টার সময় গঙ্গাতীরবর্ত্তী উদ্ধরণপুরের বাজারে পৌছিলাম। অবিলম্বে উদ্ধরণদত্তের প্রাচীন ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া লইলাম। উদ্ধরণপুরের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং এখানে দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ। এখানে মৎস্য অত্যন্ত সুলভ এবং লেবু শীতকালে এত অপর্য্যাপ্ত যে অন্যত্র বর্ষাকালে তত ফলে না। আহারাদি শেষ করিয়া কালাগ্নিরুদ্রদেবের ফটোগ্রাফ লইবার জন্য গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলাম। দক্ষিণে শ্মশানঘাট রাখিয়া অর্দ্ধমাইল পরে রুদ্রদেবের মন্দিরে পৌছিলাম, এ স্থানের নাম নৈহাটী—ইহা কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত। মন্দিরের পশ্চিমদিকে পুরোহিত শ্রীচন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ। ইঁহার বয়স ৬৭ বৎসর, ইনি রুদ্রদেবের পূজা করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহার মাসী শ্যামাঠাকুরাণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পূজাদি হইত। পুরোহিত মহাশয় যথেষ্ট ভদ্রতাসহকারে ফটোগ্রাফ লইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মন্দিরটী ক্ষুদ্রাকৃতি। শুনিলাম পূর্ব্বে প্রস্তরনির্ম্মিত বড় মন্দির ছিল। তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট দুই চারিখণ্ড প্রস্তর বর্ত্তমান মন্দিরের ভিত্তিতে গ্রথিত রহিয়াছে এবং একখানি নৈ রাজার বাটীর পথে প্রোথিত রহিয়াছে।

কালাগ্নিরুদ্রদেবের মূর্ত্তি এক অপূর্ব্বভাবব্যঞ্জক, কান্দির রুদ্রদেব পদ্মাসনাসীন ধ্যানস্তিমিত-লোচন, কিন্তু উদ্ধরণপুর বা নৈহাটীর রুদ্রদেব ত্রিভঙ্গ-স্থানসংস্থাননিবন্ধন ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি—কারুকৌশলের এক অপূর্ব্বচিত্র। শবোপরি পদ্মাসন—তদুপরি ত্রিভঙ্গভাবে রুদ্রদেব দণ্ডায়মান। শবাসনা শ্যামার ন্যায় রুদ্রদেবের বামপদ অগ্রে ন্যস্ত। তিনি চতুর্ভুজ, দক্ষিণকরে করমালা ও খট্বাঙ্গ বা টাঙি, বামকরে ত্রিশূলাকার দণ্ড অথবা বীণাযন্ত্র। কর্ণে ধুস্তুরা ও কুণ্ডল। জটাকলাপাবদ্ধবেণী প্রলম্বিত—কোন্ স্থানে তবকীমালায় গ্রন্থি। তাঁহার পরিধানে বাঘাম্বর, কটিতে কিঙ্কিণী। তিনি ব্যালযজ্ঞোপবীতী—ত্রিগুণাবৃত্তি যজ্ঞসূত্র স্কন্ধদেশ হইতে বিলম্বিত। গুল্ফদেশে বেঁকির মত অলঙ্কার। প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ ও বলয়। জানুর উপরে ও নিম্নে মুণ্ডমালা—মুণ্ডসংখ্যা বিংশতি। জানুসন্নিহিত স্থানে দুইপার্শ্বে দুইটী দিগম্বরী ভৈরবীমূর্ত্তি। তাঁহারা খট্বাঙ্গখর্পরহস্তা দ্বিভুজা নৃমুণ্ডমালিনী বিমুক্তস্তনী ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানা। আবার শবের সমীপে দুই যোগমগ্নমূর্ত্তি এবং রুদ্রদেবের স্কন্ধদেশের সমীপে দুইটী অপ্সরামূর্ত্তি অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় শূন্যে অবস্থিত। কালাগ্নিরুদ্রের ধ্যানের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির

সর্ব্বথা সাদৃশ্য আছে। পৌরাণিকধ্যানের কালরুদ্রের তন্থরুচি, নবোদিতকোটিমার্ত্তণ্ডপ্রতিম, তাঁহার ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রজ্বলিত, বিদ্যুজ্জালাকলাপের ন্যায় উজ্জ্বল বিপুলজটাজুট অর্দ্ধচন্দ্রকিরণে বিলম্বিত, তাঁহার হস্তে ঘণ্টাটঙ্ক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র, তিনি অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন। প্রতিমূর্ত্তি দৈর্ঘ্যে ২৪ ইঞ্চি প্রস্থে ১০ ইঞ্চি।

এতদ্ভিন্ন মন্দিরমধ্যে পশ্চিমদিকে রামসীতা ও হনুমানমূর্ত্তি আছে। শুনিলাম বিগ্রহসেবার জন্য ১৮ বিঘা ব্রহ্মোত্তর নির্দ্দিষ্ট আছে।

পুরোহিত মহাশয় নৈহাটীর ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন। তিনি পুরুষানুক্রমে যাহা শুনিয়া আসিতেছেন, এই আখ্যায়িকাও সেই প্রবাদ মাত্র। জনশ্রুতি এই যে, পূর্ব্বকালে 'নই' নামক এক নরপতি এই গঙ্গাতীরে রাজত্ব করিতেন। আজিও গঙ্গাতীরে তাঁহার রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ ও দেবমন্দিরাদির নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রাজপ্রাসাদের অনেকাংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর পাটাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মহান্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছেন। কথিত আছে যে, 'নই' রাজার কন্যার সহিত পাঁচথুপীর এক রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় দুর্বৃত্ত বর্গীগণ 'নই' রাজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদ ভগ্ন করে। রাজা ও রাণী এক "পাটলাজের" (ভূগর্ভস্থ গৃহ) মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ গৃহ বহির্দ্দিক্ হইতে বন্ধ ছিল এবং এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের নিকট ঐ গৃহের চাবি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তালবৃক্ষারূঢ় ভৃত্য কোন বর্গীকর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় তীরাঘাতে নিহত হয়, এ দিকে অনশনে রাজা রাণীর করুণ আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তাঁহারা উভয়েই রুদ্ধগৃহে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনা বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র খাঁর আখ্যায়িকার অনুরূপ।

রুদ্রদেবের বর্ত্তমান মন্দিরটী কাঁটোয়াবাসী ঠাকুরদাস কুণ্ড তাঁহার পুত্র শ্রীবাণেশ্বর কুণ্ডুর জন্মগ্রহণোপলক্ষে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উদ্ধরণপুরের রুদ্রদেব সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইনি পূর্ব্বকালে কান্দিতে ছিলেন, পরে জল সন্ন্যাসের দিন কান্দির সন্ন্যাসিগণের হস্তচ্যুত হইয়া গঙ্গায় পতিত হন এবং উদ্ধরণপুরের জালজীবিগণের জালে উঠিয়াছিলেন। অদ্যাপি চড়কপূজার সময়ে হোমের রাত্রি ও জলসন্ন্যাসের দিন যে ঘাটে রুদ্রদেব উঠিয়াছিলেন সেই শ্মশান ঘাটের দক্ষিণে, সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে আনয়ন করে। দুইদিন এইস্থানে থাকিয়া রুদ্রদেব পুনরায় মন্দিরে আগমন করেন। কালাগ্নিরুদ্রদেবের ফটোগ্রাফ লইয়া আমরা উদ্ধরণপুর যাত্রা করিলাম।

পথে 'নই' রাজার ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ ও রাজপথের নিদর্শন দেখিতে লাগিলাম। কিছুদূর আসিয়া চাঁড়ালপাড়ায় এক কয়লার দোকানের নিকট এক ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টকস্তূপের মধ্যে অদ্ভুত কারুকার্য্য দর্শন করিলাম। এই ইষ্টকশিল্প প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দদেবমন্দিরের ইষ্টকশিল্পের অনুরূপ এবং বিবিধ বৈচিত্র্যসম্পন্ন। ৩০।৪০ খানি বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর ইষ্টকস্তূপে প্রোথিত রহিয়াছে। অন্যান্য কারুকার্য্যালঙ্কৃত প্রস্তরগুলি স্থানীয় লোকে লইয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে প্রাচীনকালের খাদরি করিয়া গাঁথা 'নই' রাজার পথ দেখিতে পাইলাম।

শ্মশানের নিকটে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষমূলে সাগারের বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় এক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি নাসিকাভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার কিছু দক্ষিণে কালীবাড়ীর বেলতলায় ঐ আদর্শের একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি। তিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি।

ইহার পরে আমরা উদ্ধরণপুরের বাজারের নিম্নে উদ্ধরণ-দত্ত-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঘাট দর্শন করিলাম। গঙ্গার জলসীমা হইতে ঘাটের সর্ব্বোচ্চ ধাপ ৫০ হাত হইবে। এই অংশ শতাধিক সোপানে ক্রমশঃ ক্রমনিম্ন হইয়াছে। সোপানের বিস্তৃতি ১০০ হাত হইবে এবং এরূপ সুদৃঢ় ভাবে গ্রথিত যে, শত শত প্লাবনের বিপুল বেগ সহ্য করিয়া এবং ৩ শত বৎসর মৃত্তিকা মধ্যে সমাহিত থাকিয়াও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। উদ্ধরণপুর সোণারুন্দির বাবুদিগের জমীদারী। এই বংশের দেওয়ান ঢাকার অন্তর্গত লোকপাড়ানিবাসী ৺গুরুদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একশত বৎসর পূর্ব্বে বহুকালের সঞ্চিত পলিমাটীর স্তর খনন করিয়া এই ঘাট আবিষ্কার করেন। তিনি ঘাটের সান্নিধ্যে যে গঙ্গেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাহুর মার বাড়ীর পূর্ব্বে কানাই লাল রায়ের অন্য ২টী বিগ্রহশূন্য শিবমন্দির দেখিলাম।

তৎপরে আমি উদ্ধরণদত্তের সমাধি দর্শন করিতে গমন করিলাম। সোণারুন্দির বাবুদিগের উদ্ধরণপুর কাছারীর কর্ম্মচারী শ্রীগুরুদাস ঘোষাল মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া উদ্ধরণদত্তের সমাজে লইয়া গেলেন। সমাধিস্থানটী অতীব মনোরম। উক্ত বাবুদিগের একটী ৬০ বিঘার আম্রবাগানের উত্তরাংশে সমাধি অবস্থিত। সমাধির দক্ষিণে শ্বেতমর্ম্মরবিনির্ম্মিত রঙ্গেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান জমীদারের প্রপিতামহ এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয়ের সমাধির সম্মুখে গৌরাঙ্গমন্দির। কিন্তু পূজার সুবিধার জন্য বাবুরা গৌরাঙ্গকে সোণারুন্দি লইয়া গিয়াছেন। সমাধিচত্বরে একটী প্রকাণ্ড নিমগাছের গোড়া ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত রহিয়াছে। এই সমস্ত দর্শনে অনেক পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক হইল। আমি কাহুর মার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, হরেকৃষ্ণ কাঁটোয়া যাত্রা করিল। গঙ্গাতীর দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। এখানকার প্রকৃতির কাননকুন্তলা শ্যামলশোভা বড়ই মনোহারিণী। দুই পার্শ্বে সরিষার ফুলের সোণার আঁচল অস্তাচলাবলম্বিরক্তরবির রক্তিমবিভায় অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল।

ইনিৎপুর অতিক্রম করিয়া আমরা সাকাঁইএর সম্মুখীন হইলাম। দক্ষিণে কবিকঙ্কণবর্ণিত নবগ্রাম থাকিল। পূর্ব্বে সাঁকাই অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং এই স্থান হইতে ইন্দ্রাণী পরগণার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অজয় ও গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে এই স্থানের ভূভাগের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুকুন্দরামের সময়ে দেখিতে পাই, ধনপতি সদাগর "বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী" শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রায় অজয় ও গঙ্গার সংস্থান বেশ বুঝিতে পারা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সময়ে অজয় নৈহাটী উদ্ধরণপুরের

দক্ষিণেই গঙ্গায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। তখন ললিতপুরে (বর্তমান নলিপুর) অজয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এবং সাঁকাই এই অজয়গঙ্গার সঙ্গম স্থলে বিদ্যমান ছিল। দুই নদীর সঙ্গম-স্থলে বলিয়া হিন্দুরাজগণকর্তৃক এই স্থানে একটী দুর্ভেদ্য মৃন্ময় প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার বহু পূর্ব্বে এখানে শঙ্খেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রায় দেখা যায়, যখন শ্রীমন্তের ডিঙা অজয় বাহিয়া গঙ্গায় পড়িতেছে, তখন মুকুন্দরাম বলিতেছেন, "সম্মুখে উদ্ধনপুর, নৈহাটী কতদূর, শাঁখারি ঘাটে দিল দরশন। পাইয়া গঙ্গার পাণি, মহাপুণ্য মনে গণি, পূজা কৈল গঙ্গার চরণ। * * * সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আইসে যাহার সদন।"

ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অজয় নদের দক্ষিণ তীর হইতেই ইন্দ্রাণী দেশের সীমা ছিল। ইহার পরেই আছে, "ডাইনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী"। যাহা হউক এক্ষণে সাঁকাই অজয় নদের উত্তরে অবস্থিত। সাঁকাই এর স্মৃতি আমাকে বিচলিত করিল। পূর্ব্বে ইন্দ্রাণী পরগণার "তিন চণ্ডীর" অন্যতম শাঁখাই চণ্ডীর এবং "তিন ঈশ্বরের" অন্যতম শঙ্খেশ্বরের মন্দির এই স্থানে বিদ্যমান ছিল। এখন সেই মন্দির ও দুর্ভেদ্য দুর্গ গঙ্গাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। কিন্তু কাশীরাম দাসের "বারঘাট তেরহাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর"—আজিও সেই পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৃদ্ধদিগের মুখে শ্রুতপ্রবাদ এই যে,—এই স্থানে গঙ্গা শাঁখা পরিয়া, শঙ্খেশ্বর শিবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য ইহার নাম শাঁখাই চণ্ডী। মৃন্ময় দুর্গটী বর্গীর অত্যাচারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কিছু দক্ষিণে আক্তাই বা আকাই চণ্ডী ও পাতাই চণ্ডী ছিলেন। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে দেখা যায়, এস্থানে বিশেষ ভাবে বর্গীর অত্যাচার হইয়াছিল—

"আন্তাই হাট পাতাই হাট আর ডাঞি হাট।
বেড়া-ভাওসিংহ পোড়ায় আর বিকী হাট।
এরূপে ইন্দ্রায়নী পরগণা বর্গী লুটি॥"

বর্গীর অত্যাচারে সাঁকাইএর শেষ নিদর্শন লুপ্ত হইয়াছিল।

সাঁকাইএর নীলকুঠিও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে। দাশরথিরায় এই সাঁকাইএর কুঠীতেই প্রথমে কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নীলকুঠীতেই স্ত্রী কবিওয়ালী অক্ষয়া বাগ্দিনীর সহিত তাঁহার নবযৌবনের প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইয়াছিল। অক্ষয়ার সুকণ্ঠনিঃসৃত গীতাবলীই দাশরথিকে সঙ্গীতরচনায় প্রবৃত্ত করায়। ভবিষ্যতে দাশরথি সাধারণ সাহিত্যে (Popular literature) যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—সাঁকাইতেই তাহার সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত হয়। কবিদ্বের লীলাভূমি ইন্দ্রাণী পরগণায় প্রবেশ করিবা মাত্র, আমার হৃদয়ে কত অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মুকুন্দরাম বর্ণিত "ভুবন দুর্লভ ইন্দ্রাণী" বাঙ্গালা-সাহিত্যসেবীর অবিদিত নহে। যথায় বারঘাট, তেরহাট, তিনচণ্ডী তিনেশ্বর—ইন্দ্রাণীর কীর্ত্তি কাহিনী বিজ্ঞাপন করিত, "দ্বাদশ তীর্থভেদে যথা ভাগীরথী" অলঙ্কৃতা ছিলেন, যথায় শঙ্খেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর এবং ঘোষেশ্বর প্রাচীন বঙ্গের শৈব ধর্ম্মের উজ্জ্বল

নিদর্শন ছিল, কাশীরাম দাস ও দাশরথিরায় যাহার অঙ্কে বাল্যলীলা সমাপনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভারতীর কণ্ঠে অপূর্ব্ব ভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন, যেখানে কৃষ্ণধনপ্রমুখ পাঁচালীওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের কলকণ্ঠ বঙ্গবাসীকে আমোদিত করিয়াছিল, যে কবিত্বের কাননে, অক্ষয়া, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, পদ্মা প্রভৃতি স্ত্রী কবিওয়ালীগণ সঙ্গীতনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে—আজি সেই "পূর্ব্বাপর স্থিতি ইন্দ্রাণীর" সেই পূর্ব্ব গৌরব স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত। তাই গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কবি কেবল "বারঘাট ইন্দ্রাণী আইল সেই দিনে" বলিয়া নীরব হইয়াছেন। সুরধুনী কাব্যকারের সময়ে ইন্দ্রাণীর স্মৃতি বঙ্গবাসী একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন।

দিবাবসানে ইন্দ্রাণীর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে করিতে হরেকৃষ্ণের গাড়ী অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। দেখিলাম শীর্ণকায় স্বল্পতোয় অজয় মৃদু মন্দ কুলু কুলু ধ্বনিতে যেন জয়দেবের সুললিত পদাবলী গান করিতে করিতে আনন্দে জাহ্নবীকে আলিঙ্গন করিতেছে। হায় বাঙ্গালা ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব অজয়ের জলে এখনও মিশিয়া আছে। একদিন বাঙ্গালার সতীকুলশিরোমণি বেহুলা সুন্দরী মৃতপতি লইয়া অজয়ের তরঙ্গে ভেলা ভাসাইয়াছিলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্তের অগণ্যপণ্যপরিপূর্ণ বাণিজ্যতরণী অজয় বাহিয়াই সিংহল যাত্রা করিয়াছিল। অজয় প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরবস্মৃতি, অজয়! তুমি, জয়দেব, ক্ষেমানন্দ এবং মুকুন্দরামের স্মৃতির সহিত অমর হইয়া গিয়াছ। কিন্তু তোমার তীরে রাধাকান্তপুরসমীপে বর্গীর রাজপ্রাসাদচিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

দিনমণি লজ্জারক্তবদনে পশ্চিমদিকে অজয়ের জলে নিমগ্ন হইলেন। সেই পরমরমণীয় গোধূলি সময়ে বিবিধ ভাবের উচ্ছ্বাসে বিমুগ্ধ চিত্তে হরেকৃষ্ণের গো-যানেই ক্ষীণসলিল অজয় উত্তীর্ণ হইলাম। ভাবিলাম—সে দিন কবিবর দীনবন্ধু অজয়ের উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"অজয় পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর কায়,
চিতা'য়ে বিশাল বক্ষঃ বলে চ'লে যায়;
লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ,
কাঁটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।"

কিন্তু "সেদিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন" এখন অজয়ের দশা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। অদৃষ্টের কি কঠোর পরিণাম! আজি গরুড় গাড়ীতে সেই অজয়নদ পার হইয়া কাঁটোয়ায় পেঁাছিলাম।

কাঁটোয়া।

আমরা কাঁটোয়ায় পৌঁছিলে অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রিবাসের একটু স্থানের জন্য বহুলোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন স্থানে রাত্রিযাপনের বাসা পাইলাম না। তখন এক ময়রার দোকানে জলযোগ সম্পাদন করিয়া বটতলায় হরেকৃষ্ণর নিকট ফিরিলাম। এবং হরেকৃষ্ণকে জলযোগের জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিলাম। দারুণ শীতে আমি ও তপেন্দ্র বাবু দুইজনে গাড়ীর মধ্যে শয়ন

করিলাম, কিন্তু ভয়ঙ্কর শীতে অনাবৃত বৃক্ষতলে আমাদের সর্ব্বশরীর শীতল হইতে লাগিল। সেই ষষ্ঠীতলায় শ্রীরজনী রাজবংশী ঘরের মধ্যে শুইয়া আমাদের কষ্টের কাহিনী শুনিতেছিল। অবশেষে রজনী পথপার্শ্ববর্ত্তী নিজের শয়নগৃহ আমাদিগকে খুলিয়া দিয়া শয়ন করিতে অনুরোধ করিল। রজনীর এপ্রকার অযাচিত আতিথ্য আমরা এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আহারাদি সমাধান্তে আমরা মহাপ্রভুর বাটীতে গমন করিলাম। গোস্বামী বংশীয় বটব্যাল গাঞি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে মহাপ্রভুর সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। এই কাঁটোয়ার কেশব ভারতীর আশ্রমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে ১লা মাঘ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবিষয় চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসপ্রকরণে বর্ণিত আছে। এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দেখিলাম প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে কেশবেদী, এইখানে বসিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন—প্রবাদ এই যে, অদ্যাপি কেশবেদীর তলে মহাপ্রভুর কেশ রক্ষিত আছে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থোক্ত বনাশ্রম এখন নগরে পরিণত হইয়াছে। কাঁটোয়ার মহাপ্রভুমূর্ত্তি সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নৃত্যকালের মূর্ত্তির অনুরূপ বলিয়া অনুমান হয়। যে বটবৃক্ষতলে মধু নাপিত চৈতন্যের মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিল এক্ষণে সে বটবৃক্ষ নাই। অদূরে কেশব ভারতীর সমাধি রহিয়াছে। আমরা মহাপ্রভুর ফটোগ্রাফ লইতে পারিলাম না—কারণ সে দিন মহাপ্রভুর মন্দিরদ্বার সত্বরেই রুদ্ধ হইল।

মহাপ্রভুর ফটোগ্রাফ না লইয়া কেবল মাত্র কেশব ভারতীর সমাধিস্থানের ফটোগ্রাফ তোলা—তপেন্দ্রবাবু সঙ্গত মনে করিলেন না, সুতরাং আমরা বেলা ২টার সময় শ্রীযুক্ত রাম রামচন্দ্রের বাটীতে গমন করিলাম। রামবাবু আমাদের পূর্ব্বরাত্রের দুর্গতির কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং আমাদিগকে সুন্দররূপে জলযোগ করাইলেন। তিনি আমার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসা বলবতী দেখিয়া পরিষদের প্রদর্শনীর জন্য কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সমস্ত তত্ত্ব আমার নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন।

রামবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ মহাশয় "কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত তাম্রফলক" অভিধেয় যে প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং যাহা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, সেই প্রবন্ধোক্ত তাম্রফলক খানি রামবাবুই শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রদান করেন। প্রবন্ধেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রামবাবু ইন্দ্রাণী পরগণার অনেক প্রাচীনতত্ত্ব আমার নিকট বিবৃত করিলেন এবং তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত একখানি কাঁটোয়ার মানচিত্রে প্রাচীন স্থান গুলি দেখাইতে লাগিলেন, শুনিলাম মুর্শিদাবাদের ইতিহাসপ্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় অজয়নদের তীরে বিদ্যমান বর্গীদিগের 'গোরাই' দুর্গ দেখিতে আসিয়া রামবাবুর নিকট হইতে অনেক প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রামবাবু মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের জমিদারীতে অবস্থিত বরাকরের

একটী শিবমন্দিরে খোদিত লিপির যে প্রতিলিপি (Paper rubbings) আনিয়াছিলেন তাহা আমাকে পাঠ করিতে দিলেন। আমি তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হওয়ায় রামবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেখানি প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্ত আমাকে প্রদান করিলেন। উক্ত প্রতিলিপি খানি পরিষদে রক্ষিত আছে। আমি উহার যে, পাঠোদ্ধার করিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিলাম ; যত্তপি পাঠোদ্ধারে আমার ভুল হইয়া থাকে আক্ষরিক পণ্ডিতগণ তাহা সংশোধন করিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রতিলিপিতে খোদিত অক্ষরের পাঠ—

"শাকে নেত্রবসুত্রিচন্দ্রগুণিতে পুণ্যে বুধাহে তিথা-
বষ্টম্যামচিরং প্রতিষ্ঠিতবতী পক্ষে সিতে ফাল্গুনে ॥
ঐশং দেবকুলং যথাবিধি হরিশ্চন্দ্রস্ত ভূরিশ্রিয়ো।
ভূপক্রন্ত হরিপ্রিয়া প্রিয়তমা তস্যাঃ ফলপ্রাপ্তয়ে ॥"

অর্থাৎ ১৩৮৩ শকে পবিত্র বুধবারে ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে প্রভূত সম্পত্তিশালী পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্রের প্রিয়তমা হরিপ্রিয়া (নাম্নী পত্নী) তাঁহার প্রতিষ্ঠার ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত শিবদেবালয় যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বর্ত্তমানে ১৮২৯ শক চলিতেছে—সুতরাং (১৮২৯-১৩৮৩=৪৪৬) উক্ত লিপি ৪৪৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৬১ খৃঃ খোদিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে অদ্যাপি বহুসংখ্যক হিন্দুমন্দির দৃষ্ট হয়, ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ১৫শ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুনরপতিদিগের রাজ্য ছিল। বরাকরে এই রত্নেশ্বর মন্দিরগাত্রে আর একটী খোদিত লিপি আছে, কিন্তু তাহা আধুনিক বোধে প্রদান করিলাম না।

১৭৬৮ শকে নন্দলাল দে ঘরিয়া (দেবগৃহী) নামক একব্যক্তি এই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করেন। দ্বিতীয় খোদিতলিপিতে কেবল সেই বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে রামবাবু ১১৮৪ সালের ২২শে শ্রাবণ তারিখে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের বিচারিত একখানি বাঙ্গালা ফয়শালা দেখাইলেন। ইহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় তৎকালে কিরূপ বিচারকার্য্য হইত, তাহা জানা যায়। কিন্তু ফয়শালাখানি রামবাবুদিগের সম্পত্তির প্রয়োজনীয় দলিল বলিয়া, তিনি এখানি আমাকে দিতে পারিলেন না। উক্ত দলিলে "ইন্দ্রাণী পরগণা এবং কাঁটোয়া মৌজে"—এইরূপ লিখিত আছে। রামবাবুর নিকট ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন বাঙ্গালা ও পারসী দলিলের এবং শ্রীবাটীর একটী মন্দিরের ফটোগ্রাফের 'নেগেটিভ্' ছিল। তিনি সেই দুইখানি আমাদিগকে দেখিতে দিলেন এবং ভূপেন্দ্রবাবু তাহা হইতে কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ছাপিয়া লইলেন।

রামবাবু বলিলেন, কাঁটোয়ার যুবচাতলা নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন কামান অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু সময়াভাবে তাহা দেখিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইন্দ্রাণীর ধ্বংসাবশেষ কাঁটোয়ার গঙ্গাতীরে দ্বাদশতীর্থের দুই একটী ধ্বংস নিদর্শন দেখিতে গমন করিলাম। দেখিলাম ভাগীরথী কাঁটোয়ার নিম্নে অতি ক্ষীণস্রোতা

হইয়াছেন। চড়া পড়িয়া গঙ্গাস্রোত অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাঁটোয়া বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল দীনবন্ধু বাবু কাটোয়ার উল্লেখে বলিয়াছিলেন :—

"কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ কত মহাজন।
সারি সারি ঘাটে তরী বাণিজ্য-বাহন ॥
সরিষা মসিনা মুগ কলাই মসুরি।
চাল ছোলা বিরাজিত হেথা ভূরি ভূরি ॥
সুরভি "গোবিন্দভোগ" চাল যার নাম।
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারী দাম ॥"

কিন্তু কাঁটোয়ার সে বাণিজ্যসৌভাগ্য বিলুপ্তপ্রায়।

মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে কাঁটোয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মুরশিদকুলি খাঁ স্বীয় নামে, মুরশিদাবাদ, গঞ্জমুরশিদপুর এবং মুরশিদপত্তন নামে ৩টী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মুরশিদপত্তন মীর্জ্জাপুরের খালের নিকট অবস্থিত ছিল এবং গঞ্জমুরশিদপুর বর্ত্তমান কাঁটোয়ার দক্ষিণাংশে গুড়েহাটের উপরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে নামের সহিত সে স্থানের অবস্থান বিস্মৃত। কেবল গুড়েহাটে সে স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তিন ঈশ্বরের মধ্যে ঘোষেশ্বর সামান্য ভাবে বর্ত্তমান আছেন। ঘোষহাটের কাছে জগাই মাধাইএর সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। তেরহাটের অন্যতম বীরহাট বা বেড়ার নিকটে ইন্দ্রেশ্বরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইন্দ্রেশ্বরের নাম হইতে ইন্দ্রাণী পরগণার নাম-করণ হইয়াছিল।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে শ্রীমন্ত—"ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপাণি।"
মণ্ডলঘাটের পরেই ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট, তৎপরে ভূগুসিংহের ঘাট। কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও এই ক্রম ঠিক রক্ষিত হইয়াছে।

"মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুরনন্দন।" * * * *
"ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈলা দিয়া ফুলপাণি।
ভূগুসিংহের ঘাটখানি ডাহিনে রাখিয়া।" ইত্যাদি

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাটে অদ্যাপি প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থানে অনেক প্রাচীনতত্ত্বের উদ্ধার হইতে পারে। বর্গীর হাঙ্গামার এই সকল স্থানে ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইয়াছিল। কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—

"আকাই হাট পাভাই পাট আর ডাক্রিহাট।
বেড়া-ভাণ্ডসিংহ পোড়ায় আর বিকীহাট।"
অন্যত্র—"কাটিকা ভাণ্ডসিংহ-বেড়া ভাঁইহাট দিয়া।
চারিদিকে বরগি হাটনি কৈল গিয়া।"

উপরোক্ত বেড়া-ভাণ্ডসিংহ বীরহাটও ভূগুসিংহের ঘাটের অপভ্রংশ। ইহার সান্নিধ্যেই

ইন্দ্রেশ্বরের ধ্বংসাবশেষ। সম্ভবতঃ বর্গীকর্ত্তৃক ইন্দ্রেশ্বরের শেষ চিহ্নটুকু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কাঁটোয়া ঐতিহাসিকের নিকট উপেক্ষণীয় নহে। এই স্থানেই বর্গীর হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যিকের নিকটও কাঁটোয়া আদরের বস্তু। কাঁটোয়ার পূর্ব্ব-গৌরব লুপ্ত হইলেও শ্রীচৈতন্তের দীক্ষাগুরু কেশবভারতীর এবং ভক্তপ্রবর জগাই মাধাইএর সমাধি অদ্যাপি কাঁটোয়ার অঙ্কে নিহিত রহিয়াছে। "দাশরথি দাস, কাটোঞা-নিবাস"—কৃষ্ণধন এইস্থানে দাশরথি রায়ের জন্মাষ্টমীর প্রতিযোগিতায় রাধাষ্টমী রচনা করিয়াছিলেন। দুইখানি তুলনা করিলে এস্থলে দাশরথি দাসকেই দাশরথির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে গুরুর গৌরববৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

রাত্রিতে জলযোগ করিয়া সে দিন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রবাবুর একটী বিভিন্ন বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিলাম। হরেকৃষ্ণ বাঁধমুড়ায় যাইবার জন্য গাড়ী ঠিক করিয়া প্রত্যূষে আমাদিগকে জাগরিত করিল। আমরা তদ্দণ্ডেই গাড়ীতে উঠিলাম। ১২ই ডিসেম্বর সোমবারে প্রত্যূষে ৫টার সময় আমরা কাঁটোয়া পরিত্যাগ করিলাম। খেজুরডিহি গ্রামের নিকটে সূর্য্যোদয় হইল। ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সুদপুর গ্রাম বামে রাখিয়া দুর্গা বা দুর্গাগ্রামের সন্নিহিত হইলাম। পরে দক্ষিণে গোপালপুর রাখিয়া বেলা ৯ টার সময় বাঁধমুড়ায় পৌছিলাম। পথিমধ্যে ধান্যক্ষেত্র এবং তালগাছের প্রাচুর্য্য ব্যতীত উল্লেখযোগ্য অন্য কিছুই নাই। মুসলমান পাড়ার মধ্যদিয়া ক্রমে আমাদের গাড়ী দাশরথি রায়ের ভগ্নাবশিষ্ট বাটীর নিকটে পৌছিল। কিন্তু বাটীতে দাশরথিরায়ের এক ভাদ্রবধূ ব্যতীত অন্য কেহ নাই জানিয়া শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় নামক দাশরথিরায়ের একজন জ্ঞাতিকে বাটী হইতে ডাকিয়া আনিলাম। ইনি এবং শ্রীযুক্ত শিবদাস মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক আমাদগকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। ভগ্ন প্রাচীর ভিন্ন বাটীর অন্য কোন নিদর্শন নাই। বাটীর বাহিরে দক্ষিণ-দিকে একটু ক্ষুদ্র পুষ্করিণী তাহার উত্তরে একটী বাঁধান ঘাট, কিন্তু তাহার উপরে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থগাছ উৎপন্ন হইয়া বাঁধা ঘাটটীকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছে। তপেন্দ্রবাবু বাটীর ভিতর দিকের এবং বাহির দিকের দুইখানি ফটোগ্রাফ লইলেন। আমি রায় মহাশয়ের ভাদ্রবধূ ঠাকুরাণীর নিকট কতকগুলি তথ্যসংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভগ্ন প্রাচীর; বায়ুকোণে ভগ্ন দোতালা গৃহের ধ্বংসাবশেষ। সেইস্থানে রায় মহাশয়ের বিধবা ভাদ্রবধূ একখানি ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাও জীর্ণপ্রায়। দক্ষিণদিকে পূজার দালানের ভগ্নাবশেষ। পশ্চিমদিকে দুইখানি ছোটচালা একখানি রান্নাঘর, অপরখানি গোয়াল। নৈর্ঋতকোণে একটা কমলালেবুর গাছে কতকগুলি লেবু পাকিয়া রহিয়াছে। শুনিলাম এটী তিনকড়ি রায়ের স্বহস্ত রোপিত। এতদ্ভিন্ন ২।৪টী আতা এবং নিমগাছ বাড়ীর মধ্যে আছে। ঈশানকোণে একটী তেঁতুল গাছ। বঙ্গবাণীর বরপুত্র দাশরথি রায়ের জন্মভূমির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া আমার অন্তঃকরণ নানারূপ ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম ধন্য সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকগণ যাঁহারা বহু অর্থ ব্যয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রিয়কবি দাশরথির

জন্মভূমির আলেখ্যগ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমিও সেই ভগ্নগৃহের অনাবৃত প্রাঙ্গণে বসিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।

তাঁহার ভ্রাতৃবধূর দুরবস্থা দর্শনে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। * যখন দাশরথি রায়ের চীরধারিণী শীর্ণশরীরা ভ্রাতৃবধূ ঠাকুরাণী স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আমার সম্মুখে বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আমি অশ্রু সম্বরণপূর্ব্বক তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু শোকসন্তপ্তা বিধবা আমার প্রয়োজনের স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পরে আমি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলে তখন তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। এ সময় বেলা ১১টা, আমার স্নান হয় নাই দেখিয়া তিনি আমাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে স্নান করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম। এমন সময় হরপেন্দ্রবাবু আমাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সিঙ্গিযাত্রা করিবার কথা বলিলেন, কিন্তু আমি দাশরথি রায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি না জানিয়া যাইব না বলায়, তিনি আমাকে ফেলিয়া একাকীই সিঙ্গি যাইতে উদ্যত হইলে আমি সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া দাশরথি রায়ের বাটীতেই বিধবার নিকট আসিলাম।

দেখিলাম বিধবা কাঁদিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি চক্ষুর জল মুছিয়া কিছু মুড়ি ও গুড় প্রদান করিলেন এবং অশ্রুসিক্তলোচনে কহিলেন—"বাবা! ক্ষীরসর মণ্ডামিঠাই দিয়া অতিথিকে জলখাবার দিয়াছি, আর আজ আমার গুড়মুড়ি ছাড়া অন্য সম্বল নাই" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম, "মা! আমি অনেক উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন খাইয়াছি, কিন্তু আপনার প্রদত্ত গুড়মুড়ি আমার কাছে অমূল্য পদার্থ—আমি ইহাতে আমাকে ধন্য মনে করিতেছি।" তৎপরে তিনি আমার প্রার্থনাক্রমে সেই কমলালেবুর গাছ হইতে একটী পাকালেবু আনিয়া দিয়া, কহিলেন "বাবা! ও টক্ খাইতে পারিবে না।"

জলযোগ শেষ হইলে বৃদ্ধা কহিলেন "বাবা! তোমাকে দুটা ভাত খাওয়াই আমার এ শক্তিও নাই।" আমি কহিলাম "মা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কিছুপরেই অন্যত্র আহারাদি করিব। আমার ক্ষুধাও লাগে নাই, তবে যে গুড়মুড়ি খাইলাম তাহার কারণ, আপনার প্রদত্ত গুড়মুড়ি অন্যস্থানের সরভাজা হইতেও উপাদেয়।"

তখন পতিপুত্রহীনা বিধবা আমার পরিচয় লইলেন। আমি কহিলাম "মা! আপনার গৃহে দাশরথি রায় ও তিনকড়ি রায় মহাশয়দিগের যে স্বহস্তলিখিত কাগজপত্র আছে, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। কারণ আমরা সেইগুলি রক্ষা করিয়া মেলায় সকলকে দেখাইব।"

বৃদ্ধা আমাকে একটী দপ্তর প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার অনুমতি অনুসারে কয়েকখানি লিখিত কাগজ লইলাম। অবশিষ্টাংশ সাজাইয়া রাখিয়া দিলাম।

---

* এই অংশ শুনিয়া মহাত্মা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় ডনসোসাইটীর পক্ষ হইতে দাশরথি রায়ের বিধবা ভ্রাতৃবধূর সাহায্যার্থ ৫টি টাকা সভাস্থলে প্রদান করেন।

শুনিলাম বঙ্গবাসী আফিসের কর্ম্মচারী খাটুন্দী নিবাসী শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায় এখান হইতে অনেক কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধা প্রত্যাশিত অর্থ পান নাই। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু কিছু লইয়া গিয়াছেন।

দাশরথি রায় মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ তিনকড়ি রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবীর নিকট অন্যান্য যে সব তথ্য জানিয়াছি নিম্নে লিখিলাম। সেগুলি ভবিষ্যতে বাঙ্গালাসাহিত্যের ঐতিহাসিকের প্রয়োজনে আসিতে পারে।

শ্রীমতী হরসুন্দরীদেবীর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৭ বৎসর। নোটপাড়ার নিকট ঘনশ্যামপুর তাঁহার পিত্রালয়। দাশরথি রায়ের স্ত্রী প্রসন্নময়ী দেবীর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে মৃত্যু হইয়াছে। দাশরথির কালীমতী নামক একটীমাত্র কন্যা ছিল। নবদ্বীপে দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের সহিত কালীমতীর বিবাহ হয়। কালীমতীর দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল, একটী ৪ বৎসর বয়সে ও অপরটী প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কালীমতী অল্পদিনে বিধবা হন। তিনকড়ি রায়ের ঔরসে শ্রীমতী হরসুন্দরীর গর্ভে ৮ পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু ৮টী পুত্রই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। নিদারুণ পুত্রশোকার্ত্তা পতিহীনা দুঃখিনীর কথা ভাবিয়া বুঝুন।

দাশরথি রায়ের পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়, মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দেবীপ্রসাদের চারিপুত্র ভগবান্, দাশরথি, তিনকড়ি ও রামধন। তন্মধ্যে দাশরথি ও তিনকড়ি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র ভগবান্ রায়ের রামতারণ রায় নামে পুত্র ছিল। কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরে রামতারণের মৃত্যু হয়। রামতারণের একটীমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা স্ত্রী এই কন্যাটী লইয়া বর্দ্ধমানে জামাতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন। কনিষ্ঠ রামধন রায়ও অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন।

দেবীপ্রসাদ রায়ের দুই বিবাহ। দুই স্ত্রীর গর্ভে ২২টী পুত্র জন্মে। প্রথমা স্ত্রী শ্রীমতীর গর্ভে ১৫টী এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে ৭টী। দাশরথি রায়ের এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদিগের মধ্যে মধু রায় ও রতন রায় ভিন্ন হরসুন্দরী অন্য কাহারও নাম করিতে পারিলেন না। দাশরথির ভ্রাতুষ্পুত্র ৺রামতারণ রায় দিনকতক পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন। নূতন পালা রচনায় তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ২৬।২৭ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। দাশরথি রায়ের মৃত্যুর পরে তিনকড়ি রায় ৬ বৎসর পাঁচালীর দল যোগ্যতার সহিত চালাইয়াছিলেন। বাজনায় তিনকড়ির অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। দাশরথি বলিয়াছিলেন—"যদি আমি ছড়াকাটি, সন্ন্যাসী (সমসাময়িক পাঁচালীওয়ালা) গায় এবং তিনু বাজায় তবে বাঙ্গলাদেশে পয়সা রাখি না।" দাশরথি বাল্যাবধি মাতুলালয় পীলাগ্রামে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি তথায়ই স্বীয় বাসভবন ও দুইটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাঁধমুড়ার বাসভবন তিনকড়ি রায়ের নির্ম্মিত। এই বাস্তুভূমিতে কেবল দাশরথির জন্ম ও বিবাহ হইয়াছিল। ১২৬৪ সালের ২রা কার্ত্তিক পীলা গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং ১২৭০ সালের চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতিথিতে

বাঁধমুড়া গ্রামে তিনকড়ির মৃত্যু হয়। তিনকড়ি রামপুর বোয়ালিয়ায় গান করিতে যান, এবং তথা হইতে ফিরিয়া ৮ দিবসের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দাশরথি রায় রাঢ়ীয়শ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। গোপালরায়ের প্রতিষ্ঠিত "গোপালপুর" গ্রাম বিদ্যমান আছে, কিন্তু রায়বংশের সহিত তাহার সংস্রব রহিত হইয়াছে।

শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী এই সমস্ত পরিচয় দিয়া কহিলেন—"বাবা ৫ বিঘা ধানের জমি,একটী সামান্য আয়ের জমা এবং এই বাস্তটুকু ভিন্ন আমার অন্য সম্বল সব গিয়াছে। একটী গরু ও একটী কাল বিড়াল লইয়া এই শ্মশানপুরীতে একা বাস করিতেছি—বাবা! তুমি কি আমার জন্মান্তরের পুত্র যে, এই নির্বান্ধব পুরীতে আমার দুঃখের কথা জানিতে আসিয়াছ।" এই বলিয়া বৃদ্ধা অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে আবেশভরে বলিতে লাগিলেন—"বাবা লোকে বলে আমার বহুমূল্য ধনরত্ন আছে, বাবা জহুরীতে রত্ন চেনে, তাই তোমাকে বলিতেছি আমার ভাশুর ও স্বামী যে অমূল্যনিধি আমাকে দিয়া গিয়াছেন—হায় সে রত্নের মূল্য কে বুঝিবে?" বিস্ফারিত লোচনে বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বাবা বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিতে বড় ইচ্ছায় হইয়াছিল, পিতা বিধবা হইবার ভয়ে লেখাপড়া শিখিতে দেন নাই, হায় যদি লেখাপড়া শিখিয়া বিধবা হইতাম তবে আজ আমি নিজের ঘরের অমূল্যরত্নের আস্বাদ জানিতে পারিতাম। বাবা! কত শত লোকে রায় মহাশয়ের রত্ন ভাঙ্গিয়া বেচিয়া মানুষ হইয়া গেল—আর আমি হতভাগিনী, আমি এক বেলা এক মুঠা ভাতের জন্য পড়িয়া আছি। আমি এই অমূল্যরত্ন বুকে করিয়া পুড়িয়া মরিব, তথাপি আর ঘরের ধন পরকে বিলাইয়া দিব না।"

এমন সময়ে শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায় নামে একটী স্থানীয় ভদ্রলোক ও তপেন্দ্রবাবু আমাকে ডাকিতে আসিলেন। তখন বেলা ১টা। আমি আসিয়া দেখিলাম তপেন্দ্রবাবু ও হরেকৃষ্ণ এক ময়রার দোকানে চিড়ামুড়কী প্রভৃতি দ্বারা ফলার করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ আমাকে ফলার করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু আমি একপোয়া সন্দেশ খাইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া সিজি যাত্রা করিলাম। ক্ষুধার্ত্ত হরেকৃষ্ণ একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু তপেন্দ্রবাবুর রাগ দেখিয়া সে নীরব হইল। বাঁধমুড়ার দক্ষিণবর্ত্তিনী ব্রহ্মাণী নদীর উত্তর ধার দিয়া সোজা পূর্ব্বাভিমুখে আমরা সিজি যাত্রা করিলাম।

সিজি।

আমরা ব্রহ্মাণী নদীর উত্তর তীর দিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্ষুদ্র তটিনী ব্রহ্মাণী সাধারণতঃ দশগজের অধিক বিস্তৃত নহে। নদীর উভয় তীরে ধান্যক্ষেত্র দিগন্ত বিস্তৃত। কোন স্থানে ধীবরবালকগণ আনন্দকলরবে মাছ ধরিতেছিল। প্রায় ২ঘণ্টা চলিয়া আমরা সিজি গ্রামের সমীপে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে ব্রহ্মাণী নদী পার হইয়া সিজি যাইতে হয়। স্থানীয় লোকের পরামর্শানুসারে হরেকৃষ্ণ গোশকটে ব্রহ্মাণী উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু

নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াই গাড়ীর চাকা একেবারে কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া গেল। আমরা গাড়ী ছাড়িয়া অনতিগভীর জলে নামিলাম, এবং প্রাণপণে গাড়ীর চাকা তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পরে আমরা ৩ জনে গাড়ীখানি উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাণী নদী উত্তরণ করিলাম। হস্তপদের কর্দ্দম প্রক্ষালনপূর্ব্বক গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলাম এবং তেঁতুলগাছ বেষ্টিত ১টী পুকুরের পূর্ব্বধার দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমরা নবচূড়ামণ্ডিত প্রসিদ্ধ বুড়াশিবের মন্দির বামদিকে রাখিয়া দক্ষিণপাড়ার ভগ্নাবশিষ্ট বারোয়ারী তলায় পৌঁছিলাম। এইস্থানে গাড়ী রাখিয়া আমরা কাশীরামদাসের বাস্তুভূমির এবং তাঁহার নিখাত পুষ্করিণীর ফটোগ্রাফ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমাদিগের নিকটে উপস্থিত গ্রামস্থ ২।৩ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক কাশীরামদাসের বাস্তুভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যেস্থানে কাশীরাম দাস বাস করিতেন, সেস্থানে এখন অন্য লোক বাস করিতেছেন। বারোয়ারীতলার কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্ব্বে ঐ স্থান অবস্থিত। বর্ত্তমানে শ্রীগিরীন্দ্র-নাথ চন্দ্র ঐ উক্ত বাস্তুর অধিবাসী। ভদ্রলোকের অন্তঃপুর বলিয়া কাশীরাম দাসের জন্মভূমি স্পর্শজনিত আনন্দানুভব করিতে পারিলাম না। দূর হইতে একখানি ফটোগ্রাফ তোলা হইল।

তৎপরে গ্রামের দক্ষিণে প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী "কেশেপুকুর" অর্থাৎ কাশীরাম দাস নিখাত পুষ্করিণীর ফটোগ্রাফ লইবার জন্য যাত্রা করিলাম। বারোয়ারীতলা হইতে ঐস্থান একপোয়া পথ হইবে।

সিঙ্গির অন্য নাম শিবরামবাটী। সিঙ্গির অবস্থান অতি সুন্দর। ইহার উত্তরে সৈয়দপুর বা মালঞ্চ, ঈশানকোণে দেওয়াশীন বা রামচন্দ্রপুর, পূর্ব্বে করুইথাল, অনন্তবাটী এবং ওকড়সা, দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীবাটী ও মুণ্টীকৃষ্ণনগর, বায়ুকোণে নারায়ণপুর।

আমরা যখন কেশেপুষ্করিণীর তীরে পোঁছিলাম, তখন বেলা অবসানপ্রায়, সুতরাং ফটোগ্রাফ তুলিতে বিশেষ অসুবিধা হইল। অবশেষে অনেক কষ্টে দুইখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইল।

উক্ত ফটোগ্রাফের মুদ্রিত চিত্রে যেস্থলে একটী বালক দণ্ডায়মান রহিয়াছে ঐ স্থান পশ্চিম দিকের জলের সীমান্ত রেখা। বালকের পূর্ব্বদিকে যে একটী অট্টালিকার অস্পষ্টালেখ্য দেখা যাইতেছে, উহা ওকড়সা গ্রামে কাশীরামদাসের স্মরণার্থ সংস্থাপিত "কাশীরাম দাস বিদ্যালয়" নামক প্রবেশিকা পাঠশালা (Entrane school)। এই বিদ্যালয় স্থাপনে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদিগের নিকট কেশেপুকুর পরমতীর্থ। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন এই পুষ্করিণী পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তিনি ভক্তিগদগদচিত্তে এই জল মস্তকে প্রদান করিয়া পান করিয়াছিলেন। আমি কিঞ্চিৎ জল মস্তকে দিয়া পরে করপুটে এই পবিত্র জল পান করিয়া লইলাম।

পুষ্করিণীর বর্ত্তমান জলকর একবিঘা মাত্র। শুনিলাম ইহার পরিমাণ পূর্ব্বে পাহাড় সমেত

চারিবিঘা ছিল। এক্ষণে সেই উচ্চ পাহাড় চারিদিকের সমতল ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পুকুরে আড়াই হাতের অধিক জল নাই। কোন বৎসর অনাবৃষ্টির সময়ে একেবারেই শুকাইয়া যায়। এই পুষ্করিণী এক্ষণে রমানাথ মণ্ডলদিগরের ৭টী অংশীদারের অধিকারে রহিয়াছে। উত্তরদিকের পাহাড় কেবল ধান্তক্ষেত্র হইতে ও পুকুরের জলতল হইতে ২ হাত উচ্চ। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তৃত সুপক্ক ধান্তক্ষেত্র সকল অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছিল। মন্দবাত্যান্দোলিত পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগুলি অতুলনীয় চাকচিক্যতায় সৌরকর লইয়া খেলা করিতেছিল, সেই মনোরম দিবাবসান সময়ে বহুভাবের উদ্দীপনা লইয়া আমরা বারোয়ারীতলায় চলিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল,কাশীরাম দাসের এই লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্ত কোন উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। নতুবা অল্প-দিনের মধ্যে, কাশীরাম দাসের জন্মভূমি নির্দ্দেশ করিবার এখনও যে সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, তাহা বঙ্গভূমির বক্ষঃ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন হয়ত, ভবিষ্যমান সাহিত্যিকগণকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে পরিরক্ষিত পুষ্করিণীর আলেখ্যে দর্শনলালসার পরিতৃপ্তি করিতে হইবে। আমি মনে করিলাম, সাহিত্য পরিষৎ এক মহাব্রতের অনুষ্ঠান আরব্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে বিস্মৃতপ্রায় পল্লীনিকেতনে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীকে বিবিধ ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—আজি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ সেই বঙ্গভারতীর প্রিয়পুত্রগণের জন্মভূমির চিত্র পর্য্যন্তও সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বুঝিলাম বঙ্গবাসী বিলুপ্তগৌরবের স্মৃতিতে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।

সিঙ্গিগ্রাম বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাসস্থান। দেখিলাম সেখানে আজিও সে কালের আদর্শ-ভদ্রলোকের অভাব নাই। আমাদের সে দিন সমস্তদিন আহার হয় নাই,—ইহা জানিতে পারিয়া সহৃদয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্ত দুই তিন জন ভদ্রলোক অযাচিতভাবে আমাদের আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহে যত্ন করিতেছেন। সেই বারোয়ারী তলায় একটী গৃহস্থের বাটীতে আমরা রন্ধনের উদ্যোগ করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যাকালে পল্লীগ্রামে চাউল ও লবণ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া গেলনা। তখন আমরা জেলে পাড়ায় মৎস্যের সন্ধান করিয়া কিছু তরকারীর জন্ত উক্ত চন্দ্রভূষণ বাবুর "ক্ষেত্রপাল-নিকেতন" নামক সুন্দর উদ্যানে গমন করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সমাদরে আমাদিগকে গোলালু ও কাঁচকলা প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক পুকুর হইতে মাছ ধরিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলাম।

পরে আমরা রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া রাত্রি ৮টার সময় আহার করিলাম। চন্দ্রভূষণ বাবু আমাদের শয়নের জন্ত এক গৃহস্থের বহির্ব্বাটীতে বিছানা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই সময়ে সমাগত দুইচারিজন ভদ্রমহোদয়ের সহিত নানা কথাবার্ত্তা হইল।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রপাল-নিকেতনের নিকটে এই গ্রামে এক প্রাচীন দেবস্থান আছে। তদনু-সারে চন্দ্রবাবুর উদ্যানের নাম "ক্ষেত্রপাল-নিকেতন" রাখা হইয়াছে। একটী বৃক্ষতলে ক্ষেত্র-পালের পূজাদি হইয়া থাকে। পূজায় বলিদান হয়। পূর্ব্বে যে বুড়াশিবের মন্দিরের কথা

বলিয়াছি, উক্ত মন্দির ১২৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, এই মন্দিরের ৯টী চূড়া এবং মন্দিরের নানা স্থানে শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনিলাম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, মহাশয় কিছুকাল পূর্ব্বে কাশীরাম দাসের লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার মানসে মহা-ভারতের হস্তলিপির জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্বশুরালয়, সিঙ্গি গ্রামের অর্দ্ধক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে, তিনি প্রত্যহ বেলা ১০টার মধ্যে আহারাদি করিয়া রামলাল গরাইএর বাটীতে আসিতেন। এই রামলাল গরাইএর পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত কাশীরাম দাসের অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল এবং কাশীরাম দাস প্রতিবেশী গরাইদিগের বাটীতে সর্ব্বদা থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনেক হস্তলিখিত কাগজ পত্র ও পুঁথি গরাইদিগের বাটীতে ছিল। পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গরাইগৃহ হইতে কাশীরাম দাস প্রণীত নৈষধ-কাব্যের অনুকরণে বিরচিত "নলদময়ন্তী" কাব্যখানি লইয়া যান। তৎপরে বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে উক্ত পুঁথি প্রকাশিত হয় নাই। আমিও বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহার কোনরূপ সন্ধান পাই নাই। কাঁটোয়ার পূর্ব্বোক্ত শ্রীরামরামচন্দ্র পুঁথিখানি দেখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, পুঁথিখানি বৃহৎ এবং নানা ছন্দে রচিত।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যহ রামলাল গরাইএর বাটীতে আসিয়া পুঁথিগুলি আলোচনা করেন দেখিয়া সাহিত্যানুরাগী রামলাল তাঁহাকে সমস্তই প্রদান করিয়াছিল—সকলেই এই কথা বলিলেন। রামলাল এই অঞ্চলের বিখ্যাত কবিওয়ালা নারায়ণ ঠাকুরের দলে মুহরীর কার্য্য করিত এবং প্রয়োজন মত গান বাঁধিতেও পারিত। শুনিলাম পূর্ব্বে সিঙ্গিগ্রাম সর্ব্ববিষয়ে গৌরবান্বিত ছিল। এই গ্রামে এককালে ২২টী চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল। কমলাকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, রামগতি তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের কথা অনেকেই জানেন। পণ্ডিত ভূপতিনাথ ন্যায়পঞ্চাননের টোল কাশীরাম দাসের বাড়ীর নিকটে অবস্থিত ছিল। কাশীরাম সর্ব্বদাই টোলে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং প্রয়োজন মত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের তামাক সাজিয়া দিতেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কথকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেখানে তাঁহার কথকতা হইত বালক কাশীরাম সেই স্থানেই তাঁহার সহিত গমন করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সমস্ত চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। এই প্রকার পণ্ডিত সংসর্গে এবং ন্যায়পঞ্চানন মহা-শয়ের প্রসাদে কাশীরামদাস মহাভারতে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাশীরাম-দাসের বাড়ীর নিকটে যে ভগ্নপ্রায় বারোয়ারী ঘরের কথা বলিয়াছি, এই স্থানে তৎকালে নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত এবং তদুপলক্ষে পুরাণ, মহাভারতপাঠ এবং কথকতা প্রভৃতি হইত। উক্ত বারোয়ারী ঘরের এক্ষণে ৪টী স্তম্ভ এবং পশ্চাদ্ভাগে একটী ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীর বিদ্যমান আছে।

এইরূপে নানাপ্রকার কথোপকথনের পর চন্দ্রবাবু ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ আমা-দিগকে নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিয়া, স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। আমরা প্রত্যুষে এস্থান হইতে যাত্রা করিব বলিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে আমরা দাঁইহাট যাত্রা করিলাম। একটা বড় পুকুরের ধার দিয়া আমরা ব্রহ্মাণীতীরে উপস্থিত হইলাম। হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মাণী নদীতে গাড়ী চালাইয়া দিল। কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে যাইয়া গাড়ীর চাকা জলমগ্ন হইল এবং দেখিতে দেখিতে গাড়ীর চাকা গভীর কর্দ্দমে পুতিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে জল প্রবেশ করায় আমাদের বিছানা ও কাপড়াদি ভিজিয়া গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া অপর পারে উঠিলাম। হরেকৃষ্ণ অনেক টানাটানি করিয়াও গাড়ীর চাকা তুলিতে পারিল না। আমার পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুটিয়া গেল। তপেন্দ্রবাবু জলে নামিয়া চাকা তুলিতে লাগিলেন, কিন্তু গাড়ী কিছুতেই উঠিল না। এইরূপে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আমরা ব্রহ্মাণী নদীর কাদায় পড়িয়া গাড়ী টানাটানি করিতে লাগিলাম। সে কষ্টের কথা বর্ণনা করা যায় না। শেষে হরেকৃষ্ণ জলে ডুব দিয়া একখানি চাকা কিঞ্চিৎ উত্তোলিত করিলে, তপেন্দ্রবাবু তাহা ধরিয়া রহিলেন, এবং আমি গরু চালাইতে লাগিলাম। এইরূপে বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা সেই দারুণদুর্দ্দৈব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। অবশেষে সর্ব্বাঙ্গের কাদা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া ক্লান্তদেহে গাড়ীতে উঠিলাম।

চাণ্ডুলী ও ঘোঁড়ানাশের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া আমরা ক্রমান্বয়ে উত্তরদিকে চলিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে কেবল উন্নতশীর্ষ তালতরুর অপূর্ব্ব শোভা। ঘোঁড়ানাশ একটী বৃহৎ গ্রাম, এখানে তাল ও নারিকেল বৃক্ষের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইল। পথে যাইতে যাইতে গরুড় গাড়ী হইতেই এই স্থানের বিশেষত্ব অনুভব করিলাম। দুই পার্শ্বে তাঁতীদিগের গৃহে বহুসংখ্যক চর্‌কা ঘুরিতেছে দেখিয়া আমার মনে প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পসমৃদ্ধির কথা জাগিয়া উঠিল। কোন স্থানে তন্তুবায়রমণীগণ তসরের সূত্র প্রস্তুত করিতেছে, কোথায় তন্তুবায়গণ তসরের কাপড় বুনিতেছে। আবার একস্থানে দেখিলাম সোলার টুপির একটা বড় কারখানা। ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া প্রান্তরে পড়িলাম। প্রান্তরে শস্যশ্যামলা স্বভাবসুন্দরীর বিচিত্র পরিচ্ছদ সূর্য্যের সুবর্ণকরে অধিকতর উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত ও মৃদুল পবনে অপূর্ব্ব আন্দোলিত হইতেছে। অরহর, তিসি, সর্ষপ, ইক্ষু প্রভৃতির প্রচুর ক্ষেত্র নয়নপথে পতিত হইল। তন্মধ্যে হেমন্তরাণীর সরিষার ফুলের সোণার আঁচলের তুলনা নাই। ক্রমে নলাহাটী গ্রামে পৌছিলাম। এ স্থানের প্রতিও কমলা দেবীর বিশেষ দৃষ্টি আছে। বহুসংখ্যক তন্তুবায়গৃহে প্রাচীন বাঙ্গালার শিল্পের সঞ্জীবনিদর্শন দেখিয়া আমি পুলকিত হইলাম। পথপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ মনসা সিজ গাছের প্রাচুর্য্য। পথিমধ্যে দেখিলাম একস্থলে পুষ্করিণী গর্ভে ১৫।১৬ হাত উচ্চ মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমা ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাল, খেজুর ও নারিকেল বৃক্ষের বিরাম নাই। এ অঞ্চলের ভূমির নানারূপ শস্যোৎপাদিকা শক্তি আছে। ক্রমে মাধবপুর, গলখাঁজি ছাড়াইয়া একটী আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। এইস্থানে হুগলীকাটোয়া রেলপথের রাস্তা হইবে বলিয়া মাটী ফেলা হইয়াছে। ক্রমে জগদানন্দপুরে পৌছিলাম। জগদানন্দপুরে নন্দীবাবুদিগের প্রসিদ্ধ প্রস্তরমন্দির একটী প্রধান দর্শনীয় দ্রব্য।

গাড়ী হইতে নামিয়া আমি মন্দিরটী একবার দেখিয়া লইলাম। পশ্চিমভারতে কাশী

প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত প্রস্তরমন্দির আছে, এই মন্দির সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সমকক্ষ। অধিকন্তু বাঙ্গালার প্রস্তরশিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন এই মন্দিরকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। মন্দিরটী বর্ত্তমান যুগের হইলেও ইহাকে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে। কারণ এরূপ প্রস্তরমন্দির বঙ্গদেশে আর নাই। দাঁইহাটের ভাস্করগণের খোদিত, মন্দিরগাত্রে গ্রথিত দশাবতারচিত্রগুলি সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। বিশিষ্টরূপে মন্দিরটী দেখিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। ক্রমে আমরা বাঘ্‌টিকরী নামক প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রামে প্রবেশ করিলাম। এস্থানে পল্লীসুলভ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম। চতুর্দ্দিকেই তাঁত চলিতেছে এবং চর্‌কা ঘুরিতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পথিমধ্যে "মিউনিসিপ্যালিটির" চিহ্ন স্বরূপ আলোক স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। চতুর্দ্দিকেই একটা সমৃদ্ধির লক্ষণ নয়নগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা প্রসিদ্ধ দাঁইহাটের সমীপবর্ত্তী দেওয়ানগঞ্জের ষষ্ঠীতলায় উপস্থিত হইলাম। বৃক্ষমূলে সিন্দূরমণ্ডিত ও ফুলবিল্বদলবিভূষিত কয়েকটী দেবমূর্ত্তি দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম, তন্মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি, পূর্ব্বোক্ত সালার গ্রামের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত অভিন্ন। একটী ব্রহ্মামূর্ত্তি এবং অন্যান্য কতকগুলি ভগ্নপ্রায় মূর্ত্তিও সে স্থানে রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা দাঁইহাটে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১১টা, চতুর্দ্দিকে পিত্তলকাঁসার কার্য্যালয়ে হাতুড়ির শব্দ শুনিয়া আমার মনে দাঁইহাটের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথা জাগরূক হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দাঁইহাট গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে গঙ্গাস্রোত দাঁইহাট হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে মেটেরীর নিম্নে সরিয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য কিম্বা দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে মেটেরীর উল্লেখ আছে, কিন্তু দাঁইহাটের কোন উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে দাঁইহাট গঙ্গাতীরে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, অদ্যাপি এখানে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

ক্রমে আমরা বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রস্তরশিল্পী শ্রীনবীনচন্দ্র ভাস্কর মহাশয়ের কারখানায় উপস্থিত হইলাম। আমি পশ্চিমভারতের নানাস্থানে প্রস্তরশিল্পের শিল্পশালা দেখিয়াছি—কিন্তু বঙ্গভূমিতে আজি এই প্রস্তরশিল্পের কারখানা দেখিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম।

জেমো স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নবীন ভাস্করের নামে এক খানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি পত্রখানি বাহির করিয়া নবীনবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায় কারখানার অধ্যক্ষ নবীন বাবুর যোগ্য পুত্র যোগেন্দ্র বাবু আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গেলেন। নবীন বাবু পত্রপাঠপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী সিধা উপস্থিত হইল। আমাদের ইচ্ছা ছিল সে দিন রন্ধনের গোলযোগে না যাইয়া, জলযোগ করিয়া দিন কাটাইব। কারণ প্রবাসে রন্ধনের কষ্ট ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"রন্ধনং বন্ধনং পুংসাং মরণং পরিবেশনে।
ততোঽধিকং মহদ্দুঃখং রন্ধনস্থানমার্জ্জনে॥"

কিন্তু নবীন বাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয় রহিত করিতে পারিলাম না। অগত্যা রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলাম। দাঁইহাটে নারিকেল গাছের এবং বাসকের অত্যন্ত আধিক্য দৃষ্ট হইল। এক শত বৎসরের ঊর্দ্ধতন শত শত নারিকেল গাছ এ স্থানে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কাংস্যবণিক এবং তন্তুবায় সর্ব্বত্রই আপনাপন কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। বৈদেশিক শিল্পের ভীষণ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দাঁইহাটে স্বদেশী শিল্পের অনুজীবিত্ব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইল।

অবিলম্বে স্নানাদি করিয়া নবীন বাবুর বাটীতে ফিরিলাম। পরে রন্ধনান্তে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আমি নবীন বাবুকে লইয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। উপেন্দ্র বাবু নিদ্রিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ গরু দুইটাকে খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইল।

নবীন বাবু বলিলেন যে, তাঁহাদের বংশে ঊর্দ্ধতন ১৬ পুরুষে অনেক প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিনিদর্শন অদ্যাপি বঙ্গের নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। তাঁহারা ২০০ বৎসর দাঁইহাটে বাস করিতেছেন। তদবধি তাঁহাদের প্রস্তরশিল্পের কারখানায় বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া বঙ্গদেশের বক্ষঃ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, বহুদর্শী, বিচক্ষণ নবীনচন্দ্র বলিলেন—"মহাশয়, বোধ হয়, এত দিনের সাধের কারখানা বুঝি বন্ধ করিতে হয়। দেবদেবীও বিলাত হইতে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুলভে বিলাতী দেবমূর্ত্তি পাইলে লোকে বেশী মূল্যে আমাদের নির্ম্মিত মূর্ত্তিগ্রহণ করিবে কেন?"

আমি কহিলাম,—"সেকালে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার যুগে বিগ্রহশিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, বর্ত্তমান কুকুরপ্রতিষ্ঠার যুগে সে সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে।" নবীন বাবু বলিলেন যে, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের রাজবংশের দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়া আসিতেছেন।

ফলতঃ নবীনচন্দ্রের প্রস্তরশিল্পের নৈপুণ্যকাহিনী অনেকেই অবগত আছেন! যাঁহারা বিগত শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহার বালগোপাল মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়াছেন—তাঁহারাই বলিবেন—বিগ্রহশিল্পে নবীনচন্দ্র জয়পুরের শিল্পিগণ অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট!

এতদ্ভিন্ন ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা দেবীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নবীনচন্দ্রের নির্ম্মিত। ক্ষীরগ্রামের এই মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লইতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু যে কারণে তাহা ঘটে নাই উহা লিখিলাম। যুগাদ্যামূর্ত্তি বারমাস একটী পুষ্করিণীতে নিমগ্ন থাকেন। প্রতি সংক্রান্তির নিশীথ সময়ে তাঁহাকে তাঁহার সলিলশয্যা হইতে তুলিয়া মন্দিরে স্থাপিত করা হয় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পুনরায় দেবীমূর্ত্তি জলমগ্ন করা হয়। কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন মাত্র যুগাদ্যা দেবী সূর্য্যের মুখ দর্শন করেন। বৈশাখী সংক্রান্তিতে তাঁহাকে তুলিয়া এক দিন মাত্র উত্থানমন্দিরে সংস্থাপিত করা হয়। সুতরাং ঐ দিন ভিন্ন বাঙ্গালীশিল্পিবিনির্ম্মিত এই দেবীমূর্ত্তি দেখিবার বা ফটোগ্রাফ লইবার উপায় নাই। তবে মূর্ত্তিনির্ম্মাতার প্রমুখাৎ যে বর্ণনা শুনিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

যৎকালে ক্ষীরগ্রামে হরিদত্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, তখন যুগাদ্যা দেবী ভদ্রকালী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কালক্রমে ভদ্রকালী দেবীর নরবলিস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি রাজা হরিদত্তকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিলেন যে, প্রত্যহ এক একটী নরবলি না পাইলে তিনি রাজ্যধ্বংস করিবেন। এইরূপে নরবলি আরম্ভ হইল। ক্ষীরগ্রামবাসিগণ ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরাচারপরায়ণ শক্তিভক্ত রাজা হরিদত্ত সাত দিনে সাতপুত্রের বলিদানে ভদ্রকালীর করাল নর-শোণিত-পিপাসার পরিতর্পণ করিলেন। পরে পুরোহিতপুত্রের নরবলির পালা আসিল। পূজকব্রাহ্মণ রাত্রিতে সপরিবারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রকালী ব্রাহ্মণকন্যার বেশে পুরোহিতকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন—"ব্রাহ্মণ! তুমি নিজগৃহে ফিরিয়া যাও, আমি অদ্য রাত্রিতে রাজাকে প্রত্যাদেশ করিব যে, কল্য হইতে নরবলি রহিত হইবে।" পুরোহিতব্রাহ্মণ গত্যন্তরহীন হইয়া গৃহে ফিরিলেন। প্রভাতে রাজা ভদ্রকালীর প্রত্যাদেশের কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন।

তদবধি নরবলি রহিত হইল এবং দেবীর আদেশক্রমে ভদ্রকালীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পৌরাণিক ধ্যানের অনুযায়িনী দশভুজামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে সেই পুরাতনী মূর্ত্তিতে কোন দোষলক্ষিত হওয়ায় বর্দ্ধমানের মহারাজা নবীনচন্দ্র ভাস্করকে পূর্ব্বমূর্ত্তির সদৃশ অবিকল এক মূর্ত্তি গঠন করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে নবীনভাস্কর যুগাদ্যা মূর্ত্তির নির্ম্মাণ করেন। মূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে মহারাজা কোন্‌টী নূতন, কোনটী পুরাতন তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই দেবীমূর্ত্তি জটাজুটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, ত্রিলোচনা, পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ও সুপ্রসন্না ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানা। নবীনভাস্কর মহিষাসুরমর্দ্দিনীর প্রতিমূর্ত্তিতে যে নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য ও কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

এতদ্ভিন্ন, সিউড়ীর দক্ষিণারঞ্জন বাবুদিগের এবং জেমোর রাজবাটীতে স্থাপিত কালীমূর্ত্তি, মুক্তাগাছার রাণী বিদ্যাময়ী ও আনন্দময়ী দেবী কর্ত্তৃক কাশীতে প্রতিষ্ঠিতা কালীমূর্ত্তি, বর্দ্ধমান রাজবাটীর গোপালজী ও কালীমূর্ত্তি, মহারাণী স্বর্ণময়ীর সৈদাবাদ বাটীস্থ রাধামাধবজী মূর্ত্তি, ময়মনসিংহ শ্রীধরপুরের বালগোপাল মূর্ত্তি এবং মহামায়া দেবী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথজীমূর্ত্তি, নাটোর রাজবাড়ীর আনন্দকালী ও বিবিধ বিগ্রহ, নাটোরে সারদাগুরুবাটীর মহাকালী প্রতিমূর্ত্তি, মণিপুর রাজবাটীর রাধাবল্লভজীর যুগল মূর্ত্তি, ত্রিপুরা রাজবাটীর কালীমূর্ত্তি— বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রস্তরশিল্পী নবীন ভাস্করের হস্তপ্রসূত। দিনাজপুরের মহারাণী শ্যামমোহিনী নবীন ভাস্করের নির্ম্মিত কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে বিমুগ্ধচিত্তে নবীন চন্দ্রকে সোণার বাঁটালি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

প্রস্তরশিল্প ভিন্ন ধাতুময়ী দেবী মূর্ত্তিগঠনে ও নবীনচন্দ্রের অদ্ভুতদক্ষতা দেখিলাম। নবীনচন্দ্রের সমস্ত পরিচয় এই ক্ষুদ্র বিবরণে সম্ভব হয় না। আমি বলিলাম, "আপনি বর্ত্তমান রুচিকর মানুষের মূর্ত্তি গঠন করেন না কেন?" সগর্ব্বে নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন "মহাশয় যে হস্তে দেবতা গড়িয়াছি, সেই হস্তে বা-নর গড়িব? আমাকে এরূপ অপমানের কথা বলিবেন না"।

আমি ইহা শুনিয়া নবীনচন্দ্রকে ধন্তবাদ করায়, নবীনচন্দ্র অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল আমার সহিত নবীনচন্দ্রের নানাপ্রসঙ্গে কথোপকথন হইল। আমি তাঁহার নিকট অনেক পুরাতত্ত্বের তথ্য সংগ্রহ করিলাম।

নবীনচন্দ্র কহিলেন—"মহাশয় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাস্রোত দাঁইহাটের নিম্ন দিয়া প্রবহমান ছিল—তৎকালে দাঁইহাটে ৫০ জন প্রস্তরশিল্পী বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু গঙ্গাপ্রবাহের দূর গমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত শিল্পীই গঙ্গাগর্ভে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কেবল এই অধম সেই শোচনীয় পরিণাম বলিবার জন্যই বোধ হয় জীবিত আছে।'

তৎপরে নবীনচন্দ্র বলিলেন, বর্গীর হাঙ্গামায় দাঁইহাট উৎসন্ন প্রায় হইয়াছিল। কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে দাঁইহাটে বর্গীর অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে গঙ্গা দাঁইহাটের নিম্নে প্রবাহিতা ছিলেন। এই স্থানে গঙ্গার উপরে নৌসেতু বাঁধিয়া বর্গীরা গঙ্গাপার হইয়াছিল এবং এই স্থলের বর্গীসর্দ্দার ভাস্কর ১১৫০ সালের বা ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল এবং এই স্থানই বর্গীরা বিশেষ ভাবে লুণ্ঠন করিয়া অগ্নিপ্রদানে ভস্মসাৎ করিয়াছিল।

দাঁইহাট ইন্দ্রাণী পরগণার তেরহাটের মধ্যে দক্ষিণ দিকের শেষ হাট।

গঙ্গারাম লিখিয়াছেন—

"আতাইহাট পাতাইহাট আর ডাঞিহাট।
বেড়া ভাওসিংহ পোড়ায় আর বিকীহাট॥"

অন্যত্র

ডাঞিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল।
কত শত বর্গী তারা লুটিতে চলিল।

অন্যত্র

হেথা ভাস্কর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
সেরূপে ডাঞিহাটে কৈল পূজা আরম্ভণ॥"

বর্গীর লুণ্ঠন এবং অগ্নি প্রদানের দারুণ অত্যাচারেই দাঁইহাট উৎসন্ন হইয়াছিল। তদবধি দাঁইহাটের পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেলা ৩টার সময় হরেকৃষ্ণ আমাদিগকে ডাকিল। আমি ভূপেন্দ্র বাবুকে জাগরিত করিয়া নবীনচন্দ্র ভাস্করের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। দেব-দ্বিজ-ভক্তিশীল নবীনচন্দ্র, ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার ক্রটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

আমরা পদব্রজে চলিলাম। গঙ্গার চড়ায় একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তায় গাড়ী চলিতে লাগিল। এই স্থানে গঙ্গার পূর্ব্ব খাতের মধ্যে একটী অনতিগভীর খাল। খালের উপরে মানুষ চলিবার একটী সেতু আছে। কিন্তু গরুর গাড়ী খালের জলে ফেলিয়া পার করিতে হয়। আমরা পুলের উপর দিয়া অপর পারে উঠিলাম। হরেকৃষ্ণের গাড়ী জলে ডুবিয়া গেল—

তখন হরেকৃষ্ণ অনেক কৌশলে গরু খুলিয়া দিয়া গাড়ী লইয়া, অপর পারে উঠিল। কিন্তু খালের উপরে উঠিবামাত্র কলাই ক্ষেত্রের ইহু জন কৃষক হরেকৃষ্ণের গরু দুইটী খুলিয়া থানায় লইয়া চলিল। আমরা অনেক অনুরোধ করিলাম, হরেকৃষ্ণ কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল, তথাপি সেই দুর্বৃত্ত গরু লইয়া থানায় চলিল। আমি অন্য একটী কৃষকের নিকট জানিলাম যে, এই স্থান বালির জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের অধিকৃত এবং নিকটেই তাঁহার কাছারী আছে। রাজেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পূর্ব্বপরিচয় আছে বুঝিতে পারিয়া দুর্বৃত্ত গরু ছাড়িয়া দিল।

এইরূপ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল পরে আমরা গঙ্গাসৈকতের উপর দিয়া ক্রমে মেটেরীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ১৫ দিন যাবৎ যে রাঢ়ভূমিতে প্রাচীনতত্ত্বসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম, অদ্য সেই ভূমির নিকট বিদায় লইতে আমার মনে একটু বিষাদসঞ্চার হইল।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

——000——

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন।

২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি এল
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
„ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এ,
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
„ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ মহেন্দ্রনাথ দে এম্, এ, বি, এস সি
„ হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্, এ,
„ আদিত্যনাথ মৈত্র
„ বিজয়কুমার সরকার
„ জ্ঞানদাকান্ত চক্রবর্ত্তী
„ নবীনচন্দ্র লোধ
„ নলিনচন্দ্র চৌধুরী
„ প্রভাসচন্দ্র দত্ত
„ বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ নিকুঞ্জমাধব সাহা

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্, এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্, এ,
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ,
„ মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বীরেশ্বর গোস্বামী
„ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
„ অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ী
„ গিরীন্দ্রকুমার চৌধুরী
„ সতীশচন্দ্র গুহ
„ নলিনীকান্ত রায়
„ মোহিনীমোহন দাস হালদার
„ মাণিকলাল বড়াল
„ নন্দলাল দাস
„ অশ্বিনীকুমার দে
„ দুর্গাচরণ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর দত্ত	শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর সাহা
„ হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত	„ প্রতাপচন্দ্র সাহা
„ নিবারণচন্দ্র চৌধুরী	„ সুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ লোকনাথ দে	„ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নিরঞ্জন মিত্র	„ যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ সতীশচন্দ্র সাহা	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ, সম্পাদক।
„ রামকমল সিংহ	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। নূতন সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্ত্তৃক "কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "প্রদর্শনীতে পরিষৎ" নামক প্রবন্ধ।

৫। রাজসাহীতে শাখা-সভা স্থাপনসংবাদ।

৬। বহরমপুরে প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের সংবাদ। ৭। বিবিধ।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ গৃহে এই সভা আহূত হয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হয়।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বি, এল্ দিনাজপুর।
		২। „ সারদাকান্ত রায় এল্,এম্,এস্, দিনাজপুর।
শ্রীচন্দ্রভূষণ মৈত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। „ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	„	৪। „ আনন্দমোহন সাহা ৫০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
		৫। „ ডাঃ জগচ্চন্দ্র নাথ এল, এম্, এস কৃষ্ণনগর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
		৬। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় এম্, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
		৭। „ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি,এল্ কৃষ্ণনগর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	৮। „ যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার কচুবেড়ীয়া, কাশীনগর, যশোহর।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৯। „ বীরচন্দ্র সিংহ এম্, এ, অধ্যাপক টি, এন্ জুবিলী কলেজ ভাগলপুর।
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	„	১০। „ শচীন্দ্রনারায়ণ রায়, জমীদার, কাঞ্চনতলা মুর্শিদাবাদ।
		১১। „ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ ১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট্, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল :—

(১) শিখের বলিদান (২) মেরী কার্পেণ্টার—শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, (৩) শ্যামা-সঙ্গীত-লহরী—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী (৪) গয়ার পিণ্ডদানপদ্ধতি, (৫) ইস্‌লাম ও ইংরাজ (৬) Satyartha Prokash—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্, (৭) শান্তি-শতক (৮) রাঘব-বিজয়—শ্রীশশধর রায় (রাজসাহী) (৯) A Geological Excursion to Mayurbhanja—শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত (১০) Grain Banks—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (১১) A descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript.—Government Library, Madras.

৪। প্রবন্ধ—

(ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র-পুরাণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পুস্তকখানি মৈমনসিংহ প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল; পুস্তকের সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার পরিষৎকে উহা পাঠাইয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পুস্তকখানি আলিবর্দ্দী খাঁ নবাবের জীবনকালে অর্থাৎ হাঙ্গামার অনতিকাল পরেই গঙ্গারাম নামক ব্যক্তির রচিত ও সম্ভবতঃ তাঁহারই স্বহস্তলিখিত। উহার আলোচ্যবিষয় বর্গীর হাঙ্গামা। গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্র পুরাণের প্রথম খণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহার পরের আর কোন খণ্ড পাওয়া যায় নাই।

সাতারাপতি সাহু দিল্লীপতির নিকট চৌথ চাহিয়া পাঠাইলেন, দিল্লীপতি বলিলেন, বাঙ্গালার সুবেদার কর দেওয়া বন্দ্ করিয়াছেন, সেইজন্য স্বয়ং লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লও, তদনুসারে মহারাষ্ট্রপতি রঘুজিকে চৌথ আদায়ের ভার দিলেন। রঘুজি ভাস্করপণ্ডিতকে সসৈন্যে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। ভাস্করের সৈন্য আসিয়া নবাবকে বর্দ্ধমানে ঘেরাও করিলেন। বহু কষ্টে অবরোধ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবাব পলায়ন করিলেন। ভাস্করের সেনা রাঢ়দেশের গ্রাম জ্বালাইতে ও লুঠিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত জগৎশেঠের কুঠী লুট করিয়া, লোকের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাঢ়ের লোক গঙ্গাপারে গিয়া ধনপ্রাণ বাঁচাইল। বর্ষাশেষে কাটোয়ায় আসিয়া জমীদারদের সাহায্যে ভাস্কর দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন। নবাবের সৈন্য হঠাৎ আসিয়া পড়ায় দুর্গোৎসব সম্পূর্ণ হইল না। সে বৎসর বর্গী দেশ ছাড়িয়া গেল। পর বৎসর বর্গীর পুনরাগমন। এবার নবাবের সহিত ভাস্করের সন্ধির প্রস্তাব ও নবাবশিবিরে ভাস্করের অবস্থান ও হত্যা, এই বর্ণনায় সহিত গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। (মূল গ্রন্থ পরিষৎ-পত্রিকার ১৩শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।) বর্গীর অত্যাচার ও বাঙ্গালীর পলায়নবার্ত্তা গ্রন্থে সমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন ;—গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক। বর্গীর অত্যাচারকাহিনী উহাতে অতিরঞ্জিত হয় নাই। ময়ুরভঞ্জের নানাস্থানে বর্গীর উৎপাতের নিদর্শন যাহা দেখিয়াছি তাহাতে উহার ভয়াবহত্বে সন্দেহের কারণ নাই। স্বধর্ম্মী বলিয়া বর্গীরা হিন্দুর কোন খাতির করে নাই।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবের উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মহামূল্যত্ব নির্দ্দেশ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রদর্শনীতে পরিষৎ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধটি ১৪শ ভাগ ৩য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

গত ভারতশিল্প প্রদর্শনীতে পরিষৎ যে সকল ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সহ সংগ্রহ কিরূপে সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিলেন। দেশ বিদেশের মান্যগণ্য পদস্থ ব্যক্তি, বাঙ্গালার লেফ্-টেনাণ্ট গবর্ণর সার এণ্ড্রু ফ্রেজার, আমেরিকার কন্সল, এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী কর্ণেল ফিলট, হাইকোর্টের জষ্টিস্ হোমউড্ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানের পদস্থ লোক কিরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত উহা দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। সাধারণ সাহায্য করিলে পরিষৎ ঐ দ্রব্যগুলিকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া একটি জাতীয় চিত্রশালা (মিউ-জিয়ম্) স্থাপনে উদ্যোগী হইতে পারেন, এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন, পরিষৎ এই কার্য্যে অতি অল্প সময়ে যেরূপ বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা অন্য কোন সমাজের পক্ষে সাধ্য ছিল

না। বস্তুতঃ এই প্রদর্শনীতে পরিষদের গৌরব ভূরি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিষৎ দেশের জন্য কত কাজ করিতেছেন, তাহা সাধারণে পরিচয় পাইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির যথাযথ বিবরণ সহ একটি তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। পরিষদের স্থাপিত চিত্রশালায় এই সকল ও এই শ্রেণির অন্যান্য দ্রব্য সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়া লোক-শিক্ষার বিধান করুক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলিলেন, পরিষৎ অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিলেও নানা শ্রেণির দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যথা—

প্রাচীন শিল্পের নমুনা—প্রতাপাদিত্যের সময়ের এনামেল, গৌড়ের ও মুর্শিদাবাদের রাজধানীর এনামেল করা ইষ্টক।

চিত্র শিল্পের নমুনা—বিষ্ণুপুর রাজবাটীর Wall paper, চিত্রিত পুথির মলাট, প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক, প্রাচীন সংবাদ পত্র।

তাম্রশাসন—কুমার গুপ্ত ও লক্ষ্মণসেনের।

প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি—(কোচবিহার হইতে প্রাপ্ত) পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরের নমুনা, প্রাচীন কবিগণের ও আধুনিক সাহিত্য-সেবকগণের হস্তাক্ষর।

চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর, চৈতন্যদেবের উৎকল যাত্রার মানচিত্র।

বিবিধ ঐতিহাসিক অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষের ফটোগ্রাফ।

এই সকল দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সাধারণকে অনুরোধ করা হইল।

৫। তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপনের সংবাদ দিলে উহার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হইল।

৬। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বহরমপুরে প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধে বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে আমি মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়কে বহরমপুরে সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম; তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বহরমপুরে আগামী ১৭ই ও ১৮ই চৈত্র তারিখে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের আয়োজন করিতেছেন। বহরমপুরে এজন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে ও অভ্যর্থনার ব্যয় ও আয়োজন ভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের যাবতীয় সাহিত্যসেবীকে এই সম্মিলনে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছেন। গত বৎসর বরিশালে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগ হইয়াছিল, পরিষৎ নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ সম্মিলন ঘটিতে পায় নাই। এ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ স্বয়ং উদ্যোগকর্ত্তা ও নিমন্ত্রণকর্ত্তা, সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ পত্র পাইবেন। আশা করি তাঁহারা সকলে

উপস্থিত হইয়া সম্মিলনকে সার্থক করিবেন। এই সম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইলে সাহিত্যের মহোপকার সাধিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ঐ প্রবন্ধপাঠকগণকে ধন্যবাদ দিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন।

৭ই বৈশাখ (১৩১৪) ২০ এপ্রিল, শনিবার অপরাহ্ন ৪টা।

স্থান—জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, বহুবাজার ষ্ট্রীট।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীশ্রীশ্রী ১০০৮ মুনি মহারাজ ধর্ম্মবিজয়ী (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মুনি ইন্দ্র বিজয়
" মুনি বসন্ত বিজয়
" রায় বদ্রিদাস মুকিম বাহাদুর
" লালা ফুলচাঁদ মোথা বিএ, এল্ এল্ বি,
" মাণিক যেদজী সুখনী
" হীরালালজী দুসাই
" মানা মলজী
" কোঠামলজী বহাবত
" মাণিকচাঁদজী শেঠ
" উদয় মলজী সিংঘি
" প্যারীলালজী
" বাহাদুরমলজী রামপুরিয়া
" ধনকরণজী রামপুরিয়া
" জীবনমলজী রামপুরিয়া
" কনয়ালালজী কোকলিয়া
" কিষণচাঁদ বৈদ

শ্রীযুক্ত মুনি মঙ্গল বিজয়
" রায় বুধসিংহ দুধুরিয়া বাহাদুর
" লালা বনারসীদাস ঝাউচুর
" লালা সুগনচাঁদ দুধুরিয়া
" ঘসিটা মলজী
" ভগবানদাসজী দুসাই
" কোঠামলজী ঠাগা
" হীরালালজী মুকিম
" জীবণচাঁদ জীচর
" কনয়া লালজী বঠের
" মুনালালজী পারষ
" মুলচাঁদজী শেঠী
" লালচাঁদজী
" পান্নালালজী কোকলিয়া
" লালচাঁদ
" উদয়চাঁদ সিংঘি

শ্রীযুক্ত সুগনচাঁদ রূপচাঁদ
" ইন্দ্রচাঁদজী শ্রীমল
" রাজকুমার সিংহ
" পান্নালাল জী লোঢ়া
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ,
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ, বিএল,
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএল
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম,এ,
" যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম্‌এ, বিএল,
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এমএ, বিএল
" উমেশচন্দ্র ঘোষ এমএ, বিএল,
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এমএ, বিএল
" ভুবনমোহন বিশ্বাস বিএল
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী
" " প্রমথনাথ তর্কভূষণ
" " চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার
" " দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
" " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
ডাক্তার " রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমএ, সম্পাদক
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত বলদেব প্রসাদ
" রতনচাঁদজী সিপানী
" হীরালালজী চৌখানী
" হাজারীমল
" অম্বিকাচরণ সেন এম্‌এ, বিএল, সিএস্‌
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ,বিএল,
" যতীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এমএ,
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম,এ,
" বিনয়কুমার সরকার এমএ, বিএল,
" কিশোরীমোহন গুপ্ত এমএ, বিএল,
" বিধুভূষণ সেন গুপ্ত এম্‌এ,
" বরদাপ্রসন্ন সোম এমএ, বিএল,
" চারুচন্দ্র মিত্র এমএ, বিএল
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিএ,
" বসন্তরঞ্জন রায়
" চারুচন্দ্র বসু
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" বিনোদবিহারী রায়
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
" জয়দাপ্রসন্ন দত্ত
" শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী
" মন্মথমোহন বসু বিএ, সহঃ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩ পুস্তক উপহার দাতাগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪ প্রবন্ধ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ, মহাশয় কর্তৃক "জৈন ন্যায়-দর্শন" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫ বিবিধ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীশ্রী ১০০০ মুনি মহারাজ ধর্ম্মবিজয়ী মহোদয়কে যথারীতি ধন্যবাদ সহকারে অভ্যর্থনার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইল। তৎপরে সভাপতির আদেশ ক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ, মহাশয় "জৈন ন্যায়-দর্শন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। যথা সময়ে প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত

হইলে মুনি মহারাজের প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ইন্দ্রবিজয়জী প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। প্রথমতঃ তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধে আলোচিত কতকগুলি জৈন গ্রন্থকারের কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া সেই গুলির সংশোধন করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে তিনি কতকগুলি প্রখ্যাতনামা জৈন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করেন। সংশোধিত কাল মধ্যে উমাস্বাতি বাচক, সিদ্ধসেনগণি, সিদ্ধসেন দিবাকর, মল্লবাদী এবং হরিভদ্র সূরির কালের আলোচনাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "ষট্‌দর্শনসমুচ্চয়" গ্রন্থের গ্রন্থকার নিরূপণ সম্বন্ধেও তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করেন ও তাঁহাদের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রবন্ধের আরও কয়েকটি বিষয়ের সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, উমাস্বাতিবাচক ১০১ বিক্রম সংবতে লিখিত হয় নাই; ২৫০ মহাবীর সংবতে লিখিত হইয়াছিল। আত্মারামজী মহারাজ তাঁহার "উত্থানতিমির ভাস্কর" গ্রন্থে ঐ সময়েরই সমর্থন করিয়াছেন। "তপাগচ্ছপটাবলী" এবং "উপাসক দশাঙ্গ সূত্রে"র অনুবাদের টিপ্পনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণও উল্লিখিত সময়ই নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা উমাস্বাতীকে 'উমাস্বামী' বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহাবীর-সংবৎ ২৪৩৩। মহামহোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে "সিদ্ধসেন দিবাকর" সিদ্ধসেনগণির পরবর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ বিপরীত। সিদ্ধসেনগণি যে সিদ্ধসেন দিবাকরের পরবর্ত্তী তাহা সহজেই প্রমাণীকৃত হইতে পারে। সিদ্ধসেনগণি তাঁহার "তত্ত্বার্থসূত্রটীকায়" লিখিয়াছেন—"সিদ্ধসেন দিবাকর এবং আহ"। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সিদ্ধসেনদিবাকর সিদ্ধসেনগণির পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সিদ্ধসেনগণি ৪৭০ মহাবীর সংবতের বিদ্যমান ছিলেন। প্রদ্যুম্নসূরি তাঁহার "বিচারসার প্রকরণম্" গ্রন্থে ঐ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। দেবর্দ্ধিক্ষমাশ্রমণ ৯৮০ মহাবীর সংবতে বর্ত্তমান ছিলেন। আত্মারামজী মহারাজ ডাঃ হর্ন্‌লির প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সিদ্ধসেনগণি দেবর্দ্ধিগণিকে লিখন-কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ সত্য। মহামহোপাধ্যায় বলিয়াছেন মল্লবাদী ১২০০ বিক্রম সংবতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা সত্য নহে; কারণ আমরা "প্রবন্ধচিন্তামণি" এবং "প্রভাবকচারিত্র" গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, শিলাদিত্যের রাজত্বকালে মল্লবাদী—বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে শিলাদিত্য রাজার পর ১৪০০ বৎসর গত হইয়াছে। আরও দেখা যায় ডাঃ ক্ল্যাট লিখিয়াছেন, মল্লবাদী ৮৮৪ বিক্রম সংবতে বর্ত্তমান ছিলেন (Vienna Oriental Journal Vol VI. p, 67.)। এক্ষণে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়াও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মল্লবাদী ১২০০ বিক্রম সংবতে ছিলেন না বরং বর্ত্তমান সময় হইতে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। মহামহোপাধ্যায়ের মতে দ্বিতীয় হরিভদ্রই "ষট্‌দর্শন সমুচ্চয়ের" গ্রন্থকার। ইহা যে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ষট্‌দর্শন-সমুচ্চয়ের দীপিকা এবং লঘুটীকায় লিখিত আছে যে ষট্‌দর্শন সমুচ্চয়ের গ্রন্থকার ১৪৪৪ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা প্রথম হরিভদ্র সূরি। এই হরিভদ্র সূরি ৫৮৫ বিক্রম সংবতে বর্ত্তমান ছিলেন,

কিন্তু প্রবন্ধলেখক তাঁহাকে ১২৫৮ সংবতে আনিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় প্রামাণিক গ্রন্থের সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।

তপাগচ্ছপটাবলী, সিদ্ধান্তোক্ত নির্ণয়বিচার, বিচারামৃতসংগ্রহ, গচ্ছোৎপত্তিপ্রকীর্ণ, বিচারসারপ্রকরণ, অজ্ঞানতিমিরভাস্কর প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ পাওয়া যায় যে ৫৮৫ বিক্রম সংবতে প্রথম হরিভদ্র সূরি বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে ইন্দ্রবিজয়জী সাধারণভাবে পাণ্ডিত্য সহকারে জৈনধর্ম্ম ও জৈনদর্শন সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীমুনি মহারাজ একটি সংক্ষিপ্ত স্তোত্র পাঠান্তর হিন্দু ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন।

"স্যাদ্বাদো বর্ত্ততে যস্মিন্ পক্ষপাতো ন বিদ্যতে।
নাস্ত্যন্যপীড়নং কিঞ্চিজ্জৈনধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥"

যে ধর্ম্মে স্যাদ্বাদ আছে, পক্ষপাতিত্ব নাই এবং যে ধর্ম্মে প্রাণিগণের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ সেই ধর্ম্মই জৈনধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্নতাজ্ঞাপক মতগুলির একী-করণকে স্যাদ্বাদ কহে। স্যাদ্বাদের বিস্তৃত অর্থ হেমচন্দ্রাচার্য্যের "অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা দ্বাত্রিংশিকায়" এইরূপে লিখিত আছে,—

"আদীপমাব্যোম সমস্বভবং। স্যাদ্বাদমুদ্রা নতি ভেদবস্তু। ইত্যাদি।

তৎপরে তিনি "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মতের সপক্ষে কতকগুলি অখণ্ডনীয় প্রমাণ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে অহিংসাই ধর্ম্ম মহীরূহের মূল এবং এই মূল যতই শক্তি শালী হইবে বৃক্ষ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কেবল জৈনগণই যে দান ও দয়াধর্ম্ম পালন করিবেন তাহা নহে, হিন্দুদিগের নানা ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাই ধর্ম্মের সার বলিয়া গৃহীত হইয়াছে হিন্দুগণ 'অহিংসাকে' ধর্ম্মের পবিত্রতম অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন। অহিংসার প্রাধান্য সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। মনুস্মৃতি বলেন যে, একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে শতবর্ষব্যাপী জীবন পাওয়া যায়, কিন্তু যে আমিষ আহার করে না সেও সেই ফল পায়।

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং॥"

আমিষ আহারের ফলস্বরূপ মনুষ্য প্রাণিহত্যার পাপে পতিত হয়।

"সমুৎপত্তিং চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥"

জ্ঞানিগণ আমিষভক্ষণের সমস্ত কুফল স্মরণ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকেন; কিন্তু অজ্ঞান মানবগণ কেমন করিয়া দেবীর সম্মুখে শাস্ত্রের নিষেধ সত্বেও নির্দ্দোষ নিরীহ পশু বলি দিয়া থাকে। এই দেবীই জগদম্বা জগন্মাতা, কিন্তু ইহাও কি সম্ভব যে সেই জগন্মাতাই তাঁহার সমক্ষে তাঁহার আত্মতৃপ্তির জন্য তাঁহার নিজ সন্তানকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া বলি দাতাকে

পরমার্থ দান করিবেন। শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে আমরা দেবদেবীর পূজা পশু পুষ্পগন্ধ দ্বারা (পশুপুষ্পগন্ধৈশ্চ) করিয়া থাকি। আমরা পুষ্প ও গন্ধ আস্তই দিয়া থাকি, ছিঁড়িয়া দিই না, কিন্তু যখন দেবীর নিকট পশু বলি দিই তখন তাহাদিগকে জীবিত এবং অখণ্ডভাবে উৎসর্গ করি না কেন? তাহাদিগকে যূপে ফেলিয়া ছেদন করি কেন এবং সেই ছিন্ন মৃত পশুই বা উৎসর্গ করি কিজন্ত? শাস্ত্রের অনুসাশনে 'বলিং দদ্যাৎ', কিন্তু বলি অর্থে আমরা কেবল পশু বুঝি কেন? বলি অর্থে যে কোন নৈবেদ্য বুঝায়। শাস্ত্রে আরও শাসন আছে।

"মৃতং স্পৃশেৎ স্নানমাচরেৎ।"

অথচ দেবীকে অস্পৃশ্য মৃত পশু দিতে কুণ্ঠিত হই না। যাঁহারা মৎস্য মাংস ভোজন করেন, তাঁহারা কখনই জীবিত মৎস্য মাংস খাইতে পারেন না। তাঁহাদের অবশ্যই মারিয়া খাইতে হয়, কিন্তু শাস্ত্রানুশাসন ক্রমে মৃতাবস্থায় এগুলি অস্পৃশ্য, অতএব এই ঘৃণ্য অপবিত্র বস্তু আহার করা হয় কেন? যাঁহারা মৎস্য মাংস ভক্ষণে শারীরিক বলবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে মুনি মহারাজজী হস্তী ও ব্যাঘ্রের তুলনায় উভয়ের বলবিক্রমের আলোচনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্তীর নম্রতা ও শান্তভাবের সহিত ব্যাঘ্রের ক্রোধ ও উগ্রতার তুলনা করেন। তৎপরে মুনি মহারাজ বহুতর শাস্ত্র হইতে সর্ব্বজনীন প্রেমের উপদেশমূলক বচন উদ্ধার করিয়া বলেন যে এই উপদেশ যে কেবল প্রত্যেকের পালনীয় ধর্ম্ম এমন নহে, ইহা দ্বারা মানব জাতিরই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে। এই প্রেমের বলেই বরাবর জগৎ চলিতেছে, ইহারই বলে ইতরজীব হইতে মানুষের পার্থক্য সাধিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত মানুষের সহিত পশুর কোন পার্থক্য থাকে না। ইহার পর রামেন্দ্রবাবু পরিষদের পক্ষ হইতে জৈন সম্প্রদায়কে সভায় উপস্থিতির জন্য এবং মুনিমহারাজকে সভাপতিত্ব করণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন

২১শে বৈশাখ ১৩১৪, ৪ঠা মে ১৯০৭, শনিবার অপরাহ্ণ ৫।০ টা।

স্থান—জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ,—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্‌এ, বিএল, শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,
" ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি,
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এ
" যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ,
" দামোদর মুখোপাধ্যায় এম্ আর, এ, এস্
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" প্রমথনাথ সেন বি, এ,
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
" চারুচন্দ্র বসু
" আনন্দমোহন সাহা
" হরেন্দ্রকুমার মজুমদার
" বাণীনাথ নন্দী
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু বি,এ

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়
" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অশ্বিনীকুমার বসু
" কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়
" কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
" বিহারীলাল সরকার
কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" ভুবনচন্দ্র দে
" নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

আলোচ্য বিষয়াদি—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২ সভ্য-নির্ব্বাচন। পুস্তকোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৫। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ। ৬। আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৭। প্রবন্ধ,—(ক) ১৩১৩ সালের বাঙ্গালা-সাহিত্য "শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক লিখিত এবং (খ) "বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক লিখিত ৮। পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণারম্ভ সংবাদ। ৯ বিবিধ।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে তাহা গৃহিত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষক দৌলতপুর পোঃ খুলনা।
		২। শ্রীঅমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায় ৬৩ শ্রীদাম মুদির লেন ভবানীপুর

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬২ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট্।
"	"	৪। শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, ৭২ রসারোড।
"	"	৫। শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক, নড়িয়া, ফরিদপুর।
"	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৬। শ্রীদুর্গাদাস রায় নবাব হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদ।
"	"	৭। শ্রীব্রজকান্ত দেব স্মৃতিপঞ্চানন সাখুয়াই, ময়মনসিংহ।
"	"	৮। শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস, ১৩১ আপারচিৎপুর রোড
"	"	৯। চণ্ডীচরণ ঘোষ, মোহনবাগন রো।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১০। অশ্বিনীকুমার সেন, পীতাম্বর লাইব্রেরীর সম্পাদক সেনহাটী, খুলনা।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১১। শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরাহনগর, নিয়োগীপাড়া।
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১২। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ।
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"	১৩। শ্রীবিধুভূষণ বসু ১৭ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্।
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১৪। শ্রীঅম্বুজনাথ মুখোপাধ্যায় Technical Institute.
	"	১৫। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু। ৪ রসেল ষ্ট্রীট্।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১৬। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ত্রয়োদশ বর্ষের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সমগ্র সভার অনুমোদনে উহা পরিগৃহীত হইল।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষীয় শিল্প-প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের যোগে যে সারস্বত-সম্মিলন করেন, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

মহাশয়, তাহাতে পরিষদের সমস্ত সদস্যগণকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন, এই প্রশ্ন করায় পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন যে, মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহারা যে সকল সাহিত্যিকগণকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ তাঁহারাই স্থির করিয়াছিলেন, কেবল নিমন্ত্রণ ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের সাহায্য প্রার্থনা করায় পরিষদের সম্পাদক নিমন্ত্রক রূপে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার পর কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এ বিষয়ে পরিষদের কৃতকার্য্যের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, এখন এ সমালোচনায় কোন ফল নাই। পরিষদের কার্য্য-বিবরণ ঠিক লিখিত হইয়াছে কি না তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। যদি পরিষদের কৃতকর্ম্মে কাহারও ত্রুটি হয় তাহা হইলে তিনি সম্পাদককে পত্রাদি লিখিয়া তাহার সবিস্তার বিবরণ জানিতে পারেন এবং তাহার পর কোন আলোচনা করা আবশ্যক হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে জানাইতে পারেন। সভাপতি মহাশয় চারুবাবুর এই মন্তব্য সমিচীন বলিয়া গ্রহণ করিলে উপস্থিত প্রসঙ্গের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গৃহনির্ম্মাণের সংবাদ জানাইয়া বলিলেন,—গৃহনির্ম্মাণের আরম্ভের পূর্ব্বে যে সকল অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা সব শেষ হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী বাড়ীর নক্সা মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন, মার্টিন কোম্পানী ব্যয়ের যে এষ্টিমেট দিয়াছেন তাহাও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত হইয়াছে। ব্যয় ২৮০০০৲ আটাইশ হাজার টাকার কিছু উপর পড়িবে। ১৪৫০০৲ টাকার বেশী চাঁদা স্বাক্ষর হয় নাই। তাহার মধ্যেও দাতার মৃত্যুর জন্য সহস্রাধিক টাকা পাওয়া যাইবে না। এরূপ স্থলে দেশের গণ্যমান্য বদান্য ব্যক্তিগণের নিকট আরও সাহায্য প্রার্থনা করা ভিন্ন উপায় নাই। তদ্ভিন্ন পরিষদের প্রত্যেক সভ্য, এ বিষয়ে সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনা। পরিষদের প্রায় ৮০০ সদস্য আছেন। গড়ে যদি প্রত্যেকে ৫টী করিয়া টাকা দেন তাহা হইলেও ৪০০০৲। ৫০০০৲ টাকা উঠিবে। যে সকল সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন ইহাই প্রার্থনা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ১৩১৪ সালের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীর পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল :—

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বিএল।

সহকারী সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ, ডিএল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ, বিএল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু বিএ।

পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব।

ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্এ, বিএল।

গ্রন্থ-রক্ষক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

ছাত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্এ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে এম্এ, বিএল, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্এ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় জানাইলেন যে, ১৩১৪ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির জন্য পরিষদের সমস্ত সদস্যের নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত আটজন উহার সদস্য হইয়াছেন।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্এ।
২। " " বিহারীলাল সরকার।
৩। রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
৪। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৫। " যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিএ।
৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু
৭। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্এ
৮। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

এতদ্ভিন্ন গত বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত চারিজন ব্যক্তি সদস্য মনোনীত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্এ
২। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল
৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
৪। " নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এমএ,বিএল

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩১৩ সালের "বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" পাঠ করিলেন। অমূল্য বাবু নিজ চেষ্টায় এই বিবরণ সম্পূর্ণ করিবার আশায় নানা-রূপ নূতন উপায়ে নানা নূতন পুস্তকের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় এইরূপ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা এবং পরিষদের এ বিষয়ে চেষ্টার বিষয় বিবৃত করিয়া প্রবন্ধ লেখকের উদ্যমের পরিশ্রমের ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিলেন। অপর প্রবন্ধ পাঠক উপস্থিত না থাকায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করা হইল না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব অনুসারে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়কে অতঃপর বিশেষ সভ্যরূপে গণ্য করা হইবে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে এ পর্য্যন্ত সাহিত্য পরিষদে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ হইয়াছে। এই ৮০০ সদস্যের নিকটে মাসিক গড়ে ॥০ আনা করিয়া ধরিলে বৎসরে প্রায় ৪০০০ টাকা আদায় হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, অনেকের নিকট ৬ মাসের অধিক এমন কি ৪।৫ বৎসরের ও চাঁদা বাকী

আছে। এইরূপে পরিষদের প্রায় ৪০০০৲ টাকা চাঁদা পড়িয়া আছে। প্রায় ২০০ লোকের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাকী। যদি এই বাকী সমস্ত চাঁদা আদায় হয়, তাহা হইলে পরিষদের একটী ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। এক্ষণে সবিনয়ে প্রার্থনা, যে সকল সভ্য এখানে উপস্থিত আছেন, পরস্পর পরস্পরের বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করিয়া বাকী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলে পরিষদের উন্নতি-কল্পে বিশেষ সাহায্য হয়। তাহাও যদি ব্যক্তিবিশেষের নিকট পুঞ্জীকৃত হইয়া বাকী থাকে, তবে চলিবে কিসে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মনোযোগ দিলে বড় ভাল হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা
সভাপতি

৮। গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রাচীন পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পলতিকায় ভগবল্লীলা সম্বন্ধে মহাজন পদাবলী যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে গৌরাঙ্গলীলাসম্বন্ধে মহাজন ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে যতগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে, সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জগদ্বন্ধু বাবু এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিদূর্দ্ধ, পঞ্চদশ শত প্রাচীন পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৮০।৮৫ জন পদকর্ত্তার পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে আছে। ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকাংশে পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় ব্যতীত মহাজন পদ-সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু এই পুস্তক সঙ্কলনের জন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক অপ্রকাশিত পদ এবং অনেক কীর্ত্তনীয়া এবং টহলদারের নিকট শুনিয়া অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ উপায়ে সংগৃহীত পদাবলী গায়ক পাঠকের সুবিধার জন্য ভগল্লীলার ন্যায় গৌরাঙ্গ-লীলার বিবিধ অবস্থাভেদে তরঙ্গে এবং প্রতি তরঙ্গে বিবিধ উল্লাসে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৭৫০ এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবল মাত্র ২৲ টাকা। গুরুদাস বাবুর দোকানে ও মজুমদার লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

(পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অভাব-মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষা আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুঁথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পরিষৎ-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩১৪ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

——oo——

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বি,এল্।

সহকারী সভাপতিগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী এম্‌এ, ডি,এল, এফ, আর, এ, সি,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্‌এ, বি,এল,

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ,

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ,

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্‌এ,

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,

পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব,

ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ, বি,এল,

গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী,

ছাত্র-পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌এ।

নির্ব্বাচিত-সভ্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ,

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,

কুমার " শরৎকুমার রায় এম্‌এ,

" বিহারীলাল সরকার,

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,

" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর,

" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিএ,

" চারুচন্দ্র বসু।

মনোনীত-সভ্য।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ,

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ,

" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল,

" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌এ, বি,এল

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্দ্দশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—0—

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ আনা।

পরিষদ্-গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাতে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৬৫০ [ষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাকে প্রকৃতি করিয়াই বিজয়পণ্ডিতী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১॥০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১।০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা—৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বক্তৃতা—৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগ ॥০

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর যক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীপর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত [illegible] জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

[illegible] জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য [illegible] মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন।

গ্রাম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্যশব্দাদিসংগ্রহ।

শব্দরাশি ভাষার অবয়বসৃষ্টির অন্যতম উপকরণ। লেখ্য ও কথ্য ভেদে এই শব্দসমূহ দ্বিবিধ। কথোপকথনের ভাষায় লোকে যে সকল শব্দের ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কথ্য এবং গ্রন্থাদিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে লেখ্য শব্দ বলা হয়। দ্বিবিধ শব্দ সম্মিলনে ভাষা-প্রবাহিণী দ্বিপথগামিনী হইলেও এক শ্রেণীর অনেক শব্দ অন্য শ্রেণীর শব্দের সহিত মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ লেখ্য-ভাষার অনেক শব্দ কথ্য-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে এবং কথ্য-ভাষার বহু শব্দও লেখ্য-ভাষায় আসিয়া মিশিয়াছে। এ উচ্ছৃঙ্খলতা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। লেখ্য-শব্দের কথায় ব্যবহার করিবার কর্ত্তা সংস্কৃত-সেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অন্যান্য মার্জ্জিতবাদী শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু কথ্যশব্দ ভাষায় গৃহীত হইবার একমাত্র কারণ "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" এ মহাবাক্যের সার্থকতা। দাশরথি রায় পাঁচালী গাইতে বসিয়াছেন, তিনি'ত তাঁহার ভাষায় রাশি রাশি কথ্যশব্দের ব্যবহার করিবেনই। কিন্তু ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাধুভাষাজ্ঞ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদিতে যে সহস্র সহস্র চলিত বা গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার রহিয়াছে, ইহাই বিচিত্র। প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক কবির গ্রন্থমালা হইতে এক একটী মাত্র প্রয়োগ উদ্ধৃত হইল।

(১) বাগের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়। (দীনবন্ধু; দ্বাদশ কবিতা)।
(২) ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি। (পদ্মিনী; রঙ্গলাল)
(৩) বাংলা চায়েন কর;—(সভ্যতার পাণ্ডা;) গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
(৪) দেখিব যেরূপ দেখি সূর্পনখা পিসী। (মেঘনাদবধ ৩য় সর্গ—মাইকেল)।
(৫) বজ্রে শালা আলা টাকা মোর। (বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র)।
(৬) রাত্রিকালে কত দেখি কুচ্ছিত স্বপন। (কৃত্তিবাসীরামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড)।
(৭) এ সুবাদে তোমার ত বাবা হ'তে পারি। (ঈশ্বরগুপ্ত)।
(৮) বামনির মুখটা বড় কদুর্য্যি। (দেবীচৌধুরাণী—বঙ্কিম)।
(৯) ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা। (চণ্ডীদাস)
(১০) নিজে নই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগারখেটে। (রামপ্রসাদ)।
(১১) কান্নাকাটি ঝটাপটি কত করে সোর।...... (হেমচন্দ্র)

এই ত গোটাকতমাত্র শিষ্টপ্রয়োগ প্রদর্শিত হইল। ইহা ছাড়া যে কোন গ্রন্থ আপনি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সেই গ্রন্থেই ভূরি ভূরি চলিত শব্দের সংসত্তা দেখিতে পাইবেন। মাইকেল যে অতবড় সাধুভাষা-ব্যবহারী কবি, তাঁহার গ্রন্থমালাও গ্রাম্যশব্দ ব্যবহারের কবল হইতে অব্যাহতি পাইল না। আর ঈশ্বরগুপ্তের কথা কি বলিব? তাঁহার কবিত্বশক্তি ত কোমল-তর ভাবসলিলার্দ্র মৃৎপিণ্ড। তিনি যে ভাবে যখন যাহাকে যে ছাঁচে ঢালিয়াছেন, সে কবিত্ব

তখন সে আকারই ধারণ করিবে। সুতরাং তাঁহার ভাষার তাঁহার গ্রন্থাদিতে যে রাশি রাশি গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

এক্ষণে কথা হইতেছে, লেখ্য-ভাষা সাধু শব্দ বহুল হইলেও এবং কথ্য-ভাষা অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শব্দপূর্ণ হইলেও যখন সেই লেখ্য-ভাষায় এতদধিক গ্রাম্যশব্দের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতেছে, তখন ইহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য যে বঙ্গভাষায় চলিত শব্দের একখানি অভিধান প্রস্তুত হওয়া উচিত। Carey, Haughton প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্বৎবৃন্দ এবং বিদ্যাসাগর*, রামকমল বিদ্যালঙ্কারপ্রমুখ এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্‌গণ এ বিষয়ে কতক কতক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা কি অল্প আক্ষেপের কথা! সাহিত্যগগনে কতশত গ্রহতারকার আবির্ভাব হইয়া গেল, ভাষাকাশে কত শত চন্দ্রসূর্য্য আবির্ভূত হইয়া জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কালতরঙ্গে মিশাইয়া যাইল, তথাপি এতবড় একটা অভাবকালিমা অপনীত করিতে কাহারও প্রতিভালোক প্রধাবিত হইল না—কোন সাহিত্যরথীও বঙ্গভাষার এতাদৃশ একটা কলঙ্কাঙ্কুর বিনষ্ট করিতে পারিলেন না।

আনন্দের কথা যে, আজ কয়েক বৎসর হইতে ঐ অভাবের অবশ্য-দূরীকার্য্যতা সাহিত্যসেবী মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার ফলে চলিত শব্দের অভিধান রচনার চেষ্টা চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎসভা এ বিষয়ে অন্যতম উদ্যোগিনী। প্রায় ৫ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন পরিষদের সাহত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনই আমি বুঝিতে পারি, যে চেষ্টায় প্রণোদিত হইয়া আমি গ্রাম্যশব্দের অভিধান-রচনারূপ মহদ্ব্যাপারে প্রলিপ্ত আছি, পরিষদের সেই চেষ্টা বলবতী আছে। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষৎ আমাকে গ্রাম্যকোষ-সম্পাদনের ভারার্পণ করেন। বলা বাহুল্য, সেই হইতে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। তাহার ফলে, শব্দকোষের অস্থিমাংসের সংস্থান প্রায় শেষ হইয়াছে। তবে ত্বক্ রক্তের যোজনা করিতে এখন বাকী। জেলাসমূহের শব্দসংগ্রাহকগণ একটু দয়াপরতন্ত্র হইলে, একটু দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করিলে, একটু ক্ষিপ্রগতিতে কার্য্য করিলে, এটীও এতদিন সম্পূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।

গ্রাম্যশব্দের অভিধান লিখিতে হইলেই নানাজেলার চলিত শব্দসংগ্রহের আবশ্যক। পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি একার্য্যে ব্রতী আছি। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণা এই কয়েক জেলার গ্রাম্যশব্দ লইয়াই "গ্রাম্যশব্দকোষ" লিখিত হইবে, কিন্তু তাহার পর চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটী জেলার কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়া তাহাতে তৎ তৎ জেলার চলিত শব্দের বিদ্যমানতা দেখিয়াই আমার সে স্থিরনিশ্চয় বিলীন হইয়া যায়। তখন আমি নানা জেলার চলিত শব্দসংগ্রহে ব্যাপৃত

---

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রাম্যশব্দকোষ সঙ্কলন কল্পে গ্রাম্যশব্দতালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষদ্ বাহির করিয়াছেন। তাহাতে হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমানের সকল গ্রাম্য শব্দ আছে কিনা সন্দেহ, তাহা ছাড়া অধিকাংশ শব্দ বিকৃত ভাবে লিখিত।

হই।—বহু বাধা বিঘ্ন যাইল, বহুবিপত্তি হইল, বহু রোগ শোক দেখা দিল, কিন্তু আমি কার্য্যপথ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম না। ইহার ফলে, প্রায় ১৯খানি জেলার শব্দসংগ্রহ কতক সমাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা শব্দসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে (১) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার (যশোহর); (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী বি, এ, (নদীয়া); (৩) শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, (বীরভূম); (৪) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী, (শ্রীহট্ট); (৫) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়, (রঙ্গপুর); (৬) শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, (মেদিনীপুর); (৭) সেখ জমিরুদ্দীন, (নদীয়া); (৮) শ্রীযুক্ত গোপালনারায়ণ মজুমদার, (জলপাইগুড়ি) এই কয় মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির ইষ্টাপত্তি থাকিলেও তাঁহারা শব্দসংগ্রহাদির দ্বারা যেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য এ দীন লেখক তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শব্দসংগ্রহাদির দ্বারা যিনি যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা গ্রাম্য শব্দকোষ বাহির হইলে তাহাতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইবে। তাহা ছাড়া শব্দকোষের এক এক খণ্ড তাঁহারা উপহার পাইবেন।

জগতে 'অমাবস্যা' না থাকিলে পূর্ণিমা ভাল লাগিত না, 'কু' না থাকিলে 'সু'এর সম্মান হইত না, অসৎ না থাকিলে সতে সমাদর পাইত না, নিশ্চেষ্ট না জন্মিলে সচেষ্টের সুখ্যাতি বাড়িত না, স্বার্থপরতা না থাকিলে নিঃস্বার্থপরতার আদর ঘটিত না। আমার শব্দকোষ সঙ্কলনব্যাপারে ইহার বেশ জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়াছি। একদিকে যেমন স্বার্থত্যাগী সচেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহায়তায় আমি আপ্যায়িত হইয়াছি, অন্যদিকে আবার তেমনই যৎসামান্য শ্রমস্বীকারে কুণ্ঠিত কতকগুলি ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইহাঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ দুই কথা শুনাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। সংস্কৃতে একটী মহাবাক্য আছে, 'ন খলু সুজনসঙ্গে প্রার্থনানিষ্ফলা স্যাৎ"। দেখিতেছি এ মহাবাক্য ইহাঁদিগের নিকট নগণ্য বঙ্গভাষার জন্য, সাহিত্যক্ষেত্রের একটী চিরন্তন অভাব সমুন্মূলিত করিবার জন্য, যৎসামান্য শ্রমদানেও যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদিগের নিকট সমাজের কোন আশা ভরসা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর লোকের সাহিত্যিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। পত্রাদি লিখিয়া লোক পাঠাইয়া অনেক জেলার শব্দ-সংগ্রহ আমি নিষ্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলার গ্রাম্য-শব্দসংগ্রহের জন্য তৎ তৎ জেলা-বাসী শিক্ষিত ব্যক্তিবরের কৃপাপ্রার্থী হইতেছি। এই কয় খানি জেলার শব্দসংগ্রহ সমাপ্ত না হইলে গ্রাম্য শব্দ কোষ মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদ ভোগ করিতে পারিবেনা। ইহা যেন সকলের মনে থাকে।

যে কয়েকটী জেলার শব্দসংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই—(১) বাখরগঞ্জ (২) খুলনা (৩) মুর্শিদাবাদ (৪) সাঁওতাল পরগণা (৫) পূর্ণিয়া (৬) দিনাজপুর (৭) বগুড়া (৮) ভাগলপুর (৯) মুঙ্গের (১০) মানভূম (১১) ত্রিপুরা (১২) ঢাকা।

শব্দকোষ সম্বন্ধে অতিরিক্ত বক্তব্য আমার নাই। জেলা বিশেষের শব্দ লইয়া অভিধান

সঙ্কলনের উপকারিতা সম্বন্ধে দুইচার কথার আলোচনা করিয়া অদ্য পরমসাহিত্যসেবী মাতৃভাষা-প্রিয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সংগৃহীত পাবনা অঞ্চলের সংগৃহীত গ্রাম্যশব্দ, ছড়া, গীত প্রভৃতির কিয়ৎ কিয়ৎ অংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্ণবাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শত ধন্যবাদে পুরস্কৃত করিলেও যথেষ্ট হয় না।

পূর্ণবাবু এ পর্য্যন্ত আমাকে শব্দসংগ্রহের সাতখানি তালিকা অর্পণ করিয়াছেন। এই কয়েক দফা তালিকার মধ্যে পাবনার ভিন্ন ভিন্ন অংশের গ্রাম্যশব্দ, উচ্চারণগত পার্থক্যসূত্র, গ্রাম্যগল্পাবলী, প্রচলিত ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদবাক্য, সমস্যা ইত্যাদি শব্দকোষসঙ্কলনের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য সংগ্রাহকদিগের পক্ষে পূর্ণবাবুর অবলম্বিত পন্থা বিশেষরূপে অবলম্বনীয়। শব্দসংগ্রহব্যাপারে আর দুইজন আত্যন্তিক পরিশ্রমী শিক্ষিত ব্যক্তির নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী (ঢাকার সংগ্রাহক), অপর ব্যক্তি স্বনামপ্রসিদ্ধ মুন্সী আবদুল করিম (চট্টগ্রামের সংগ্রাহক)। গ্রাম্যশব্দকোষ সঙ্কলন যখন অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম, তখন তজ্জন্য শব্দসংগ্রহাদির দ্বারা সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুঃখের বিষয় সকলে এ কথা বুঝেন না এবং অনেকের মতে স্ব স্ব নিবাসভূত জেলার গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া অসভ্যতার প্রকাশক। কি মূর্খতা! কাহার কাহার মতে গ্রাম্যশব্দকোষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রাদেশিকশব্দের সমাবেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এটী সম্পূর্ণ মতিভ্রান্তির পরিচয় সন্দেহ নাই।

গ্রাম্যশব্দকোষে জেলাবিশেষের গ্রাম্যশব্দ-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি অপর জেলার লোকে পাঠ করিবে, তখন আর শব্দার্থবোধের কোন উপায় থাকিবে না। এতদ্দেশীয় কতকগুলি লোকে যে দেশকে বাঙ্গালদেশ বলিয়া আপনাদিগের সুসভ্যদেশবাসিতার পরিচয় দিতে চাহে, সেই বাঙ্গাল দেশেরও কোন কোন জেলার গ্রাম্যশব্দ কোন কোন গ্রন্থাদিতে স্থান পাইয়াছে। এমন কি, দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত ও অন্যান্য গ্রন্থকারকৃত নাটকবিশেষেও তাহাদের যথেষ্ট সমাবেশ রহিয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে গ্রাম্য শব্দকোষ লিখিতে হইলে তাহাতে নানা জেলার গ্রাম্যশব্দাবলী বিন্যাসও অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। তাহার পর আর এক অসুবিধা সম্মুখে বর্ত্তমান। মনে করুন— (১) পাবনাবাসী একজন আসিয়া গাইল—

"খাড়্যা পর্‌য়া মাইয়া মানুষ কুথায় পলান দ্যাও।"

(২) ময়মনসিংহ অঞ্চলের একব্যক্তি আসিয়া বলিল—

"থাতু বিস্যুইদ আইবাইন।"

"কও দেখিলো রাজার ঝি, কৈতর লয়্যা করবাম্ কি?"

---

(১) খাড়্যা—মল অলঙ্কার। পর্‌য়া—পরিয়া। কুথায়—কোথায়। পলান—পলাইন। দ্যাও—দেও।

(২) থাতু—দিদিমা। বিস্যুইদ—বৃহস্পতিবার। আইবাইন—আসিবেন। কও দেখি লো রাজার ঝি, পায়রা ল'য়ে ক'র্‌বো কি?

(৩) চট্টগ্রাম প্রদেশের কোন লোক আসিয়া ছড়া কাটাইল—

"উত্তরথুন্ আইএর ময়না পাখ লাড়ি লাড়ি।
বড়ই গাছত বৈস্তে ময়না করের চাতুরালী॥"

(৪) যশোহরজেলায় কোন অধিবাসী আসিয়া গাইল—

"তোমার সঙ্গে করিয়ে প্রেম নায়ের হ'ল্য মানা।" (বিনোদের বারাসে গীত)

(৫) ঢাকা অঞ্চলের কোন অধিবাসী আসিয়া রসিকতা করিল—

"মনাছিব ছেমরী পাল্যে দরদ্ ছাড়ে কেডা ?"

এখন বলুন দেখি, কেমন করিয়া অর্থাবগতি করিবেন। যদিচ কথায় কথায় Dictionary খুলিয়া অর্থাববোধ করা চলে না; তথাপি যে অর্থবোধের একটা উপায় থাকিবে তাহাও শ্লাঘার বিষয়। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের জন্য স্বদেশী করিতেছি, পূর্ব্ববাঙ্গালার সহানুভূতি চাহিতেছি, আর তাহাদিগের কথ্যভাষাবোধের উপায় করিব না, এ কেমন কথা! জেলাভেদে উচ্চারণভেদ্ অনেক আছে, দুইএকটী দৃষ্টান্ত দিই—

ইক্ষু—আক্ (হুগলী হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা); কুসের—বাখরগঞ্জ; কুসুল—ময়মনসিং; কুসুর—নদিয়া।

পারাবত—পায়রা ঐ কৈতর—ময়মনসিং; কবিতর—নদিয়া; কতুর—পাবনা।

বার্ত্তাকু—বেগুন ঐ বাইঅন—চট্টগ্রাম; বাওন—যশোহর; বাইগুন—সিংহভূম।

এইরূপ এক শব্দের নামভেদ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণার কথা ছাড়িয়া দিলেও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলার সহিত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—

একার্থবাচক শব্দের জেলাভেদে নামান্তর—

গোধ—গোসাপ (হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা); গোমা—পাবনা; গুইল—ঢাকা; গোধি—সিংহভূম।

জ্যোৎস্না—জোচ্ছনা ঐ জোন—চট্টগ্রাম; জোনাক—রঙ্গপুর।

মার্জ্জার—বিড়াল ঐ বিলাই—রাজসাহী; মেকুর—নদীয়া।

বেড়—বেড়া ঐ ধাড়া—মেদিনীপুর; আদাড়—বাঁকুড়া; বালি—চট্টগ্রাম।

মই—মই ঐ চগো—পাবনা; বাঁশই—যশোর; সাঙ্গড়—খুলনা।

---

(৩) উত্তরথুন—উত্তর হইতে। আইএর—আসৃছে। লাড়ি—নাড়িয়া। বড়ইগাছত—কুলগাছে।

(৪) নায়ের হ'ল মানা—পিত্রালয় গমন নিষেধ।

(৫) মনাছিব—মনোমত। ছেমরী—যুবতী, ছুঁড়ী। দরদ্—মমতা। কেডা—কে।

তবেই বুঝা যাইতেছে গ্রাম্যশব্দকোষ এরূপভাবে বিরচিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বঙ্গের সকল জেলার গ্রাম্যশব্দাবলী স্থান পায়। নচেৎ যে উদ্দেশ্যে অভিধান সূচিত হয়, তাহা সুসিদ্ধ হইবে না।

এইবার গ্রাম্যশব্দকোষের অবয়ব-সৃষ্টির পদ্ধতিসম্বন্ধে শেষ কয়েক কথা বলিয়াই মুখবন্ধের উপসংহার করিব। আমার মতে গ্রাম্যশব্দকোষে (১) সকল জেলার সকল গ্রাম্যশব্দ বিন্যস্ত হওয়া উচিত; (২) গ্রাম্যভাষায় যদি কোন সাধুশব্দ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, শব্দকোষে তাহাদিগেরও সংস্থান হওয়া আবশ্যক; (৩) যতদূর সম্ভব শব্দের সাধুভাষায় অর্থ ও তৎশব্দব্যবহারক কোন গ্রন্থকৃত প্রয়োগ বা প্রাদেশিক ছড়াংশ উদ্ধৃত করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম রথী মাননীয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক) প্রমুখ কয়েকজন মনীষির মতে যে সকল গ্রাম্য ভাষা গৃহীত শব্দের অভিধেয় বিষয়াদি অন্য অভিধানাদিতে বিন্যস্ত হইয়া গিয়াছে—"গ্রাম্যকোষে" আর তাহাদিগের স্থান দিবার দরকার নাই। আমি এটী সমীচীন মনে করি না। যখন গ্রাম্যশব্দের একখানি সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত হইতেছে, তখন তাহাকে অঙ্গবৈকল্যহীন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করাই কর্ত্তব্য। কতকগুলি শব্দার্থ দর্শনের জন্য একখানি অভিধানের সাহায্য লওয়া হইবে, আবার তজ্জাতীয় আর কতকগুলি শব্দের অর্থোদ্ভতবোধের নিমিত্ত অন্য একখানি অভিধান পরিদৃষ্ট হইবে এ কেমন কথা? একটা কাজের মত কাজ করিতে হইলেই তাহাতে সমুচিত অর্থব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রমের আবশ্যক।

গ্রাম্যশব্দকোষের জন্য যে সকল শব্দ ছড়াদি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাবনাজেলার সংগ্রহের কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। বর্ণ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মভেদে মনুষ্যনাম—

কামলা—মজুর। রঙ্গপুরে—মুনিশ। পাবনায়—পা'ঠও বলে।

খুলু—কলু, তৈলিকজাতি।

গোয়াল—গোপ, হুগলীহাওড়াদি জেলায় অর্থ—গোগৃহ।

চকীদার—চৌকীদার।

দ্বশ—সহিস।

জাও—জা, ,যাতৃশব্দজ সুতরাং জাও না হইয়া যাও ভাল।

নোনোদ—ননদ, ননন্দৃশব্দজ।

বুন—বোন, ভগিনী।

২। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—

আঁঠু—হাঁটু।

কান্যা—কনুই, কফোনি।

ক্যানানোখ—কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

গুড়মুড়া—গোড়ালি।

ঘিলু—মস্তিষ্ক।

চারা—নথ।

প্যাও—পা, চরণ।

দুধ—মাই, স্তন।

মাজা—কোমর।

৩। পীড়াদি—

আঁচলি—আঁচিল।

কোঁড়োল—একশিরা।
ঘ্যাগ—গলগণ্ড।
পীল্যা—প্লীহা রোগ।

৪। পশু—
কুত্তা—কুকুর।
বিলাই—বিড়াল।
শ্যাজার—শজারু।
ছাও—ছানা।

৫। পক্ষী—
কতুর—কবুতর, পায়রা।
কাউয়া—কাক।
পাণিকাউর—পাণকৌড়ি।
সগুণ—শকুনি।
সারোক—শালিক।

৬। সরীসৃপ কীটপতঙ্গাদি—
কঁ্যাছা—কেঁচো, মহীলতা।
গোমাসাপ—গোক্ষুর।
গুইসাপ—গোসাপ।
চিকা—আরসোলা, তেলাচোরাও বলে।
ছাইপোকা—ছারপোকা।
জুনী—জোনাকীপোকা, খদ্যোত।
পেঁপড়—পিপীলিকা।
বল্লা—বোলতা।
বিচ্ছুক—বৃশ্চিক।
দুরা—একজাতীয় কচ্ছপ।

৭। মৎস্য—
ইলস্তামাছ—ইলিসমাছ।
ইচ্যামাছ—চিঙ্গড়িমাছ।
কাতোল—কাতলামাছ।
মওলা—রোহিতমৎস্য (ক্ষুদ্রজাতীয়)
ফলীমাছ—চিতল (ক্ষুদ্রজাতীয়)।
বা'মমাছ—বাইনমৎস্য।
মজগুড়—মাগুর মাছ।
সরপুঁটী—বৃহদাকার সফরীমৎস্য।

৮। বৃক্ষাদি—
কদব্যাল—কয়েত বেলগাছ।
কুশাল—ইক্ষু।
জলপুইগাছ—জলপাইবৃক্ষ।
জিগ্যাগাছ—জিওলগাছ।
পাঙ্গ্যাগাছ—বকমবৃক্ষ, পার্ব্বত্যগাছ ইহার কাঠ ভিজাইয়া পূর্ব্বে রং করা হইত।
বরুইগাছ—কুলগাছ।
ভ্যান্নাগাছ—ভ্যারাণ্ডাগাছ।
গোড়া—গাছের গুঁড়ি।

৯। ফুল ও ফল—
দুবুটী—দুপাটীপুষ্প।
না'লফুল—কুমুদপুষ্প।
ব'ল ম'ল—মুকুল।
আমসব্‌রী—পেয়ারা।
জামির—লেবু।
ডুঁফোল—দেওফল, মাদারফল।
পিষ্ক্যা—পেঁপে।
বাঙ্গী—ফুটী।
শিঁকুড়ী—পাণিফল।
সব্‌রীআম—ক্ষুদ্রজাতীয় পেয়ারা।
সব্‌রীকলা—অনুপামকলা, মর্ত্তমানজাতীয়।

১০। তরকারী—
কল্যা—উচ্ছে, করলা
মরিচ—লঙ্কা।
কুঁমুড়—কুমড়া।
খুঁড়্যার ডাঁটা—ডাঁটা।
ছিম—শিম।

থোর—মোচা ।

বাগুন—বেগুন ।

বিলাতীলাউ—মিঠাকুমড়া ।

১০ । শস্যাদি—

অড়োল—অড়হরডাল ।

কলুই—কলাই ।

গোম—গম ।

টিসী—মসিনা ।

ক্যাসারী—খেঁসারীকলাই ।

ভুঁটা—ভুট্টা ।

মাল—সর্ষপ ।

সয্যা—সর্ষপ ।

১২ । খনিজদ্রব্যাদি—

আফ—অভ্র ।

তুঁত্যা—তুঁতিয়া ।

সন্দপ—সৈন্ধবলবণ ।

১৩ । গৃহপ্রকার—

কুঁড়্যাঘর—প্রসবগৃহ ।

জুম্মাঘর—খড় প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত মুসলমানের উপাসনাগৃহ ।

মোণ্ডোপঘর—দেবমন্দির ।

রান্নুনঘর—রন্ধনগৃহ ।

১৪ । গৃহের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি—

কাদো—কর্দ্দম ।

থাম—থাম, খুঁটী ।

খ্যাড়—বিচালী, খড় ।

চগো—মই ।

ছোন—খড় ।

জালনা—জানালা ।

পিঁড়্যা—বারেণ্ডা, অলিন্দ ।

১৫ । গৃহব্যবহার্য্য সামগ্রী—

আলা—উনান, চুল্লী ।

কড়াই—কড়া, কটাহ ।

কাছি—কাঁচি ।

কাঁকুই—চিরুণী ।

কোম্বোল—কম্বল ।

কোলবালিশ—পাশবালিশ ।

খাপ—মলাট ।

খোড়া—বাটি ।

চট্—মাদুর ।

চালুন—চালুনী ।

ছাপা, ছাবা—ছবি ।

সেলেট—স্লেট ।

ঝাড়ী—গাড়ু ।

টুপড়ী—চুপড়ী ।

তয়কা—তাকিয়াবালিশ ।

ত্যানা—স্তাকড়া ।

দিয়াবাতি—দিয়াশালাই ।

পাউলী—ঘটী ।

বারুণ—খড়নির্ম্মিত ঝাঁটা । ইত্যাদি

নিম্নলিখিত ছড়া ও সমস্যা হইতে পাবনার গ্রাম্যশব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাইবেন ।

পাবনাজেলার প্রচলিত ছড়া ।

(১)

আয় চাঁদ নড়িয়া ভাত দেবো বাড়িয়া

মাচতলায় ঠাঁই দেবো গাই বিয়ালে দুধ দেবো

মোষ বিয়ালে ছাও দেবো মণির কপালে মোর টুকু দিয়্যা যা ॥

(২)

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আ'ল আশে।
টীয়ায় ধান খাইল খাজনা দেবো কিসে॥

(৩)

নিদাগুনী দাগুমণি গাছেরই পাথোরা।
ষষ্ঠীতলায় নিদ্ যায় ষষ্ঠীরই নফোরা॥
আঁসট্যাশালে নিদ্ যায় বিড়াল কুকুর।
রান্নাঘরে নিদ্ যায় বান্‌ন্যা ঠাকুর।
মায়ের কোলে ঘোম্ যায় পবোন ঠাকুর॥
বড় ঘরে নিদ্ যায় রাজার বিটী রাণী।
খাটপালঙ্গে নিদ্ যায় সোণার যাদুমণি॥

(৪)

ঘোম আ'লরে যাদুমণি গাঁড়ারকাদা খেয়ে।
দুইটা শিয়াল মর‍্যা গেল কোকনের বালাই নিয়ে॥

(৫)

ঘোম আ'লরে কোকনমণি গাছেরই পাতায়,
ষষ্ঠীতলায় নিদ্ যায় ষষ্ঠীরই নফোরা।
রাজার বাড়ী ঘোম যায় দিব্বি হাতী ঘোড়া॥
ছাই মুড়ি দিয়া নিদ্ যায় ধোপার কুকুর।
আমার বাড়ী ঘোম যায় গোপাল ঠাকুর॥

(৬)

বউ কাঁদোনা কাঁদোনা শ্বশুরবাড়ী যাতে।
হাতগামছা পাওগামছা দাসী দেবো সাথে॥
বড় বড় কড়ি দেবো খ্যাওয়া পার হ'তে।
ছোট ছোট কড়ি দেবো মোণ্ডা কিন্যা খা'তে॥
আমকাঁঠালের বাগিচা দেবো ছ্যামায় ছ্যামায় যাতে।
দুধের পুষ্কর্ণী দেবো ঝাঁপুর খেলাতে॥

(৭)

ধোন্ ধোন্ ধোন্ ধোন্।
কিচেহারা দুধ্ বাথোরো চিত্তনিবারণ॥

(৮)

আরে টাকা টাকা তুমি নাহি যার ঘরে।
বৃথায় মানব জন্ম কিবা নামটী ধ'রেছ বাছিয়ে ॥
তোমার নাম টাকা নয়ন বাঁকা শক্তি হারে রাধা ।
তোমায় ইংরেজী ফার্সী আছে ন্যাখা ॥
রাজার দরবারে গেলে তোমায় নজর দিলে।
দাঁড়ায়্যা পাছে সবে কত আদর করে ॥
দৈবী মাটীতে পরে বাদসায় মহোর কলে।
কপালে ছোয়ায়্যা তোলে ॥
অবোধ বালকের হাতে প'লে।
পাওয়া মাত্র বড় সন্তুষ্ট কাড়্যা ন্যাওয়া বড় কষ্ট
তখনই চুম দেয় সে গালে ॥

সমস্যাসংগ্রহ।

(১)

মামারাই রাঁধে বাড়ে মামারাই খায়।
আমরা গেলে পরে ঘরে দুয়ার দেয় ॥
উঃ—শম্বুক।

(২)

ইরি ইরি দণ্ড ছিরি ছিরি পাত।
মাণিক দণ্ড ষোলখানি হাত ॥
উঃ—সুপারিগাছ।

(৩)

ঘাড় পাড়ে ধরে কাত ক'রে পাড়ে।
এক জ্যাগার জল আর জাগায় পড়ে ॥
উঃ—কলসীতে জল ভরিয়া আনয়ন।

(৪)

ভোন্ ভোন্ করে ভোমরাও না।
গলায় পৈতা বামুনও না ॥ উঃ—চরকা।

(৫)

বোন থেকে বার হ'ল টিয়া।
সোণার মুটুক মাথায় দিয়া ॥ উঃ—মোচা।

(৬)

এখান থেকে ছুড়লাম থাল।
থাল গেল সমুদ্রের পার ॥ উঃ—সূর্য।

(৭)

বুক দিয়ে খায় পিঠ দিয়ে হাগে।
এমন জন্তু কোথায় থাকে ॥
উঃ—রেঁদা (কামারের যন্ত্র)।

(৮)

ভগ্ ভগ্ করে ভক্কে,
কাল রংএর তক্কে,
আট হাতে যুদ্ধ করে,
তাকে বলে কোন দেবতা ? উঃ—চরকা।

(৯)

আমারও নাই তোমারও নাই।
ভেঙ্গে দিলাম বোঝাও নাই ॥
উঃ—নাই (নাভি)।

সারি গীত।

(১)

কেঁদে মেনকা বলে আমার গৃহে ছিল তারিণী।
আমায় অনাথ ক'রে কৈলাসেতে যায় ছেড়ে মা ভবানী॥

(২)

ত্রেতাযুগে অবতারে ওই রাম রাবণে লাগলো বিবাদ।
ও রাবণ পলাও পলাও লঙ্কা ঘিরিল রঘুনাথ।
ওই দুষ্ট রাবণ ধ্বংস ক'রে অযোধ্যায় রাজা হ'ল রঘুনাথ॥

(৩)

ওহে নন্দ হাত বাড়ায়ে দেখ, কোন বনে গোপাল
গোপাল ব'লে ডাক ;—নন্দ হে—
নন্দ গিয়াছে বাগানে যশোদা গিয়াছে ঘাটে,
শূন্য গৃহ পেয়ে কৃষ্ণ সব ননী লোটে,
কৃষ্ণ — আমিত খাই নাই মাগো বলাই খেয়েছে,
ছিদাম সুবলের মা, তারা দেখেছে,
যশোদা — বলাই যদি খেতো ননী ভাণ্ড করতো আধা।
তুমিই খেয়েছ ননী ভাণ্ড ক'রেছ ছেঁদা॥
লাফ দিয়ে উঠিলেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে
ডালে ডালে হাঁটেন কৃষ্ণ মাটিতে না দেন পা,
নীচে থেকে নন্দরাণী কাঁপে থর থর,
যশোদা — নামরে নামরে বেটা পেড়ে দিব ফুল।
ডাল ভেঙ্গে কৃষ্ণ মজাবে গোকুল॥
কৃষ্ণ — একটী সত্য কর মাগো একটী সত্য কর।
নন্দঘোষ তোমার পিতা যদি আমায় মার॥
যশোদা — এই কি কথা হয় রে গোপাল এই কি কথা কয়
নন্দঘোষ তোমার পিতা সর্ব্বলোকে কয়॥
নানা ভোলা দিয়া রাণী গোপালকে নাবাল।
গাভী বাঁধা দড়ী দিয়ে গোপালকে বাঁধিল॥
কৃষ্ণ — কি বন্ধন বাঁধিলি মাগো বন্ধনের জ্বালায় মরি।
পাকা সূতার বন্ধন সহিতে না পারি॥
দিয়ে ছিলি মা খাড়ু বালা নিয়ে যা তোর ঘর
ঘৃত ননী হ'ল আপন আমি হলেম পর॥

পঞ্চটী রাখাল এসে দিল ধ্বনি।
কৃষ্ণের হস্তের বন্ধন খুলিল আপনি॥

শ্রীরাজকুমার কাব্যভূষণ।

মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন।

এই খোদিত লিপিটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কটক জেলার অন্তর্গত পটীয়াকেল্লার জমিদারীতে একটী কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। পটীয়াকেল্লার রাজা এই তাম্রশাসন পাঠোদ্ধারের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। নগেন্দ্রবাবুর নিকট শুনিয়াছি যে, এই তাম্রশাসনের ন্যায়ও একই সময়ের অপরএকটী তাম্রশাসন তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন যে উভয় তাম্রশাসনই এক প্রকার। কিন্তু এই দ্বিতীয় তাম্রশাসন আমি দেখিতে পাই নাই।* নগেন্দ্রবাবু ময়ূরভঞ্জরাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অবৈতনিক অধ্যক্ষ হইয়া এই তাম্রশাসন প্রথম আনয়ন করেন। পরে তাঁহার সময়াভাবের জন্য ইহা পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত আমার প্রার্থনামত আমায় দেখিতে দিয়াছেন।

একখানি ৭½ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চ প্রশস্ত তাম্রপত্রের উভয় পার্শ্বে এই লিপিটী খোদিত আছে। খোদিত লিপির বামভাগে তাম্রপত্রের সহিত সংযুক্ত পিত্তলের একটী শীল বা মোহর আছে। এই পিত্তল খণ্ডের উপরিভাগে একটী গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তমধ্যে সম্ভবতঃ রাজার নাম ও লাঞ্ছন ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার কোনই চিহ্ন নাই। তাম্রপত্রে ১৮টী পংক্তি আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃত গদ্য ও অক্ষরগুলি অতি সুন্দর, কিন্তু কালবশে ক্ষয় হইয়াছে। তাম্রপত্রের একটী কোণ ভগ্ন হওয়ায় প্রথম ও শেষ দুই পংক্তির শেষ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। এই খোদিত লিপিটী ২৮৩ গুপ্তাব্দে খোদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পংক্তির শেষাংশে লিখিত আছে:—"মানবংশ সাজ্য সংবৎসর ত্র্যধিকাশীত্যুত্তর * * ।" ও অষ্টাদশ পংক্তির শেষভাগে খোদিত লিপির মাস অঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে:—"সহস্রানি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তাচানুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ। সংবৎ ২৮ * * ।" ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কোন অব্দের ২৮৩ সংবৎসরে ইহা খোদিত হইয়াছিল। ইহার অক্ষরগুলি ভারতীয় লিপিমালার উত্তরভাগের অক্ষর ও মুণ্ডেশ্বরীর[১] খোদিত লিপির অনুরূপ। মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি ৩০ হর্ষাব্দে অর্থাৎ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত। খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সহিত গঞ্জাম জেলায়

* এই তাম্রশাসন খানি শ্রীযুক্ত আর্ত্তত্রাণ মিশ্র মহাশয় পটিয়া কেল্লা হইতে আনাইয়া পাঠোদ্ধারের জন্য আমায় প্রেরণ করেন, উহার পাঠ ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ববিবরণী মধ্যে প্রকাশিত হইবে। সা-প-প-সম্পাদক।

(১) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩শ ভাগ ৪৫ পৃঃ।

মহারাজ শিবরাজের প্রতিশাসন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৮। ৩য় সংখ্যা।
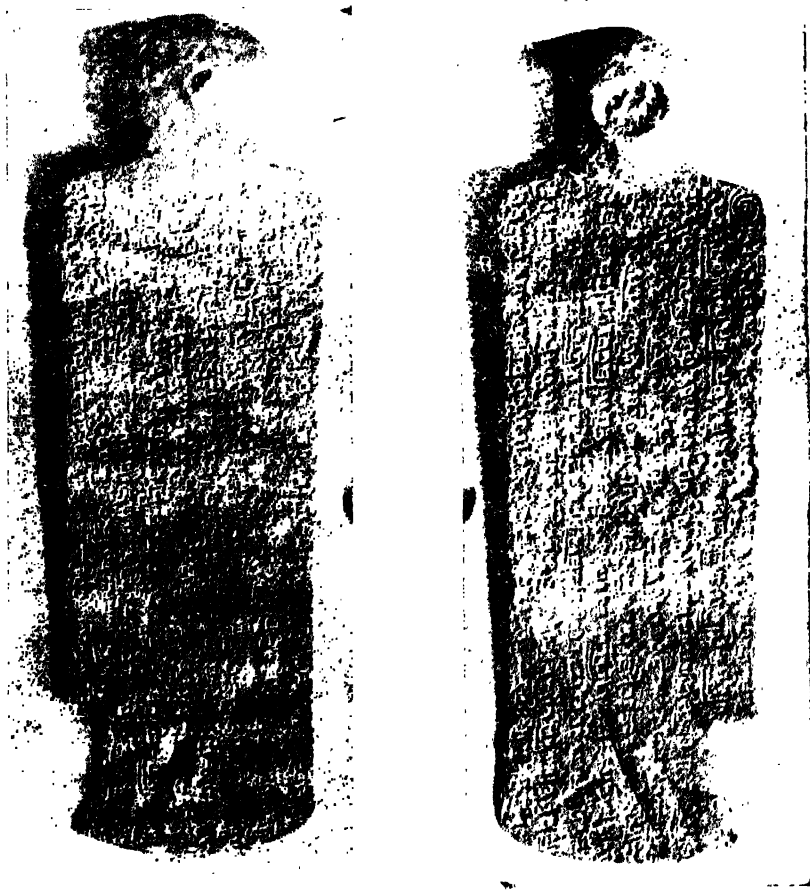
আবিষ্কৃত শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্তের তাম্রশাসনের[২] অক্ষরসমূহের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শশাঙ্কের তাম্রশাসন ৩০০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৬১৯ খৃঃ খোদিত। মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি ও শশাঙ্কের তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহের সহিত বিশেষ সৌসাদৃশ্য হেতু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই খোদিত লিপির মান গুপ্তাব্দ অনুসারে গণিত হইবে। এই অনুমানের সত্যাসত্যতা প্রমাণের একটী সুন্দর উপায় আছে। নেপালে ৩৪ হর্ষাব্দ ও ৩১৮ গুপ্তাব্দের খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৩]। পটীয়া কেল্লার তাম্রশাসনের অক্ষরগুলির সহিত নেপালের উক্ত খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য অনুমানে সত্যাসত্যতা প্রমাণ করিতেছে। অক্ষরতত্ত্ব সম্বন্ধে এই তাম্রশাসনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—

(ক) "ণ" দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—অষ্টম পংক্তিতে "পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে" ও সপ্তম পংক্তিতে "ভোগিকাধিকরণান্বেব" এবং নবম পংক্তিতে "সলিলধারাপূর্ব্বকেণাচন্দ্রার্ক"।

(খ) এই তাম্রশাসনের অক্ষরগুলির সহিত মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপির অক্ষরগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গঙ্গামের তাম্রশাসনের সহিত আম্রদ্বীপনিবাসী মহাস্থবির মহানামের বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপির[৪] অক্ষরগুলির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপিতে ও গঙ্গামের তাম্রশাসনে "য" গুপ্তলিপির সদৃশ। কিন্তু মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি ও এই তাম্রশাসনে 'য' ত্রিশূলাকার। বুদ্ধগয়া ও গঙ্গামের খোদিত লিপিতে 'য' র অধোভাগ সকোণ, কিন্তু মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি ও এই খোদিত লিপিতে উহার অধোভাগ গোলাকার। স্থান সান্নিধ্যহেতু মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপির সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিতলিপির ও গঙ্গামের খোদিত লিপির সহিত বর্ত্তমান খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য থাকাই উচিত।

(গ) সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর অক্ষরের ন্যায় এই খোদিত লিপিতেও কয়েকটী অক্ষরের অধোদেশ সকোণ, যথা—স ও ম সর্ব্বত্রই সকোণ, কিন্তু কয়েকটী অক্ষরের অধোভাগ কোন স্থানে গোলাকার কোন স্থানে বা সকোণ। যথা—'ধ' ইহা তৃতীয় পংক্তি 'দীধিতি' শব্দে গোলাকার, কিন্তু পঞ্চম পংক্তি "ক্ষৌণিহারাধিগম" শব্দে সকোণ।

(ঘ) মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপির অক্ষরগুলির সহিত এই খোদিত লিপির অক্ষরাবলীর ভিন্নতা এই মাত্র যে মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপিতে 'ণ' য়ের উভয় পার্শ্বের ব্যবধান বর্ত্তমান খোদিতলিপির 'ণ' অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন।

(ঙ) এই তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহের সহিত নেপালের গোলমাঢ়িটোলের ৩১৮ গুপ্তাব্দের খোদিতলিপির অক্ষরগুলির যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, এই খোদিত লিপির মান গুপ্তাব্দ অনুসারে গণিত হওয়া উচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অক্ষর

(২) Epigraphia Indica—Vol. VI—p. 143.

(৩) Indian Antiquary—Vol. IX. p. 168 and Bendall's Journey to Nepal, p. 12. pl—VIII.

(৪) Fleet's Gupta Inscription, p. 274. Pl. XLI.

তত্ত্বালোচনা করিতে হইলে নেপালের খোদিত লিপিসমূহের আলোচনা করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। নেপালে আবিষ্কৃত ৩৪, ৩৯ ও ৪৫ খৃষ্টাব্দে ও ৩১৮ গুপ্তাব্দের খোদিত লিপি পাঠ করিলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গুপ্তাক্ষরের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ৩১৮ গুপ্তাব্দে গোলমাঢিটোলের খোদিত লিপির অক্ষরগুলি প্রায় উজ্জয়িনীপতি যশোধর্ম্মদেবের মন্দশোর খোদিত লিপির[৫] অক্ষরসমূহের অনুরূপ। ললিতপত্তনের ৩৪ খৃষ্টাব্দের[৬] খোদিতলিপির অক্ষরগুলি গঞ্জামের তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহের অনুরূপ। ৩৯ ও ৪৫ খৃষ্টাব্দের খোদিত লিপির অক্ষরসমূহ বোধগয়ার খোদিত লিপি[৭] ও হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন[৮] ও বাঁশখেরা[৯] তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষরসমূহের অনুরূপ।

(চ) এই খোদিতলিপিতে 'ত' ও 'দ'য়ে বিশেষ ভেদ নাই। সপ্তম পংক্তিতে "বৃহদ্ভোগিকাধিকরণ" শব্দ দেখিলে "বৃহট্‌ভোগিকাধিকরণ" বলিয়া বোধ হয়।

(ছ) 'ব' ও 'চ'য়ে বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। 'চলন্তরঙ্গ' স্থানে 'বলতরঙ্গ' ও শিবরাজ স্থানে 'শিচরাজ' পড়া বিশেষ আশ্চর্য্য নহে।

(জ) 'য' কোন কোন স্থানে অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি। 'শগ্‌গুয়য়্যন' শব্দের 'য' 'বিষয়ে' শব্দের 'য' অপেক্ষা বৃহদাকার। সংযুক্তাক্ষরে 'য' অর্থাৎ য ফলার আকার 'ভবিষ্যৎ' শব্দে, 'ত্র্যধিক' বা 'রাজ্য' শব্দ অপেক্ষা বৃহদাকার।

দক্ষিণ তোসলির অধিপতি শগ্‌গুয়য়্যনের রাজত্বকালে তদধীন শিবরাজ নামক একজন ভূপতি কর্ত্তৃক কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তণ্ডুবসু নামক গ্রাম দান করায় এই তাম্রশাসন উপস্থিত হইবার কারণ। শগ্‌গুয়য়্যনের উপাধি "পরমমাহেশ্বর পরমভট্টারক ও পরম দেবতাধিদৈবত।" তোসলি বর্ত্তমান কলিঙ্গের প্রাচীন নাম। ধৌলিপর্ব্বতগাত্রে সম্রাট্‌ অশোকের শিলালিপিতে তোসলির নাম প্রথম পাওয়া যায়। ৯০০ বৎসর পরে তোসলির নাম দ্বিতীয়বার আবিষ্কৃত হইল। ক্ষুদ্র তোসলির দক্ষিণার্দ্ধের উপাধিসমূহ দেখিয়া সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধঃপতনের সীমা উপলব্ধি হয়। সিন্ধুকূল হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সমুদ্রগুপ্তের এত অধিক উপাধিচ্ছটা নাই, কিন্তু সামান্য গ্রাম্যদলপতির উপাধির দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা অধিক। হূনজাতি অধঃপতনের প্রশস্ত পথে অগ্রসর হইতেছে; বহিশত্রুর আগমনের ভয় না থাকিলে ধনজনপূর্ণ উর্ব্বরভূমির যে দশা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষেরও সেই দশা

(৫) Fleet's Gupta Inscription's, p. 150. Pl. XXII.
(৬) Indian Antiquary—Vol. IX.p. 169 and Bendalls Journey to Nepal p. 74.
(৭) Indian Antiquary—Vol. XX. p. 170 and Bendall's Journey to Nepal p. 77—Pl. X.
(৮) Epigraphia Indica—Vol. I p. 67
(৯) Epigraphia Indica—Vol. IV. 240.

হইয়াছিল। দশমশতাব্দীতে যখন তুরস্কজাতি নবীন ধর্ম্মের উৎসাহে কাবুল ও পুরুষপুরের প্রাচীন শকরাজ্যের ধ্বংসসাধন করে, তখনও গর্ব্বিত রাজপুত-রাজন্যগণের চৈতন্য হয় নাই। এই অধঃপতনের সূচনা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে।

চক্রবর্ত্তী রাজা ও তদীয় করদ ভূপতির নাম দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ভূমিগৃহীতাগণের নাম দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অনুমান হয়; যথা বিষ্ণুস্বামী, রেবতীস্বামী, গোপালস্বামী, ইত্যাদি। তাম্রশাসন বোর্ত্তনোক নগর হইতে নানা গোত্রজ ও বিবিধ চরণভুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে তণ্ডুবলু গ্রাম দান করিবার জন্য খোদিত ও প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে যে মানবংশের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের নাম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর দুই একটী খোদিত লিপিতে পাওয়া গিয়াছে যথা—

১। দুধপানির শিলালিপি[১০]।

২। নওয়াদা গ্রামের শিলালিপি[১১]।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় গোবিন্দচন্দ্রের গীত মুদ্রণকালে উক্ত রাজবংশবিষয়ে সমালোচনা করিয়াছেন[১২]। বর্ত্তমানকালে তণ্ডুবলু গ্রামের বা বোর্ত্তনোকনগরের কোন চিহ্ন আছে বলিয়া বোধ হয় না। তণ্ডুবলু কোন বিষয়ে (অর্থাৎ প্রদেশে) কোন ভুক্তিতে (অর্থাৎ জেলায়) কোন মণ্ডলে (অর্থাৎ পরগণার) অবস্থিত ছিল তাহা বলা যায় না।

খোদিত লিপিটীতে নিম্নলিখিত বর্ণাশুদ্ধি আছে —

পংক্তি	শব্দ
১ম	মংগুর,
২য়	বঙ্শ, ও অশীতি,
৮ম	গ্রেষ্ঠো,
৯ম	ধর্ম্মেন

(১) নবম পংক্তির পূর্ব্বভাগে "সলিলধারাপূর্ব্বকেণ" শব্দ আছে। ভূমি দেবালয় প্রভৃতি উৎসর্গকালে দাতা ভূমিতে সলিলধারা পাত করিতেন, তাহার প্রমাণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাওয়া যায়। ভারত গ্রামের স্তূপের রেলিংএ এইরূপ জলধারাপাতের একটি চিত্র আছে, ইহার নিম্নে খোদিত লিপি আছে,—

(২) "অনাথ পিণ্ডিক জেতবনো দেতি কোটি সংথতেন কেতা" (অর্থাৎ অনাথপিণ্ডিক বা অনাথপিণ্ডদ কোটি সংখ্যক মুদ্রা ভূমিতে বিছাইয়া তৎপরিমাণ ভূমি দান করিতেছেন)। কথিত আছে, শ্রাবস্তী নগরীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ রাজকুমার জেতের উদ্যান, সুবর্ণ মুদ্রা বিস্তার করিয়া বুদ্ধদেবের জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৌদ্ধসাহিত্যে এই উদ্যান

(১০) Epigraphia Indica Vol II p. 346.

(১১) Epigraphia Indica Vol. II p. 333.

(১২) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত, পৃঃ ৸৶—১,

জেতবনবিহার নামে খ্যাত হয়। ভারতগ্রামের রেলিংএর চিত্রে দেখা যায় যে, উদ্যানের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান অনাথপিণ্ডদ ভৃঙ্গার হইতে ভূমিতে সলিল নিক্ষেপ করিতেছেন। অন্যান্য তাম্র শাসনেও এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে যথা—(ক) বলভী-রাজ সপ্তম শিলাদিত্যের আলান গ্রামের তাম্রশাসনে ৬৯ পংক্তিতে "উদকাতিসর্গেণ ব্রহ্মদায়ত্বেন প্রতি-পাদিতঃ" উৎকীর্ণ আছে। (খ গ) জয় মহারাজের অরং তাম্রশাসনের দশম পংক্তিতে ও তীবর দেবের রাজিম গ্রামের তাম্রশাসনের ২৪ পক্তিতে "উদকপূর্ব্বং" শব্দের উল্লেখ আছে। (২) নবম পংক্তির শেষ ভাগে দেখা যায়—"নীবীধর্ম্মেণ গোত্রচরণেভ্যঃ"।

কোন কোন তাম্রশাসনে "নীবী" স্থলে "নিধি" পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পদ্ধতিসমূহে কিম্বা বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থে এইরূপ শব্দ পাওয়া যায় না। নাটোর হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের যে তাম্রশাসন গত বৎসর পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও অষ্টম পংক্তিতে নীবী শব্দের উল্লেখ আছে যথা—"নীবী ধর্ম্মেক্ষ মালভ্য"......

শিবরাজের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি।

(১) ওঁ স্বস্তি সলিলনিধি-বেলা-বলয়িত চল তরঙ্গাভরণ রুচির মংগুর......

(২) পত্তনবত্যাং বসুমত্যাং প্রবর্ত্তমান মানবংশ রাজ্যকালে, ত্র্যধি-কাশীত্যুত্তর......

(৩) মৌদ্গলামলকুলে গগনতলসিতদীধিতি নিবাতে সিতচরিতে পরম মাহেশ্বর শ্রীশগ্নুয়য্যনে

(৪) শাসতি দক্ষিণ তোসল্যাং বোর্ত্তনোকাৎ পরমদেতবাধিদৈবত শ্রীপরমভট্টারকচরণকমলামলক্ষৌ

(৫) নিহ্যারাধিগম প্রতিহতঃ কলিযুগাগত দুরিতনিচয়ঃ মহারাজ শিব-রাজঃ কুশলী অস্মিন্নেব

(৬) বিষয়ে সমুপগতাভবিষ্যৎ সামন্তরাজ রাজস্থানীয়োপরিক কুমারা-মাত্য তদাযুক্তক মহা মহত্তর

(৭) বৃহদ্ভোগিকাধিকরণাণ্যেব রাজপাদোপজীবী যথার্হং শ্রাবয়তি মানয়তি চ বিদিতমস্তুভবতাং যথা

(৮) ত্র বিষয় সম্বদ্ধ তণ্ডুল্লু গ্রাম বোর্ত্তনোকাববাস গেহস্তোহস্মাভিঃ মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যা

(৯) ভি বৃদ্ধয়ে সলিলধারা পূর্ব্বকং আচন্দ্রার্ক সমকালাক্ষয়ং নীবীধর্ম্মেণ নানাগোত্র-

(১০) চরণেভ্যঃ অনুরুদ্ধ স্বামি গোমিদেব স্বামি শূরস্বামি বোপ্পস্বামি পুরস্বামি

(১১) হারুস্বামি চন্দ্রস্বামি ভদ্রস্বামি ছেদিস্বামি পুষ্যস্বামি প্রভাকর স্বামি রোহিণী স্বামি

(১২) বুদ্ধস্বামি মহাসেনস্বামি বিষ্ণুস্বামি যদুস্বামি মাত্রডস্বামি নাগ-স্বামি রোহিণী স্বামি

(১৩) অনন্তস্বামি প্রভাকরস্বামি নাগস্বামি দীপিস্বামি জম্বুস্বামি ধোপো-স্বামি বলস্বামি

(১৪) জ্যেষ্ঠস্বামি অদর্শনদেব ধনদেব কুমারস্বামি জ্যেষ্ঠস্বামি রেবতী-স্বামি প্রায়স্বামি

(১৫) পুষ্যস্বামি ছেদিস্বামি বপ্পস্বামি প্রবস্বামি গোপালস্বামি গোমি-স্বামি এভ্যস্তাম্র

(১৬) পট্টীকৃত্য সংপ্রদত্তঃ। পূর্ব্বরাজ কৃতোধর্ম্মেণানু পালনীয় ইতি মত্বাভবদ্ভিঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রেস্বপি শ্রুয়তে।

(১৭) বহুভির্ব্বসুধা দত্ত্বা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ষষ্ঠীং বর্ষ

(১৮) সহস্রাণি স্বর্গেতিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যে-ব নরকে বসেৎ

সংবৎ ২০০....

অনুবাদ

পৃথিবীতে মানবংশের রাজ্যকালে ২৮০ সংবৎসরে * * * * পত্তন পরিপূর্ণ সমুদ্রে বেলা যাহার বলয় স্বরূপ, এবং চলনশীল তরঙ্গসমূহ যাহার আভরণ স্বরূপ উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ মৎস্য সমূহ যাহার * * * নির্ম্মল মৌদগল বংশে জাত শুভ্র চরিত্র গগনতলে অবিচলিত চন্দ্রের ন্যায় শ্রীশগ্‌শুরষ্যন যখন তোসলীতে রাজ্য করিতেন, তখন মহারাজ শিবরাজ যিনি ভট্টারক দেবতাধিদৈবতের নির্ম্মল চরণ হইতে ধরিত্রী শাসনের ভার লাভ করিয়া কলিযুগাগত দুরিত

নিচয়ের অনধিগম্য হইয়াছিলেন। বোর্ত্তলোক নগর হইতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সামন্তরাজ রাজস্থানীয় উপরিক কুমারামাত্য ভদাযুক্তক মহামহত্তর বৃহদ্ভোগিকাধিকরণ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণকে ও রাজপাদোপজীবিগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন ও শ্রবণ করাইতেছেন "আপনারা জ্ঞাত হউন তণ্ডুবলুগ্রাম বোর্ত্তলোক হইতে মদীয় পিতামাতা এবং আমার পুণ্যবৃদ্ধির জন্য যথাবিধি সলিলধারাপাত করিয়া নিধি ধর্ম্ম অনুসারে অনুরুদ্ধ স্বামী প্রমুখ নানা গোত্র ও চরণভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে তাম্রপট্ট দ্বারা প্রদত্ত হইল। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য অক্ষয় থাকিবে, ততদিন এই দান অক্ষুন্ন রহিবে। পূর্ব্ব রাজকৃত ধর্ম্ম পরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক পালনীয়, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক হে উত্তর পুরুষগণ! তোমরা আমার নাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুত হওয়া যায় (এই স্থানে মহাভারতের দুই শ্লোক আছে)" সংবৎ ২০০।...

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীববিজ্ঞানের পরিভাষা

ন্যূনাধিক তিন বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় জীববিজ্ঞানের পরিভাষা প্রকাশিত করেন। উহা দশম ভাগ পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। রায় মহাশয় পরিভাষা সঙ্কলনে যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রকৃতই উহার যথোপযুক্ত প্রশংসা করা অসম্ভব। কিন্তু এ শ্রেণীর কার্য্য একার সাধ্য নহে, এবং প্রথম উদ্যমেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আরও অনেক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলিত হইতে বাকি আছে। যে সকল শব্দের পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু দুই একটী শব্দ কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে যেন ভাল হয়। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন যে পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া অনেক সময় নিজেই তুষ্ট হওয়া যায় না। আমি নিম্নে যেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতেও সকল সময় তুষ্ট হইতে পারি নাই। তথাপি রায় মহাশয়ের এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিবেচনার নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছি। তাঁহাদিগের মনোনীত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যে গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সুখোচ্চার্য্য, ক্ষুদ্র এবং বাঙ্গালা ভাষায় চলিত, কিন্তু মূলে সংস্কৃত হইলেই সকল দিক্ রক্ষা পায়।" কিন্তু তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় চলিত না হইলেও ঐ শব্দ ভিন্ন অর্থে চলিত

না থাকা আবশ্যক ; এবং উহা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত না হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্থলে Nucleus এবং Parthenogenesis এই দুইটী শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রায় মহাশয় প্রথমটীকে 'নাভি' এবং দ্বিতীয়টীকে 'কানীনতা' করিয়াছেন। 'নাভি' শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অন্য অর্থে প্রচলিত আছে ; এবং 'কানীনতা' প্রকৃত অবস্থার বিপরীত। কানীনপুত্র পুংসংসর্গ ব্যতীত জাত হয় না ; কিন্তু Parthenogenesis পুংসংসর্গের অপেক্ষা করে না। এই সকল স্থলে রায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষা দুষ্ট হইয়াছে। রায় মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন যে জীববিজ্ঞান পড়িবার ও লিখিবার লোকের অভাব। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সঙ্কলনের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। কালে তাঁহার পরিশ্রম সুফল প্রসব করিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে মূল শব্দ এবং তাঁহার ও আমার প্রস্তাবিত অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ লিখিলাম না ; পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

মূলশব্দ	রায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত	আমার প্রস্তাবিত
Nucleus	নাভি	কোষেশ
Nucleoulus	নাভিক	কোষেশক
Response	উত্তর	প্রতিক্রিয়া
Reproductive	উৎপত্তিক	বংশবৰ্দ্ধক
Anabolism	অনুলোম পরিণাম	ধ্বংসক্রিয়া
Metabolism	পরিণামী	গঠন-ভঞ্জন
Asexual	অনুদ্বাহিক	অ-চিহ্নিত, অলিঙ্গ
Sexual	উদ্বাহিক	চিহ্নিত, সলিঙ্গ
Fossil	জীবশেষ	জীবাবশেষ
Primary	সত্য	প্রথম যুগ
Secondary	ত্রেতা	দ্বিতীয় যুগ
Tertiary	দ্বাপর	তৃতীয় যুগ
Quaternary	কলি	চতুর্থ যুগ
Fauna	প্রাণিনামমালা	প্রাণিমালা
Flora	উদ্ভিদ্নামমালা	উদ্ভিদ্মালা
Bright	স্নিগ্ধ	উজ্জ্বল
Dull	রুক্ষ	অনুজ্জ্বল
Pigment	রঞ্জক	রঞ্জক, বর্ণোপকরণ
Gland	গণ্ড	গণ্ড, বর্তুল
Auricle	কোষ্ঠ	রক্তগ্রাহক স্থলী
Ventricle	উদর	রক্তচালক স্থলী

মূলশব্দ	রায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত	আমার প্রস্তাবিত
Ganglion	বাতগণ্ড	স্নায়ুগণ্ড, স্নায়ুবর্ত্তুল
Spinal chord	বাতরজ্জু, সুষুম্না	মেরুস্তম্ভ, মেরুসূত্র
Ray	ভুজ	ভুজাভাস
Tentacles	ভুজ	শুঁড়, শুণ্ড
Fins	পাখ্‌না	ফড়ে, ডানা
Hibernation	হিমশয়ন	দীর্ঘনিদ্রা
Rotifera	চক্রধারী	ঘূর্ণকীট
Arthropoda	পর্ব্বপদী	গ্রন্থীপদ
Tuber	আলু	মৃৎকাণ্ড
Protoplasm	জৈবনিক	জীববস্তু
Perthenogenesis	কানীনতা	অপুংজনন
Sparmatozoon	শুক্রাণু	শুক্রকীট,
Ovum	ডিম্বাণু	স্ত্রীডিম্ব
Spermary	শুক্রাধাশয়	শুক্রাশয়
Conjugation	সঙ্গম	সংযোগ
Variation	প্রকরণ	পরিবর্ত্তন
Heridity	কুলসংক্রমণ	বংশানুক্রম
Alternation of generation	পুরুষপর্য্যায়	জননবিপর্য্যায়

রায় মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষা মধ্যে আরও কয়েকটীতে আপত্তি করিবার কারণ আছে। তৎসম্বন্ধে আমার প্রস্তাব পরে জানাইব।

শ্রীশশধর রায়।

কোন কোন জীব গ্রীষ্মকালেও দীর্ঘ-নিদ্রায় মগ্ন হয়

দশহরার উৎপত্তি

ভগবান্ শাক্যসিংহ যে দশটি পাপ বর্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান ও কামপূর্ব্ব-মিথ্যাচার এই তিনটি পাপ কায়িক। মৃষাবাদ, পৈশুন্য, মানুষ্য ও সম্ভিন্নপ্রলাপ এই চারি পাপ বাচনিক। অবিদ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি এই তিন পাপ মানসিক। এই দশ প্রকার পাপ-বর্জ্জনের নাম দশশীল। চুল্লকসেট্রিকথা জাতকে ও বৃহৎ স্বয়ম্ভুপুরাণে এই দশশীল উক্ত হইয়াছে। উত্তরকালে বুদ্ধোক্ত দশশীল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত ও ব্রহ্মপুরাণে গৃহীত হইয়াছে। অনুশাসনপর্ব্ব ১৩শ অধ্যায়ে কথিত আছে—

"প্রাণাতিপাতং স্তৈন্যঞ্চ পরদারমথাপি চ।
ত্রিণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
অসৎপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা।
চত্বারিবচো রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ॥
অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি ত্রিবিধং মনসাচরেৎ॥"

বুদ্ধোক্ত কায়িক ও বাচনিক পাপগুলির সহিত মহাভারতোক্ত কায়িক ও বাচনিক পাপের অভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। বুদ্ধোক্ত, মানসিক অবিদ্যাদি তিনপ্রকার পাপবর্জ্জনের স্থলে মহাভারতে অবিদ্যাদি তিনটি বিষয়ের বিপরীত তিনটি বিষয়ের অনুধ্যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে—

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
দারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসম্॥"

নিম্নে বুদ্ধোক্ত মহাভারতোক্ত ও ব্রহ্মপুরাণোক্ত দশবিধ পাপের একটি তালিকা এবং "Gospel of Buddha" কর্ত্তা Paul kerus কৃত বুদ্ধোক্ত পাপবাচক নাম গুলির ইংরাজি অনুবাদ প্রদত্ত হইল। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বর্জ্জনীয় তিনটী মানসিক পাপবাচক নামের স্থলে মহাভারতে গ্রহণীয় যে তিনটি সদ্বিষয়বাচক নাম আছে, এস্থলে সেই গ্রহণীয় তিনটী সদ্বিষয়বাচক নামের স্থলে বিপরীত গুণবাচক বর্জ্জনীয় তিনটী পাপবাচক নাম বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল—

	বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত	মহাভারতোক্ত	ব্রহ্মপুরাণোক্ত	ইংরাজী প্রতিশব্দ
কায়িক	প্রাণাতি পাত	প্রাণাতিপাত	অবৈধহিংসা	Murder
	অদত্তাদান	স্তৈন্য	অদত্তোপাদান	Theft
	কামপূর্ব্বমিথ্যাচার	পরদার	পরদারোপসেবা	Adultery
বাচনিক	মৃষাবাদ	অনৃত	অনৃত	Lying
	পৈশুন্য	পৈশুন্য	পৈশুন্য	Slandering
	মারুষ্য	পারুষ্য	পারুষ্য	Abuse
মানসিক	সম্ভিন্নপ্রলাপ	অসৎপ্রলাপ	অসম্বদ্ধপ্রলাপ	Idle talk
	অবিজ্ঞা	(পরস্বে অভিধ্যা)	পরদ্রব্যাভিধ্যান	coveiousness
	ব্যাপাদ	(সর্ব্বসত্ত্বে দোহন)	মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা	Hatred
	মিথ্যাদৃষ্টি	(কর্ম্মফল নাই)	বিতথাভিনিবেশ	Error

ভগবান্ বুদ্ধ ঐ দশপাপ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন, তদনন্তর কালান্তরে তদনুসরণ করিয়া মহাত্মা যিশুখৃষ্টও প্রায় ঐরূপ দশপাপ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। মহাভারতের প্রক্ষেপকর্ত্তা, বুদ্ধের বিনা নামোল্লেখে তদুক্ত কয়েকটী পাপ নামের উল্লেখ করেন। ব্রহ্মপুরাণকর্ত্তাও বুদ্ধের বিনা নামোল্লেখে বুদ্ধোক্ত দশপাপের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নয়, গঙ্গার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির নিমিত্ত এক অদ্ভুত কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী, গঙ্গাস্নায়ীর ঐ দশপাপ হরণ করিয়া থাকে। এ কল্পনাটি ব্রহ্মপুরাণ কর্ত্তার নিজস্ব—তাহার পূর্ব্বে ঐরূপ কল্পনা উদ্ভাবিত হয় নাই বলিয়া মহাভারতেও উহা স্থান নাই।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ

(১৩১৪। ২রা চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।)

বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস নাই। কেবল চিরপ্রচলিত এমন কতকগুলি জাতীয় প্রথা ও অনুষ্ঠান আছে, যাহাদের গৌরব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই নিজস্ব জাতীয় গৌরবের রত্নরাজি অনুসন্ধান করিতে এখন অনেকেই পল্লীপ্রান্তের নিভৃতগৃহে প্রবেশ

করিতেছেন। এই লুপ্তপ্রায় ও অনেকাংশে বিকৃত সামগ্রী সকল অতীতের অতলগর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করিতে কত ত্যাগশীল, কর্ম্মবীর, মহাপ্রাণ ব্যক্তির রক্তরাশি ব্যয়িত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই বিক্ষিপ্ত রত্নরাজির একটি সুগ্রথিতহার, কোন দিন বঙ্গভাষার কণ্ঠশোভন করিবে কি না, ভগবান্ জানেন; কিন্তু সহৃদয় ও চিন্তাশীল সুধীবর্গের নিকট ইহাদের গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না। প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিই দেশপ্রচলিত চিরন্তন প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিকে সম্মানের চক্ষে দেখিবেন। তাহারা কত যুগ-যুগান্তের সাক্ষী, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কত ঝঞ্জা, কত বিপ্লব দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা সেই ঝঞ্জা, বিপ্লব অগ্রাহ্য করিয়া আপন গৌরবে এখনও পল্লীপ্রান্তের শীতল ছায়ায় বিরাজ করিতেছে। এই প্রাচীনত্বের নিকট মস্তক আপনিই অবনত হয়। যে পিতৃপুরুষগণের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হই, যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের গৌরবে হৃদয় স্পন্দিত হয়, যাঁহাদের পুণ্যনামে এখনও আমরা দশ জনের মধ্যে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারি, সেই বিরাট্ পুরুষদের শৈশব-সুলভ কত কলহ ও বন্ধুত্ব, কত বিচ্ছেদ ও মিলন, কত হাসি ও অশ্রু, কত হর্ষ ও ব্যথা, এই সকল খেলার প্রতি অঙ্গে জড়িত রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই ভাবিবার জিনিষ। এই পুণ্যস্মৃতিজড়িত রত্নরাজি আমাদের গৌরবের ধন, ইহাদের বিষয় আলোচনা করিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

বঙ্গদেশীয় খেলাগুলি বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের সামগ্রী

সাহিত্যপরিষদের ছাত্রসভ্যরূপে বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই আজ ব্যক্ত করিব। দুঃখের বিষয় যে, কালমহিমায় অনেক খেলা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, বিদেশী বন্যায় যখন সমস্ত দেশেই ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন এসব খেলাগুলি যে কিছু লুপ্ত, কিছু বিকৃত হইবে না, সে আশা-করা বিড়ম্বনা। তবে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে পড়িলে, তাহা হইতে অনেক সুন্দর তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। "খেলা" শব্দের অর্থ বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিলে খেলা গুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইংরাজীতে যাহাদিগকে outdoor games বলে, সাধারণ বাঙ্গলা ভাষায় তাহাদিগকে "চল্‌তি খেলা" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তদনুযায়ী indoor games গুলির নাম "বস্‌তি খেলা" রাখা গেল। আমরা যে অর্থে "চল্‌তি খেলা" কথাটা ব্যবহার করিব, Outdoor games ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করেন। যে সব খেলা খেলিতে বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রয়োজন হয়, ঘরে যে সব খেলা খেলা যায় না তাহাদিগকে outdoor games বলে। আমাদের "চল্‌তি খেলা" কথার অর্থ—যে সব খেলায় হস্তপদাদির চালনা প্রধান অঙ্গ। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। "মুগুর ভাঁজাকে" outdoor game না বলিয়া indoor game বলিলে ক্ষতি নাই। কারণ ঘরে থাকিয়াও মুগুর ভাঁজা যায়, সে জন্য কোন বহিঃপ্রাঙ্গণের দরকার হয়

খেলার বিবরণ সংগ্রহ পরিষদের একটি কার্য্য

খেলা গুলির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ।

ক-চল্‌তি
খ-বস্‌তি

শব্দ দুইটির অর্থ

না। কিন্তু মুগুর ভাঁজাকে আমরা "চল্‌তি খেলা" না বলিয়া "বস্‌তি খেলা" বলিতে পারি না। বুকডন, "উঠবস্‌" প্রভৃতি খেলাও indoor, কিন্তু "চল্‌তি খেলা"। তবে আমরা বুঝিলাম যে, হস্তপদাদির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা যে সব খেলার প্রধান অঙ্গ তাহাদিগকে "চল্‌তি খেলা" বলিব। আর যে সব খেলায় হস্তপদাদির চালনার আবশ্যকতা বিশেষ নাই, বসিয়া বসিয়া শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই চালনা করিতে হয়, তাহাদিগকে আমরা "বস্‌তি খেলা" বলিব।

শ্রেণীজ্ঞাপক নাম দুটিতে গ্রাম্যতা-দোষ

"চল্‌তি" ও "বস্‌তি" এক আখটির মধ্যে গ্রাম্যতা-দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের মনোভাব জ্ঞাপক, অথচ সহজবোধ্য এবং আলোচ্য লেখাগুলির নামোপযোগী আখ্যা, এই দুটি ছাড়া আর পাইলাম না। তবে পাণ্ডিত্যের খাতিরে "চল্‌তি খেলাকে" "শরীর খেলা" এবং "বস্‌তি খেলাকে" "মানস খেলা" বলা যাইতে পারে। কারণ চল্‌তি খেলায় সাধারণতঃ এবং প্রধানতঃ শারীরিক অনুশীলন এবং বস্‌তি খেলায় প্রধানতঃ মানসিক অনুশীলন হয়। কিন্তু এইরূপ নাম করণে "খেলা" কথাদ্বারা যে ভাব জ্ঞাপিত হয়, তাহার সঙ্গে যে মধুর সহজ সরলতার কথা মনে পড়ে, তাহা নষ্ট হয়।

"চলতি" খেলার মধ্যে বিক্রমপুরে, ডুগুডুগু, দাড়িয়া বান্ধা, গোল্লাছুট, চোখবুজানি বা লুকোচুরি, ক্রিকেট, ফুটবল, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই খেলাগুলির মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। হাডুডুডু, দাড়িয়া-বান্ধা, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলাতেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু ছোট ছোট এমন অনেকগুলি খেলা আছে, যাহাতে একদলে শুধু একটিমাত্র খেলোয়াড় থাকে এবং অন্যদলে একাধিক খেলোয়াড় থাকে, যেমন—লুকোচুরি। এই খেলাতে একজন লোক "চোর" হয় এবং তাহার অবশিষ্ট খেলোয়াড়গণ দলবদ্ধ হইয়া, তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য যত্নবান্‌ হয়। যে খেলাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে,

ক-চলতি দৃষ্টান্ত

চলতিখেলার শ্রেণীবিভাগ (ক) সমদল

সে খেলাকে সমদল আখ্যায় অভিহিত করিব এবং যে খেলাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান থাকে, তাহাকে অসমদল খেলা বলিব। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে উভয়দলের শক্তি ও সুবিধার সামঞ্জস্য করিবার জন্য অনেক সময় সমদল খেলা গুলিতেও দুইদলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান হয়। যেমন হাডুডুডু খেলায় একদলে যদি তিনজন খুব ভাল খেলোয়াড় থাকে, অন্যদলে পাঁচজন বা ছয়জন অপটু খেলোয়াড় থাকিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য উভয় দলের অনুমোদিত সাময়িক নিয়ম। খেলার প্রকৃত নিয়মের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

(খ) অসমদল

সাধারণতঃ সমদল খেলাগুলির অধিকবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত। অসমদল খেলাগুলি অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। অসমদল খেলায় একদলে একটিমাত্র খেলোয়াড় থাকে এবং সাধারণতঃ সে "চোর" নামে অভিহিত হয়, যেমন লুকোচুরি খেলায় "চোর।" বিক্রমপুরে প্রচলিত অসমদল খেলাগুলির

তাহাদের মধ্যে পার্থক্য

মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি খেলা বালকদের বড় প্রিয়, গ্রাম্যপরিভাষাতেই নামগুলি রাখা গেল—চো'খ-বুজানি, লোস্কা লোস্কা, কুমীর কুমীর, ডগারে ডগা, ল্যাদোর ল্যাদোর বা বসুমতী, বাইগণ টিপ্‌টিপি, নলডুবানি, ইত্যাদি। সমদল খেলার মধ্যে, ডুডু, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, বুড়ীছি, দাণ্ডাগুলি, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সমদল খেলার ও অসমদল খেলার দৃষ্টান্ত

সমদল খেলাগুলিকে আবার দেশীয় ও বিদেশীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্ ও ব্যাড্‌মিন্‌টন প্রভৃতি বিদেশীয় খেলাগুলি আমাদের গ্রামে গ্রামে বেশ প্রচলিত হইয়াছে। অসমদল খেলাগুলির মধ্যে কোন বিদেশীয় খেলা দেখি না।

(ক) সমদল খেলা দেশীয় ও বিদেশীয়

চলতি খেলার মধ্যে যে সব খেলায় দল করিয়া খেলা হয় এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সব খেলার কথাই হইল। কিন্তু আমরা খেলার অর্থকে একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইব। মুগুরভাঁজা, মেটে ডন, প্রভৃতিকে খেলার মধ্যে ধরিয়াছি। অথচ এ সব খেলাতে দল বাঁধিবার কোন দরকার হয় না। কাজেই প্রথমতঃ খেলাগুলিকে দলগত ও ব্যক্তিগত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহা হইলে মোটের উপর আমরা এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ পাইলাম।

দলগত ও ব্যক্তিগত খেলা সমদল ও অসমদল
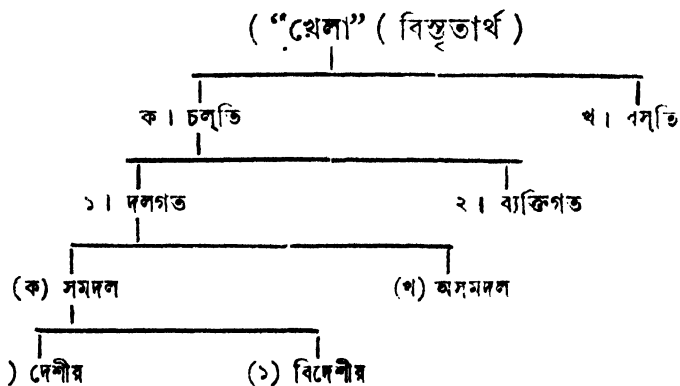
বসতি খেলার মধ্যে অধিকাংশই গুটিখেলা। অন্য রকমেরও দুই চারিটি খেলা আছে। গুটিখেলার মধ্যে কতকগুলি আবার দাবাজাতীয়, কতকগুলি পাশাজাতীয়। পাশাজাতীয় খেলা তাহাদিগকে ব'লব যে সব গুটিখেলায় পাশাখেলার মত "দান" ফেলিতে হয়। আর যে সব খেলায় "দান" না ঢালিয়া শুধু দাবাখেলার মত চাল দিতে হয়, তাহাদিগকে দাবাজাতীয় খেলার অন্তর্ভুক্ত করা গেল। একটি কি দুইটি গুটিখেলা আছে, যাহাদিগকে এই দুই

বিভাগের কোন বিভাগেই রাখা যায় না। বিক্রমপুরে পাশাজাতীয় গুটিখেলার মধ্যে, পাশা, দশপঁচিশ, ছক্কাপাঞ্জা, অষ্টাঅষ্টা প্রভৃতি সুপরিচিত। দাবাজাতীয় খেলার মধ্যে দাবা, ষোলগুটি, মঙ্গলপাটা, তিনগুটি, বাঘচাল, ২৪ গুটি বাঘচাল, ১২ গুটি পাইট পাইট, ৩ গুটি পাইট-পাইট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এতদ্‌বহির্ভূত গুটিখেলার মধ্যে, ফুলসুল, জোড়বেজোর, ও টোকাটাকি শুধু এই তিনটি খেলার নাম করা যাইতে পারে। গুটিখেলা ছাড়া অন্যান্য যে বস্‌তিখেলা আছে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত, তাস, রসকস, আপিলাজাপিলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। নিম্নে বস্‌তিখেলার একটি মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল :—

পাশাজাতীয় ও দাবাজাতীয় খেলার দৃষ্টান্ত
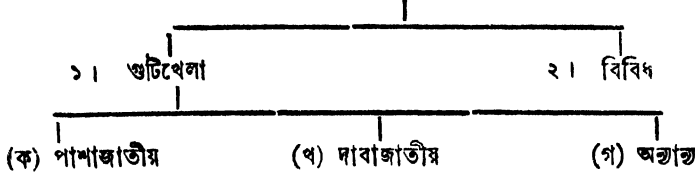
বিক্রমপুরে প্রচলিত খেলার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আশাকরি আপনারা এই আলোচনাটুকু হইতে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন। অন্যান্য স্থানের খেলাগুলি সম্বন্ধে এ শ্রেণীবিভাগ খাটে কিনা তাহা আলোচ্য নহে।

এইখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখা দরকার। সমদল চলতিখেলা গুলিতে, দুইদল সমান ভাগ হয় এবং অসমদল খেলাতে দুইদলের খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান থাকে। সমান হউক বা অসমান হউক, দল দুটি ভাগ করিবার একটি সুন্দর আমোদপ্রদ রীতি বিক্রমপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। খেলোয়াড়দিগকে দুইদলে ভাগ করিয়া নেওয়ার নাম (গ্রাম্য পরিভাষায়) "বাঁটীয়া নেওয়া"। "বাঁটা" শব্দের অর্থ বাঁটকরা অর্থাৎ বণ্টন করা। খেলার পূর্ব্বে দল বাঁটিবার নিয়ম এই—

সমদল খেলার খেলোয়াড় মধ্যে দল বিভাগ করিবার প্রচলিত নিয়ম

সমদল খেলাগুলিতে প্রথমতঃ দুইজন "রাজখেড়ু" নির্ব্বাচিত হয়। "রাজখেড়ু" শব্দটা একটু বুঝা দরকার। বিক্রমপুরে খেলোয়াড়কে "খেড়ু" বলে। 'রাজখেড়ু' কথার অর্থ খেলোয়াড়দের রাজা। এই 'রাজখেড়ু' দুইজন দুই দলের সর্দ্দার হয়। 'রাজখেড়ু' নির্ব্বাচিত হইলে পর দুইজন দুইজন করিয়া এক একটা দল করা হয়। এই ক্ষুদ্র দুইদল করিবার সময় দেখিতে হয় যে, দলস্থ দুইজন যেন খেলাতে সমান পটু হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে খেলার পরিভাষায় 'কাচ' বলা হয়, তদনুসারে 'রাজখেড়ু' দুইজনের দলটিকে 'রাজকাচ' বলা যায়। 'রাজখেড়ু' দুইজন একজায়গায় বসিয়া

সমদল খেলার দলবিভাগপ্রণালী

থাকে, আর অন্যান্য দলগুলি দূরে গিয়া নিজেদের এক একটা কল্পিত নাম রাখিয়া আসে। এক নাম রাখিবার কোন নিয়ম নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সেই নাম রাখে। তবে নিম্নোক্ত নামগুলি সমধিক প্রচলিত। যথা, বন্দুক ও কামান, সিন্ধুক ও বন্দুক, ফুল ও ফল, আম ও জাম, আম ও কাঠাল, গাছ ও মাছ, চন্দ্র ও সূর্য্য, ঢাল ও তরোয়াল (তরবারী) ইত্যাদি। নাম রাখা হইলে এক একটী দল আসিয়া "রাজখেড়ুদের' সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং সমস্বরে বলে "ডাক্ ডাক্ কিস্কো ডাক্"? 'রাজখেড়ুদের' মধ্যে একজন বলে—'হাম্‌কো ডাক্'। আবার প্রশ্ন হয় "বন্দুক নিবা না কামান নিবা"? উত্তরকারী "রাজখেড়ু" তখন তাহার ইচ্ছামত বন্দুক বা কামান বাছিয়া নেয়। তারপর অন্য একদল আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করে। তখন অন্যতম রাজখেড়ু পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর দেয় এবং খেলোয়াড় বাছিয়া নেয়। এইরূপে দুই রাজখেড়ুর বা সর্দ্দার খেলোয়াড়দের অধীনে সমস্ত খেলোয়াড়গণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া যায়। বিভক্ত হওয়ার পর যদি এমন দুই একটী খেলোয়াড় অবশিষ্ট থাকে, যাহাদের দ্বারা একটী দল হয় না, অথচ তাহাদিগকে লইতে হইবে, তবে তাহাদিগের একজনকে "জ্যাক" ও তারপর আর একজন থাকিলে তাহাকে "টম্" নাম দিয়া খেলা দেওয়া হয়। তাহারা এক এক ব্যক্তিতে এক এক দলে খেলে। এই দলবিভাগকে অনেকে "ধর্ম্মের বাঁই" বা "ধর্ম্ম-কাচ" বলে। এইজন্যই এই বিভাগের পরে আর কেহ কোন আপত্তি করে না। জ্যাক ও টম্ এই ইংরেজী নাম দুইটী এত প্রাচীন খেলার মাঝে কি প্রকারে কোন সময়ে আসিল বুঝাযায় না।

অসমদল খেলার দলবিভাগপ্রণালী

অসমদল খেলাগুলিতে দলবিভাগের জন্য অন্যরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে তিনজন পরস্পরের হাত ধরিয়া চক্রাকারে দাঁড়ায়। তারপর সকলেই একসঙ্গে হাত ছাড়িয়া দিয়া বা হাতের উপর ডানহাত স্থাপন করে। যদি দুইজনের ডানহাত "উপুড়" বা 'চিং" হইয়া পড়ে এবং একজনের হাত তাহার বিপরীত ভাবে পড়ে (অর্থাৎ চিৎ বা উপুড় হয়) তবে শেষোক্ত ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিয়া মনে করা হয়। তখন অন্য একজন নূতন খেলোয়াড় আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে এবং পুনরায় ঐরূপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে ক্রমে যখন সকল খেলোয়াড় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এবং সর্ব্বশেষে দুইজন খেলোয়াড় মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন উত্তীর্ণ খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে একজন আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং যে পর্য্যন্ত না অবশিষ্ট খেলোয়াড় দুইজনের একজন উত্তীর্ণ হয় সে পর্য্যন্ত সে তাহাদের সঙ্গে এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত থাকে। সর্ব্বশেষে যে অনুত্তীর্ণ থাকে সেই চোর হয় এবং উত্তীর্ণ খেলোয়াড় সকল একদলে যায়। এইরূপে যে বিভাগ করা বা বাঁটা হয় তাহাকে "হাত বাঁটা" বলে।

এই "হাত বাঁটা" ছাড়া অসমদল খেলায় দলবিভাগের জন্য অন্যান্য উপায়ও আছে। তাহাদের মধ্যে একটী এই :—একজন খেলোয়াড় অগ্রবর্ত্তী হইয়া খেলোয়াড়দের সমান সংখ্যক কাঁঠালপাতা বা আমপাতা বা অন্য কোন দীর্ঘাকৃতির পাতা একত্র করিয়া দুইহাতের ভিতরে

চাপিয়া রাখে। পাতাগুলির অগ্রভাগ বাহির করা থাকে, এবং সে অংশছাড়া পাতাগুলির অন্য কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। একত্র পাতাগুলির মধ্যে একটী পাতা যে রকমেই হউক চিহ্নিত থাকে। খেলোয়াড়গণ একে একে পাতাগুলির অগ্রভাগ ধরিয়া এক একটী করিয়া টানিয়া বাহির করে। যাহার ভাগ্যে চিহ্নিত পাতাটী উঠিয়া আসে, সেই চোর হয়। সকলের টানা শেষ হইলে পর যদি চিহ্নিত পাতাটী যথাস্থানেই থাকিয়া যায় তবে, যে ব্যক্তি পাতাগুলি ধরিয়াছিল সে চোর হয়। এরূপ আরও দুই তিন রকম বাঁটিবার প্রথা আছে। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বোক্ত দুটী উপায়ের কোন একটীর রূপান্তর। প্রাগুক্ত প্রথা দুটীর মধ্যে প্রথমটীই অধিকতর প্রচলিত। কারণ তাহাতে আমোদ বেশী। কিন্তু দ্বিতীয়টী সহজ ও অল্প সময়সাপেক্ষ বলিয়া অনেক সময় আদৃত হয়।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, যেখানে খেলোয়াড়দের মতের মিল হয়, সেখানে এরূপ নিয়মানুসারে দলবিভাগের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই অধিক বয়স্ক বালকদের মধ্যে এবং ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি বিদেশীয় খেলাতে, উপরোল্লিখিত প্রথা দৃষ্টি হয় না। অল্প বয়স্ক ছেলেদের মধ্যেই এরূপ উপায় অবলম্বনে দলবিভাগ হয়, কারণ তাহারা ব্যক্তিগত মত সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিতে চাহে। সুতরাং কোন মীমাংসা হয় না। সে জন্যই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় নিযুক্ত হয়। পূর্ব্বে এ রকম ছেলে দেখা যাইত, যাহারা "ধর্ম্মবাঁটের" ফলকে অমান্য করা পাপ বলিয়া মনে করিত।

উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম

এখন খেলাগুলির নাম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অধিকাংশ খেলাই খেলার একটী বিশেষ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। বসতি খেলার মধ্যে দাবা, পাশা, তাস, ৩ গুটি বা ১২ গুটি পাইট ২, ৩ গুটি বা ২৪ গুটি বাঘচাল, ১৬ গুটি মঙ্গলপাটা প্রভৃতি খেলার নাম যে খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই বোধিগম্য। দশপঁচিশ, পাঞ্জা, অষ্টা-অষ্টা প্রভৃতি খেলার নাম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় দান হইতে হইয়াছে।*

খেলাগুলির নামের ব্যুৎপত্তি

চলতি খেলার মধ্যেও ঐরূপ। ডুডু খেলায় "ডাক দেওয়া" প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। এক দমে কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষ দলের কোর্টে যাওয়ার নাম ডাক দেওয়া। বিক্রমপুরে ডাক দিবার সময় "ডুডু ডুডু" এইরূপ শব্দই অধিকাংশ স্থলে করা হয়। সে জন্যই এ খেলার নাম ডুডুখেলা। "বুড়ী ছায়ানি" খেলায় বুড়ীকে ছোয়া প্রধান কাজ, "চোখবুজানি" খেলায় চোকবুজে থাকা প্রধান কাজ ইত্যাদি। অসমদল খেলার মধ্যে কোন কোনটীতে চোরের বিশেষ

চলতি সমদল খেলায় অঙ্গ বিশেষের নাম হইতে ?

* শিশুদের মনোরঞ্জনার্থ যে সব বসতি খেলা আছে। তাহাদের নাম, সে সব খেলায় ব্যবহৃত—বসতি খেলার (১) খেলার উপকরণ হইতে, (২) প্রয়োজনীয় দান হইতে, (৩) ছড়াগুলির প্রথমাংশ হইতে হইয়াছে যথা—বাগডোম বাগডোম, আপিলা আপিলা ইত্যাদি।

বিশেষ নাম আছে। সে সব খেলার নাম চোরের সেই বিশেষ নামানুযায়ী হইয়াছে। যেমন "কুমীর কুমীর" "মাছ মাছ", লোস্তালোস্তা, "ডগারে ডগা"। "ডগারে ডগা" খেলাতে চোর গাছে থাকে এবং বিপক্ষদের আক্রমণ হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে ডালে ডালে ঘুরিতে হয়। আবার অনেক উদ্ভিদের কোমল পল্লবাগ্রভাগকে "ডগা" বলে। তাহা হইতেই বোধ হয় চোরের নাম ডগা হইয়াছে। এবং চোরের ঐ নাম হইতেই খেলার নাম হইয়াছে। ডাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলা খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে। "দাড়িয়াবান্ধা" নামে একটী খেলা আছে। সে খেলার জন্য একটী প্রশস্ত জায়গাকে বর্গাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশের চারি দিকে আবার স্বল্প পরিসর একটী পথের মত থাকে। চতুর্দ্দিকে পথটিকে দাড়িয়া বলে এবং মধ্যস্থিত বর্গাকৃতি জায়গাটীকে বান্ধা বলে। তাহা হইতেই এই খেলার নামোৎপত্তি।

অসমদল খেলার চোরের নাম হইতে

দাড়িয়া বান্ধা নামের ব্যুৎপত্তি

প্রত্যেক খেলার নামের ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করা এখানে সম্ভবপর নহে। তবে ১৬ গুটী মঙ্গলপাটা নামে পূর্ব্বে যে একটী বস্তি খেলার নামোল্লেখ করিয়াছি, সে খেলাটির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অনেক জায়গায়তেই খেলাটীকে ১৬ গুটী মঙ্গল-পাঠান বা মোগলপাঠান বলা হয়। মঙ্গলপাটা যে মোগলপাঠানের অপভ্রংশ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোগলপাঠানের যুদ্ধ বঙ্গ ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ। ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে মোগলপাঠানদের যুদ্ধই বঙ্গদেশের প্রধান যুদ্ধ। মুসলমানদের বঙ্গে প্রথম আগমনের সময় যুদ্ধই হয় নাই। তার পর পরাক্রান্ত জমিদারদিগকে অধীনে আনিবার জন্য পাঠানদের যে চেষ্টা তাহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলা যায় না। মোগল পাঠানদের যুদ্ধ দুই বিক্রমশালী রাজবংশের মধ্যে বহু দিবস ব্যাপিয়া ঘটিয়াছিল, তাই তাহার কাহিনী, বর্গীর হাঙ্গামার কাহিনীর মত বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই খেলাটীর গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্যই ইহার নামকরণ ঐ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধানুযায়ী হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে এই খেলাটী কি পূর্ব্বে অন্য নামে প্রচলিত ছিল, শেষে মোগলপাঠানের যুদ্ধের পর বর্ত্তমান নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে না উক্ত যুদ্ধের পরই এই খেলার প্রথম সৃষ্টি?

১৬ গুটি মঙ্গলপাটা।

মোগলপাঠানের যুদ্ধস্মৃতিরক্ষক

কতকগুলি খেলার মধ্যে নানারকম ছড়া আছে। ছড়াগুলির মধ্যে কতকগুলির বেশ অর্থ-বোধ হয়। অন্য কতকগুলির কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই অর্থশূন্য ছড়াগুলি কতকগুলি বস্তি খেলার মধ্যে ব্যবহৃত। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভুলাবার জন্য যে সব বস্তি খেলা আছে, সে সকল খেলাতেই ছড়ার ব্যবহার হয় এবং তজ্জন্যই সে সব ছড়াগুলি শুধু শিশুদের মনোরঞ্জনার্থ কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দবিন্যাস মাত্র। একটি নমুনা দেই। সব ছেলেমেয়ে চক্রাকারে পদ্মাসনে বসে, একজন তখন নিম্নোক্ত ছড়াটি

অর্থযুক্ত ছড়া

অর্থহীন ছড়া

বলে এবং ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের এক একটি হাঁটু স্পর্শ করা হয়। ছড়াটি এই—

"আপিলা জাপিলা ঘন ঘন মাছি,
আমের হুক্কা নলের বাঁশী,
একাদল পঞ্চাদল,
কেরে যাবি কামাম্বল" ইত্যাদি।

আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে শান্ত রাখিবার জন্য "ঘুঙ্গি ঘুঙ্গি" নামে একটি খেলা আছে। যাহার তত্ত্বাবধানে শিশু থাকে সে শুইয়া, হাঁটু উপরদিকে উঠাইয়া পা সঙ্কুচিত করে, তারপর শিশুটিকে পার পাতাদুটির উপর বসাইয়া দোলাইতে থাকে এবং নিম্নলিখিত ছড়া বলিতে থাকে—

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি দাও (দা-কাটারী) খান দে
দাওখান কেন? পাতাখান কাট্‌তে!
পাতাখান কেন? ছালিমাটি ফেলাইতে।
ছালিমাটি কই? ধোপায় নিছে।
ধোপা কই? হাটে গেছে (ইত্যাদি ইত্যাদি)

এখন হয়তো বুঝিলেন যে এ সব ছড়া অর্থশূন্য কতকগুলি শব্দবিন্যাস মাত্র।

চলতি খেলায় যে সব ছড়ার ব্যবহার হয়, তাহারা এরূপ অর্থশূন্য নহে। অনেক খেলায় অর্থযুক্ত ছড়া। তাহা বীরত্বব্যঞ্জক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অনেক খেলাতে উহা উত্তেজক বীরত্বব্যঞ্জক না হইলেও বেশ অর্থযুক্ত; যেমন— চোখবুজানি বা লুকোচুরি খেলা। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লুক্কায়িত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চোর আপনার চোখ বুজাইয়া রাখে এবং চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে :—

"চোখবুজানি লোহার কাঠী পালারে ভাই সকল ক'টি"

অর্থ—আমি লোহার কাঠী (অর্থাৎ শলাকা) দিয়া চোখ বুজাইয়াছি, এই অবসরে তোমাদের সকল খেলোয়াড় কয়জন পালাও।

ডুডু খেলায় যে সব ছড়া ব্যবহৃত হয়, তাহা বড় উত্তেজক এবং বীরত্বব্যঞ্জক। এই খেলায় ছড়াদ্বারা কথার কাটাকাটি হয়। আপনারা রামরাবণের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদের ডুডু খেলার ছড়া। যুদ্ধপ্রারম্ভে বাগ্‌যুদ্ধের কথা পড়িয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে অনেক জায়গায় কথায় passage-at-arms-এর কথা শুনিয়া থাকেন। এই সুযোগে কৃত্রিমযুদ্ধে নিযুক্ত পল্লীবীরদের নিজস্ব পল্লীভাষায় কথিত বাগ্‌যুদ্ধের একটু নমুনা শুনুন।

পূর্ব্বে ডাক দেওয়া কাহাকে বলে বুঝাইয়াছি। একদমে কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষদের কোটে যাওয়ার নাম ডাক দেওয়া। ডাক দিবার সময় একজন খেলোয়াড় লাফাইতে লাফাইতে সগর্ব্বে ও সতেজে বলিয়া উঠিল—

"ডুগু ডুগু লপ্পে (লাফে—লম্ফে)
খারা (খাড়া) লইয়া কাপ্পে
খারার কপালে ফোটা
মইষ (মহিষ) মারি গোটা গোটা।"

ব্যাখ্যা—"হাতের (খাড়া) কাঁপাইয়া লাফ দিতে দিতে আমি ডাকদিতেছি, ওহে প্রতিদ্বন্দ্বী বীরসকল সাবধান। দেখনা আমার খাঁড়ার কপালে মন্ত্রপূত রক্তচন্দনের ফোটা। এই খাড়া দিয়া আমি গোটা গোটা অর্থাৎ অনেক মহিষ বিনষ্ট করিয়াছি।"

ইহার পর প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পূর্ব্বোক্ত বীরকে তাহার বৃথা আস্ফালনের জন্য বিদ্রূপ করিয়া বলিতে থাকে—

একহাত্তা বলরাম　　　　দোহাত্তা শিং
নাচেরে বলরাম　　　　তাক্ ধিনা ধিন্ ধিন্

ব্যাখ্যা—"আহা এই না তোমার চেহারা! এ নিয়ে আবার এত আস্ফালন! তোমার শরীরের পরিমাণ একহাত (অর্থাৎ শক্তির অধিক তোমার আস্ফালন) কিন্তু দুইহাত তোমার শিং দুটি, এই নিয়ে তুমি লম্ফ দেও—ইহাতো শুধু ক্ষুদ্র পুতুল নাচের মত দেখায়।"

আত্মরক্ষাকারী দল যদি আক্রমণকারীকে নিজদের কোটে ধরিয়া রাখিতে পারে, অমনি যেন জয়োল্লাস করিতে করিতে উৎসাহের সহিত বলিতে থাকে—

"মরা (মড়া) রইছে (রহিয়াছে) মইরা (মরিয়া)
সাতদিন ধইরা (ধরিয়া)
শিয়ালে শকুনে খায়
মরা হাড্ডি দেখা যায়।"

ব্যাখ্যা—"তোমাদের দলের খেলোয়াড়কে আমরা সাতদিন যাবৎ মারিয়া রাখিয়াছি। তোমাদের লজ্জা হয় না! এই তোমাদের দম্ভ। দেখ এসে তাহাকে শিয়াল শকুনিতে খাইয়া ফেলিতেছে এবং হাড় দেখা যাইতেছে।"

ইহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য বিপক্ষ খেলোয়াড় আস্ফালন করিতে করিতে বলে—

"আমার খেড়ু মাড়িয়া কিবা পাইলি সুখ।
লাইথাইয়া ভাঙ্গুম্ তর পাটাতনের বুক॥"

ব্যাখ্যা—"আমার সঙ্গী খেড়ুকে মারিয়া তোমার কোন সুখই বা হইল? কারণ তাহার প্রতিফলস্বরূপ লাথি মারিয়া এই তোমার ঐ প্রশস্ত বক্ষঃ চূর্ণ করিয়া দিতেছি।"

এইসব ছড়া সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, সমদল চলতি খেলাগুলি একরকম কৃত্রিম যুদ্ধ। কাজেই কয়েকটি খেলার রীতিনীতি যুদ্ধের রীতিনীতির সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় কেহ বিস্মিত হইবেন না এবং এইভাবে বিচার করিতে গেলে ডুডু খেলা সম্মুখযুদ্ধ স্বরূপ।

সম্মুখ যুদ্ধের মত এই খেলাতে একাধারে শক্তি ও সাহস চাই। দলের সর্দার খেলোয়াড়কে সর্ব্বদা দলকে সুশৃঙ্খল রাখিতে হয়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহরচনা করিয়া দুই প্রান্তে ভাল ভাল খেলোয়াড়দিগকে এবং মাঝে নিকৃষ্ট খেলোয়াড়দিগকে রাখা হয়। শত্রু আসিয়া যেই প্রান্তভাগ আক্রমণ করে, অপরপ্রান্তবর্ত্তী খেলোয়াড়গণ অমনি শত্রুর পার্শ্ব আক্রমণের চেষ্টা করে। এই ব্যূহকে সুসংযত ও দৃঢ় রাখা সর্দ্দারের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না পারিলে শত্রু আসিয়া বিক্ষিপ্ত খেলোয়াড়দিগকে একে একে মারিয়া যায়। এ খেলায় শক্তি ও সাহসের এত প্রয়োজন যে দুর্ব্বল ছেলেরা এ খেলাতে কিছু পশ্চাৎপদ। ঢাকার কুট্টি নামক নীচ শ্রেণীর মুসলমানেরা এই খেলায় খুব পারদর্শী। এই খেলাতে তাহাদের পটুতা বিক্রমপুরে প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে এবং বিক্রমপুরের সকল খেলোয়াড়ই অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের কৌশল ও সাহস অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে।

ডুডুখেলার সামরিকতা ও সম্মুখযুদ্ধ-নীতি

গোল্লাছুট নামে একটি খেলা আছে। এই খেলাতে পলায়নবিদ্যার অনুশীলন হয়। পলায়ন-বিদ্যাটি বড় প্রাচীন বিদ্যা। নিত্যনৈমিত্তিক খেলাতেও তাহার অনুশীলন হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যাকে আশ্রয় করার আবশ্যকতা বাড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ এ বিদ্যার চর্চ্চা ছিল তখন তত দরকার ছিল না, এখন দরকার হইয়াছে কিন্তু চর্চ্চা নাই। যাহা হউক গোল্লাছুট খেলায় গোল্লা নামে একটি চিহ্নিত স্থান থাকে। একদল সেস্থান অধিকার করিয়া থাকে, অন্যদল তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পাহারা দিতে থাকে, গোল্লাধিকারীদলকে besieged party বলা যায়। তাহাদের উদ্দেশ্য বেষ্টনকারী শত্রুদের মধ্য দিয়া কৌশলে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হওয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই খেলাতে পলায়ন-নীতির অনুশীলন হয়। তাই পলায়ন করিবার জন্য যে সব গুণের আবশ্যক সে সব গুণ (অর্থাৎ খুব দ্রুতগতিতে দৌড়ান, শত্রুদিগের সহিত চাতুরী করা) ইত্যাদি নানা গুণ না থাকিলে এ খেলায় পারদর্শী হওয়া যায় না।

গোল্লাছুট ও পলায়ন-নীতি

বুড়ীছোয়ানি খেলাতে বন্দীদিগের উদ্ধার করিবার কৌশল প্রদর্শিত হয়। বুড়ী শত্রুদের বন্দিনী। তাহার চারিদিকে সতর্ক পাহারা। তাহা হইতে শত্রুপুরীতে গিয়া বুড়ীকে উদ্ধার করিতে হইবে। শত্রুপুরীতে প্রথম গিয়াই বুড়ীর সংবাদ লওয়া হয়, তারপর শত্রুনিধনের জন্য চেষ্টা করা হয়। বুড়ীও সুবিধা পাইলেই উঠিয়া দৌড় দেয়।

বুড়িছোয়ানি—বন্দিনী-উদ্ধার

দাড়িয়াবান্ধা খেলাকে যদি যুদ্ধ বলা যায়, তবে ইহাকে কতকগুলি খণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমষ্টি বলিতে হইবে। বিস্তীর্ণ এক যুদ্ধক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধের সহিত খেলার যে সাদৃশ্যের কথা এতক্ষণ বলা হইল, তাহা যে সব খেলাতেই দৃষ্ট হয় এমত নহে। উপরি উক্ত খেলা কয়টিতেই এই সাদৃশ্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

দাড়িয়াবান্ধা

এখন খেলাগুলির প্রচলন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ফুটবল

ক্রিকেটের মহিমায় এই সব জাতীয় খেলাগুলি লোপ পাইতেছে। কি ছোট কি বড় সকলেই ঐ সব বিদেশীয় খেলার অনুরক্ত হইয়াছে। এমন কি নিরক্ষর রাখাল বালকগণ পর্য্যন্ত মাঠে তাহাদের গোরু ছাড়িয়া দিয়া যেখানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা হয় তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। ক্রিকেট খেলা বিক্রমপুর অঞ্চলে অনেক দিন যাবৎ প্রচলিত হইয়াছে। বিক্রমপুরান্তর্গত মাল্‌খানগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে বাঙ্গালীদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ক্রিকেট-খেলোয়ার বাহির হইয়াছেন। ফুটবলের প্রচলন অল্পদিন যাবৎ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিকেট অপেক্ষা ইহার প্রচলন অধিক, কারণ এই খেলা অল্পব্যয় সাপেক্ষ।

খেলাগুলির প্রচলন

দেশীয় সমদল খেলার মধ্যে ডুডু, গোয়াছুট, বুড়ীছোয়ানী প্রভৃতি গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে খেলা হয়। কারণ এই সব খেলায় বেদনা পাইবার সম্ভাবনা আছে। শীতকালে মাটি শক্ত থাকে, বেদনাও খুব বেশী লাগে। তবে দাড়িয়াবান্ধা খেলাটা সব সময়েই হয়।

চলতি খেলার মধ্যে অধিকাংশ খেলাই পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত, শুধু বসুমতী, চোখবুজানি, কুমীর-কুমীর, মাছ-মাছ এই অসমদল খেলাগুলিতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সকলেই যোগ দেয়। অসমদল খেলা অল্পবয়স্কদের মধ্যেই প্রচলিত।

তারপর ব্যক্তিগত খেলাগুলি যথা, মুগুরভাজা, কুস্তি, লাঠীখেলা প্রভৃতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল। শুধু বিদেশী "ডাম্বেল পরিচালন" অনেক যুবকের প্রিয় ছিল। ঈশ্বরা[illegible] এখন আমরা আত্মরক্ষার ও তদুপযোগী শক্তির উপযোগিতা বুঝিয়াছি। তাই এই [illegible] সরে বিক্রমপুরে খেলার রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত। ফুটবল, ক্রিকেট সব চলিয়া যাইতেছে। সকলেই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। বিক্রমপুর অঞ্চলে এখন এমন গ্রাম দেখিতে পাইবেন না, যেখানে যুবক ও বালকবৃন্দ লাঠী খেলা অভ্যাস করিতে ব্যস্ত নয়। এক গ্রামের সঙ্গে গ্রামান্তরের এই লাঠী খেলায় Mock-fight (কৃত্রিম যুদ্ধ) হইতেছে। বর্ষাকালে যখন মাঠ ঘাট সকল প্লাবিত হইয়া যায়, তখন হয়তো সকলের মিলিবার সুবিধা হয় না। তাহারা তখন নিজ নিজ বাড়ীতে নিজের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য যত্নপর। মাঝে মাঝে দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দল বাঁধিয়া "বাইছ" খেলিতে নদীর দিকে যায়। ইংরাজীতে যা'কে Boat-race বলে বিক্রমপুরে তাহারই নাম "বাইচ" খেলা বা বাইছালিখেলা। এ খেলাতে ভদ্র অভদ্র সকলেই আমোদ পায়।

দেশীয় খেলার মধ্যে ডুডু খেলার মত লোকপ্রিয়, সুপরিচিত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত জাতীয় খেলা বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নাই। এই রাজধানীতেই যখন এই খেলা দেখিবার জন্য লোকের আগ্রহ দেখা যায় তখনই বুঝিতে পারা যায় যে এই খেলা কতদূর পরিচিত। বিক্রমপুরে বিদেশীবন্যায় যখন অন্যান্য সকল দেশীয় খেলা লোপ পাইতেছিল, তখনও দেখিয়াছি গ্রামের স্থানে স্থানে দুই চারি জনে মিলিয়া ডুডু খেলায় তৎপর। গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণের এই খেলাতে এত আগ্রহ যে, এত

ডুডু সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত খেলা

ফুটবল ক্রিকেট খেলার আধিক্য সত্ত্বেও যদি কোথায়ও যুবক বা বালকদল ডুডু খেলার জন্য একত্র হয়, তাহার চতুঃপার্শ্বে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রাখাল, পথিক, ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া এক সরস ও সতেজ আমোদের সৃষ্টি করে। পূর্ব্বে যখন এ খেলার অধিকতর প্রচলন ছিল, তখন বিদ্যালয়ের ছেলেরা ছুটির পর একবার ডুডু না খেলিয়া বাড়ী যাইত না। রাখাল-বালকেরা গোরুগুলিকে ইচ্ছামত চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া হরিৎপ্রান্তর মধ্যবর্ত্তী কোন বিশাল বট বা অশ্বথের বিস্তৃত ছায়ায় অথবা প্রান্তর-প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের ক্ষুদ্র ছায়ায়, বাড়ী যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই খেলার আমোদে মত্ত থাকিত। গ্রামের লোকেরা এই খেলার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণের জিনিষ পায়, যাহার জন্য এখনও পথিক তাহার গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া, গৃহস্থ হাটবাজারের কথা ভুলিয়া, রাখালবালক গোরুর কথা ভুলিয়া, গোয়ালা দুধের কথা ভুলিয়া, অন্ততঃ কতক্ষণের জন্য খেলা দেখিয়া অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করে।

বসতি খেলার মধ্যে, তাস, পাশা, দাবা ছাড়া অন্যান্য সব খেলাই মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। তবে কালমহিমায় অনেক স্থানে মেয়েরা বাঘবন্দী, পাইট পাইট প্রভৃতি খেলা ছাড়িয়া তাসখেলায় মনোনিবেশ করিতেছেন। চলতি খেলার মধ্যে যেমন ডুডু খেলা যুবকদের আদরণীয়, বসতি খেলার মধ্যে পাশা দাবা তেমনি বৃদ্ধদের আদরের সামগ্রী, পাশা ও দাবাছাড়া বৃদ্ধদের মজলিস জমে না। বিশেষতঃ পাশা খেলা বিক্রমপুরে সুপ্রচলিত। বিক্রমপুরবাসী ঢাকাকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়ের দাবাখেলায় পারদর্শিতা বিক্রমপুরে প্রবাদস্থানীয়।

মেয়েলী খেলার মধ্যে দশ পঁচিশ খেলা সর্ব্বত্র প্রচলিত। বৃদ্ধাদের নিকট এই খেলা বড়ই প্রিয়। দুপ্রহরের খাওয়াদাওয়া হইয়া গেলেই বৃদ্ধাগৃহকর্ত্রী সকলকে একত্র করিয়া এইখেলা খেলিবার উদ্যোগ করে। অন্যান্য খেলা বর্ত্তমানকালে, শুধু স্মৃতির বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ছেলেরাও অনেক সময় এ সব মেয়েলীখেলাতে যোগদান করে।

উপসংহার

শিশুমনোরঞ্জনার্থ যে সব খেলা আছে, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নূতন নূতন ছড়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তাহাদের ভাষা পরিমার্জ্জিত, ছন্দও সুবিন্যস্ত। পুরাতন ছড়াগুলির সরলতা ও সরসতা এ নূতন ছড়াগুলিতে নাই। এই যে পুরাতন চলিয়া যাইতেছে এবং নূতন হইতেছে, তাহাতে রক্ষণশীলতাপ্রবণ হৃদয়ে দুঃখ হয় সত্য কিন্তু উপায় কি? কবি বলিয়াছেন—

"প্রাচীন চলিয়া যায়
নবীনেরে দিয়া সিংহাসন।"

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন এই যে আমি জানি, আমার এ প্রবন্ধটি এই সুধীসমাজে পঠিত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তবে পরিষদের পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়, ও ছাত্রসভ্যের মাননীয় পরিদর্শক মহাশয়ের আগ্রহে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই, আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আপনাদের নিকট পড়িতে সাহসী হইয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমি আমার আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। উপস্থিত সুধীবর্গের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা যেন এ অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি সহৃদয়তাগুণে মাপ করেন।

প্রবন্ধের আয়তন-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ প্রবন্ধে সকল প্রকার খেলার সবিশেষ বিবরণ ও খেলাসম্বন্ধীয় সকল প্রকার ছড়াগুলি সন্নিবিষ্ট করিতে পারি নাই। এক একটি খেলা ধরিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। অনেক খেলার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও সংগ্রহ হয় নাই। সংগ্রহ হইলেই তাহা বাহির করিব।

চলন্তি—১। ছিদৌড় খেলা।

১। ছিদৌড় বা ডুগুডুগু—এইখেলা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। অতএব ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। শুধু দুই একটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ দেওয়া গেল।

যে স্থানে খেলা হয় তাহাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হয়। এক এক ভাগে এক এক দল খেলোয়াড় থাকে। এই এক একটি ভাগকে বিক্রমপুরে চলিত কথায় "তৈল" বা "তলি" বলে। দুই তৈলের মধ্যবর্ত্তী সীমাজ্ঞাপক রেখাকে "সমানতৈল" বলে। ঐ রেখাটি যে কোনরূপে চিহ্নিত থাকে।

যে কোন রকম কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষদলের তৈলে যাওয়াকে "ডাকদেওয়া" বলে।

খেলিবার জায়গার চারিদিকেও অনেক সময় একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তাহার বাহিরে কোন খেলোয়াড় গেলে সে খেলিতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবে। চারিদিকের এ নির্দ্দিষ্ট সীমাকে বিক্রমপুরে চলিত কথায় "জ্বলন্তি-পুড়ন্তি" বলে এবং যে এই সীমা অতিক্রম করে সে "জ্বলিয়া গিয়াছে বা পুড়িয়া গিয়াছে" এইরূপ বলা হয়। অন্যান্য অনেক খেলাতেও এই "জ্বলন্তি-পুড়ন্তির" ব্যবহার হয়।

এই খেলার প্রচলন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সামরিকনীতি বিদ্যমান তাহারও উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

এই খেলার নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা বলিতে চাই যে বিক্রমপুরে এই খেলার তিন চারিটা নাম প্রচলিত আছে যথা—"ছিদৌড়," "কপাটি," "ছিছি," "ডুগুডুগু"। ইহাদের মধ্যে "ছিদৌড়" নামটিই পুরাতন বলিয়া মনে হয় কারণ চাষাভূষাদের মধ্যে ঐ নামই প্রচলিত। "ছিছি" "ছিদৌড়" নামেরই রূপান্তর। কপাটি নামও চাষাভূষাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঢাকার কুট্টিরা (এই খেলা সম্বন্ধে যাহাদের পারদর্শিতার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) এই খেলাকে "কপাটি" নামে অভিহিত করে। বোধ হয় তাহাদের নিকট হইতেই এই নামটি ধার করা হইয়াছে। "ডুগুডুগু" নাম অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোকদের মধ্যেই প্রচলিত, তাহাতেই মনে হয় যে নামটি আধুনিক।

ডাক দিবার সময় "ড়ড়ড়" বা "ডুগুডুগু" বলা হয় বলিয়াই বোধ হয় এই খেলার নাম

"ডুগুডুগু" হইয়াছে। "ছিছি" বলিয়া "কপ্‌টি কপ্‌টি" বলিয়াও অনেক খেলোয়াড় ডাক দেয়। "ছিদোড়" "ছিছি" ও "কপাটি" নামও বোধ হয় উহা হইতেই আসিয়াছে।

এই খেলার ছড়া সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করা এখন বড় দুষ্কর হইয়াছে। কারণ কালমহিমায় ছড়াগুলি লোকের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া যাইতেছে। এখানে অতিরিক্ত দুটি ছড়া দেওয়া গেল।

১। ছিদোড় কোটরা ধর।
বাইন্যা মাগি টাইন্যা ধর॥

২। ছিয়া ছিয়া ছিয়া।
(তাদের) তগ বাড়ী দিয়া॥
পান নাই সুপারি নাই
তুলসী পাতা দিয়া॥

২। গোল্লাছুট।

প্রণালী—খেলোয়াড়গণ সমান দুই দলে বিভক্ত হয়। খেলিবার জায়গার একপ্রান্তে মৃত্তিকাতে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিতে হয়। ঐ ক্ষুদ্র গর্ত্তটির নাম "গোল্লা"। অনেক সময় কোন বৃক্ষের মূল বা কোন তৃণস্তূপকেও "গোল্লা" করা হইয়া থাকে। গোল্লা হইতে সম্মুখের দিকে কতকটা দূরে (২৫।৩০ গজ) খেলিবার জায়গার অন্য সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। একদল খেলোয়ার গোল্লা অধিকার করে, অন্যদল খেলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গার অন্যান্য সকল স্থান অধিকার করিয়া প্রণালী মত অবস্থান করে। যে দল "গোল্লার" অধিকারী তাহাদের লক্ষ্য—বিপক্ষদলের খেলোয়াড় দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থায় খেলিবার জায়গার অন্যপ্রান্তে যাওয়া। এইরূপ যে যাইতে পারে সে "পাকা" বলিয়া গণ্য হয়। নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে যদি বিপক্ষদলের কেহ "গোল্লার" অধিকারী দলের কাহাকেও ছুঁইতে পারে—তবে শেষোক্ত ব্যক্তি "মরা" বলিয়া গণ্য। "গোল্লার" অধিকারীদের লক্ষ্য "পাকা"—বিপক্ষদলের লক্ষ্য "মারা"।

গোল্লার অধিকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে আবার একজন উপযুক্ত লোক গোল্লা রক্ষায় নিযুক্ত থাকে। যে খুব দৌড়াইতে ও পালাইতে সক্ষম সেই উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। এই গোল্লা-রক্ষকের উপরেই জয় পরাজয় নির্ভর করে। সে যতক্ষণ না মরে, ততক্ষণ (অন্য সকলে মরিয়া গেলেও) খেলার ফলাফল কিছু নির্দ্দিষ্ট হয় না।

গোল্লারক্ষক ব্যতীত অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে যদি কেহ "পাকে" তবে সে আসিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গোল্লার কিছু দূরে নূতন গোল্লা নির্দ্দিষ্ট করে এবং সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে। যেই পূর্ব্ব গোল্লারক্ষক "অ-মরা" অবস্থায় আসিয়া তাহাকে ছুঁইল, অমনি পূর্ব্ব গোল্লারক্ষক ছুঁইলে শেষোক্ত ব্যক্তি মড়া বলিয়া গণ্য হয়।

খেলার প্রথমেই একটা সংখ্যা ঠিক করিয়া লওয়া হয় এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ডাকের মধ্যে বুড়ীকে উদ্ধার করিতে হইবে। নচেৎ বুড়ী মারা গেল।

বুড়ী কোন রকমে মারা গেলে, বুড়ীর দল হারিল। তখন বিপক্ষদল নিজেদের বুড়ী বসায়। বুড়ী নিরাপদে আসিতে পারিলে বুড়ীর দল জিতিল এবং পুনরায় সেই দল বুড়ী বসাইবে। (গোল্লাছুটেও এই নিয়ম)

প্রচলন—গোল্লাছুটের চেয়ে এ খেলার প্রচলন বেশী ছিল। এখন দুই খেলারই অবস্থা একরূপ।

নাম—এই খেলার নাম অনেক যথা—"বৌ ছোয়ানি" বা "বুড়ী ছোয়ানী" "বুড়ীছি" "বৌয়াছি" অথবা "বৌ আনি"। বৌকে বা বুড়ীকে ছুইয়া আনিতে হয় অথবা বৌকে বা বুড়ীকে ছোওয়ার উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে, এই জন্যই এই সব নামের সৃষ্টি।

মন্তব্য—এই ক্রীড়াযুদ্ধে বুড়ী বিপক্ষদলের বন্দিনী। তাহাকে উদ্ধার করিতে তাহার পক্ষীয় লোক সর্ব্বদা সচেষ্ট, কিন্তু বিপক্ষদল এরূপ শক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে সহজে উদ্ধার দুঃসাধ্য। তাই প্রথমে বুড়ীর কাছে যাইয়া তার সংবাদ নিয়া বুড়ীর পক্ষের যোদ্ধা, বিপক্ষ প্রহরী বিনাশের চেষ্টা করে; কিন্তু একটি প্রহরীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গেলে অন্যান্য বহু প্রহরী আসিয়া বুড়ীকে বেষ্টন করে। বিশেষতঃ বুড়ী সাধারণ খেলোয়াড় হইল। নূতন গোল্লা প্রকৃত গোল্লা হইল। নূতন গোল্লারক্ষক প্রকৃত গোল্লারক্ষক হইল। পূর্ব্ব গোল্লারক্ষক এখন আবার পাকিবার চেষ্টা করে।

যদি "পাকা" খেলোয়াড়গণ সংখ্যায় বেশী হয়, তবে এই ভাবে গোল্লা ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়; এবং যদি এই ভাবে সীমাতে গিয়া নূতন গোল্লা স্থাপন করিতে পারে, তবে গোল্লা-রক্ষকের দল "সাতবাজি" অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বাজি জিতিল।

প্রথম নির্দ্দিষ্ট গোল্লা হইতে যদি গোল্লারক্ষক একবারে পাকিতে পারে তবে এক "বাজি জিত"।

গোল্লারক্ষক (নূতন বা পুরাতন) মরিলেই এক বাজি হার হইল।

গোল্লারক্ষক বা গোল্লারক্ষকের সঙ্গে স্পৃষ্ট কোন ব্যক্তি যদি বিপক্ষদলের কাহাকেও ছুঁইতে পারে, তবে বিপক্ষদলের সেই খেলোয়াড় "মড়া" বলিয়া গণ্য। গোল্লারক্ষক যতক্ষণ গোল্লা ছুঁইয়া থাকে ও অন্যান্য খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ গোল্লারক্ষককে ছুঁইয়া থাকে ততক্ষণ এ নিয়ম খাটে। "গোল্লার" সঙ্গে ছোওয়া না থাকিলেও বিপক্ষদলের কাহাকেও তদবস্থায় ছুঁইলে গোল্লার অধিকারী দলের লোক মড়া বলিয়া গণ্য হয়।

গোল্লা খালি থাকিলে বিপক্ষদলের কেহ যদি তাহাতে থু থু ফেলিতে পারে, তবে আর গোল্লারক্ষক তাহাতে আসিতে পারিবে না। তাহাকে বাধ্য হইয়া পাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রচলন—পূর্ব্বে এ খেলা ভদ্রেতর সকলের ভিতরই অধিক পরিমাণে প্রচলন ছিল। এখন কদাচিৎ দুই এক গ্রামে ভদ্রলোকদের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায়। চাষাদের ভিতর এখনও অনেক জায়গায় আছে।

নাম—"গোল্লা' হইতে ছুটিয়া গিয়া পাকিতে হয় বলিয়া ইহার নাম "গোল্লাছুট"।

গোল্লারক্ষককেও অনেক সময় "গোল্লা" বলিয়া ডাকা হয়।

মন্তব্য—যুদ্ধের পরিভাষায় বলিতে গেলে এ খেলাটা পলায়ন-নীতি শিক্ষা দেয় এবং তজ্জন্যই যাহারা খুব দৌড়াইতে, পাশ কাটিতে ও ছল করিতে পারে তাহারাই এই খেলায় বিশেষ পারদর্শী। গোল্লারক্ষকের সর্ব্বদাই এই লক্ষ্য যে বিপক্ষদলের কোন্ খেলোয়াড়টি অমনোযোগী হইয়াছে—খেলিবার জায়গায় কোন ধারে দুর্ব্বল খেলোয়াড় পাহারা দিতেছে বা পালাইবার ফাঁক আছে। পালাইবার সুবিধা ঠিক করা খুব বিবেচনাসাপেক্ষ।

বিপক্ষদলও মাঠের চারিদিকে এইরূপ সজ্জিত থাকে যে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাওয়া বড় কঠিন। এজন্য বিপক্ষদলকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য গোল্লারক্ষক তাহার নিজের দলের সকলকে এক যোগে এলোমেলো ভাবে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদিগকে মারিবার জন্য বিপক্ষদল যখন ব্যস্ত থাকে, গোল্লারক্ষক তখন আপনার পথ খুঁজিয়া লয়।

বিপক্ষদলের নেতা বুদ্ধিমান্ হইলে গোল্লারক্ষকের পাহারার জন্য একজন খেলোয়াড়কে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখে। সে কিছুতেই গোল্লারক্ষককে নজরের বাহির করে না।

এই খেলায় বিশেষ কোন ছড়া নাই। তবে গোল্লারক্ষক তাহার পক্ষীয় খেলোয়াড়দিগকে ছুটাইয়া দিতে বিলম্ব করিলে তাহাকে উত্যক্ত করিবার জন্য দুই একটি অশ্রাব্য ছড়া চাষাদের ভিতর প্রচলিত আছে।

শীত কাল ব্যতীত প্রায় সকল কালেই এই খেলা হয়।

৩। বৌ-ছোয়ানি—বুড়ী ছোয়ানি।

প্রণালী—এই খেলার প্রণালী কতকটা পূর্ব্বোক্ত খেলার মত। পূর্ব্বোক্ত খেলায় যেরূপ গোল্লারক্ষকের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে, এখানে সেরূপ "বৌ" (বা বুড়ী) এর উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে। বৌকে বিপক্ষদলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হয়। তাহার পক্ষীয় লোক খেলার জায়গায় একপ্রান্তে একটা সীমার বাহিরে থাকে, সেই সীমা হইতে ডাকনিয়া আসিয়া বুড়ীর পক্ষীয় লোক প্রথম বুড়ীকে ছোঁয়, তারপর বিপক্ষদলের লোকদিগকে মারিতে চেষ্টা করে। ডাক ডাক থাকিতে থাকিতে যাহাকে ছুঁইতে পারিবে সেই "মরা"।

বুড়ীকে নিজেদের দলে আনা বুড়ীর পক্ষীয় লোকের উদ্দেশ্য। যাইবার সময় বুড়ীকে মারা অর্থাৎ ছুঁইয়া দেওয়া বিপক্ষদলের উদ্দেশ্য। কাজেই বিপক্ষদল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, যেন যাইবার সময় কেহ না কেহ বুড়ীকে ছুইতে পারে।

বুড়ীর পক্ষের লোক ডাকনিয়া বুড়ীকে ছুইয়া গেলেই বিপক্ষদলের লোক বুড়ীকে আসিয়া ছুঁইয়া দেয়, বুড়ী না উঠিতে উঠিতে ছুইতে পারিলে বুড়ী সেই ডাকে উঠিতে পারিবে না।

যে ডাক দেয় বিপক্ষদলের ভিতর যদি তাহার ডাক না থাকে, এবং সে অবস্থায় যদি বিপক্ষ-দলের কেহ তাহাকে ছুঁয়ে দেয়, তবে ডাকদেওয়া খেলোয়াড় মারা গেল।

সীমার ভিতর থাকিয়া বুড়ীর দলের লোক বিপক্ষদলের কাহাকেও পশ্চাৎ দিকে আসিতে দেয় না, একজন শক্ত প্রহরী সর্ব্বদাই আছে। বুড়ীর খবর লইয়া যাওয়া মাত্রেই সেই প্রহরী আসিয়া বুড়ীকে পাহারা দেয়।

কাজেই বুড়ীর পক্ষের লোক সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বিপক্ষ প্রহরীদিগকে একটি একটি করিয়া মারিতে থাকে, যখন প্রহরীর সংখ্যা কমিয়া আসে, বুড়ী তখন আপন সুবিধা বুঝিয়া নিজপক্ষীয় লোকের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসে। বুড়ী একবার ছুটিলে আর রক্ষা নাই। হয় তাহাকে নিজের দলে যাইতে হইবে, নচেৎ বিপক্ষের হাতে মারা যাইতে হইবে, সে আর আগের মত নিজের জায়গায় আসিয়া বসিতে পারিবে না।

৪। দাড়িয়া বান্ধা (দাইরা বান্দা)

প্রণালী—নিম্নলিখিত চিত্রটি হইতে এই খেলার প্রণালী বেশ বুঝা যাইবে।

* * * * * * *

ক		ক
	ছ	
খ		খ
	জ	
গ		গ
	ঝ	
ঘ		ঘ
	ঞ	
চ		চ

খেলোয়াড়গণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, একদল প্রথমতঃ তারকাচিহ্নিত লাইনের বাহিরে থাকে। অন্যদল ক, খ, গ, ঘ, চ চিহ্নিত জায়গাগুলিকে অধিকার করিয়া দাড়াইয়া থাকে। শেষোক্ত স্থানগুলিকে "দাড়িয়া" বলে, এবং ইহাদের দ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডকে "বাহ্ণা" বলে। দাড়িয়া গুলির প্রস্থ একটি পায়ের দৈর্ঘ্যের সমান। "বাহ্ণা" গুলি বর্গাকৃতি। ইহার পরিমাণ এরূপ হয় যে, একজন খেলোয়াড় বাহ্ণার ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে, দুই দিকে "দাড়িয়ার" খেলোয়াড়দ্বয় এক সঙ্গে হাত বাড়াইয়া যেন তাহাকে ছুইতে না পারে।

দুই দলের মধ্যে যাহারা "দাড়িয়া" নেয়, তাহাদের এক একজন এক একটি "দাড়িয়া" অধিকার করিয়া থাকে, এবং যাহাতে বিপক্ষ খেলোয়াড় এক "বাহ্ণা" হইতে অন্য "বাহ্ণাতে" না যাইতে পারে তাহা দেখে। যদি দাড়িয়ার খেলোয়াড় কোন ক্রমে বাহ্ণার খেলোয়াড়কে ছুঁইয়া দিতে পারে, তবে সে মড়া বলিয়া গণ্য হয় এবং একজন লোক মরিলে সমস্ত দলটি সে বারের জন্য খেলিতে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। তাই তাহারা আসিয়া তখন দাড়িয়া অধিকার করে, এবং যাহারা দাড়িয়ায় ছিল, তাহারা তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

যাহারা বাহ্ণা নেয়, তাহাদের মধ্যে যদি একজনও পাকিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে তাহাদের একবাজি জিত হইল। "ক" চিহ্নিত (অর্থাৎ প্রথম) দাড়িয়ার বহির্ভাগে প্রথমতঃ বাহ্ণার খেলোয়াড়গণ একত্র হয়, তারপর তাহারা একে একে একটি একটি করিয়া বাহ্ণা পার হইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি কোন খেলোয়াড় "চ" চিহ্নিত (অর্থাৎ সর্ব্ব শেষ) দাড়িয়া পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বহির্ভাগে পঁহুছিতে পারে, তবেই সে "পাকিল"। এবং পাকিবার পর সে যদি আবার ফিরিয়া সে প্রথম দাড়িয়ার বহির্ভাগে—যেখানে খেলার প্রারম্ভে ছিল—সেখানে পৌঁছিতে পারে, তবে তাহাদের একবাজি জিত হইল। কিন্তু যদি এই যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার পথে তাহাকে কোন দাড়িয়ার খেলোয়াড় ছুইয়া দিতে পারে, তবে সে মরিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দলও মরিল।

অথবা যদি কোন এক বাহ্ণার মধ্যে দুইএর অধিক খেলোয়াড় একত্র হয় তবে তাহারা মরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দলটিও মরিল।

অথবা যদি কোন পাকা খেলোয়াড় কোন কাঁচা (যে পাকিতে পারে নাই) খেলোয়াড়ের সঙ্গে এক বাহ্ণায় একত্র হয় তবে সে দলটি মরিল।

অথবা যদি কোন খেলোয়াড় খেলিবার জায়গার চতুর্দ্দিকের নির্দ্দিষ্ট ও চিহ্নিত সীমার বাহিরে যায়, তবে সে দলটি মরিল।

তবে প্রথম দাড়িয়ার বহির্ভাগে খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দাড়িয়ার লোক ছুঁইলেও মড়া হইবে না।

এদিকে যাহারা দাড়িয়া অধিকার করিয়া থাকে তাহাদের পা কাহাকেও ছুঁইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কতকক্ষণ ঠিক দাড়িয়ার মধ্যে থাকা চাই। যদি পা বাহ্ণার মধ্যে

যায় বা চারিদিকের সীমার বাহিরে যায়, তবে বিপক্ষকে ছুঁইলেও সে মরিবে না, বরং বিপক্ষ তাহাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে।

দাড়িয়ার লোক প্রথম যে দাড়িয়ায় থাকে সে দাড়িয়া ছাড়িয়া অন্য দাড়িয়ায় গিয়া মারিবার তাহার কোন অধিকার নাই। শুধু কাঁচাকে মারিতে হইলে পিছনে এক দাড়িয়ায় যাইতে পারিবে, আর পাকাকে মারিবার সময় সম্মুখের এক দাড়িয়ার যাইতে পারে। অর্থাৎ কাঁচাকে মারিতে হইলে ক দাড়িয়ার খেলোয়াড় ছ দাড়িয়ায়; এবং খ দাড়িয়ার খেলোয়াড় জ দাড়িয়ায়, অথবা গ এর খেলোয়াড় ঝতে যাইতে পারিবে ইত্যাদি। আর পাকাকে মারিতে হইলে, চএর খেলোয়াড় ঞতে, ঘএর খেলোয়াড় ঝতে যাইতে পারিবে ইত্যাদি। মনে রাখিতে হইবে ছ, জ, ঝ, ঞ দাড়িয়াতে খেলার প্রথমে কোন লোক থাকে না। খেলোয়াড়গণ শুধু, ক, খ, গ, ঘ, চ, দাড়িয়া অধিকার করিয়া থাকে এবং উহাদের সমান্তরাল যতটি দাড়িয়া থাকে, ততই খেলোয়াড় এক এক দলে থাকিতে পারে।

প্রচলন—এখন এ খেলার খুব প্রচলন আছে। শিক্ষিত যুবকেরাও ইহাতে খুব যোগ দেয়। সকল গ্রামে, সকল সহরেই (পূর্ব্ববঙ্গে) এ খেলার প্রচলন দেখা যায়।

নাম—দাড়িয়াবান্ধা নামের ব্যুৎপত্তি সহজেই বুঝা যায়। পূর্ব্বে দাড়িয়া ও বান্ধা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই নামের সার্থকতা বুঝা যাইবে।

মন্তব্য—এই খেলায় পরিশ্রম খুব বেশী হয় এবং খেলায় চতুরতার বিশেষ আবশ্যক। দাড়িয়ার খেলোয়াড় সর্ব্বদা বান্ধার খেলোয়াড়ের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছে, সর্ব্বদা তাহাকে চৌকি দিতেছে। এ অবস্থায় দৌড়াইবার মধ্যে নানা রকম চতুরতা প্রকাশ করিয়া, দাড়িয়ার খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিতে হয়। এ খেলায় কোন দলের জয় পরাজয় বড় কম হয়, কারণ একবার গিয়া পাকিয়া আবার ফিরিয়া আসা বড় কষ্টের কথা। বিশেষতঃ ফিরিয়া আসিবার সময় কাঁচাপাকা মিশিয়া যাইবার ভয় থাকে।

৫। বসুমতী বা ল্যাদোর-ল্যাদোর।

প্রণালী—এই খেলায় একদলে শুধু একজন লোক থাকে এবং অপর দলে আর সকল খেলোয়াড় থাকে। এ অবস্থায় যথারীতি "বাঁটিয়া" নিয়া একজনকে "চোর" করা হয়। সে অবশিষ্ট সকল খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ছুঁইতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চোর থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত খেলোয়াড় সকল দাঁড়ান অবস্থায় থাকে, স সময়ের মধ্যে ছুঁইতে না পারিলে ছুঁইয়া কোন ফল নাই। অর্থাৎ ছুঁইবার পূর্ব্বে যদি খেলোয়াড় একবার মাটিতে বসিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহাকে ছুঁইলেও, চোরের মুক্তি হয় না। দাঁড়ান অবস্থায় ছুঁইতে পারিলে, চোর মুক্তি লাভ করিল, আর চোর যাহাকে ছুঁইল সে আবার চোর হইল। চোরের ভয়ে একবার মাটিতে বসিয়া পড়িলে আবার উঠিয়া দাঁড়ান সহজ নয়। উঠিয়া দাঁড়াইতে হইলে হয়—(১) দাঁড়ান অবস্থায় কোন খেলোয়াড়কে তাহার মাথা ছুঁইতে হইবে।

(২) অথবা মাটিতে বসিয়া আছে এরূপ দুইটি খেলোয়াড় পরস্পরকে ছুইবে। কিন্তু এইরূপে ছুঁইবার সময় চোর যদি ঐ দুইজন খেলোয়াড়ের মাথা একই সময়ে দুই হাতে ছুঁইতে পারে তবে আর তাহাদের উঠা হইবে না। পুনরায় যদি কোন দাঁড়ান অবস্থার খেলোয়াড় আসিয়া তাহাদের মাথা ছুঁইতে পারে, তবেই তারা উঠিতে পারিবে।

দাঁড়ান অবস্থার কোন খেলোয়াড় ছুইয়া গেলে এবং যাহাকে ছুঁইল তাহার উঠিবার পূর্ব্বে যদি চোর আসিয়া আবার শেষোক্ত খেলোয়াড়কে ছুঁইতে পারে তবে সে বারে আর তাহার উঠা হইল না।

প্রচলন—চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে এই খেলার খুব প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেরা যাহারা হাডুডু প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কষ্টসাধ্য খেলাগুলিতে অপটু বা অভিজ্ঞ, এই খেলায় তাহারা খুব আমোদ উপভোগ করিত। কিন্তু আজকাল বড় বিশেষ একটা প্রচলন দেখা যায় না। কচিৎ দুই একটা গ্রামে দেখা যায়। উপরে এই খেলার দুইটী নাম লিখিয়াছি—

(১) বসুমতী—এই নাম কেন হইল বুঝি না। সম্ভবতঃ চোরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বসুমতীই একমাত্র উপায় (কারণ মাটিতে বসিয়া পড়িলে আর চোরের ভয় থাকে না)। এইজন্য ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

(২) ল্যাদোর ল্যাদোর—বিক্রমপুরে সাধারণতঃ দুর্ব্বল ছেলেকে ল্যাদা বলে। সব কাজেই যাদের "গা-ছাড়া" ভাব, উঠিতে, বসিতে, খাইতে, চলিতে, ফিরিতে সব কাজেই যাহাদের (গাছাড়া ভাব) দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহাদিগকে ল্যাদা বলে। তাহাদের বসিবার ধরণটাকে ল্যাদোর বলা হয়। আর এই খেলাতে যে অত্যন্ত অপটু, বসিয়া পড়াই তাহার প্রধান উপায় বলিয়া এই খেলাটাকেও উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। অনেক জায়গায় দুই নাম প্রচলিত নাই।

৬। চোখবুজানি বা লুকপলানি।

শুদ্ধ ভাষায় যাহাকে "লুকোচুরি" খেলা বলে, তাহাকেই বিক্রমপুরে সাধারণ ভাষায় চোখ-বুজানি বা লুকপলানি খেলা বলে। এই খেলা সর্ব্বত্র প্রচলিত। পৃথিবীর সকল জায়গাতেই কোন না কোন রূপে এ খেলার প্রচলন আছে। বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই খেলা প্রচলিত, তাই আর ইহার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি না।

প্রচলন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই খেলা এখনও বিক্রমপুরের পল্লীতে পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচলিত। এই খেলার বিক্রমপুরে প্রচলিত নাম সম্বন্ধে একটি কথা বলা যাইতে পারে।

নাম—অন্যান্য খেলোয়াড় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লুক্কায়িত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত "রাজা" চোরের চোখ দুইটী বুজাইয়া রাখে। রাজা যদি মানুষ না হইয়া কোন গাঁছপালা হয়, তবে চোর নিজেই নিজের চোখ বুজাইয়া রাখে। এইজন্যই এই খেলাকে চোখবুজানি খেলা বলে।

"লুকপলানি" নামটা লুকান ও পলান এই দুই সমার্থবাচক শব্দসংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

মন্তব্য—চোর যখন চো'খ বুজিয়া থাকে, তখন প্রায়ই নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া থাকে—

"চোখবুজানি লোহার কাঠি ;
পলারে ভাই সক্কল্ কটি ॥"

অর্থাৎ লোহার কাঠি (শলাকা) দিয়া আমার চোখ বুজান হইয়াছে, তোমরা সকলেই এখন পালাও। (সক্কল=সকল)

যদি কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বার অবিচ্ছিন্ন ভাবে চোর থাকে, তবে আবার খেলাটা অন্য রকমের হইয়া যায়। একখণ্ড কাপড় দিয়া তখন চোরের চো'খ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ তখন চুপি চুপি যাইয়া চারিদিক্ হইতে চোরের মাথায় "চাটি" মারিতে থাকে। চোর যদি তখন কাহাকেও ধরিয়া তাহার নাম বলিতে পারে, তবেই সে মুক্ত হইল, নচেৎ নয়। যাহার নাম বলিয়া চোর মুক্তিলাভ করে, তাহাকে আবার তখন এরূপ চো'খ বাঁধিয়া "চাটি মারা" হয়।

৭। ডগারে ডগা।

একজন খেলোয়াড় গাছে উঠে, অন্যান্য সকলে প্রথমতঃ নীচে দাঁড়ায়। নীচের খেলোয়াড়গণ তারপর চিৎকার করিয়া ডাকে—"ডগারে ডগা ?"

গাছ হইতে ডগা উত্তর দেয়	কিরে ডগা।
পুনর্ব্বার প্রশ্ন হয়	গাছে কেন্ ?
উঃ	বাঘের ডরে।
প্রঃ	বাঘ কই ?
উঃ	মাটির তলে।
প্রঃ	মাটি কই ?
উঃ	ঐ তো।
প্রঃ	তরা কয় ভাই ?
উঃ	সাত ভাই।
প্রঃ	আমারে একটা দিবি ?
উঃ	ছুইতে পারলে নিবি।

শেষোক্ত উত্তর হওয়া মাত্র নীচের খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়জন গাছে উঠে আর কয়েকজন মাটিতে থাকে। তখন গাছের উপরে প্রথম যে খেলোয়াড়টি ছিল তাহাকে ছুইবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা হয়। তাহাকে মাটিতে পড়ার পূর্ব্বে ছুঁইতে পারিলে সে আসিয়া মাটিতে দাঁড়াইবে এবং যে ছুঁইল সে তখন গাছে উঠিবে এবং পুনরায় প্রথম হইতে খেলা আরম্ভ হইবে।

উপরি লিখিত ছড়াটির প্রথম ছত্র হইতেই খেলার নাম হইয়াছে। গাছে যে খেলোয়াড়টি

থাকে তাহাকে "ডগা" বলা হয়, কেন বুঝিতে পারা যায় না। হয়তো গাছের ডগা (পল্লবযুক্ত শাখাগ্রভাগ) হইতেই গাছের উপরের খেলোয়াড়টির এই নাম হইয়া থাকিবে।

এই খেলা ছেলেপিলেদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। রাখাল বালকদের মধ্যেই এ খেলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর। মাঠের মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া রাখাল বালকগণ মাঠের কিনারায় আসিয়া ছোট ছোট ঝোপের ধারে একটি গাছ বাছিয়া লয় এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত খেলিতে আরম্ভ করে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যখন ডগা ডাল হইতে ডালে যাইতে থাকে, তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই মনোরম।

৮। ৯। ১০। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস্, বেডমিনটন্।

এতৎসম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক, ফুটবল প্রায় সকল গ্রামেই আছে। ক্রিকেটও প্রায় তদ্রূপ, তবে কিছু ব্যয়সাধ্য বলিয়া এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। টেনিস্ ও অনেক গ্রামে আরম্ভ হইয়াছে। বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণপারস্থিত গ্রামগুলি ক্রিকেট খেলার জন্য অতি প্রসিদ্ধ। মালখানগর, তেঘরিয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেক খেলোয়াড় বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১১। কুমীর-কুমীর।

অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা এই খেলায় খুব অনুরক্ত। একজন কুমীর হয়, আর সকলে মানুষ হয়। কুমীর উঠানরূপ নদীতে ভাসিয়া বেড়ায়। মানুষেরা উঠানের চারিদিকের ঘরে আশ্রয় লয়। কুমীর যখন তাহার খাদ্যের জন্য বা তাহার বাচ্চাগুলির তল্লাসে আশেপাশে ঘুরিতে থাকে, তখন মানুষেরা সুযোগ পাইয়া নদীতে স্নান করিতে নামে এবং উৎসাহের সহিত বলিতে থাকে—"এই গাঙ্গে কুমীর নাই ঝাপ্পুর, ঝুপ্পুর"।

কখন কখন বা মানুষেরা এই সুযোগে নদী পার হইয়া পরস্পরের আশ্রয়-স্থান পরিবর্ত্তন করে। কুমীর মানুষের শব্দ পাইয়া পাইয়া, "হাউ মাউ" বলিয়া দৌড়াইয়া আসে। অমনি পালাইবার জন্য তাড়া পড়িয়া যায়। আশ্রয়স্থানে উঠিবার পূর্ব্বে যদি কুমীর কাহাকেও ধরিতে পারে, তবে কুমীর মানুষ হয়, আর সেই ধৃতমানুষটি কুমীর হয়। মানুষ নদীতে স্নান করিতেছে, এই অবসরে যদি কুমীর সেই মানুষের শূন্য ঘর অধিকার করিতে পারে, তবে কুমীর মানুষ হয়, আর যে স্নান করিতে গিয়াছিল, সে কুমীর হইয়া নদীতেই থাকে।

১২। লোন্তা-লোন্তা।

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদের মধ্যেও এই খেলার প্রচলন দেখা যায়। একজন খেলোয়াড় চোর হইয়া একটি কুণ্ডলীর মধ্যে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে। অন্যান্য খেলোয়াড় সকল সে গণ্ডীর বাহিরে থাকে। চোর তখন ডাক (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য) লইয়া বিপক্ষদল ধ্বংসের জন্য বাহির হয়। এক ডাকে বিপক্ষদলের কাহাকেও ছুঁইতে যাইয়া আবার নিজের কুণ্ডলীর মধ্যে ফিরিয়া আসা চাই। গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিবার পূর্ব্বে যদি ডাক ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে

বিপক্ষদল মৌমাছির ঝাঁকের মত তাহাকে ঘিরিয়া তাহার শরীরের সকল স্থানে অসংখ্য কিল মারিতে থাকে। আবার কাহাকেও যদি ছুঁইতে পারে, তবে আর তাহাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহাকে ছুঁইয়াছে, তাহার কপালে আবার পূর্ব্বোক্ত দশা ঘটে, এবং সে তখন চোরের দলে আসিয়া চোরের কার্য্য করে। ডাক লইয়া মাঝে মাঝে তাহাকেও যাইতে হয়। যখন সকল খেলোয়াড়ই চোরের দলভুক্ত হয়, শুধু একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই অবশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উঠে "লোস্তা"! চোরের দল উত্তর দেয়—"এক"। আবার ডাক হয়—"লোস্তা;" আবার তাহার উত্তর হয়—"দুই"। এইরূপে চোরের দলে যতসংখ্যক লোক আছে, তত সংখ্যা পর্য্যন্ত, এইরূপ ডাক ও উত্তর হইতে থাকে। শেষ সংখ্যা হইয়া গেলে, অবশিষ্ট ব্যক্তি দৌড়াইয়া কুণ্ডলীর ভিতর যাইয়া কুণ্ডলী অধিকার করে এবং কুণ্ডলীর ভিতর কাহাকেও পাইলে তাহাকে "কিল" মারিতে থাকে। সকলে বাহির হইয়া গেলে, আবার ফিরিয়া খেলা আরম্ভ হয়।

এই খেলা খেলিতে এবং দেখিতে গ্রাম্য লোকেরা বিশেষ আমোদ পায়। চাষা ও ভদ্র সকল প্রকার লোকের মধ্যেই এই খেলা প্রচলিত।

"লোস্তা" এই নাম কোথা হইতে আসিল বুঝা যায় না।

১৩। ডাণ্ডাগুলি বা দাণ্ডাগুলি।

এই খেলার প্রণালী বর্ণন নিষ্প্রয়োজন ১০। ১২ বৎসর পূর্ব্বে এ খেলার খুব প্রচলন ছিল। এখন রাখাল বালকদের ছাড়া অন্য কাহারও মধ্যে এই খেলার প্রচলন বড় দেখা যায় না।

১৪। ১৫। কড়ি খেলা ও মার্ব্বেল খেলা।

এই খেলা দুটির অনেক রকম শাখা আছে। অধিকাংশ শাখাতেই বাজি রাখিয়া খেলা হয়। বাজির পরিমাণ দুইটি কি তিনটি কড়ি বা মার্ব্বেলের বেশী বড় না হয়। মধ্যে ভদ্র অভদ্র সকল ছেলেরাই এই খেলা খেলিত। এখন ভদ্র লোকের মধ্যে মার্ব্বেল খেলার একটি শাখা ছাড়া অন্য কোন রূপ এই জাতীয় খেলা প্রচলিত নাই।

১৬। বাইগন টিপ্ টিপ্—(বাইগন-বেগুন)

খেলোয়াড়দের মাঝে একজন চোর হয়। অবশিষ্ট কয়জন বৃত্তাকারে মাটিতে বসিয়া থাকে। চোর একখানা কাপড়ের টুকরা দিয়া একটা পুঁটুলির মত করে। ধরিবার জন্য কাপড়ের একটা ধার আল্‌গা থাকে। ইহাই চোরের বেগুন, চোর ইহা নিয়া অন্যান্য খেলোয়াড়দের পিছনে পিছনে ঘুরে। এবং মাঝে মাঝে কোন কোন খেলোয়াড়ের পিছনে পুটুলিটাকে যেন রাখিয়া দিল, এরূপ ভান করে বা প্রকৃতই রাখিয়া দেয়। কোন খেলোয়াড় যদি পিছনের দিকে তাকাইয়া বা হাত দিয়া পুটলি না পায়, এবং যদি তাহার পিছনের দিকে তাকান বা হাত বাড়ান চোর দেখিতে পায়, তবে চোর আসিয়া তাহার "বাইগুন" দিয়া উক্ত খেলোয়াড়ের পিঠে খুব মারিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত উক্ত খেলোয়াড় উঠিয়া গিয়া চোরের

গন্তব্যদিক্ অনুসরণ করিয়া বৃত্তাকারে সমস্ত খেলোয়াড়ের পিছন ঘুরিয়া নিজের জায়গায় না বসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে চোরের আঘাত সহ্য করে।

আবার যাহার পিছনে রাখা গিয়াছে, সে যদি টের না পায়, (চোর ঘুরিয়া তাহার পিছনে পুনরায় আসিবার মধ্যে), তবে তাহাকে উক্তরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। যার পিছনে রাখা হইয়াছে, সে যদি টের পাইয়া চোরের বাইগুন হস্তগত করিতে পারে, তবে সে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী চোরকে মারিতে থাকে, এবং সে সময় হইতে সে "চোর" বলিয়া গণ্য হয়।

এ খেলার প্রচলন আজ কাল বড় নাই। দুই এক গ্রামে কদাচিৎ বৃদ্ধদের প্ররোচনায় ছোট ছোট ছেলেরা ইহা খেলে। বৃদ্ধেরা তাহাদের ছেলে বেলার প্রিয় খেলার পুনরভিনয় দেখিয়া অতীত জীবনের অনুভূত সুখ, এই বৃদ্ধ বয়সে আংশিক উপভোগ করে।

এ খেলায় চোর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ চোরই এ খেলার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে।

১৭। মাছ-মাছ।

একজন "মাছ" হয়, অপর সকলে তাহা ঘিরিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, এবং পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া মাছের চারিদিকে একটা বেড়ার মত প্রস্তুত করে। "মাছ" তখন নিজের পায়ের কব্জীর কাছে হাত রাখিয়া বলে—

"এতটুকুন জল এতটুকুন পানি।"

বেষ্টনকারীরা অমনি চীৎকার করিয়া উঠে—

"জাকৈর জানি।"

মাছ ক্রমে ক্রমে তাহার হাত উপরের দিকে রাখিতে থাকে, এবং প্রত্যেকবারে উক্তরূপ কথা বলে ও উত্তর পায়। যখন মাথা পর্য্যন্ত জলের পরিমাণ হইয়া যায় তখন মাছ বলে—

"এ দুয়ারটি কা'ড়্‌বো।" অমনি উত্তর দেয়—"হাত ছুড়ে' মারবো॥"

মাছ ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি দুইজন খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়া যাইতে চায়। খেলোয়াড়গণ "হাত ছুড়ে" মারিবার ভয় দেখায়। মাছ একবার সুবিধা বুঝিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। যদি কখনও কৌশলে বা জোরে মাছ পালাইতে পারে, তবে সে কুণ্ডলী হইতে বাহির হইয়াই দৌড়াইতে থাকে। অন্যান্য খেলোয়াড়গণও তখন তাহার পিছনে পিছনে দৌড়ায়। যে দৌড়াইয়া সকলের পূর্ব্বে "মাছ"-কে ছুঁইতে পারে, সে তখন "মাছ" বলিয়া গণ্য হয়, এবং পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপে খেলা আরম্ভ হয়।

শেষোক্ত ছড়াটির ভিতর বিক্রমপুরের পল্লীভাষার স্থলে রাজধানীর ভাষা স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

১৮। নলডুবানী।

দল বাঁধিয়া যখন স্নান করা হয়, তখন এই খেলাতে খুব আমোদ পাওয়া যায়। স্নানার্থি-দের একজন "নল" হয়। সে অন্যান্য স্নানার্থিদের নিকট হইতে প্রথমতঃ কতকটা দূরে থাকে।

তখন উভয়দলের সম্মতিক্রমে খেলা আরম্ভ হয়। "নল"কে ছোঁওয়াই এই খেলার সর্ব্বপ্রধান কাজ। "নল" ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চায়। আর অন্যান্য খেলোয়াড়গণ চারিদিক্ হইতে তাহাকে ছুঁইতে আসে। যে "নল"কে সর্ব্বপ্রথম তাহার মাথায় ছুঁইতে পারে, সে তখন হইতে নল বলিয়া গণ্য হয়। এবং তখন আবার সকলে তাহাকে ছুঁইবার চেষ্টা করে।

খেলা শেষ হইলে যাহারা জিতিয়াছে তাহারা বিপক্ষকে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া অনেক সময় উত্যক্ত ও অপমানিত করে :—

"হাইর' গেল কুত্তি
নাক ভইরা মুতি।
নাকে হইল ঘাও
পেইয়া পুইছা খাও॥"

খ—বস্‌তি খেলা।

১। তাস, পাশা, সতরঞ্চ।

এই খেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। যেখানে বাঙ্গালী আছে সেখানেই এই সব খেলার প্রচলন আছে। বয়সনির্ব্বিশেষে প্রায় সকলই খেলাগুলির অনুরক্ত।

২। ষোল গুটি মঙ্গলপাটা।

প্রণালী—এই খেলায় দুইজন খেলোয়াড় দুই পক্ষে বসে। পাশে অঙ্কিত একটি কোট
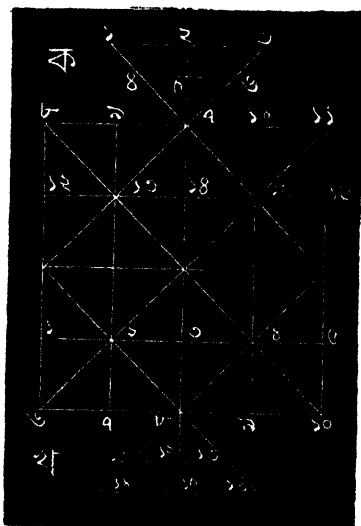
আঁকিয়া কোটের দুইধারে সংখ্যাদ্বারা দুই-প্রত্যেক ঘরে এক একটি গুটি রাখা হয়। প্রত্যেক পক্ষে ষোলটি গুটি থাকে। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে একটা গুটি নেওয়ার নাম চাল দেওয়া। প্রত্যেকটি চাল একটি সরল রেখা অনুসরণ করিয়া দিতে হয়। যেমন অঙ্কিত কোটের "ক" চিহ্নিত অংশটির মধ্যে, ৬এর ঘর হইতে, ৩, ৫, ৭এর ঘরে চাল দেওয়া যায়। ৬ হইতে ২তে একবারে চাল দেওয়া যায় না। ৬ হইতে ২এ যাইতে হইলে প্রথমে ৫ বা ৩এ যাইতে হইবে।

পরস্পর গুটিগুলিকে "খাওয়া" অর্থাৎ খেলোয়াড়দের পরস্পরের লক্ষ্য থাকে। যার গুটিগুলি আগে "খাওয়া" যায় তারই একবাজি হার হয়। একটা গুটিকে ডিঙ্গাইয়া

যাওয়ার নাম "খাওয়া"। "ক" চিহ্নিত অংশে ৫এর ঘরে যে গুটি থাকে, তাহাকে "খাইতে" হইলে, ২এর ঘর হইতে ৭এর ঘরে এবং ৬এর ঘর হইতে ৪এর ঘরে বা তাহার বিপরীত ভাবে খাইতে হয়।

পথ পরিষ্কার থাকিলে একবার দুই তিনটা বা ততোধিক গুটি খাওয়া যাইতে পারে। যেমন "ক" চিহ্নিত অংশে ৮এর ঘরে আমার একটি গুটি আছে, আর ৯, ৬, এবং ২এর ঘরে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের এক একটি গুটি আছে। ৭এর ঘরে এবং ৩এর ঘরে এবং একের ঘরে কোন গুটি নাই। এ অবস্থায় আমি একেবারে আমার ৮এর ঘরের গুটি ৭এর ঘরে, তথা হইতে ৩এর ঘরে এবং তথা হইতে ১এর ঘরে গিয়া বিপক্ষ ব্যক্তির ৯, ৬ এবং ২এর ঘরের গুটি "খাইতে" পারি।

বলা বাহুল্য যে প্রভেদ করিবার জন্য দুই পক্ষে দুই রকম গুটি থাকে এবং একজন উপর্য্যুপরি দুইবার চাল দিতে পারে না।

নাম—এই খেলার নাম "মোগলপাঠান" শব্দ হইতে উৎপন্ন। অনেক জায়গাতে "মঙ্গলপাটা" না বলিয়া "মোগলপাঠান"ই বলে। বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মোগলপাঠানের যুদ্ধকাহিনী পল্লীগ্রামেও সুবিদিত ছিল। সেই যুদ্ধেরই স্মরণার্থ বোধ হয় এই খেলার সৃষ্টি। নাম হইতেই বুঝা যায় যে এই খেলা বিশেষ পুরাতন নয়। মোগলপাঠানদের যুদ্ধের পরই এই খেলার সৃষ্টি বা প্রচলন আরম্ভ হয়।

প্রচলন—মেয়েদের মধ্যেই এই খেলার বিশেষ প্রচলন। বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই এই খেলা এখনও প্রচলিত আছে।

৩। ২৪ গুটি বাঘ চাল।

প্রণালী—উপরে অঙ্কিত কোটের অনুরূপ একটি কোট আঁকিয়া, ১, ২, ৩, ৪, চিহ্নিত ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে ছয়টি করিয়া গুটি বসাইতে হয় এবং ক ও খ অথবা গ ও ঘ চিহ্নিত
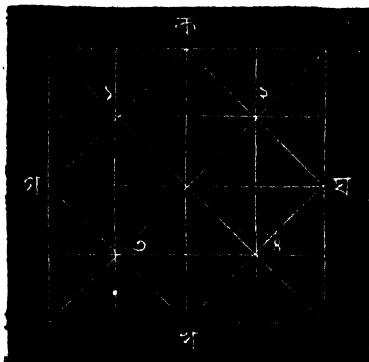
ঘরে এক একটি বাঘ বসাইতে হয়। একজন বাঘচালায়, অন্যজন গুটি চালায়। গুটি-চালক ব্যক্তির উদ্দেশ্য বাঘকে বন্দী করা। বাঘচালক ব্যক্তির উদ্দেশ্য গুটিগুলি খাইয়া ফেলা, যেন বাঘদুটিকে বন্দী করিতে না পারে। এই খেলাতে চাল দেওয়া ও গুটি খাওয়ার নিয়ম "মোগলপাঠান" খেলার মতন। কোটটীও প্রায় তদনুরূপ। গুটি-গুলিকে যখন বাঘের চারিদিকে এরূপ-ভাবে সাজান হয় যে বাঘের আর চাল হইতে পারে না, তখনই বাঘবন্দী হইল।

বাঘবন্দী করিতে পারিলে গুটিচালকের একবাজি জিত হইল, আর গুটিগুলিকে খাইতে পারিলে বাঘ একবাজি জিত হইল।

নাম—খেলার উপকরণগুলি দ্বারা নাম হইয়াছে। যেহেতু এ খেলায় ২৪টি গুটি ও দুটি "বাঘ" নেওয়া হয়। অনেক জায়গায় অধুনা এই খেলার নাম "বাঘবন্দী" হইয়াছে। এই নামটি পশ্চিমবঙ্গ হইতে ধার করা।

প্রচলন—বিক্রমপুরে সকল গ্রামেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই খেলার প্রচলন আছে, কিন্তু দিন দিন তাহা কমিয়া আসিতেছে।

৪। ৩ গুটি বাঘ চাল।

প্রণালী—পার্শ্বে অঙ্কিত কোটে "ক" বা 'খ" চিহ্নিত ধারে ১, ২, ৩ চিহ্নিত ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া গুটি বসাইতে হয়, আর বিপরীত ধারে (অর্থাৎ "ক" চিহ্নিত

ধারে গুটি বসাইলে "খ" চিহ্নিত ধারে এবং "খ" চিহ্নিত ধারে গুটি বসাইলে "ক" চিহ্নিত ধারে) ৩এর ঘরে একটি বাঘ বসাইতে হয়। বাঘকে বন্দী করাই ও গুটি খাওয়াই বাঘচালকের লক্ষ্য। এই খেলায় চাল দিবার ও গুটি খাওয়ার নিয়ম পূর্ব্বোক্ত "বাঘবন্দী" খেলারই মতন। এই খেলাতে গুটির সংখ্যা মোটে তিনটি থাকাতে একটি গুটি খাইতে পারিলেই বাঘ চালকের একবাজি জিত হয়।

নাম ও প্রচলন—এই খেলারও নাম খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত "বাঘবন্দী" খেলার মত ইহার প্রচলন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এ খেলাতে বড় আমোদ পায়, কারণ এই খেলা একটু সহজ।

৫। দশপঁচিশ।

এই খেলার কোঠ ঠিক পাশা খেলার কোঠের মত। এক এক দলে যত সংখ্যক ইচ্ছা গুটি থাকিতে পারে এবং প্রত্যেক দলে সমান সংখ্যক লোক চাই। পাশার পরিবর্ত্তে এই খেলাতে সাতটি কড়ি চালা হয়। এই খেলা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিদ্যমান; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদের সব খেলায় আমোদ বেশী। বর্ষীয়সী বৃদ্ধা হইতে বালিকা পর্য্যন্ত এই খেলায় অনুরক্ত।

৬। ১২ গুটি পাইট পাইট।

প্রণালী—প্রত্যেকে ১২টি গুটি লইয়া দুইজনে এই খেলা খেলিতে বসে। পার্শ্বে অঙ্কিত কোঠে তীরচিহ্নিত ঘর গুলির একটিতে প্রথমে একজন একটি গুটি বসায়। তারপর অন্য জন আর একটি গুটি অন্য একটি ঘরে বসায়। এইরূপ এক জনের পরে অন্য জন গুটি বসাইতে থাকে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক সারিতে ক্রমান্বয়ে তিনটি করিয়া গুটি বসান। যাঁর

কাহারও তিনটি গুটি ক্রমান্বয়ে (১, ২, ৩ এর ঘরে বা ১, ৩, ৭ এর ঘরে বা ৪, ৫, ৬ এর
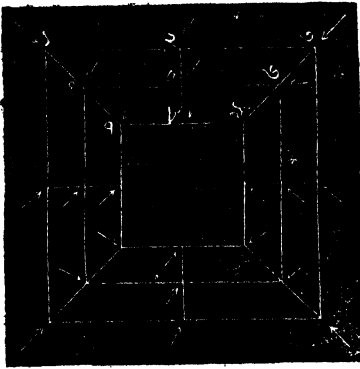
ঘরে বা ২, ৫, ৮ এর ঘরে ইত্যাদি রূপে) বসিতে পারে, তবে তাহার এক পাইট হইল। এক একটি বার পাইট হইলে বিপক্ষ ব্যক্তির সাজান গুটি হইতে ইচ্ছামত যে কোন একটি গুটি উঠাইয়া নেওয়া হয়। কাজেই যাহার অধিক সংখ্যক পাইট হয়, খেলা শেষে তাহারই জিত হয়। কারণ যত সংখ্যক পাইট হইবে, বিপক্ষ ব্যক্তির ততসংখ্যক গুটি কমিয়া যাইবে, এবং শেষে তাহার আর পাইট করিবার কোন সুযোগই থাকে না। প্রথমতঃ হাতের ১২টি গুটি একটি একটি করিয়া বসাইতে হয়। হাতের গুটি বসান শেষ হইলে, সাজান গুটিগুলিকে চালে দিতে হয়। গুটি বসাইবার সময় এবং গুটি চা'ল দিবার সময় দুইটি বিষয়েই খুব লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোথায় বিপক্ষ ব্যক্তির পাইট হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার পাইট নষ্ট করা। দ্বিতীয় কথা, কোথায় গুটি বসাইলে বিপক্ষ ব্যক্তি সহজে নিজের পাইট নষ্ট করিতে না পারে।

নাম ও প্রচলন—"পাইট করা" কথায় বিক্রমপুর অঞ্চলে "সুবিন্যস্ত করা" বুঝায়। যেমন "চুল পাইট করা"। এই খেলাতে প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকে, ক্রমান্বয়ে তিনটি গুটি সারি দিয়া বসান, অর্থাৎ সুবিন্যস্ত করা। আর এই খেলায় প্রত্যেকদলে ১২টি গুটি থাকে। এই জন্যই এই খেলার নাম ১২ গুটি পাইট পাইট। স্ত্রীলোকদের মধ্যেই এই খেলার প্রচলন ছিল। এখন কাল মহিমায় ইহার প্রচলন কমিয়া আসিতেছে।

৭। ৩ গুটি পাইট পাইট।
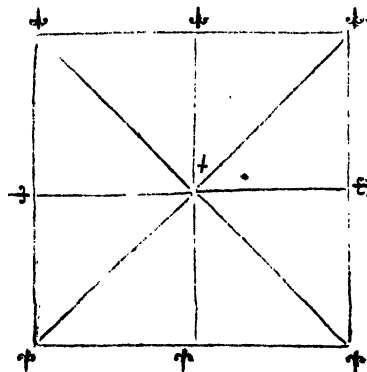
এই খেলার প্রণালী ১২ গুটি পাইট পাইট খেলারই মত। তবে এই খেলায় ১২ গুটির

পরিবর্ত্তে ৩ গুটি নিয়া খেলিতে হয়। খেলার নামও তদনুযায়ী হইয়াছে। প্রচলন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

৮। জোড়-বেজোড়।

কতকগুলি গুটি (কড়ি বা তেঁতুল বিচি বা অন্য কোন রকম) এক একজনে লইয়া দুই জনে খেলিতে থাকে। কাপড়ের আঁচল দিয়া গুটি গুলি লুকাইয়া রাখা হয়। তারপর তাহা হইতে কতগুলি গুটি নিয়া মুষ্টির ভিতর লুকাইয়া বিপক্ষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে—"জোড় না বেজোড় ?" বিপক্ষ ব্যক্তি "জোড়," "বেজোড়," ও "ফাকা" এতিনটির একটা উত্তর দেয়। "ফাকা" শব্দ দ্বারা এই বুঝায় যে তাহার হাত খালি, গুটি মাত্রও নাই। যদি উত্তর ঠিক হয়, তবে মুষ্টিতে যতগুলি গুটি ছিল, তাহা সবই সে পায়। উত্তর ঠিক না হইলে, যতগুলি গুটি হাতে ছিল, ততগুলি গুটি আবার প্রথম ব্যক্তিকে দণ্ড স্বরূপ দিতে হয়। "ফাকা" যেবার থাকে, সেবারে আদান প্রদান মোটে একটি গুটি।

৯। বুদ্ধিমন্ত।

প্রথমতঃ একজন রাজা নির্ব্বাচিত হয়। তারপর খেলোয়াড়গণ সমান সংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত হয়। রাজা দুই দলের মধ্যে বসে। দল দুটি রাজার নিকট হইতে এতটা দূরে বসে যে, রাজার কাণে অন্য কেহ আস্তে আস্তে কথা বলিলে যেন কোনও দলের কেহ শুনিতে না পায়। প্রথমতঃ একদল হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তির নাম রাজার কাণে বলিয়া যায়। তারপরে বিপক্ষদল হইতে একজন আসিয়া আবার পূর্ব্বোক্তদলের এক ব্যক্তির নাম রাজার কাণে বলিয়া যায়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে এক এক দলের এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার বিপক্ষদলস্থ কোন ব্যক্তির নাম রাজার কাছে বলিয়া যাইতে থাকে।

বিপক্ষ খেলোয়াড় যাহার নাম যে বারে বলে, সে বারে যদি সেই ব্যক্তি নিজ পক্ষের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য রাজার কাছে উপস্থিত হয়, তবে সেই শেষোক্ত ব্যক্তি "মড়া" বলিয়া গণ্য হয়। ক খ এর বিপক্ষে খেলিতেছে। ক আসিয়া খ এর নাম বলিয়া গেল, ঠিক তার পরেই যদি বিপরীত পক্ষ হইতে খ নাম বলিতে আসে, তবে খ মড়া বলিয়া গণ্য হইবে। "মড়া" খেলোয়াড় রাজার কাছে বসিয়া থাকিবে, এবং সে অবস্থায় সে পরামর্শ ইত্যাদি দ্বারা নিজ পক্ষের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে না।

যদি কখনও 'মড়া" খেলোয়াড়ের বিপক্ষদলের লোক মরে, তবে "মড়া" বাঁচিয়া উঠে। খ "মড়া," এখন যদি কএর দলস্থ কোন ব্যক্তি মরে, তবে খ বাঁচিবে এবং পুনরায় নিজ দলে গিয়া খেলিবে।

এক দলের সমস্ত খেলোয়াড় যদি মরিয়া যায়, তবে বিপক্ষ দলের এক বাজি "জিত" হয়। একদলের সমস্ত খেলোয়াড় মরিয়া গিয়াছে—শুধু এক জন—মনে করুন ক বাঁচিয়া আছে। এখন বিপক্ষদল হইতে যে আসিবে, সে ক এর ডান হাত কি বা-হাতের নাম করিয়া যাইবে।

রাজা ক-কে হাত উঠাইতে বলিবে। ক যদি বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উল্লিখিত হাত উঠায়, তবে ক-এর হাত "মড়া"। এইরূপে পা, চোখ, কাণ প্রভৃতিকেও খেলার অঙ্গীভূত করিয়া খেলাকে বাড়ান যায়। ইহাতে একটি সুবিধা এই যে, যে দলের একজন খেলোয়াড় মাত্র বাঁচিয়া আছে, সে দলকে তাহার নিজেদের দলবৃদ্ধি করিবার জন্য, কয়েকবার অবসর দেওয়া হয়।

হাত, পা, চোক, কাণ প্রভৃতির কোন্ কোন্টিকে খেলার অঙ্গীভূত করা হইবে, তাহা খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে রাজা ঠিক করিয়া দেয়।

নাম—এই খেলাতে বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই ইহার নাম "বুদ্ধিমন্ত" হইয়াছে। এই খেলায় অনুমানশক্তির বিশেষ প্রয়োজন।

এই খেলা আজ কালও মাঝে মাঝে খেলা হয়। বৃষ্টির সময় ঘরে বসিয়া এ খেলা খেলিতে বিশেষ আমোদ পাওয়া যায়।

১০। ফাকা ফাক্কা বা টাইলো টুয়নি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই খেলাতে বেশ আমোদ পায়। একজন হাত উপুড় করিয়া রাখে। অন্য একজন এক হাত দিয়া সে হাতকে "চিম্টি দিয়া" ধরে, আর একজন আবার তার হাত ঐরূপ "চিম্টি কাটিয়া" ধরে। এ রকম করিয়া সকল খেলোয়াড়ের সকল হাত দিয়া একটী শিকলের মত গড়া হয়। তারপর সে শিকলকে সকলে মিলিয়া উপরে নীচে উঠাইতে ও নামাইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি বলিতে থাকে—

টাইলো টুয়নি খইল্সা মাছের বুয়নি
মামায় দিল খইল্সাটা সে'রে নিল চিলে,
চিলের লাগুর পাইলাম না ফাক্কা ভাইঙ্গা যা।

যেই ছড়াটি বলা শেষ হয়, অমনি সকলে যার যার হাত সরাইয়া নিয়া শিকলটি ভাঙ্গিয়া ফেলে।

১১। ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি।

যাহার তত্ত্বাবধানে শিশু থাকে সে চিৎ হইয়া শুইয়া হাটু ভাঙ্গিয়া পা দুটি সঙ্কুচিত করে। তারপর শিশুকে পায়ের পাতার উপর বসাইয়া, উপর ও নীচের দিকে দোলাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ছড়াটি বলে—

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি দাওখান দে
দাও খান কেন্? পাত খান্ কাটতে,
পাত খান্ কেন্? বৌ ভাত খাইব
বৌ কই? জলেরে গেছে

সিংহনাদ লোকেশ্বর

জল কই ?	ডাউগে খাইছে
ডাউগ কই ?	আরা বনে গেছে
আরাবন কই ?	পুইরা গেছে
ছালি মাটি কই ?	ধোপ্পায় নিছে
ধোপ্পা কই ?	হাটে গেছে
হাটে কেন ?	সুইচ সুতা কিন্‌তে
সুইচ সুতা কেন্?	ঝুলিকাথা শিলাইতে
ঝুলি কাথা কেন্ ?	টাকা কড়ি থুইতে
টাকা করি কেন্ ?	দাসী নফর কিন্‌তে
দাসী নফর কেন্ ?	আমার নমুরে হাগাইতে মুতাইতে

তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে।
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে ॥

তারপর শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়—

সোণার ডাইলে পরবা
না গুয়ের ডাইলে পরবা ?

কখনও বা শিশুর উত্তর নিয়া কখনও বা শিশুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, শিশুকে একবার বাঁ-ধারে, একবার ডান ধারে হেলাইয়া বলা হয়—

পর্ পর্ পর্ সোণার ডাইলে পর্।
পর্ পর্ পর্ গুয়ের ডাইলে পর্ ॥

তারপর এক "ডাইলে" শিশুকে ফেলাইয়া দিয়া সরিয়া গিয়া বলা হয় "ছুঁইস্ না ছুঁইস্ না"। শিশু তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত।

সিংহনাদ লোকেশ্বর।

অপর পৃষ্ঠায় যে মূর্ত্তিটী মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার নাম সিংহনাদ লোকেশ্বর। ইনি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটী উপাস্য দেবতা। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা এই কথাটী বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে ইনি উক্ত সম্প্রদায়ের কিরূপ প্রাচীন দেবতা ? কেন না দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাক্যমুনির প্রচারিত ধর্ম্মে দেবতার উপাসনা নাই। আকিবার কথাও নহে,

যেহেতু তিনি যখন তাঁহার সুখাবাসে থাকিয়া জরা-মৃত্যু-ব্যাধিরূপ জীবের দশাবিপর্য্যয় দেখিয়া তাঁহার স্বাভাবিক চিন্তাশীল প্রাণে ভাবিতে থাকেন এ সংসারে এসব হয় কেন? এই যে জীব আজ বাঁচিয়া থাকিয়া আনন্দ করিতেছে, আনন্দ দিতেছে সে আবার কাল মরিয়া যায় কেন? কেন এই সুন্দর সুঠাম যুবদেহ বার্দ্ধক্যে বিরূপ হয়? আজ সুস্থদেহে হাসিতেছি, কাল আবার কেন রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি? এসব কি? এ দুঃখময় জরা-মৃত্যু ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি উপায় নাই? সে মহাপ্রাণে যেমন এই চিন্তা অমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ ও তপস্যাকরণ। তপস্যা অবশ্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কাহাকে না কাহাকে প্রসন্ন করিয়া ইহার উপায় নির্দ্ধারণ মানসেই হইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না, তখন তাহার চৈতন্য হইলে তিনি ভাবিলেন, এ তপস্যা বৃথা, জীবের এ দশাবিপর্য্যয়ের এমন অপর কেহ নির্দ্দিষ্ট বিধাতা নাই, যিনি তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ইহার হাত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। ইহার বিধাতা জীব নিজে। জীব যদি আপনাকে আপনি প্রসন্ন করিতে পারে, তবেই তাহার আত্মা "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" বলিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতে পারে। আর কাহারও সাধ্য নাই এই এক "আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" ছাড়া আর কাহারও কেহ শত্রুমিত্র নাই। সুতরাং আত্মনৈর্ম্মল্যেই উদ্ধার, আত্মার উপাসনাই উপাসনা। এই প্রাচীন বিলুপ্তজ্ঞান লাভ করিয়াই গৌতম বুদ্ধ। তাঁহার ধর্ম্মে আর কিছুরই কথা নাই—মূল কথা আত্মার উপাসনা। আত্মাকে বড় কর—নির্ম্মল কর, নির্ব্বাণ লাভ হইবে, জন্মিতে হইবে না, জরামৃত্যুব্যাধির তাড়না সহ্য করিতে হইবে না।

তাই বলিতেছি, শাক্যমুনির প্রচারিত ধর্ম্মে দেবতার উপাসনা নাই, থাকিবার কথাও নহে। তবে এই সিংহনাদ আসিলেন কোথা হইতে?

সিংহনাদ আসিলেন কোথা হইতে বলিতেছি।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বুদ্ধের প্রতিভাময় প্রচারের ফলে যখন সেই প্রাচীন বিলুপ্ত জ্ঞানময় ধর্ম্ম রাত্র্যবসানে পুনরুদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ছড়াইয়া ছিল, তখন নৈশাকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় দেশের দেবতামণ্ডলীও বিলীন হইয়া পড়িয়াছিল। সকল জ্যোতিষ্ক হইতে প্রধান জ্যোতিষ্ক যেমন সূর্য্য—তেমনি সকল দেবতা অপেক্ষা প্রধান দেবতা হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধজ্যোতিঃ ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্ম্ম।

আত্মোন্নতি-শিক্ষাই তখন একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়াছিল। সে উপাস্য দেবতার যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার আবার সম্ভ্রমের সীমা ছিল না। তাহার পর সময়ের বলে যখন বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন অচিরাস্তমিত সূর্য্যের দেহপ্রভার ন্যায় তাঁহার সেই ধর্ম্মপ্রভা সংসারকে কিয়ৎকাল সমুজ্জ্বলই রাখিয়াছিল। তাঁহার নির্ব্বাণলাভের তিনশত বৎসর পরেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার সম্প্রদায়ে দেবতা, তাঁহার ত্রিরত্ন, তাঁহার দেহাবশেষ, তাঁহার বোধিবৃক্ষ, তাঁহার চরণচিহ্ন ও উষ্ণীষ। অন্য দেবতা নাই। এমন কি তাঁহারও মূর্ত্তি তখনও

গঠিত হইয়া পূজিত হইত না। তিনি লোকহৃদয়ে তখনও এত জাগ্রত যে তাঁহার মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের আবশ্যক হয় নাই।

তাহার পর হইতেই ক্রমেই অন্ধকারের প্রসার। তাঁহাকে ভাবিয়া আনিতে আর না পারিয়া তাঁহার মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইল। তাঁহার ত্রিরত্ন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তিও উপাস্যরূপে পরিণত হইল। এইরূপে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে সাকারোপাসনার সুরু হইল।

তাহার পর সার্দ্ধপঞ্চশত বৎসর অতীত হইয়া গেলে এত আঁধার যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বুদ্ধের খাঁটি মত লইয়া দুইটা দল হইয়া গেল। একটা দলের নাম মহাযান ও অপরটির নাম হীনযান। নাগার্জ্জুন নামক একজন প্রধান বৌদ্ধ মহাযানের অন্যতম প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা।

এই মহাযানে ত্রিরত্ন, দেহাবশেষ, চরণচিহ্ন, উষ্ণীষ ও বুদ্ধ ছাড়া আবার অনন্ত দেব দেবী আশ্রয় পাইল।

ক্রমে এই সম্প্রদায়ই এ দেশে প্রবল হইল, অপর সম্প্রদায় এ দেশ হইতে তাড়িত হইয়া সিংহল, শ্যাম, যব ও ব্রহ্মে যাইয়া আশ্রয় লইল। দূরে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সব জায়গায় উহা খাঁটি রহিল না, মহাযানের দেব দেবী কিছু কিছু ঢুকিয়া গেল। তাই যবদ্বীপেও কোথায় না কোথায় তারামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

এত প্রবল বলিয়াই নাগার্জ্জুন প্রতিষ্ঠিত পথটী মহাযান অর্থাৎ প্রশস্ত পথ, অপরটী অপ্রবল বলিয়া হীনযান কিনা অপ্রশস্ত পথ।

মহাযানে বুদ্ধ ব্যতীত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়—ধ্যানিবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও তারা। ধ্যানিবুদ্ধ পাঁচটী যথা—বিরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি। বোধিসত্ত্ব অনেক, তাহার মধ্যে সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি এই পাঁচটী প্রধান। ইহা ছাড়া সিংহনাদ লোকেশ্বর, খসর্পণ লোকেশ্বর, গণপতি, চণ্ডমহারোষণ, ত্রৈলোক্যশঙ্কর, মঞ্জুশ্রী, ত্রৈলোক্যবিজয়, জম্ভল, মহাকাল, ধর্ম্মধাতু-বাগীশ্বর, মঞ্জুকুমার, মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুনাথ, মঞ্জুবজ্র প্রভৃতি নানারকম বোধিসত্ত্ব আছেন।

আমার প্রবন্ধের উপজীব্য এই সিংহনাদ লোকেশ্বরও সেই নানাবিধ বোধিসত্ত্বের অন্তর্গত একজন বোধিসত্ত্ব ও মহাযান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা, সুতরাং ইনি ঠিক কত প্রাচীন বলা যাইতে না পারিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে ইনি অন্ততঃ দেড়হাজার বৎসরেরও কিছু উপর হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

ইনি রোগ-নিবারণের দেবতা। ভক্তগণ তাঁহাদিগের ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য ইহার পূজা করিয়া থাকেন, এ কথা আমরা ইহার ধ্যানে দেখিতে পাই। ইহার ধ্যান যথা—

"ত্রিভুজৈকমুখং শুক্লং ত্রিনেত্রং সিংহবাহনম্।
সিংহনাদমহং বন্দে সর্ব্বব্যাধিহরং গুরুম্॥"

ইহাকে চিনিতে হইলে সিংহনাদসাধন নামক পুস্তকে ইহার যেরূপ রূপের বর্ণনা আছে, তাহা মিলাইয়া লইতে হয়। ইহার রূপবর্ণনা যথা—

"সর্ব্বাঙ্গশুক্লং, দ্বিভুজৈকমুখং ত্রিনেত্রং জটামুকুটধরং অমিতাভালঙ্কৃতশীর্ষং মহারাজলীলয়াবস্থিতং সিংহাসনং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং স্ফুরৎপঞ্চতথাগতং অর্দ্ধচন্দ্রালঙ্কৃতং বামহস্তস্থিতং শুক্লপদ্মোপরি সিতখড়্গং তৎসমীপস্থিতং শুক্লপদ্মোপরি নানাসুগন্ধিকুসুমপরিপূর্ণশুক্লকরোটকং; দক্ষিণে সিতপদ্মোপরি সিতফণিবেষ্টিতাস্ত্রিশূলদণ্ডং।"

এই ইঁহার রূপ, কিন্তু এরূপ বর্ণনার সহিত আমাদের এ সিংহনাদের তিনটী বিষয়ে অমিল রহিয়াছে, প্রথমতঃ ইহাঁর শীর্ষদেশে অমিতাভের মূর্ত্তি নাই, তৎপরিবর্ত্তে একটি চৈত্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইনি স্ফুরৎপঞ্চতথাগত নহেন অর্থাৎ বিরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটী ধ্যানিবুদ্ধের মূর্ত্তিদ্বারা ইনি বেষ্টিত নহেন। তয়তঃ অর্দ্ধচন্দ্রালঙ্কৃতও নহেন। ইহার কপালে কোথায়ও চন্দ্রকলা আছে বলিয়া মনে হয় না।

এ বৈষম্যসত্ত্বেও ইনি সিংহনাদ লোকেশ্বরই বটেন। কেননা অপরাপর সমস্ত লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান আছে। এরূপ বৈষম্যের কারণ স্থানভেদে সাধনের বিভিন্নতা। আমি যে সাধন অনুসারে ইহার রূপবর্ণনা পাইয়াছি, ইনি যে প্রদেশের যে সময়ের মূর্ত্তি সে প্রদেশে সে সময়ে ইহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ তারতম্য হয়তো বিদ্যমান ছিল, তাই এমন হইয়াছে। মদুল্লিখিত সিংহনাদ-রূপবর্ণনকারী সাধনপুস্তক নেপাল দেশীয়। এই সিংহনাদ মূর্ত্তিটী বুদ্ধগয়ার। এরূপ স্থলে দেশান্তরপ্রসিদ্ধ রূপের সহিত অপর দেশস্থ রূপের কিছু তারতম্য হওয়া বিচিত্র নহে। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে হয়তো কখন এ প্রদেশে কোনরূপ সাধনপুস্তক আবিষ্কৃত হইয়া এ বৈষম্যের মীমাংসাও করিয়া দিতে পারে বা একেবারে আজিকার আমার মত খণ্ডনও করিয়া দিতে পারে অর্থাৎ তদনুসারে ইহা সিংহনাদ না হইয়া অন্য মূর্ত্তিও হইতে পারে। উপস্থিত যতদিন সে সময় না হয়, ততদিন ইহাকে সিংহনাদই বলা যাউক।

এ মূর্ত্তিটী বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত ও ইং ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসে আর্কিওলজিকল-সর্ভে-অব্-ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক মিউজিউমে প্রদত্ত। ইহার পাদপীঠের গাত্রে ৪টী অক্ষর খোদিত আছে। অক্ষর কয়টী খুব প্রাচীন কালের না হইলেও নির্দ্ধারিতরূপে পড়া যায় না। তবে অক্ষরের আকার দেখিয়া এ মূর্ত্তিটীকে ৮০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ের বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতার মিউজিউমে এ জাতীয় মূর্ত্তি এই একটি আছে। আর ডাক্তার ফুসে সাহেব তাঁহার ভারতীয় বৌদ্ধমূর্ত্তিতত্ত্ব নামক পুস্তকে এ জাতীয় একটী মূর্ত্তির ছবি দিয়াছেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

সন্ধি

দুই শব্দের সান্নিধ্যহেতু তাহাদের সম্মিলনে যে কোন কোন স্থলে উচ্চারণ ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার নাম সন্ধি। "তুমি ইহা দেখিয়া আসিবে" এই বাক্যটী যখন কথায় বলা যায়, তখন প্রণিধান পূর্ব্বক শুনিলে বুঝিতে পারি যে, "দেখিয়া আসিবে" কেহ বলে না; দেখিয়া শব্দের আকারটীকে একটুকু দীর্ঘোচ্চারণ করিয়া "দেখিয়াসিবে" বলে। "বসিয়া আছি" এই বাক্যটী লেখাতে যে প্রকার, কথায় বলিতে সেই প্রকার হয় না; কথায় বলিতে "বস্যাছি" বলে। এই প্রকার যে যে বর্ণে যোগ হইতে পারে, তাহারা যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়, একটী একটি করিয়া স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না, দুই বর্ণের একটীর উচ্চারণ খর্ব্ব করিয়া তাহাকে অপরটির সহিত মিলাইয়া একটী যুক্ত-বর্ণ করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু লিখিতে ঐ প্রকার লেখা হয় না, লেখাতে শব্দগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াই লেখা হয়। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই এই প্রকার কথায় সন্ধি হয়, কিন্তু লেখাতে হয় না। কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই লেখাতে সন্ধি করিয়া লেখা হয়। কোন্ কোন্ অক্ষরে মিলাইয়া কি প্রকার উচ্চারণ করিতে হইবেক, তাহা কেবল সংস্কৃতে ভিন্ন অন্য ভাষাতে নিয়মবদ্ধ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে সংস্কৃত লেখাতে সন্ধি হয় কেন? সংস্কৃত ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার ব্যাকরণে যদি সন্ধির নিয়ম বা বিধান নাই, তবে কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার বিধি-বিধান লইয়া এত আড়ম্বর কেন?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংস্কৃত পদ্যসঙ্গীতের ভাষা এবং তাহার ব্যাকরণও পদ্যসঙ্গীতের ব্যাকরণ। পদ্যরচনায় অক্ষর গণিয়া ছন্দোবন্ধন করিতে হয়, তাহাতে যুক্তোচ্চারিত বর্ণদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিলে লেখাতে ছন্দোমিলন হয় না। "বসিয়া আছি" ইহাতে পাঁচটী শব্দাংশ বা স্বর, আর "বস্যাছি" ইহাতে তিনটী শব্দাংশ মাত্র। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিলে ছন্দোমিলনের বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য পদ্য লেখাতে সন্ধি করিয়া লেখা প্রয়োজন।

ব্যাকরণে সন্ধির নিয়ম প্রকটিত করিবার আর এক কারণ এই যে, কথা বলিতে সন্ধি করিয়া কথা বলা যদিও সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক, তথাপি দুই জনে বা দুই সম্প্রদায়ে অথবা দুই প্রদেশে এক প্রকার সন্ধি নাও করিতে পারে। নিয়ম মাত্রেই বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা সন্ধির নিয়ম জানি, কিন্তু তাহার বিজ্ঞান কি? উৎকৃষ+তম=উৎকৃষ্টম হয় কেন? ইহার মূল এই যে, সন্ধিতে স্বভাবতঃ এক বর্ণ অন্যবর্ণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে। মূর্দ্ধণ্য (ষ) মূর্দ্ধা হইতে উৎপন্ন, আর (ত) দন্ত হইতে উৎপন্ন, এই দুইবর্ণের সন্ধি করিতে হইতে উহারা একে অন্যকে নিকটে আকর্ষণ করিবে। তাহাতে হয় উহারা উভয়ে মূর্দ্ধাতে না হয় দন্তে যাইয়া উচ্চারিত হইবে। এস্থলে "ষ"কে প্রাবল্য প্রদান করায় তাহার আকর্ষণে "ত" মূর্দ্ধাতে যাইয়া "ট" হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায় বা প্রদেশে "ষ"কে প্রাবল্য না দিয়া "ত" কে প্রবল করিত, তবে তাহার আকর্ষণে যকার মূর্দ্ধা

হইতে দন্তে সরিয়া আসিয়া দন্ত্যসকারে পরিণত হইত, এবং উক্ত শব্দের রূপ উৎকৃন্তম হইত ; অতএব কেহ উৎকৃষ্টম, কেহ উৎকৃন্তম না লেখে এবং না বলে এই জন্য ব্যাকরণে তাহার নিয়ম প্রকটিত হওয়া প্রয়োজন।

আবার কাল বিশেষে লোকের স্বভাব, শক্তি ও রুচির পরিবর্ত্তন হয়। ভাস্বান্+চন্দ্র= ভাস্বাংশ্চন্দ্র ; ইহার মধ্যে একটী শ আগম হইল, তাহার কারণ বা উদ্দেশ্য কি ? ন+চ সন্ধি করিলে স্বাভাবিক নিয়মে চ কারের প্রাবল্য হেতু তাহার আকর্ষণে দন্ত্য ন তাহার স্বস্থান দন্তকে ত্যাগ করিয়া তালুতে যাইয়া (ঞ) রূপ প্রাপ্ত হইতে পারে এবং তাহাতে ভাস্বান্+চন্দ্রঃ=ভাস্বাঞ্চন্দ্রঃ হইতে পারে, কিন্তু তাহা না করিয়া ভাস্বাংশ্চন্দ্র বলিবার কারণ কি ? কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে যুক্তশব্দগুলিকে স্থলবিশেষে এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য প্রদান করার নিয়ম ছিল এবং সেই নিয়মই এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। তখন আর্য্যগণ যে অতিশয় বলশালী ছিলেন, তাহা তাঁহাদের ভাষা দ্বারাই জানা যায় এবং এখন যে আমরা একবারে শক্তিহীন হইয়াছি, তাহার পরিচয় আমাদের বর্ত্তমান উচ্চারণ। (ভাস্বান্+চন্দ্রঃ)কে ভাস্বাংশ্চন্দ্র বলা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। যে স্বয়ং শৌর্য্যবান্, তাহার ভাষাও ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যবতী হইবেই।

"ভাস্বাঞ্চন্দ্রঃ" বলিলে শব্দটি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নিরতিশয় ক্ষীণপ্রাণ হইয়া পড়িত, সেই জন্যই "শ" যোগ করিয়া উহাকে শক্তিশালী করা হইয়াছিল। আমরা যে এখন এত ক্ষীণজীবী তথাপি আমরাও অনেক স্থলে শব্দবিশেষকে বর্ণযোগ দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়া লই ; যেমন সংস্কৃত যত্র, তত্র, অত্র—স্থলে কথিত ভাষায় যথা, তথা, এথা বলে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ঐ এথা শব্দটীকে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে হ যোগ করিয়া হেথা বলে। যদ্, তদ্, শব্দের বাঙ্গালাতে দ লুপ্ত হইয়া যা, তা, থাকে, কিন্তু তাহাদিগকেই আবার লিখিবার সময় যাহা, তাহা, লেখা হয়। কারণ সাহিত্যে যা, তা, প্রভৃতি শব্দকে নিতান্ত শক্তিহীন বোধ হয়। সংস্কৃত নবতি শব্দের ত লোপ পাইয়া বাঙ্গালাতে নবই থাকে, কিন্তু তাহাকে আমরা ক্ষীণপ্রাণ জ্ঞান করিয়া আর একটী ব যোগ পূর্ব্বক নব্বই বলিয়া থাকি ; দুর্গা শব্দেও আমরা আর একটী গ যোগ করিয়া দুগ্‌র্গা উচ্চারণ করিয়া থাকি, দুর্‌গা বলি না। সংস্কৃতে স্থাপন ও অধ্যাপন শব্দের "প" যোগ ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ; সরল নিয়মানুসারে ঐ দুই শব্দ স্থায়ন এবং অধ্যায়ন হইত, কিন্তু তাহাতে "প" যোগ করিয়া ঐ দুই শব্দের বল বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

এই প্রকার অক্ষর যোগ করিয়া কোন কোন স্থলে শব্দের গৌরব বৃদ্ধি করা অস্বাভাবিক নহে, এবং সেই স্বভাবের বশেই ভাস্বান্+চন্দ্র=ভাস্বাংশ্চন্দ্রঃ হইয়াছিল। কিন্তু দেশকাল পরিবর্ত্তনে এক্ষণে আর আমাদের সেই প্রকার শরীর ও প্রকৃতি নাই, সুতরাং এই প্রকার দুরূহ সন্ধি এখন আর আমরা ব্যাকরণ না পড়িয়া বুঝিতে পারি না। এই কারণে যদি ব্যাকরণে সন্ধির নিয়ম প্রকটিত না থাকিত, তবে আমরা এখন "ভাস্বাঞ্চন্দ্রঃ"ই বলিতাম। ভাস্বাংশ্চন্দ্র

বলিতাম না এবং বুঝিতাম না। দেশ-কাল-পাত্রবিশেষে সন্ধির এই প্রকার গোলযোগ না ঘটিতে পারে, তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাহার নিয়ম প্রকটিত হইয়াছে। তাহা না হইলে এখন সংস্কৃত ভাষা অবোধ্য হইয়া পড়িত। এখন আমরা উক্ত কারণে সন্ধিবৃত্তি না পড়িয়া উৎকট সন্ধি ভঞ্জন করিতে পারি না, আর সহজ সন্ধিগুলিও উচ্চারণ দোষে আমাদের অবোধ্য হয়। "দ্বি"কে "দুই"র ন্যায় উচ্চারণ না করিয়া "দ্দি" উচ্চারণ করিয়া থাকি।

সংস্কৃতে সন্ধিবিধানের প্রথম প্রয়োজন দুই তিন শব্দ মিলাইয়া একটী নূতন শব্দ গঠন করা। যথা—সং+দর্শন=সন্দর্শন, রৌ+অন=রাবণ, উপরি+উপরি=উপর্য্যুপরি। দ্বিতীয় প্রয়োজন, সন্নিহিত দুই শব্দকে মিলাইয়া একত্রোচ্চারণ করিয়া সঙ্গীত ও পদ্যের সুশ্রাব্যতা বিধান করা। যেমন—"প্রপরাপসমম্ববনির্দুরভিঃ" এখানে দুই শব্দ মিলাইয়া কোন একটী নূতন শব্দ গঠন করা হয় নাই, কেবল প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব প্রভৃতি উপসর্গগুলিকে তোটকচ্ছন্দে পদ্যাকারে বলিতে ছন্দোঽনুরোধে ঐ প্রকার সন্ধি করিতে হয়।

পদ্যে সন্ধির ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা না করিলে দোষ হয়। গদ্য ভাষা কতক পদ্যের এবং কতক কথিত ভাষার প্রকৃতি লইয়া গঠিত হয়, সেই কারণে পদ্যের ন্যায় গদ্যেও সন্ধির ব্যবহার হয় এবং কখন বা নাও হইতে পারে। যেমন "বাল্যাবধি শাস্ত্রানুশীলনং কৃত্বা অপরিসীমজ্ঞানোপার্জ্জনং চকার"। এস্থলে অপরিসীম এবং চকার শব্দদ্বয়কে তাহাদের পূর্ব্বশব্দের সহিত সন্ধি না করায় ক্ষতি হয় নাই। পাঠ করিতে যদিও সন্ধি করিয়া উচ্চারণ করি, তথাপি লেখাতে সন্ধি করিয়া লেখা নিষ্প্রয়োজন। পদ্যে যেমন লেখাতে সন্ধি করা সর্ব্বস্থলেই আবশ্যক এবং তাহা না করিলে ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয়, গদ্যে সেই প্রকার নহে। গদ্য লেখাতে কখন পদ্যের অনুকরণে সন্ধি করা হয় এবং কখন বা করা হয় না। আর কথিত ভাষা লিখিত করিলে, সেই লেখাতে যদি সন্ধি করা যায় তবে ভাষা অবোধ্য হইয়া পড়ে। এইজন্য তাহাতে সন্ধির ব্যবহার করা অবিহিত। যেমন "করা অবিহিত" এই বাক্যকে সন্ধি করিয়া "করাবিহিত" লেখা যায় না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান এই যে, সন্নিহিত দুই শব্দে যদি সন্ধি হইতে পারে তবে সন্ধি করিতেই হইবেক তাহা না করিলে ব্যাকরণ দোষ ঘটে। বোধ হয়, এই শাসন কেবল পদ্য সঙ্গীতের জন্য। এই শাসন দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, সন্ধির নিয়ম সর্ব্বস্থলে ছিল না, থাকিলে ব্যাকরণে এই নিয়ম প্রকটিত হইত না। সাধারণ লোকে যে কথা বলে তাহাতে দুই সন্নিহিত বর্ণের সন্ধি হইয়া উচ্চারণ হয় সত্য, কিন্তু তাহা সর্ব্বস্থলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে হওয়া পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে অসম্ভব। এবং সেই প্রকার বলিতে গেলে তাহা অবোধ্য হয়। "রাম এখানে নাই, শ্যাম আছে" এই বাক্যকে "রামৈখানে নাই শ্যামাছে" অথবা "আমরা অন্ধকারে এখন দেখিতে পাই না"। এই বাক্যকে—"আমরান্ধকারৈখন দেখিতে পাই না।" এইরূপ করিয়া সন্ধি করা হয় না। সংস্কৃত যে কেবল পদ্য-সঙ্গীতের ভাষা এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ

যে কেবল পদ্যসঙ্গীতের ব্যাকরণ, ইহা একাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশ থাকাতে আমাদের কথিত ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষাকে পদে পদে বিভিন্ন দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমান কথিত ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালাতে সাহিত্য রচনা করিলে তাহা স্বভাবতঃ আমাদের মূল সাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে বিরচিত হইবে, সুতরাং স্থলবিশেষে তাহাতে সন্ধির নিয়ম সেই প্রকারই ব্যবহৃত হইবে; যেমন "আমরা মোহ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি" এই বাক্যে মোহ এবং অন্ধকার এই দুইটী শব্দ যেমন বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয়, তেমনি সংস্কৃতেও হয়; এইজন্য তাহাদের সন্ধি করা প্রয়োজন। এখানে লিখিতে হয় "আমরা মোহান্ধকারে নিমজ্জিত আছি"। সন্ধি না করিয়া মোহ অন্ধকারে লিখিলে ভাষা নিতান্ত নিস্তেজ ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু "নিমজ্জিত আছি" এই শব্দদ্বয় মধ্যে সন্ধি করা যায় না, কারণ নিমজ্জিত এবং আছি, এই দুই শব্দ মধ্যে আছি শব্দ তাহার সংস্কৃত (অস্মি) রূপ হারাইয়া কথিতাকার ধারণ করিয়াছে ও আমরা পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি যে, কথিত ভাষাকে লিখিত করিলে তাহাতে সন্ধি করা অবিহিত।

উল্লিখিত কারণে বাঙ্গালা গদ্যে দুইটী শব্দের সংস্কৃতাকারে সন্ধি হইতে পারে, কিন্তু দুই প্রাকৃতাকার প্রাপ্ত শব্দে কিম্বা একটী সংস্কৃতাকারবিশিষ্ট শব্দের সহিত একটী প্রাকৃতাকার-বিশিষ্ট শব্দের সন্ধি করা প্রায় হয় না। আমাদের মূলসাহিত্য সংস্কৃত এবং কথিত ভাষা বাঙ্গালা। সেই বাঙ্গালাতে যখন গ্রন্থাদি প্রণীত হইতে লাগিল, তখন তাহা আমাদের মূল সাহিত্যের অধীন আর একটী নিম্নতর সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইল। এই কারণে বাঙ্গালা সাহিত্যে সন্ধির নিয়ম কতক প্রচলিত আছে এবং তাহা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা কেবল সংস্কৃত শব্দে, প্রাকৃত শব্দে নহে। কারণ প্রাকৃত অর্থ সংস্কৃতের কথিতাকার, আর পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, কথিত ভাষা লিখিত করিলে তাহাতে সন্ধির ব্যবহার করা হয় না, এবং করিলে ভাষা অবোধ্য হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে "তৎ আদর্শ" স্থলে "তদাদর্শ" লিখিতে হয় কিন্তু "তার আদর্শ" স্থলে "তারাদর্শ" লিখিতে পারি না, কারণ "আদর্শ" সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ শব্দ; কিন্তু "তার" তস্য শব্দের প্রাকৃত রূপ, সুতরাং কথিতাকার বিধায় তাহার সন্ধি হইতে পারিল না।

সংস্কৃতে কথা বলিতে হইলে পণ্ডিতগণ বৃহৎ বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করেন এবং মহাংস্তরুঃ,ক্ষিপং সুৎকারম্ প্রভৃতির ন্যায় সন্ধির সমারোহ করিতে থাকেন; সুতরাং অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না এবং না পারিলেই বিদেশীয়গণ বলেন, তোমরা সংস্কৃত বুঝিতে পার না, সুতরাং উহা তোমাদের ভাষা নহে, উহা স্বতন্ত্র ভাষা। আমরা বলি ইংরেজী সুইট্‌মিট্ শব্দটীকে সন্ধি করিলে "স্বিস্মিট্" হয়, কিন্তু তাহা বলিলে কি কোন ইংরেজ বুঝিতে পারিবেন?

"দি সিজন্নী চিপেষ্টার্টিকেল ল্লাক্সুর্য্যোভারেনভেণ্টেড্" এই বাক্যটী কি ভাষা এবং ইহার অর্থ কি তাহা কে বুঝিতে পারে? সন্ধির নিয়ম যে শিক্ষা করিয়াছে সেই অতি কষ্টে ইহাকে বিশ্লেষ করিয়া কোনও প্রকারে বুঝিতে পারে, অশিক্ষিতের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এক্ষণে সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া দেখুন "দিস্ ইজ্ দি অনলী চিপেষ্ট্ আর্টিকেল অভ্ লাক্ষুরী এভার

ইন্‌ভেণ্টেড্‌।” This is the only cheapest article of luxury ever invented. এখন সকলেই ইহা অতি সহজে বুঝিতেছেন। উল্লিখিত সন্ধিযুক্ত বাক্য সহজবোধ্য নয় বলিয়া কি উহাকে এবং বিযুক্ত উক্ত বাক্যটীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে হইবে। সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালায় প্রভেদ এইরূপ।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

হস্তালিঙ্গন

অধুনা আমাদের এই ভারতভূমে স্বদেশী ভাবের স্রোতঃ চলিয়াছে, এই স্রোতের মুখে পড়িয়া অনেক বৈদেশিক ভাব চালচলন রীতিনীতি ভাসিয়া যাইতেছে। এরূপ সময়ে যদি কোন আচারব্যবহার আমাদের মধ্যে বৈদেশিক বলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইবারই কথা। কিন্তু যদি কোন উত্তম আচারব্যবহারকে আমরা বৈদেশিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাহা যদি পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সেই আচারব্যবহারকে আমরা বৈদেশিক রীতি বলিয়া পরিত্যাগ করিব কি না? আমি সেকহ্যাণ্ডের (Shakehand) কথা বলিতেছি, ইহা দ্বারা আত্মীয়তা ও বন্ধুতার বর্দ্ধন হয়। ইহা কি বৈদেশিকেরা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে? আর্য্যশাস্ত্রে কি উহা প্রচলিত থাকার প্রমাণ নাই? আমি বলি আছে, এবং উহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পাণিগ্রহণ, পাণিপীড়ন, করস্পর্শন, করতলদান, হস্তালিঙ্গন যাহাকে বলে, প্রাচীন ভারতে তাহা প্রচলিত ছিল। ঐগুলি সেকহ্যাণ্ডেরই অনুরূপ—ইন্দ্র একবার এক ঋষির দক্ষিণ-পাণিগ্রহণ করেন এবং ঋষিও সখ্যভাবে ইন্দ্রের পাণি স্বীয় পাণি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন—

নৈগেয়ার্ষ দৈবতবেদাঙ্গে—

“তথেত্যুক্ত্বা চ তুরাসাট্‌ পাণৌ জগ্রাহ দক্ষিণে।
ঋষিশ্চাস্ত সখিত্বেন পাণিনা পাণিমস্পৃশৎ॥”

রাম, সখিভাবে সুগ্রীবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে—

“রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্ম্মর্য্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবম্‌॥
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্‌।
সংপ্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা॥”

বলরাম, পাণ্ডবদের পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি আগমন করিলে যুধিষ্ঠির স্বীয় কর দ্বারা তাহার কর স্পর্শ করিয়াছিলেন।

উদ্যোগপর্ব্ব ১৫৬ অধ্যায়ে—

"পূজয়াঞ্চক্রিরে তে বৈ সমায়াস্তং হলায়ুধম্।
ততস্তং পাণ্ডবো রাজা করে পস্পর্শ পাণিনা ॥"

কোন আনন্দজনক ব্যাপার উপস্থিত হইলে পরস্পরকে করতল প্রদান করিবার রীতি ছিল। বনপর্ব্ব ২৩৭ অধ্যায়ে—

"ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব্বে তেহন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ।"

শাম্ব ও কালযবন, বন্ধুভাবে হস্তালিঙ্গন করিয়া ও কুশলাময় জিজ্ঞাসা করিয়া সিংহাসনে সুখে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

"হস্তালিঙ্গনকং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলাময়ম্।
সুখোপবিষ্টৌ সহিতৌ শুভে সিংহাসনে নৃপৌ ॥"

আর এক প্রকার করগ্রহণ আছে, যাহা লড়াইএর পূর্ব্বে করিতে হয়। জরাসন্ধ ও ভীম যুদ্ধের প্রাক্কালে করগ্রহণ ও পাদবন্দন করেন যথা—

"করগ্রহণপূর্ব্বন্তু কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ॥"

কুস্তির পালোয়ানগণ কুস্তির প্রারম্ভে আজিও করগ্রহণ করেন। দেখা গেল পুরুষে পুরুষে সকলেই বন্ধুভাবে পরস্পরের পাণিগ্রহণ করিতেন, কিন্তু বিবাহ ভিন্ন স্থলে বান্ধব যে বান্ধবীর পাণিগ্রহণ করেন, এরূপ দৃশ্য প্রাচীন ভারতে দেখা যায় না। বিবেচনা হয়, বান্ধবী, যদি বান্ধবকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত না দিয়া বাম হস্ত বাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না, এবং বৈদেশিক আচারব্যবহারেরও অনুকরণ করা হয় না।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
”	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীশ্রীনাথ সিংহ শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া তালুকা, নদীয়া।
”	”	শ্রীআজিজ্জ রহমান ১২ রইড ষ্ট্রীট্।

৫। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ অর্পণ করা হইল—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—(১) চৈতন্যবিলাস, (২) ক্ষতি কি, (৩) Army Regulations, India, Vol. 1 pt ii.

(৪) বঙ্গীয় কবি—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (৫) বেতিক—শ্রীকৃষ্ণদাদ বসাক

(৬) ব্রতকথা—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (৭) মুদ্রা—শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

৬। (ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "বাঙ্গলায় আদি গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের "দময়ন্তীর চৌতিশা" পাঠ করিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত—"বেলুচিস্তানের ভূতত্ত্ব" পাঠ করিলেন।

(এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

(ঘ) শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত 'বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ সুবিস্তৃত ভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

৭। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিনোদেশ্বর বাবুকে ধন্যবাদ অর্পণ করেন ও বলেন যে, এই প্রবন্ধ ছাত্রসভ্যদিগকে উৎসাহিত করিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। খেলা প্রভৃতির বিবরণ উপেক্ষার জিনিষ নহে, এই সমস্ত লিপিবদ্ধ করা উচিত। এই সমস্ত বিবরণ জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ। ছুটীতে ছাত্রগণ অনেক কথা সংগ্রহ করিতে পারেন এবং এই জন্য ছাত্রসভ্যদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন যে বিনোদেশ্বর বাবু যেরূপ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেইরূপ প্রবন্ধে জাতীয় আমোদের দিক্ হইতেও উপকারিতা আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের খেলার বর্ণনা চিত্রসহ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে অনেক খেলা লোপ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে হেমবাবু শঙ্কিতভাবে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ করার কোন কারণ ছিল না। এই সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের জন্য। বিনোদেশ্বর বাবু তাঁহার প্রবন্ধে মার্জ্জিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা উচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেন যে বিনোদেশ্বর বাবুর প্রবন্ধে বেশ শৃঙ্খলা আছে। তাঁহার রচিত আসল প্রবন্ধটী পঠিত প্রবন্ধ হইতে অনেক বড়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে জীবেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে

ধন্যবাদ। এই চৌতিশাখানিতে সাহিত্যের হিসাবে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই কেবল একটি নূতন কবিতা ও নূতন কবির নাম পাওয়া গেল, এই মাত্র। নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ, ইহা পরিষদের প্রকাশিত শূন্যপুরাণের ভূমিকারূপে লিখিত। শূন্যপুরাণে এমন অনেক শব্দ আছে যাহার অর্থ করা দুঃসাধ্য। জুগীদের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ আচার ব্যবহার এখনও অনেক বর্ত্তমান আছে। জুগীশ্রেণীদ্বারা এ বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে। নাথ সন্ন্যাসিগণ দ্বারা শূন্যপুরাণের অর্থোদ্ঘাটনে অনেক সহায়তা হইতে পারে। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দেশীয় খেলার বিস্তৃত বিবরণ আরও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে শূন্যপুরাণ বাঙ্গালা ভাষার আদি গ্রন্থ। ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যমান ছিল ইহা নূতন ও গৌরবজনক সংবাদ। লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

৮। নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হয়—

(১) ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

(২) ৺নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

(৩) ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪) ৺মৌলবী মেহেরুল্লা।

৯। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখকদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করেন।

১০। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
কার্য্যবিবরণী

—o—

১৩১৪ বঙ্গাব্দ

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—কলেজস্কোয়ার ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হল।

সময়—২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন, শনিবার, অপরাহ্ণ—৫৷৹টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়
„ আনন্দমোহন সাহা
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
„ মন্মথমোহন বসু } সহঃ সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
„ শ্রীরামকমল সিংহ
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী।

অদ্য অতিরিক্ত দুর্য্যোগবশতঃ শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল এইজন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সম্মতিক্রমে অদ্যকার সভা স্থগিত রহিল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, ১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌।

সময়—৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন, শনিবার অপরাহ্ণ ৪৷৹টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌,এ,
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌,এ, বি,এল,

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম,এ,
মন্মথমোহন বসু বি,এ,
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ ফুলচাঁদ মোষা বি,এ, এল, এল্, বি,
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিএল,
„ দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ
„ আশুতোষ দাস গুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অতিরিক্ত বর্ষায় মুনি মহারাজ আসিতে না পারায় এবং শ্রোতৃবর্গের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প হওয়াতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মতিক্রমে অদ্যকার সভা স্থগিত রহিল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সভাপতি

প্রথম মাসিক স্থগিত অধিবেশন।

স্থান—ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ হল।

সময়—১লা আষাঢ় ১৫ জুন রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল্ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ অনাথকৃষ্ণ দেব
„ পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ,বি,এল
„ দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্,
„ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ,
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্,এ, বি,এল্,
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এ,
„ মন্মথমোহন বসু } সহঃ সম্পাদক।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণসংগ্রহ" ৫। প্রদর্শন—উল্লিখিত প্রবন্ধসংক্রান্ত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি। ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য-নির্ব্বাচিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক	১। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি, এল্ ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্
		২। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল ৫২ চাউলপটী রোড।
		৩। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল ৫৭ বকুলবাগান রোড।
		৪। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি, এল উকীল, হাইকোর্ট।
		৫। অতুল্যচরণ বসু বি,এল ঐ
		৬। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস এম্এ, বি এল, ঐ
		৭। শ্রীবারাণসী বাসী মুখোপাধ্যায় এম,এ বি,এল উকীল হাইকোর্ট
		৮। শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার এম্এ বিএল্ ঐ
		৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এমএ বিএল ঐ
		১০। শ্রীভুজগেন্দ্রনাথ মুস্তফী বি এল্ ঐ
		১১। শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ বি এল ঐ
		১২। শ্রীচারুচন্দ্র দে এম্ এ বি এল্ ঐ
		১৩। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি এল ঐ
		১৪। শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ বি এল ঐ
		১৫। শ্রীদাশরথি সান্যাল বি এল ঐ
		১৬। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ বি এল, ঐ
		১৭। শ্রীধীরেন্দ্রলাল কাস্তগির বি এল ঐ
		১৮। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বি এল, ঐ
		১৯। শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল বি এল, ঐ
		২০। শ্রীহরকুমার মিত্র বি এল, ঐ
		২১। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ বি এল, ঐ
		২২। শ্রীহরিমোহন চক্রবর্ত্তী বি এল ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক	২৩। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল, উকীল হাইকোর্ট
		২৪। শ্রীহীরালাল সান্ন্যাল এম এ, বি এল, ঐ
		২৫। শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায় বি, এল, ঐ
		২৬। শ্রীযদুনাথ মণ্ডল বি, এল, ঐ
		২৭। শ্রীজগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ
		২৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল, ঐ
		২৯। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, ঐ
		৩০। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এল, ঐ
		৩১। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ
		৩২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শ্রীমানী বি এল, ঐ
		৩৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র দে বি এল, ঐ
		৩৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি,এল, ঐ
		৩৫। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি এল, ঐ
		৩৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল, ঐ
		৩৭। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ঐ
		৩৮। শ্রীজগদ্বল্লভ বসাক এমএ, বি এল, ঐ
		৩৯। শ্রীকরুণাময় বসু এম এ, বি এল, ঐ
		৪০। শ্রীমুকুন্দলাল কুণ্ডু বি,এল, ঐ
		৪১। শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, ঐ
		৪২। শ্রীললিতমোহন ঘোষ এম এ বি এল, ঐ
		৪৩। শ্রীশালেমোহন দাস এম এ, বি এল, ঐ
		৪৪। শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, ঐ
		৪৫। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বি, এল, ঐ
		৪৬। শ্রীমনোমোহন ঘোষ এম এ, বি এল, ঐ
		৪৭। শ্রীমুকুন্দনাথ রায় বি এল, ঐ
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন	৪৮। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি এল, ৬ চোরবাগান
		৪৯। শ্রীবিশ্বেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, দেওয়ান, গৌরীপুর।
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ		৫০। শ্রীযুগলকিশোর দাস ১ নেপাল ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৫১।	শ্রীহীরালাল দাঁড়া ১।১ চাকুলিয়া রোড।
		৫২।	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ৫ মহেন্দ্রনগর লেন।
		৫৩।	শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, ৩ শম্ভুচন্দ্র চাটুয্যের ষ্ট্রীট্।
		৫৪।	শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বি.এ. ১৬ টালাবাগান লেন
		৫৫।	শ্রীবিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫।১১ আশুতোষ দেবের লেন।
		৫৬।	শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত ১৩ মদনবড়ালের লেন,
		৫৭।	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার, ১২ বাজার লেন,
		৫৮।	শ্রীকুলদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, কুমারখালী।
শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৯।	শ্রীনলিনকৃষ্ণ সরকার, ১৪ গোয়ালপাড়া লেন।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	"	৬০।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসুমতী অফিস
	"	৬১।	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৩ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় লেন।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	"	৬২।	শ্রীক্ষেত্রনাথ মল্লিক, ২১ ক্যাথিড্রাল মিশন লেন।
শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	"	৬৩।	ডাঃ সরোজিনীনাথ বর্দ্ধন বি,এ,এল;এম্,এস্ কারকো লেন, সিলোন।
শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু	৬৪।	শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে বি, এল, মুন্সেফ, দিনাজপুর।
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	৬৫।	শ্রীকুলচাঁদ মোঘা বি.এ, এল, এল, বি, উত্তরপশ্চিম, সাহারানপুর।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) কলিকাতা গোস্বামিগণের গোরক্ষক। (২) রাখীকঙ্কণ—গঙ্গাচরণ নাগ। (৩) বেদান্তদর্শন—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। (৪) Prospectus of the Chattra Bhandar Limited. (৫) Report—National Council of Education. (1906) (৬) বেণু ও বীণা (৭) Convocation Address by Justice A. T. Mukerji. (৮) Malabikagni Mitra.—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, (৯) নীতিকথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ (১০) সারস্বত-সর্ব্বস্ব—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী (১১) লক্ষণভাষা, (১২ চট্টগ্রামী ভাষা—লক্ষণ মজুমদার, (১৩) লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর আরতিগান—শ্রীললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ,

(১৪) তারকনাথ গ্রন্থাবলী—শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস, (১৫) গীতস্তোত্র—প্রসূন কার্য্যালয়, কাঁটোয়া। (১৬) Journal and Proceedings—Asiatic Society—by Asiatic Society of Bengal. (১৭) A Report of the Calcutta Industrial Exhibition—শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত।

অতঃপর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বঙ্গের পুরাবৃত্তের উপকরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকা ১৪শ ভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন—Ethnology সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানাই নাই। আমরা কেহই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালার স্বদেশী নহি—বিদেশী, তবে বহু পুরাতন স্তরের বিদেশী। আমাদের পরে আরও কত শ্রেণীর লোক আসিয়া এদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন সময়ে আগত বিভিন্ন দলকে জাতিতত্ত্বের এক একটী স্তর বলা যাইতে পারে। এই সকল স্তরের আলোচনা বড় আনন্দদায়ক এবং প্রয়োজনীয়। নগেন্দ্রবাবু যে কুলজী গ্রন্থের আলোচনা করিলেন, উহা ঐরূপ এক স্তরের বিবরণ মাত্র। উহা এত বিস্তৃত যে সমস্ত আলোচনা এক জীবনে কুলায় না। উহার সমস্ত সংগ্রহ আজও করা হয় নাই। সকলে সহায় না হইলে উহা হইবেও না। জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা না হইলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেশাদির প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে ঈশ্বরকৃত যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারও আলোচনা কর্ত্তব্য। নগেন্দ্রবাবু পুরাবৃত্তের উপকরণ-সংগ্রহে যে নূতন পথ দেখাইয়া দিলেন এবং তাহা হইতেও যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া ইতিহাসের ছিন্ন ভিন্ন অংশ সকলের সংযোগ সাধনে সক্ষম হইয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের বহু কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন—

এই কুলজী শাস্ত্রের আলোচনায় বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথের সহিত আমিও বহুকাল হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। কুলজীতে যে কত অপূর্ব্ব-ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে, তাহা সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবার উপযুক্ত সময় আমাদের নাই। বাঙ্গালীর ইতিহাসপ্রিয়তা কত প্রবল ছিল, তাহা এই কুলজীগ্রন্থ হইতে জানা যায়। প্রত্যেক জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়, অধিকন্তু প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির আদান-প্রদানের ইতিহাস তৎসম্পর্কে পরিবারের ও সমাজের মানসম্ভ্রম ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ এবং বিস্তৃত ইতিহাস ইহা হইতে পাওয়া যায়। সামাজিক নীতি ও ব্যবস্থা লঙ্ঘনে সমাজের দণ্ড কিরূপ ছিল, দণ্ডিত ব্যক্তি সমাজে কি ভাবে গৃহীত হইত, তাহার বিপুল ইতিহাস ইহাতে আছে। নগেন্দ্র বাবু কুলজী সংগ্রহে এবং তদবলম্বনে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশে দেশের যে মহৎকার্য্য করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। সম্প্রতি তিনি পুরাবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহে আবার এক নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া-

ছেন। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য একটী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ অবৈতনিক ভাবে এই বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই ইঁহার অনুসন্ধানবলে ময়ূরভঞ্জে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনেক প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। কত তাম্রশাসন, কত প্রাচীন দেবালয়, কত পুরাতন নগরের প্রাচীন অবস্থান এবং কত স্তূপ উৎখাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে মঠমন্দির দুর্গনগরাদির ধ্বংসাবশেষ নগেন্দ্র বাবু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা হইতে বৌদ্ধযুগের তান্ত্রিকযুগের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আর একদিন শুনিতে পাইব। নগেন্দ্র বাবুর এ অনুসন্ধানে আরও কত অপূর্ব্বতথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যখন উড়িষ্যার অধিকার ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ছিল, তখন নানা বাঙ্গালা সাহিত্য এদেশ হইতে উড়িষ্যায় গিয়াছে, তাহা উড়িয়া অক্ষরে লিখিত হইয়া এখনও উড়িষ্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ নানা গ্রন্থ নগেন্দ্র বাবুর হস্তগত হইয়াছে। ইহাদের বিবরণও আমাদের আর এক দিনের ভাল খোরাক হইবে। যাহা হউক, আমার ও নগেন্দ্র বাবুর মত আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা, আপনারা স্ব স্ব গ্রামে এইরূপ কুলজীগ্রন্থ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথিসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন। কেহ আপন শক্তিকে ক্ষুদ্র ও সামান্য বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন না, দেখিবেন আপনাদিগের দ্বারা দেশীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের কত অধিক উপকার হইবে। আমরা এক্ষণে ইতিহাসহীন হইতে বসিয়াছি। কুলজী শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রত্যেকের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইতিহাস-গর্ব্বে গর্ব্বী ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়াছেন, সেই অবধি আমাদের ইতিহাস লেখা বন্ধ হইয়াছে, ঘটককুল উৎসন্ন গিয়া বিবাহের দালাল মাত্র হইয়াছেন। ইংরাজই আমাদের যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে আমরা ইতিহাসের অনাদর করিতেই শিখিয়াছি।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, বলিলেন—কুলজীশাস্ত্র সাধারণের অবিদিত, সুতরাং উহার মধ্যে মূল্যবান্ বস্তু আছে। এরূপ অপ্রকাশিত শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা ইতিহাসের উদ্ধার হইলে বাস্তবিক সুখের কথা হয়। তিব্বতীয়দিগের Ethnology সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হইলে আমি History, Statistics এত পাইয়াছিলাম যে, আমার বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। তিব্বতের ন্যায় অপরিচিত জাতির সহিত অতি অল্প দিনের পরিচয়ে ইংরাজেরা তাহাদের সম্বন্ধে এত অধিক জানিয়া ফেলিয়াছে যে, তত্টা আমরা আমাদের নিজের জাতি সম্বন্ধে জানি না। ইংরাজ ভারতবাসীর শাসনকর্ত্তা—ভারতবাসীর সহিত সামাজিকতায় মিশে না, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আয়নার মত করিয়া রাখিয়াছে—প্রত্যেক ভারতবাসী প্রতিদিন কি দিয়া অন্ন আহার করে, তাহার সংবাদ ইংরাজ প্রতিদিন রাখিয়া থাকে। এই ভাবে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আমরা জানি না।

এ বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য বড় বেশী। আমরা ইংরাজীতে History বলিলে যেরূপ ইতিহাস বুঝি, সেরূপ ইতিহাস আমাদের ছিল না। রাজা বা দেশকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশে ইতিহাস লেখা হইত না। মহাবংশ আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন। মঠের ভিক্ষুরা ইহার লেখক, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার—উদ্দেশ্য, রাজা বা ঘটনার বিবরণ এই উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। রাজতরঙ্গিণী কতকটা ইংরাজী ইতিহাসের ন্যায় গ্রন্থ বটে। চীনের ইতিহাসপ্রিয়তা বড় বেশী; ইতিহাস লেখার উদ্ভাবনা চীনেই প্রথম হয়। ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয় কিরূপে তাহা চীনেরাই জানে, ইংরাজেরা আজিও তাহাদের মত পারেন না। ফাহিয়ান ও হুয়েন্ সাঙের মত ভ্রমণকারী আর হইল না। রাজা স্রংচান গম্পো হইতে তিব্বতের ইতিহাস এখনও লেখা হইতেছে। বাঙ্গালীর এরূপ ইতিহাস ছিল না। তাহার জন্য বাঙ্গালী দোষী নহে। বাঙ্গালার সীমার স্থিরতা ছিল না, সুতরাং বাঙ্গালার রাজারও স্থিরতা ছিল না, কাজেই ইতিহাসের কোন কেন্দ্রই ছিল না। পালবংশের অনেক নাম পাওয়া গিয়াছে—তাম্রশাসনে ভূমিদাতা বলিয়া উল্লেখ পাইলেই যে, রাজা বলিয়া ধরিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পাল রাজার সময়ে রাঢ়, বারেন্দ্র এক ছিল, সেন রাজাদের সময়ে ছিল না। সুতরাং কোন্ শতাব্দীতে বঙ্গ কতটুকু, তাহা নগেন্দ্র বাবু নোট করিয়া দিতে পারেন। বঙ্গদেশ প্রতিভার দেশ, বৌদ্ধপিটকে বঙ্গীয় প্রতিভার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কুলজীগ্রন্থ যাহা পাওয়া যায়, তাহাও খুব প্রাচীন পাওয়া যায় না; যে কোন জাতির বংশ পরিচয় পাওয়া যায়, বড় জোর তাহা ১০০০ বৎসরের প্রাচীন। ৪।৫ শত বৎসরের প্রাচীন জাতির সংখ্যাই অধিক। যাহা হউক নগেন্দ্র বাবু কুলজীশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিলেন, রাজনৈতিক ইতিহাস একটা জাতির স্পর্দ্ধার পরিচায়ক। সেরূপ ইতিহাস আমাদের দেশে অভাব। সামাজিক ইতিহাস ধর্ম্মান্দোলনের উপরেই নির্ভর করে; আমাদের ইতিহাসের লক্ষ্য সেই দিকে। তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের দেশীয় সাহিত্যের সকল গ্রন্থেই কিছু না কিছু পাই, রাজাকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাস লেখা হয় নাই, ইহা আমি লাভ বলিয়াই মনে করি। ইংরাজ বাণিজ্যমুখ, ইংরাজ শিখাইয়াছে—বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি, জাতীয় উন্নতি অবনতির প্রধান ভিত্তি, কিন্তু ভারতবাসীর উন্নতি অবনতির ধারণা অন্যরূপ, তাহারা কি চায়, কি চায় না, তাহা রামায়ণ মহাভারতে আছে। সনাতন সত্য—ওরূপ ইতিহাসের লক্ষ্য নহে। সেই লক্ষ্য ব্যতীত আমাদের আর কিছু ছিল না। যা' ছিল না, তা' এখনও নাই, আর তা' চাই না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—সভাপতির কাজ নীরবে চলে না, নহিলে ইতিহাসে মূর্খ—আমি এ সভার কথা কহিতাম না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের মতে, মহামহোপাধ্যায়ের মতে, ইতিহাসের মূর্ত্তি ভিন্ন। সেন মহাশয় যে সনাতন ধর্ম্মের আদর্শের কথা বলিলেন, তাহাও এক প্রকার ইতিহাসের অবিবার কথা বটে। যাহা হউক নগেন্দ্র বাবু

পরিশ্রম করিয়া যে প্রবন্ধ শুনাইলেন, তাহাতে আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। তিনি প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ। যাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাঁহারাও অনেক নূতনকথা শুনাইলেন—খোরাকটা পাওয়া গেল ভাল। নগেন্দ্র বাবু অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যেরা তাহাতে ব্যঞ্জন দিলেন, আমরা সুখে ভোগ করিলাম, অতএব সকলকেই আমরা ধন্যবাদার্হ জ্ঞান করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সম্পাদক।	সভাপতি।

প্রথম বিশেষ স্থগিত অধিবেশন।

স্থান—জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ—১৯১।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

সময়—৮ আষাঢ়, ২৩ জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩॥০ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীশ্রীশ্রী ১০০৮ মুনি মহারাজ ধর্ম্মবিজয়ী জী—(সভাপতি)।

১। শ্রীশ্রীমুনি ইন্দ্রবিজয়জী
২। " মুনি মঙ্গলবিজয়জী
৩। " মুনি বল্লভবিজয়জী
৪। শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ যোধা বি,এ,এল,এল,বি
৫। " ইন্দ্রজি সুন্দরজি
৬। " মোহনলাল চাঁদ
৭। " লালাধর কালিদাস
৮। " কিসচাঁদ লোধিয়া
৯। " করসন দাস
১০। " মোতিচাঁদ বীরচাঁদ
১১। " মণিলাল বীরচাঁদ
১২। " ব্যাসধিমুলজি
১৩। " তারানাথ রায়চৌধুরী নবশক্তির স্বত্বাধিকারী
১৪। " উপেন্দ্রনাথ দে
১৫। " গিরিন্দ্র কুমার চৌধুরী
১৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ, বি,এল
১৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ
১৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৯। " চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ, বি,এল্
২০। " নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
২১। " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
২২। " নরেন্দ্রনাথ দত্ত
২৩। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
২৪। " জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৫। " মহেন্দ্রনাথ দে এম্, এ, বি, এস্, সি
২৬। " উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
২৭। " আশুতোষ দাস গুপ্ত
২৮। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ,বি,এল,
২৯। " ব্যোমকেশ মুস্তফী—(সহঃ সম্পাদক)
৩০। " রামকমল সিংহ
৩১। " শচীন্দ্রসেবক নন্দী

অতঃপর আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "জৈন ধর্ম্মের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ।

অতঃ পর জৈনগুরু মুনিমহারাজ ধর্ম্মবিজয়জী সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল। সকলের আগ্রহে ও সমর্থনে তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তৎপরে মুনি মহারাজের প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ইন্দ্রবিজয়জী হিন্দীভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—জৈনধর্ম্মের প্রাচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা লইয়া যে তর্ক উঠিয়াছে সে তর্কের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। যাঁহারা বলেন, খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দে জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের মতেও জৈনধর্ম্ম ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন ধর্ম্ম, লেথব্রিজ সাহেব ইহাতে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা আরও পুরাতন কালে প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করেন, কেহ বা বলেন, জৈনধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। চীনপরিব্রাজক হিয়োন সাঙ্ নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে শ্বেতাম্বর সাধুদিগের বর্ণনা এবং দাক্ষিণাত্যে জৈনমন্দিরাদির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফাহিয়ান্ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রাজগৃহবর্ণনে নির্গ্রন্থগণের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অনেকে মহাবীর স্বামীর শিষ্যগণকে নির্গ্রন্থ বলেন, কিন্তু তাহা নহে। পার্শ্বনাথ স্বামী নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, অতএব মহাবীর স্বামী যখন ২৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পার্শ্বনাথ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত নির্গ্রন্থ জৈনসম্প্রদায় যে ২৫০০ বৎসরের পুরাতন হইতেছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তৎপরে ভি, এস্, স্মিথ্ তাঁহার গ্রন্থে মথুরাবর্ণনায় বাসুদেব নামে এক রাজার একখানি শিলালিপি হইতে জৈনদিগের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। মথুরাস্থ কঙ্কালী টিলায় প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরও ১৮০০ বৎসরের প্রাচীন। উক্ত রাজা বাসুদেব, হুবিষ্ক ও কণিষ্ক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং খৃষ্টজন্ম পূর্ব্বে যে জৈনধর্ম্ম ছিল, তাহা এক প্রকার সিদ্ধই হইল। অশোকের শিলালিপিতে শ্রমণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নির্গ্রন্থ ও আজীবক শব্দ দেখা যায়। অশোক ২২০০ বৎসরের প্রাচীন ব্যক্তি। এরূপ স্থলে জৈনমত ২৫০০ বৎসর না হউক ২২০০ বৎসরেরও যে প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পূর্ব্বে জৈন সাহিত্য ও দর্শনের গ্রন্থ অতি দুর্লভ ছিল, সম্প্রতি সে দুর্লভতা আর নাই, কাজেই এ সকল বিষয়ে জৈনগ্রন্থ হইতেও অনেক বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারা যায়। জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায়, দেবচন্দ্র শ্রেষ্ঠী বীর নির্ব্বাণের ২০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মহাবীরের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি একস্থলে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—নির্গ্রন্থ সাধু আসিলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য? তাহার পর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহাবীরের পূর্ব্বেও নির্গ্রন্থ জৈনমত বিদ্যমান ছিল। এইরূপে জৈনমতের প্রাচীনতা বৌদ্ধধর্ম্মের অপেক্ষাও অধিক তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কেহ কেহ মহাবীরের পরিচয় লইয়া গোল করেন, কিন্তু সাধনসম্পন্ন মহাবীর যে কাশ্যপগোত্রীয়, জৈনগ্রন্থে তাহা

স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মহাবীরের পূর্ব্ববর্তী তীর্থঙ্কর সুধর্ম্মা অগ্নিবৈশ্য বৈশম্পায়নগোত্রীয় ছিলেন। নির্গ্রন্থ ও মহাবীরের মতে বিশেষ প্রভেদ নাই। নির্গ্রন্থেরা চারি যাম স্বীকার করেন এবং মহাবীরমতে পাঁচ যাম স্বীকার করা হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রেও চারি যামের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত চারিযামই প্রচলিত ছিল। জৈনমত বৌদ্ধমতের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বলিয়াছি। আবার বেদব্যাস ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব জৈনমত বেদব্যাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। আবার শাট্যায়ন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং যজুর্ব্বেদে ৯।২৫ জৈন নেমিরাজের উল্লেখ আছে অতএব জৈনমত বৈদিক-মতের সমসাময়িক। বেদের অনেক শ্রুতি লোপ হইয়াছে। সায়ণ বলেন অনেক শাখাই লোপ হইয়াছে। পুরাণে যে ঋষভদেবের কথা আছে, সেই ঋষভদেবের মতই জৈনমত—তাহাই মহাবীরের শাস্ত্র।

অতঃপর মুনিমহারাজ হিন্দিতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—জৈনমতের প্রাচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা প্রতিপাদন অত্রকার আলোচ্য নহে। তাহা কাহারও মতামতের উপর নির্ভর করে না। জৈনাচার্য্য হরিসূরি বলিয়াছেন,—জৈন কে? না, যে ব্যক্তির কোন ধর্ম্মমতে পক্ষপাত নাই, সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রে যাহার ঘৃণা নাই, আপন আগম শাস্ত্রে অনুরাগবশতঃ অপরের আগম শাস্ত্রে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া যে ত্যাগ করে না,সেই প্রকৃত জৈন। প্রাচীনতা ও অর্ব্বাচীনতা—পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আমরা জৈন—জৈনেরা একটা অদ্ভুত কিছুই নহে—আমরা গুরু-ধর্ম্ম-দেব এই তিন বস্তুই মানি। জৈনসিদ্ধান্ত অনুসারে ধরিত্রী অনাদি। "কর্ম্মনা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মে জন্তুঃ বিলীয়তে।" কর্ম্মই কর্ম্মের ফলদাতা—কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর আমরা মানি না। তিনি কর্ম্মের অতীত, অতএব জীবের কর্ম্মফলের সঙ্গে তাঁহার সংস্রব থাকিবে কিরূপে? পঞ্চ কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না। অঙ্গুলি হেলনাদিও নহে, অতএব ঈশ্বর কর্ম্মসংবদ্ধ নহেন। তিনি সকল মঙ্গলাময়। সর্ব্ববিধ মঙ্গলই তিনি বিধান করেন। কর্ম্মফলস্বরূপ পাতকজাত অমঙ্গল তিনি কেন প্রেরণ করিবেন? ক্রোধ-মান-মায়া-রাগ-দ্বেষহীন, মোক্ষসুখবিলাসী ব্যক্তিই জৈনমতে গুরু হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। গুরুর উপদেশে সন্দেহ হইতে পারে না, সন্দেহে ঝগড়ার কল্যাণ হয় না। গুরুর দৃষ্টান্তই উপদেশের পূর্ণফল প্রদান করে। ইঙ্গিতে সর্ব্বদেশে সর্ব্বভাবই বুঝে, ভাষায় বুঝে না। গুরুর সদ্দৃষ্টান্তই ইঙ্গিত, উপদেশ ভাষা মাত্র। ধর্ম্মদুর্গতি পথবর্ত্তী, জন্তুকে যাহা রক্ষা করে তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপে ধর্ম্মের উপাস্য যাহা—তাহাই দেবতা।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইতে উঠিয়া বলিলেন,—মুনি-মহারাজ আজ দ্বিতীয়বার পরিষদের সভায় অধিষ্ঠান করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়, চরিত্রের উন্নতভাব জানিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। ভারতের গৌরবই ধর্ম্ম। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এই তিন ধর্ম্মই ভারতের গৌরব প্রকাশক। বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও যতি ইঁহারাই ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা ভারতের গৌরব

বাড়াইয়া গিয়াছেন। বানপ্রস্থ আজকাল নাই বলিলেই চলে, ভিক্ষুও ভারতে তেমন নাই, যতি আছেন। মুনিমহারাজ বলেন বর্ত্তমান সময় ভারতে তিনশতাধিক জৈন যতি আছেন। বাঙ্ নিয়ম সংযম করিয়া যিনি চলেন তিনিই যতি। বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও "ধর্ম্মধর" "গণধর" "আচার্য্য" প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রতিপালকেরা উহাদের ধর্ম্মপ্রচার ও রক্ষার বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। বুদ্ধের উপদেশেই আচার্য্যমুষ্টি ছিল না অর্থাৎ উপদেশ অধিকারী নির্ব্বিশেষে দেওয়া হইত। মনুর উপদেশে অনুর্ব্বর স্থলে বীজবপনের নিষেধ দেখা যায়। বিদ্যা পেটে রাখিয়া মরিবে তবু অনধিকারীকে দিবে না। ইহাতে বিদ্যাপ্রচারের বাধা হইত। এখন ইয়োরোপীয় আলোচনায় ভারতের গৌরব দেশবিদেশে প্রচারিত হইতেছে। সংস্কৃত কাব্যনাটকের যে কয়খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জানা গিয়াছে তদ্ব্যতীত আর পাওয়া যাইতেছে না। জৈনসাহিত্যের আবার কতকগুলি নীতিকাব্যের পরিচয় পাইব আশা করিতে পারি। মুনিমহারাজের পদার্পণে কলিকাতার বাঙ্গালীসমাজে জৈন শাস্ত্রালোচনার যে সূত্রপাত হইল, তাহা স্থায়ী হউক, ইহাই প্রার্থনীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ মোঘা এল্, এল্, বি, হিন্দিতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাঙ্গালী কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ জৈন শাস্ত্রালোচনায় যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং মুনিমহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এজন্য আমি জৈন সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই প্রবন্ধগুলি হিন্দী ও ইংরাজীতে অনুদিত ও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলিলেন, বাবু ফুলচাঁদ যে প্রস্তাব করিলেন তাহা আমারও প্রার্থনীয়। এইরূপ করিতে হইলে বাঙ্গালী ও জৈনতে মেশামিশি আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এইরূপ মিলনীর ক্ষেত্র হউক। মুর্শিদাবাদের দুধুরিয়া বাহাদুরের ন্যায় যাঁহারা বাঙ্গালা বুঝেন এবং যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারা পরিষদে যোগ দিলে এই উদ্দেশ্য সহজেই সুসম্পন্ন হইবে। "এক-লিপি-বিস্তারপরিষদের" সাহায্যে নাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষা প্রচার হইতেছে, জৈন ভ্রাতৃগণ তৎসাহায্যে বাঙ্গালার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। অতঃপর হীরেন্দ্র বাবু সভাপতি, মুনিমহারাজ, জৈনযতিমণ্ডলী এবং জৈন ভদ্রলোকগণের প্রশংসা করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা ;

স্থান—ন্যাশনাল কলেজ গৃহ (১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট)।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান, ৪। প্রবন্ধ—(১) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "যশোহরের নূরউল্ল্যা খাঁ ও মির্জ্জানগর" এবং (২) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদে অস্থিগণনা" ৫। শোকপ্রকাশ—পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে, ৬। বিবিধ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (সভাপতি),

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্, এ,
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল,
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্, এ,
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী,
" সুরেন্দ্রনাথ সান্দকী গোস্বামী,
" সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল,
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ,
" মুকুন্দলাল বসু,
" সুরেশচন্দ্র সেন,
" শ্রীশচন্দ্র সেন এম্, এ,
" নিত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
" তারাভূষণ পাল,
" যতীন্দ্রকিশোর দত্ত,
" সুরেন্দ্রমোহন রায়,
" কবিরাজ সতীশচন্দ্র রায়,
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,
" মহেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল,
পণ্ডিত " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল,
" হরিপদ চট্টোপাধ্যায়,
" কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ,
" উপেন্দ্রনাথ দে,
" ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত,
" সূর্য্যনারায়ণ সেন বি, এ,
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ,
" কৃষ্ণদাস বসাক,
" রসিকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
" সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত,
" নীরদভূষণ সান্যাল,
" রোহিণীকুমার সেন,
" শরচ্চন্দ্র গুপ্ত,
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, সম্পাদক,
" মন্মথমোহন বসু বি, এ, } সহঃ সম্পাদক
হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম,এ, }

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যনির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্, এ,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, রিপন কলেজ।
”	”	” সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্, এ, রিপণ কলেজ।
” রাজকুমার বেদতীর্থ	” ব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শরচ্চন্দ্র রায় এম, বি, ৩৭ অপার সার্কুলার রোড।
” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	” হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন সাঁকরাইল, টাঙ্গাইল।
” ডাঃ সরসীলাল সরকার	” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	পণ্ডিত রামচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, মুন্সেফ, মধুবনী, ভাগলপুর।
” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	” ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্, এ, বি এল, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালী।
”	”	শ্রীযুক্ত অনন্তনারায়ণ সেন, ১১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্টীট্।
”	”	” সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় বি, এল্, ১২ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন
” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	”	” বরদাকান্ত মিত্র বিএ।
” জানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	” নলিনাক্ষ রায়চৌধুরী, ১২৪।৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
” হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	”	” নিশিকান্ত সেন এম্, এ, অধ্যাপক, সেণ্টষ্টিফেন্স কলেজ, দিল্লী।
”	”	শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী রায় বাঙ্গালী মেস্, কোয়েটা।
”	”	” উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী সাঁকরাইল, টাঙ্গাইল।
”	”	” নৃপেন্দ্রনাথ বাণার্জী এম্, এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এম্,এ, অধ্যাপক, সিটি কলেজ।
	কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দত্তগুপ্ত এম,এ, সি, ই, ডিষ্ট্রীক ইঞ্জিনিয়ার দিনাজপুর।
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	" সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বিএ, সার্পেন্টাইন লেন।

৩। নিম্নলিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতাগণকে যথা-রীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল :—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—(১) কালিদাস ও ভবভূতি, (২) দত্তকবিধিবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৩) এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত—(৪) অঞ্জলী।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী—(৫) ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী।

Madras Government—(৬) Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript.

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র রায়—(৭) বিদ্যাবলী, (৮) জ্যোতির্ম্ময়ী।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী—(৯) In Memoriam, Bankim Chandra.

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(১০) শিবাচার্য্য ঠাকুর।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—(১১) সিন্ধুগাথা।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(১২) ব্যাকরণ দর্পণ, (১৩) Sanskrit word Book. (১৪) কায়স্থজাতিতত্ত্বনির্ণয়, (১৫) পরমার্থবিষয়ক গীতাবলী, (১৬) হৃদয়-উচ্ছ্বাস, (১৭) রাস-রসামৃত, (১৮) উপাসনা (মাসিক পত্র), (১৯) নবনূর (মাসিক পত্র), (২০) On a complete investigation of phenomenon taking place beyond the critical angle. (২১) বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অকাল মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইলে শোকপ্রকাশ করেন। ৺কাব্যবিশারদ সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী ছিলেন এবং তাঁহার এই মৃত্যুতে দেশের ও বঙ্গভাষার সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রামেন্দ্রবাবুর উক্তির সমর্থন করেন। তৎপরে সভাপতির আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন 'যশোহরের নূরউল্যা খাঁ ও মীর্জ্জানগর' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। মন্মথবাবু লেখককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বঙ্গদেশের প্রতি জেলাতে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে সেই সমস্ত অনুসন্ধান পরিষদের অন্যতম কার্য্য,—সুতরাং প্রবন্ধ লেখকের উদ্যম অনুকরণীয়।

পরিষদের মফঃস্বলস্থ সভ্যগণ বঙ্গদেশের প্রাচীনকীর্ত্তি অনুসন্ধানে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী এই বলিয়া রামেন্দ্রবাবু দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদে অস্থিগণনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। রামেন্দ্রবাবু বলেন, যে, পরিভাষা হিসাবে প্রবন্ধ অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ইংরেজী Bone ও সংস্কৃত "অস্থি" এই দুই শব্দ আমরা এক অর্থে ব্যবহার করিতে পারি কিনা তাহা বিবেচ্য, কারণ প্রবন্ধ হইতে আমরা বুঝিলাম যে, আয়ুর্ব্বেদ মতে Bone, Cartilage, ও Epidermes এই তিনটিকেই অস্থি বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, যে প্রবন্ধকার যে সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রমাণ যে অভ্রান্ত তাহা দেখান উচিত।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, ত্রিপিটকে উল্লেখ আছে যে, দেহ প্রধানতঃ ৩২ অংশে বিভক্ত। পুরাতত্ত্ব হিসাবেও এই প্রবন্ধ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়কে পালিভাষা হইতে অস্থির নাম সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে ন্যাশন্যাল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক	সভাপতি

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

তারিখ—৭ই ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা

স্থান—ন্যাশন্যাল কলেজগৃহ (১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট)

আলোচ্য-বিষয়—

১। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃ-গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ এবং (খ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয়ের "ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগীরথী তীরে বাঙ্গালার সভ্যতা" ৫। পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ, ৬। বিবিধ।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ,
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল,
" হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্‌এ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, (সম্পাদক)
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" জয়দাপ্রসন্ন দত্ত
" রামচন্দ্র মিত্র
" নীরদভূষণ সান্ন্যাল
" তারাভূষণ পাল
" পরেশনাথ বসু
" জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিনয়কৃষ্ণ বসু
" পণ্ডিত রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম, এ,
" সূর্য্যকমল সিংহ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ

শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ
" বঙ্কুবিহারী রায় কবিরাজ
" মোহিনীমোহন দাস হালদার
" মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ
" নরনারায়ণ বিশ্বাস
" গিরীন্দ্রকুমার চৌধুরী
" মহেন্দ্রনাথ দে এম্, এ, বি, এস সি,
" সুরেন্দ্রমোহন রায়
" ফকীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" দীনেশচন্দ্র দাস
" জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" রাখালদাস সেনগুপ্ত
" শ্রীশচন্দ্র গুহ
" অমৃতগোপাল বসু
" দুর্গানারায়ণ সেন
" প্রমথনাথ সেন
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্রদাসগুপ্ত এম্,এ,
} সহঃ সম্পাদক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল। ২ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য-নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমৃতলাল চন্দ্র এম্, এ, ৪০ নিমুগোস্বামীর লেন
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীমথুরানাথ মজুমদার মাণিকতলা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীগণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ এল,এম্,এস, ১৪ বাঁশতলা ষ্ট্রীট্।
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	"	শ্রীযুগলবিহারী মাকড় এম্,এ,বি,এল, রামপুরহাট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বি,এস্ সি, আর,এম্,ই ২১০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	"	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, কৃষ্ণনগর।
		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম,এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
		শ্রীহরিপদ পাঁড়ে এম, এ, অধ্যাপক, কুচবিহার কলেজ।
		শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, ঐ
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, ১১১।৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী ১১ সিমলা ষ্ট্রীট্।
শ্রীসরসীলাল সরকার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামানন্দ ঠাকুর বাক্‌বজ।
		ছাত্র-সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল সেন
"	ঐ	" প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
"	ঐ	" গজেন্দ্রকুমার রায়।
"	ঐ	" রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩৬ বহুবাজার।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতাকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল—শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ—(১) প্রেম ও ভক্তি।

৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বাস্তবিক দুঃখিত ও এই সংবাদ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জ্ঞাপন করা হউক। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রবাবু বলেন যে দামোদর বাবুর মৃত্যুতে সাহিত্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তিনি ঐ পত্তালিক হইলেও ইদানিং হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাঁহার

গীতার সংস্করণ শেষ হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল এবং তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে তাঁহার একখানা পুস্তক শিক্ষা-পরিষৎকে দান করিবেন।

পঞ্চানন বাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। দামোদর বাবু বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন ও তিনি অসাধারণ পরিশ্রমে গীতার সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার গীতা অমূল্য। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ" নামক প্রবন্ধের এক অংশ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে) সময়াভাবে পঞ্চানন বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ও কলেজের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—কলেজ স্কোয়ার, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট

সময়—৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল,
" অশ্বিনীকুমার সেন এম্ এ, এম্ আর এ এস্
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল,
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্,এ বি এল,
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল,
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ,
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়
" নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাম্বুধি
" চারুচন্দ্র বসু
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" আনন্দমোহন সাহা
" মহেন্দ্রলাল মিত্র
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত
" রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
" নিকুঞ্জ নাথ ঠাকুর
কবিরাজ " রাখালদাস কাব্যতীর্থ
" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল,
" পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
" মন্মথমোহন বসু
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন এম্ এ, বি এল, এম আর এ এস্ মহাশয় "ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদীয় ধর্ম্ম" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বেদ বিষয়ে তিনি বাঙ্গালায় ধারাবাহিক-রূপে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। সেই সকল প্রবন্ধের সূচনা স্বরূপ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠের ভূমিকা স্বরূপ বলেন—"ঋগ্বেদ কি? ইহাতে নানা ছন্দে নানা দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনার কথা, স্তব বন্দনার কথা আছে, তদ্ভিন্ন ভেকের শব্দের বর্ণনা, পাশক্রীড়ার কথা, যমযমীর প্রণয় কথা, পুরূরবা উর্ব্বশীর প্রণয় কথা প্রভৃতি কিছু কিছু অন্য কাহারও প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, ইহাতে দেবদেবীর যে পূজা অর্চ্চনার কথা পাওয়া যায় তাহা বর্ত্তমান ঋগ্বেদ সংগ্রহেরও বহু পূর্ব্বকালের। দেবদেবী সকল সম্বন্ধে আমার যে সকল বক্তব্য আছে তাহা পরে বলিব। ইহাদের পূজা অর্চ্চনা ত্রিবিধ প্রকারে করা হইত—অর্চৈঃ ঋক্‌দ্বারা, উক্‌থৈঃ—ছন্দদ্বারা এবং গীর্ভিঃ—বাক্যদ্বারা। এই ঋক্-ছন্দ-বাক্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা কালে সোমরস ও আহার্য্য পদার্থ সকল আহুতিরূপে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইত। যাঁহারা এইরূপে অর্চ্চনা করিতেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ঐ সকল বস্তু দগ্ধ হইয়া তাহার ধূম ঊর্দ্ধে উঠিলে দেবতারা উহা প্রাপ্ত হন।

আমরা বেদের সকল অংশ পাই না। বৈদিক গ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে এক সময়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল যে সমস্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সেই দুর্ঘটনার পর যাহা সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে অর্দ্ধেকও বোধ হয় পাওয়া যায় নাই। এই সংগ্রহকালে অনেক ঋক্ লোপ হইয়াছে জানিতে পারায় যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আবার নূতন নূতন ঋক্ রচিত হইয়াছিল। কর্ম্মের বিধান স্থির রাখিবার নিমিত্তই বোধ হয় সেই সময় নিয়ম হইয়াছিল যে "তোমরা প্রাচীন ঋক্ পাঠ করিও না—ভৃগুরা যেমন রচনা করিয়াছিলেন,তদ্রূপ হে ইন্দ্র! আমি তোমাকে নূতন ঋক্ দ্বারা স্তব করিতেছি।" এরূপ বিধান বৈদিক গ্রন্থেই আছে। বর্ত্তমান-কালে আমরা চারি বেদ বলিতে যাহা পাই, তাহার সংগ্রহকর্ত্তা বেদব্যাস।

বর্ত্তমান ঋগ্বেদের মধ্যে এক হইতে চারি চরণ বিশিষ্ট নানাবিধ ঋক্ মন্ত্র আছে। কতকগুলি ঋক্ লইয়া একটী সূক্ত হয়। সূক্ত শব্দের অর্থ—সু+উক্ত অর্থাৎ মূল্যবান্ বা সুন্দর রচনা। কয়েকটী সূক্ত লইয়া মণ্ডল নামক ভাগ কল্পিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ মৌলিক গ্রন্থ নহে। ইহাতে ঋক্ মন্ত্রের আলোচনা ও তৎসম্বলিত যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা বর্ণনাই ইহার প্রধান অঙ্গ, তদ্ভিন্ন ইহাতে গদ্যে অর্থাৎ তখনকার প্রচলিত ভাষায় প্রার্থনাদিও আছে। যজুর্ব্বেদের দুইটি ভাগ—কৃষ্ণ যজুঃ অর্থাৎ তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুঃ অর্থাৎ বাজসনেয় সংহিতা।

সামবেদ—ঋক্ মন্ত্র অবলম্বনে গানমাত্র। এক সময়ে এই তিন বেদ লইয়া বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হইত। অথর্ব্ববেদকে বেদ মধ্যে গণনা করা হইত না; উহাকে 'অথর্ব্বাঙ্গিরস' নামে অভিহিত করা হইত। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা নামক ঋষিদ্বয়ের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। ইহাতে একেশ্বরবাদের কথা, ভূতপ্রেতের কথা, বশীকরণাদির কথা, জ্বরনিবারণমন্ত্র প্রভৃতি আছে।

ঋগ্বেদের একেশ্বরবাদ অতি সরল, লোকের প্রাণের সহজ কথা মাত্র। আর অথর্ব্ববেদের একেশ্বরবাদ দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ গভীর জ্ঞানগম্য কথা।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি হইতে যজ্ঞের যে আভাস পাওয়া যায় তাহাতে যাজ্ঞিকেরা দেবতাদিগকে চক্ষে দেখিতে পাইতেন না কিন্তু অনুভব করিতেন বলিয়া বুঝা যাইত, কারণ যজ্ঞ করিতে বসিয়া তাঁহারা দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে কয়েকখানি আসন পাতিয়া রাখিতেন। পার্থিব ও আন্তরীক্ষ দেবতাভেদে অগ্নির আসন কুণ্ডের নিকট রাখা হইত ও বিষ্ণুর আসন কুণ্ড হইতে দূরে পাতা হইত। যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞকালে আপনাদের সহিত দেবতাদের অভেদ কল্পনা করিতেন, তাহা ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটি হইতে জানিতে পারা যায়। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ হোতারম্ দেবমৃত্বিজম্ রত্নধাতমম্'—আমি পুরোহিত নহি, অগ্নিই ঋত্বিক্, মন্ত্ররচক আমরা কারু অর্থাৎ পরিচারক কর্ম্মচারী মাত্র। এই আদি মন্ত্রে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মের আরম্ভকালের কথা হইতে পারে না—ইহা বহু চিন্তার ফল। ক্রমবিকাশ শাস্ত্র বলেন, কোন বিষয়ের বিচারে মাঝখান ধরিও না, গোড়া ধর। ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে হইলে ঋষিরা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বেশী আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের গোড়ার ইতিহাস জানিবার জন্য যে সকল উপকরণ বর্ত্তমান আছে, ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে হইলে তাহাদের অপেক্ষা আরও বেশী উপকরণ পাওয়া যায়। এত বেশী উপকরণ আর কোন ধর্ম্মের ইতিহাস দিতে পারেন কিনা আমি জানি না।

ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মের ইতিহাস অনুসরণ করিতে হইলে বুঝা যায় আর্য্যগণ উত্তরদিকে কোথাও ছিলেন এবং সেখান হইতে কতকজন পশ্চিমদিকে ও কতকজন দক্ষিণে গমন করেন। পারসীকগণ ও ঋষিগণ আফগান এবং সপ্তসিন্ধুর পূর্ব্বদেশে একত্র আসেন। এই পূর্ব্বদেশ হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে পথে তাঁহাদের বিচ্ছেদ হয় তাহা ঠিক নহে। এ সকল কথার প্রমাণাদি পরে প্রদর্শন করিব।

ঋগ্বেদের আলোচনায় ম্যাক্সমূলর ঋগ্বেদের বহু দেববাদের কথা আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তিনি ঋগ্বেদের সমস্ত দেবতার মূল দ্যৌঃ নামক একমাত্র দেবতা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু আমি যতটা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমি বলি, (১) প্রথমে সকলে মিলিত হইয়া দ্যৌঃ ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করিতেন না। (২) দ্যু ধাতু হইতে সমস্ত দেবনাম উৎপন্ন। দিব ও দ্যু ধাতুর অর্থ এক এবং শব্দতত্ত্বের নিয়মানুসারে উভয়ের প্রকৃতি এক।

(৩) বরুণ ও অদিতি ভিন্ন সমস্ত দেবতা দ্যৌঃ পুত্র কন্যা। (৪) এই ভাবের পর ঋগ্বেদের শেষে আবার সেই দ্যৌঃ দেবতায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা অর্থাৎ একেশ্বরবাদের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। এই দ্যৌঃ দেবতার গোড়ায় কি ছিল, গাছপালার পূজা ছিল কিনা জানি না, কোন প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আর্য্যজাতির আবিষ্কার এই দ্যু আকাশ প্রথম, না মিশরে 'নু' আকাশ প্রথম ইহা লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আর্য্যঋষিরা যেমন দ্যু হইতে দ্যৌঃ দেবতা গ্রহণ করিয়াছেন, মিশরে নু হইতে তেমনি 'নুট্' দেবতা হইয়াছেন। সুমেরিয়ান বা ফিনিসীয়ানগণ সেমিটিক শাখা নহে—তাহারা ভারতবর্ষের নিকট প্রদেশবাসী এবং তাহারা এদেশ হইতেই সভ্যতা লইয়া গিয়াছিল। ইহাদের অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন পাশ্চাত্যজাতির সভ্যতার বিবরণ কোন ইতিহাস দিতে পারে না—ইহাদের 'অনু'ও আকাশ-বাচী ও দেববোধক। চীনজাতি অন্য জাতি অপেক্ষা পুরাতন সভ্যজাতি বলিয়া কথিত কিন্তু তাহাদেরও 'চীয়েন' শব্দে আকাশ বুঝায় ও তাহাই প্রধান দেবতা। তাহাদের আরও দেবতা ছিলেন তাঁহারা আমাদের পিতৃগণের ন্যায়। তাহার পর আর্য্যঋষিরা যখন বহু দেবতার মধ্যে পুনরায় দ্যৌকে খুঁজিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন তখন বিষ্ণুকেই 'এষঃ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে—এষঃ অর্থাৎ তুমি অন্বেষণযোগ্য।

(ইহার পর বক্তা তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করেন, তাহা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে পরে জানা যাইবে।)

ইহার পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় প্রবন্ধের দুই একটী কথা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করেন।

তৎপরে হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন, বক্তা মহাশয় আজ দুইটি নূতন কথা আমাদের শুনাইলেন—একটি, পারসীক ও আর্য্যগণ একত্র ভারতে আসিয়া পরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, ইহা আমাদের জানা ছিল না। আমরা জানিতাম পথেই তাঁহারা পশ্চিমে প্রস্থিত হন, কিন্তু তাহা নহে। আর দ্বিতীয় কথাটি এই, Andrew Lang অনার্য্যজাতির traditions আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে একেশ্বরবাদ হইতেই তাহাদের ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এতদিন জানিতাম বেদের বহুদেববাদ হইতে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা নহে। বেদেও আছে আগে একেশ্বরবাদ পরে বহুদেববাদ, পরে পুনরায় একেশ্বরবাদে পরিণতি। বক্তা মহাশয়ের এই দুটি নূতন মীমাংসায় আমাদের ঐতিহাসিক ও ধর্ম্ম বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞান লাভ হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বক্তার পরিচয় আমি প্রথমে দিই নাই, এখন আর দিতেও হইবে না। তাঁহার বক্তৃতাতেই তাঁহার পরিচয় আপনারা পাইয়াছেন। তাঁহার গবেষণাতেই আপনারা বুঝিয়াছেন এ বিষয়ে তিনি কত গভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে আপনারা বুঝিয়াছেন বেদ সার্ব্বজনীন, বেদ সকলের মূল, বেদের সোম-পানাদি আচার ব্যবহার অতি পুরাতন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বেদের পরবর্ত্তী। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মমূলক গ্রন্থাদি হিন্দুর একার। ব্যাস যে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেবতার প্রাধান্য বা তাহার

প্রাচীনতা ধরিয়া কোন বিভাগ কল্পনা করেন নাই। সকল বেদের সর্ব্বত্রই প্রাচীন ভাষা বর্ত্তমান আছে। তিনি কি নিয়মে বেদের বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক। ত্রয়ী কেন বলা হয় তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণাদি আছে; অতি প্রাচীন ভাষাও তাহাতে আছে, অথচ অথর্ব্বকে বাদ দিয়া বেদকে এক সময়ে কেন ত্রয়ী বলা হইত তাহা জানিবার বিষয় বটে। আমার মনে হয় ত্রিভাগে বিভক্ত এইজন্য ত্রয়ী। পালি তেবিজ্জ সুক্তে তিনটি ভাগ আছে—আধিশিক্ষা অর্থাৎ Culture, আধিশীলম্ অর্থাৎ Training, আধিচিত্ত অর্থাৎ Character। আমাদের ত্রয়ী ঠিক এই ভাবের না হউক অন্য কোন ভাবের বিভাগ কিনা তাঁহা অনুসন্ধেয়। বক্তা স্তোপিতরকে আদি দেবতা বলেন, কিন্তু অনেক স্থলে ইন্দ্র আদি দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বক্তার নিকট আমরা অনেক কথা শুনিতে পাইব। এক্ষণে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

তারিখ—২২ ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা

স্থান—ন্যাশন্যাল কলেজ গৃহ।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ" প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ, ৫। বিবিধ।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল, সভাপতি,

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাসগুপ্ত
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" অশ্বিনীকুমার দে
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	" রথীন্দ্রকুমার মিত্র
" আনন্দলাল দত্ত	" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ	" উমেশচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ আচার্য্য
" গিরিজাভূষণ মণ্ডল
" অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" রসিকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ,
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল্
" বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ,
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম, এ,
" চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" তুলসীদাস বসু
" শ্যামাচরণ চৌধুরী
" যদুনাথ মজুমদার
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু বি, এ,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ
} সহঃ সম্পাদক

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য-নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রামগোপালপুর ষ্টেট্, মৈমনসিংহ।
"	"	২। শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, ময়মনসিংহ।
"	"	৩। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় ধিতপুর। পোঃ চরপাড়া, মৈমনসিংহ।
"	"	৪। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় ঐ।
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত এম এ,	"	৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন এম্ এ, ৬৭ ক্যাথিড্রালমিশন লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	"	৬। শ্রীসত্যচরণ পাল বিএ, (ছাত্রসভ্য) ৬৮ গৌড়ীবেড় লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৭। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, দিনাজপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৮। শ্রীইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী এম্এ বিএল।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		৯। শ্রীজগৎপদ হালদার ২১ টালাবাগান লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, নিউইণ্ডিয়ান্ স্কুল কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
"	"	১১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, অধ্যক্ষ, ভাগলপুর কলেজ।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক, রঙ্গপুর শাখা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
"	"	১৩। ,, মহেশচন্দ্র সরকার উকীল, রঙ্গপুর।
"	"	১৪। ,, শরচ্চন্দ্র সিংহরায় রায়পুর, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
"	"	১৫। ,, রজনীকান্ত মৈত্র সেন-পাড়া, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
"	"	১৬। ,, হেমচন্দ্র সেন ,, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাসা সেনপাড়া রঙ্গপুর।
"	"	১৭। মুন্সী জমীরুদ্দিন সাহা বেতগাড়ী, রঙ্গপুর।
"	"	১৮। ,, এনাতুল্লা মহম্মদ। ঐ ঐ

নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

	পুস্তক	দাতা
১।	ইন্দুবালা (৩ খানি)	শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
২।	Social Reform in Bengal.	"
৩।	আমার দেশ	" কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত
৪।	লিসিদাস	"
৫।	Minutes for 1906.	Registrar, Calcutta University.

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ পাঠ করেন। (প্রবন্ধ, পরিষৎ-পত্রিকাতে প্রকাশিত

হইবে।) প্রবন্ধ পাঠ হইলে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় সভ্য পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

তারিখ—৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহ।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান, ৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক একটী সপ্তশতাধিক বর্ষের প্রাচীন গোলা প্রদর্শন, ৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের "ষোড়শ শতাব্দীতে আদি গঙ্গাতীরে বাঙ্গালার সভ্যতা"। (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের "মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন" ৬। বিবিধ।

এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল,	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল (ক)	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ,	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ,	„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ জানকীনাথ গুপ্ত এম, এ,	পণ্ডিত „ অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল (খ)	„ „ রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ,	„ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী	„ আনন্দমোহন সাহা
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ	„ যতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র ঘোষ
„ রামহরি ভড়
„ নৃত্যগোপাল বিশ্বাস
„ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার
„ আশুতোষ বাগচী
„ গুণেন্দ্রমোহন রায়
„ বিনোদবিহারী হালদার
„ কালীপদ ভট্টাচার্য্য
„ জগদিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ হেমেন্দ্রনাথ রক্ষিত
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত
„ সত্যেন্দ্রনারায়ণ দত্ত
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ উপেন্দ্রনাথ দে
„ সুরেশচন্দ্র রায়
„ নরেশচন্দ্র মজুমদার
„ অনাথনাথ বসু
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত
„ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, বি এল
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ রামকমল সিংহ
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এমএ } সহঃ সম্পাদক
„ মন্মথমোহন বসু বিএ } সহঃ সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় বিএ,
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২। শ্রীসীতানাথ কাব্যরত্ন
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	৩। শ্রীপঞ্চানন বৈদ্যরত্ন
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র
„	„	৫। শ্রীজহরলাল দে বিএ, এম্, বি
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৬। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
„	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৭। শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৮। শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	
সম্পাদক, রঙ্গপুর শাখা	„	৯। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত বিএ, জালালগঞ্জ কাছারী দেউলপাড়া, রঙ্গপুর
„	„	১০। „ লোকনাথ দত্ত সব-ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড়তরফ, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
„	„	১১। „ বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর
„	„	১২। „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, হরিপুর বড়তরফ জীবনপুর, দিনাজপুর

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটী গোলা প্রদর্শন করেন। এই গোলাটী প্রায় ২৩।২৪ বৎসর গত হইল হাজীপুরে গঙ্গাগর্ভে পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় এই গোলাটী পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহাতে বোধ হয় যে, "ইন্দ্র" নামক কোন রাজার এই গোলাটী ছিল এবং সেই রাজবংশের লাঞ্ছন "বৃষ"। লেখা আছে "শ্রী-ন্দ্র-নৃপস্য"। লেখার অক্ষর ৬০০।৭০০ বৎসর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। রাজা ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু গোলার লেখা তত প্রাচীন নহে। এটী গোলা কি কন্দুক তাহা ঠিক বলা যায় না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই "ইন্দ্র" ও রাজা "ইন্দ্রায়ুধ" এক ব্যক্তি নহেন বলিয়া বোধ হয়।

৫। (ক) তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ মহাশয় "ষোড়শ শতাব্দীতে আদি গঙ্গাতীরে বাঙ্গালার সভ্যতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধকার প্রথমে প্রাচীন ভারতে গঙ্গাতীরে যে সকল সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার আভাসস্থলে কনখল, কনোজ, কাশী, হস্তিনাপুর, প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুরী, পাটলীপুত্র এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বিগত গৌরবের অনুধ্যান করিয়া গঙ্গার যে প্রাচীন প্রবাহ গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিম্নে মহানদীর সহিত সঙ্গত ছিল, যাহা এক্ষণে বুঁজিয়া গিয়াছে, তাহার প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানসহ, ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে গৌড়ের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত বর্ত্তমান স্থানের যে সাদৃশ্য আছে তাহা দেখাইলেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে প্রমাণাবলি সংগ্রহ করিয়া ও প্রাচীন ইন্দ্রাণী পরগণা ও ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের বাণিজ্যবৈভব বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধকার গঙ্গাপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের নিদর্শন প্রদান করেন।

"কালীঘাট হইতে সাগর সন্নিহিত কপিলাশ্রম পর্য্যন্ত যে সমৃদ্ধ সভ্যতা-বর্দ্ধিত নগরাদি বিদ্যমান ছিল তাহার তালিকা এবং বিধ্বস্ত-প্রায় নিদর্শনের একটী বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধকার বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ব্যপদেশে আদি গঙ্গাতীরে বহুদিন পর্য্যন্ত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত দেবমন্দির, দেবমূর্ত্তি, প্রাচীন অট্টালিকা, প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, গঙ্গার পুরাতন বাঁধা ঘাট প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার তালিকা প্রদান করেন। প্রবন্ধকার যে সমস্ত দেবমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পিত্তলময় সূর্য্যমূর্ত্তি, প্রস্তরময় নৃসিংহ, বিষ্ণু, হনুমান, মকরবাহিনী গঙ্গা, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী, অনন্ত-শয্যায় নারায়ণ মূর্ত্তি অদ্যাপি শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত এবং অভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে। সুন্দরবনে খাড়ী পরগণায় যেস্থান হইতে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধকার সেই স্থানে প্রাপ্ত ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের একটী তাম্রকৌটা, ১২টী প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং কুমীরের গর্ভেস্থিত স্ত্রীলোকের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রদর্শন করেন। মুদ্রার মধ্যে কতকগুলি ১৪শ শতাব্দীর, বাঙ্গালার পাণ্ডুয়ার স্বাধীন পাঠান রাজা ইলিয়াস্ শাহ ও তৎপুত্র সেকন্দর শাহো কতকগুলি পারসী অক্ষরে খোদিত মুদ্রার মধ্যে শিবের গৌরীপট্ট ও বাঙ্গালা "ক" অক্ষর এবং চরণচিহ্ন অঙ্কিত। এই প্রবন্ধে ২০ মাইলব্যাপী "জয়রাম হাতীর" গর্ড নামক এক দুর্গ প্রাকার এবং সমুদ্রতীর হইতে প্রাচীন গৌড় পর্য্যন্ত "দ্বারীর জাঙ্গালের" পরিচয় আছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধকারের অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, তিনি মুকুন্দরামের সময় গঙ্গার গতির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, বঙ্গদেশ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ মহাশয় বলেন যে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই প্রবন্ধে দেবমন্দিরের সবিস্তৃত বিবরণ নাই। সংগৃহীত মুদ্রাগুলির মধ্যে একটী মুদ্রা পুরাতন, অন্যান্য গুলিতে বিশেষ আশ্চর্য্যজনক কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন যে, বেতুর বোধ হয় শিবপুর। চারুবাবু গঙ্গার স্রোত সম্বন্ধে মন্মথবাবুর সহিত একমত প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই আলোচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, প্রদর্শনীতে পরিষদের উপাদান সংগ্রহে প্রবন্ধকার অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন। বাঙ্গালার সভ্যতা গঙ্গাতীর হইতে সমুদ্ভূত ও গঙ্গাতীর হইতে বিস্তৃত। এই প্রবন্ধ ভবিষ্যৎ ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। প্রবন্ধে কেবলমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর সভ্যতার বর্ণনা নাই, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎপরবর্ত্তী সভ্যতারও বর্ণনা আছে।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শিবরাজের তাম্রশাসন" পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ ও তাম্রশাসনের প্রতিলিপি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, এই তাম্রশাসনখানি তিনি কটক জেলার পটীয়া

কেল্লার রাজার নিকট প্রাপ্ত হয়। এই স্থানের প্রাচীন নাম পত্তনবতী ও এই স্থানের রাজবংশ পাণ্ডুবংশ বলিয়া পরিচিত। এই সময়ে সমস্ত উড়িষ্যা দেশকে কলিঙ্গ বলা হইত। শিবরাজের নাম এই প্রথম। বোধ হয় তাম্রশাসনখানি ১৩০০।১৪০০ বৎসরের পুরাতন।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, উড়িয়া অক্ষর ও গুপ্ত অক্ষরের সম্মিলন দেখিয়া তাম্রশাসন-খানি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কি না তাহাতে সন্দেহ হয়। রাজার নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থির করিয়া কিছুই বলা যায় না।

৫। ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিষদে লিখিত ধন্যবাদ-জ্ঞাপক পত্র পঠিত হইল, ও তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীঅমৃতলাল শীল
সভাপতি

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

তারিখ—৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গৃহ।

আলোচ্য-বিষয়—

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(১) (ক) মালয় উপদ্বীপের মৃণ্ময় মুদ্রা ও (খ) তক্ষশীলার তাম্রলিপি—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) (ক) দশহরার উৎপত্তি, (খ) হস্তালিঙ্গন, (গ) রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, (৫) প্রদর্শন—সৌরাষ্ট্রদেশের শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম ও রুদ্রসিংহের রৌপ্য মুদ্রা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। বিবিধ।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল এম্ এ, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্,
" জানকীনাথ গুপ্ত এম, এ,
" জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু এম্, এ,
" চিত্তসুখ সান্যাল

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী
" নিশিকান্ত সেন
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ
" কৃষ্ণদাস বসাক

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ,
" ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্ এম্ এস্
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্এ,

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ সম্পাদক
" মন্মথমোহন বসু বি এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ
} সহঃ সম্পাদক

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল এম্ এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১।	শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়	"	২।	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, মৈমনসিং
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	৩।	শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৪।	শ্রীরোহিণীকুমার সেন গুপ্ত
"	"	৫।	মাধবচন্দ্র দাস গুপ্ত (ছাত্রসভ্য)
শ্রীমণিমোহন সেন	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬।	শ্রীযুক্ত কালীকুমার অধিকারী
		৭।	শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী
		৮।	শ্রীহরিমোহন মৈত্র
		৯।	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
		১০।	শ্রীজীবনধন বন্দ্যোপাধ্যায়
		১১	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
		১২	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
		১৩	শ্রীনিত্যগোপাল সরকার
		১৪	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়
		১৫	শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী
		১৬	শ্রীকেদারনাথ বসু
		১৭	শ্রীজানকীনাথ পাঁড়ে
		১৮	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র এমএ, বি এল্
		১৯	পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী
		২০	রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল বাহাদুর

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
		২১। প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
		২২। শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২৩। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এ
শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২৪। শ্রীরাজমোহন রায় কবীন্দ্র
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ঐ	২৫। শ্রীকুমুদবিহারী বসু
		২৬। শ্রীহরিমোহন সিংহ বি এ
		৩৪। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম এ
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	ঐ	৩৫। শ্রীনিত্যবোধ বিদ্যারত্ন
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২৭। শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বিএ
		২৮। " হৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৯। " বিপিন বিহারী সেন এম্ এ.
		৩০। " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
		৩১। " রাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত		৩২। " গিরীন্দ্রকুমার সেন এম্ এ
		৩৩। " বিমলচন্দ্র সোম
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী		৩৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
সম্পাদক, রঙ্গপুর শাখা		নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা রঙ্গপুর

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ অর্পণ করা হইল :—

(১) হোমশিখা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (২) অমর, (৩) প্রবাদ সংগ্রহ, (৪) ধনবিজ্ঞান, (৫) The Partition Agitation, (৬) Anoocool Chandra Mukerjee (A memoir), (৭) Proceedings of Bethune Society 1882-83-84, (৮) A monograph on the gold and silver work in Bengal—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(৯) ঠাকুরমার ঝুলি—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ; (১০) কৃষক ও শ্রমজীবী—শ্রীমন্মথমোহন বসু ; (১২) ময়মনসিংহের ইতিহাস—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার ; (১৩) কালোপাখ্যান, (১৪) Papers on Land Revenue of B. India—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয় মালয় উপদ্বীপে প্রাপ্ত কয়েকটি মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি বলেন মালয় উপদ্বীপে "প্রাম" নামক এক জাতি বাস করে। প্রামগণ বলে যে, তাহারা "ওয়ানিলারা" নামক স্থান হইতে প্রায় ১১।১২ শত বৎসর হইল আসিয়া এই উপদ্বীপে বাস করিতেছে। 'প্রাম্' শব্দ বোধ হয়, 'ব্রাহ্মণ' শব্দের ও 'ওয়ানিলারা' বাঙ্গালার অপভ্রংশ। এই জাতির নিকট সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত পুস্তকাদি

পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি একটি গুহাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি বুদ্ধদেবের ও অপরগুলি বোধিসত্ত্বের।

অতঃপর রাখাল বাবু রাওলপিণ্ডি হইতে কয়েক মাইল দূরে তক্ষশিলা নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি তাম্রভিত্তিফলক প্রদর্শন করেন। এই তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পারা যায় যে, মেথিয়ক নামক এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় কর্ত্তৃক (ক) দশহরার উৎপত্তি (খ) হস্তালিঙ্গন ও (গ) রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ নামক তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে ক্রীত দুইটি মুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই মুদ্রা দুইটির মধ্যে একটি রুদ্রদামের ও অপরটি রুদ্রসিংহের। ইহারা উভয়েই শকবংশীয় ছিলেন, রুদ্রদাম ১৫০ খৃষ্টাব্দে ও রুদ্রসিংহ ১৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় বলেন যে, কাম্বোডিয়াতে হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বড় বড় মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপে হিন্দুরাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৯। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলেন যে, Editor ও Secretary এই উভয় শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি হইতে পারে; এই উভয় শব্দের পরিবর্ত্তে—'সম্পাদক' শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে অসুবিধা হইয়া থাকে। এই দুইটি শব্দের দুইটি পৃথক্ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই সম্বন্ধে কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সভাকে অবগত করান যে, বিগত সাহিত্যসম্মিলনের সময়ে বহরমপুরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহরমপুরে পরিষদের একটি শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে।

১০। অতঃপর পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পরিষদের পরম হিতৈষী। পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতে মহারাজ পুনরায় দারুণ মনঃপীড়া পাইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মহারাজের এই শোকে তাঁহার সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

১১। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

তারিখ—২০শে পৌষ, ১৩১৪।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎগৃহ।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার দাতাগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধপাঠ। (ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা নাম রহস্য" (খ) শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "বাঙ্গালায় বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ"। ৫। শোক প্রকাশ—স্বর্গীয় রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে। ৬। পরিষদের গৃহনির্ম্মাণারম্ভ সংবাদ জ্ঞাপন। ৭। বিবিধ।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্ (সভাপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিএ
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী (রঙ্গপুর)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
" বাণীনাথ নন্দী
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" অনাথনাথ বসু
" অশ্বিনীকুমার সেন
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" জগবন্ধু মোদক

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক
" শশীন্দ্রসেবক নন্দী
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র সেন
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" রামকমল সিংহ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু বিএ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহন করেন।

২। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী	১। শ্রীযুক্ত তারানাথ রায়চৌধুরী ৪ নং রাজার লেন
	"	২। শ্রীযুক্ত জহরলাল মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া
মুন্সী রওসন আলী	"	৩। মুন্সী সেখ আহম্মদ হোসেন আনসারী, মুর্শিদাবাদ
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি,এল্ উকীল রঙ্গপুর।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১। কুমুদানন্দ—শ্রীনকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ২। কুলশাস্ত্রপ্রদীপিকা—রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। ৩। সাধু-সঙ্গীত—শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী। ৪। প্রফুল্ল নির্ম্মাল্য—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। ৫। Misunderstood—শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬। শ্রীমদ্ভগবদগীতা—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী। ৭। বারেন্দ্রকুলীনদিগের বংশাবলী (লাহিড়ীবংশ)—শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী। ৮। মদিনাসরিফের ইতিহাস ও ৯। ইসলাম-চিত্র—সেখ আবদুল জব্বর। ১০। সতীলক্ষ্মী—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু। ১১। বৈদিক-কোষ—পণ্ডিত মধুসূদন ওঝা। ১২। Meghduta—এস্ সি, সরকার এম্ এ।

৫। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। রায় বাহাদুর পশুপতিনাথ বাবু পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতিসূচক পত্র লেখার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে পরিষদের গৃহনির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত করুণাময় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে ও গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই নির্ম্মাণ পরিদর্শনের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গালায় বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বৈদেশিক ও বিজাতীয় শব্দ ভাষায় কিরূপে স্থান পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার কতকগুলি নমুনা এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্লাস, কাপ, ডিস্, টাইম প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধকার উপসংহারে বলেন যে এখন বিজ্ঞানালোচনার জন্য শব্দ সঙ্কলন আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে বৈদেশিক শব্দ সংগ্রহ কালে ভাষার স্বাধীনতার প্রতি একটা বিশেষ লক্ষ্য রাখা যাইতে পারিবে।

৮। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে অনেক শব্দ বাঙ্গালাভাষাতে ঢুকিতেছে সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন যে বহুদিন হইতে বৈদেশিক শব্দ আমাদের ভাষাতে ঢুকিতেছে। শবরস্বামী এই বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেন। 'তামরস' ও 'নেম' শব্দ বৈদেশিক। বৈদেশিক শব্দ বিদেশীয় ভাবেই গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে হিন্দীভাষা প্রভৃতির তুলনায় বাঙ্গালা-ভাষাতে বৈদেশিক শব্দের সংখ্যা বেশী। বাঙ্গালাভাষা অতি সহজেই পরকে আপন করিয়া ফেলে বৈদেশিক শব্দ-বাহুল্যের ইহা এক প্রধান কারণ।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলেন যে অনেকস্থলে লেখকদের অত্যাচারে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃতের খাতিরে অযথা পরিবর্ত্তিতভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় বলেন যে বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি প্রণয়নে আমাদিগকে অনেক বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহা না করিলে যথার্থ বিজ্ঞানালোচনা আমাদের দেশে অসম্ভব হইবে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বৈদেশিকভাষা বর্জ্জনের কোনও আবশ্যকতা নাই। এ বিষয়ে গোঁড়ামিতে দরকার কি? ইহাতে মর্য্যাদাহানি হইবে না।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঙ্গালা নাম-রহস্য" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। অতঃপর প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীহৃষীকেশ শর্ম্মা (শাস্ত্রী)
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—পরিষৎগৃহ

সময়—২৭শে পৌষ, ১২ জানুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ পাঠ:—(ক) শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের

"সন্ধি"। (খ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত"। ৫। বিবিধ।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (সভাপতি)

" মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ	শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্	" রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
" বাণীনাথ নন্দী	" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	" মন্মথমোহন বসু বিএ } সহঃ সম্পাদক
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্এ } সহঃ সম্পাদক
" তারাপদ চট্টোপাধ্যায়	" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্	" রামকমল সিংহ

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। সভ্যগণ সমবেত হইলে সভাপতির প্রস্তাবে ও সমগ্র সভার অনুমোদনে মহারাজ সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সভার সাধারণ কার্য্যাদি বন্ধ করা হয়।

৩। অতঃপর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ হিতৈষী, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্যিক-গণের অকপট সুহৃদ্ বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের একজন প্রধান পুষ্টিকর্ত্তা মহারাজ বাহাদুর সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোক গমনে সমগ্র বঙ্গদেশের বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। পরিষদের সদস্যবর্গ তাঁহার বিয়োগে মর্ম্মাহত হইয়া গভীর শোকানুভব করিয়াছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি আপনাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন)।

৪। তৎপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর পরিষদের যেরূপ অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার নিকট যে ভাবে উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পরিষদের সাধ্যমত পরিষদ্গৃহে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ যত শীঘ্র সম্ভব পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হইবে।"

৫। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবদ্বয়ের নকল মহারাজ সার্ প্রদ্যোতকুমারের নিকট প্রেরিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

৬। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি

বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন

সময়—১৩ই মাঘ, অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা

১। উদ্দেশ্য—মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ।

২। এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
" সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্যারিষ্টার
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" বাণীনাথ নন্দী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী, " মন্মথমোহন বসু, " হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত } সহঃ সম্পাদক।

৩। সভ্যগণ উপবেশন করিলে পর বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র বলিলেন যে নিমন্ত্রণ পত্রের ছাপাতে ভুল ছিল এবং কোনও কোনও সংবাদপত্রে সভার অধিবেশনের দিন সম্বন্ধে ভুল খবর বাহির হইয়াছিল। অতএব অদ্যকার সভা স্থগিত থাকুক। সমবেত সভ্যগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি

স্থগিত অষ্টম অধিবেশন।

স্থান—পরিষৎগৃহ

সময়—১৯শে মাঘ, ১৩১৪ অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকা।

১। এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী (সভাপতি)
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ অনাথনাথ ভট্টাচার্য্য
„ মহম্মদ খায়রল আনাম
„ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ উপেন্দ্রমোহন রক্ষিত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু }
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত } সহঃ সম্পাদক।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। সপ্তম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হয়।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১। শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস, ১২ নারিকেলডাঙ্গা।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায়, বালেশ্বর।
		৩। „ যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বালেশ্বর।
		৪। „ কুমার মন্মথনাথ দে, রাজবাটী, বালেশ্বর।
		৫। „ চৌধুরী প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র, জমিদার, ভেড়া, কুঁয়াপাল, কটক।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু এম্ এ, বি এল্, ১৬ নন্দরাম সেনের লেন।

		৭।	„ কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাতোড়, হাওড়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	৮।	„ কেশবচন্দ্র রায়
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৯।	„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ রায়, ডেঃ মাঃ ২০ বলরাম ঘোষের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১০।	„ দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডিমাপুর, আসাম।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	১১।	„ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ প্রেসিডেন্সীকলেজ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	„	১২।	„ প্রফুল্লকুমার ঘোষ, এম্, এ ডেঃ মাঃ হাওড়া।
„	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৩।	„ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এম্,এ ৪১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ অর্পণ করা হয়।

(১) হিন্দুধর্ম্ম (২য় ভাগ), (২) জ্ঞানপ্রভা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

(৩) রসায়ন—শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ।

(৪) মঞ্জরী—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ।

(৫) University Calendar for 1907 (3 vols)—Registar, C. U.

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেনকর্ত্তৃক লিখিত 'সন্ধি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বলেন, লেখক বলিয়াছেন যে পদ্যসাহিত্য হইতে সন্ধির সৃষ্টি। বোধ হয় এই মত ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলেন যে শব্দ সর্ব্বদাই বিজ্ঞানসম্মত ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অনুযায়ী হইবে।

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে বাঙ্গালা ভাষাতে কি প্রকারে সন্ধি হইবে তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধে আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধে তাহা নাই।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন মহাশয় বলেন যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে সংস্কৃতভাষাতে পদ্য হইতে সন্ধির উৎপত্তি এই মত যথার্থ নহে। অন্যান্য ভাষাতে পদ্য আছে কিন্তু সন্ধি নাই। মিলের জন্য সন্ধির সৃষ্টি কিন্তু সমস্ত স্থলেই সন্ধি প্রয়োগ বৈধ নহে। এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই—

"সংহিতৈকপদে নিত্যা, নিত্যাধাতুপসর্গয়োঃ * * * স্যাদন্যত্র বিভাষয়া।"

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সপ্তগ্রাম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে)।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর মহম্মদ খায়রল আনাম সাহেব একটী খোদিতলিপির প্রতিলিপি পাঠ করেন ও তাহার অর্থ বলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে প্রাচীনকালে সপ্তগ্রামের নাম 'ষাইটগাঁ' ছিল। মুকুন্দরামের গ্রন্থে প্রথমতঃ সপ্তগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিতলিপির অক্ষরগুলি লক্ষ্মণসেনের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। মুসলমানদের পূর্ব্বে অনেকস্থলে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। সভাপতি মহাশয় রাখালবাবুর প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন,—

কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ নিরতিশয় দুঃখিত এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট সম-বেদনাসূচক একখানি পত্র প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

৯। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
সভাপতি

স্থগিত বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন।

তারিখ—৩রা ফাল্গুন ১৩১৪, সময় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি,আই,ই,
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল
" মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এমএ
" পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী
" " হৃষীকেশ শাস্ত্রী
" " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এমএ বি এল্

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ,
" চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি এল্
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্
" ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্এ, বি এল,
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ,
" বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" বাণীনাথ নন্দী
" দুর্গাদাস লাহিড়ী
" বরদাপ্রসাদ বসু
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" " প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
" পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
" গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" বিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত
" লালগোপাল সেন
" নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম এ, বি এল্
" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ এস্

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" নরেশচন্দ্র ঘোষ
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" নিশিকান্ত সেন
পণ্ডিত " পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়
" আনন্দমোহন সাহা
" সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়
" রামকমল সিংহ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্এ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মন্মথমোহন বসু বিএ } সহঃ সম্পাদক
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এমএ

১। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। সভাপতিমহাশয় সভার উদ্দেশ্য সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করিলে পর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন—

পরলোকগত মহাত্মা, দানশীল, কীর্ত্তিমান, বঙ্গীয় সাহিত্যের চিরবন্ধু এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পরম হিতৈষী মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাধ্যানুসারে নিজ গৃহে মহারাজা বাহাদুরের তৈলচিত্র অথবা মর্ম্মরমূর্ত্তি রক্ষা করিবেন এবং প্রতিবৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষের উদ্দেশে উপযুক্তরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবেন এবং ঐ পুরস্কার মহারাজ বাহাদুরের নামসম্পৃক্ত হইবে। রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং বলেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সময় হইতে যতীন্দ্রমোহন নাট্য সাহিত্যে যোগদান করিতেন। কেবলমাত্র অর্থ সাহায্য দ্বারা নাট্য সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই, তিনি নিজে একজন কবি ও সুলেখক ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যানুরাগী ছিলেন না—তিনি সাহিত্যামোদী ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন হিন্দী, ফারসী প্রভৃতি ভাষাতেও সুপণ্ডিত

ছিলেন। তিনি অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিশারদ ছিলেন এবং রাজদরবারেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। পরিষদের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। বিলাসবর্জ্জিত হইয়া এরূপ বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী আমাদের দেশে আর হইবে কি না সন্দেহ। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্রে এরূপ সমাবেশ বোধ হয় আমরা আর দেখিতে পাইব না। এরূপ বাঙ্গালীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি সকল সময়েই বলিতেন যে তিনি বাঙ্গালী—তিনি ব্রাহ্মণ। দীন ও ধনী এতদুভয়ের মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করিতেন না। সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবীদের নিকট আমার এই প্রার্থনা তাঁহারা যথাসাধ্য সাহিত্য-পরিষদের এই কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন ও বলেন যে দেশীয় বিদেশীয় সমস্ত পণ্ডিতগণকে মহারাজ যথেষ্ট সমাদর করিবেন।

সমবেত সভ্যগণ একবাক্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে টাকা সংগ্রহ হয়ত কিছু কঠিন হইবে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্ত। সুতরাং পরিষদের পক্ষে বেশী টাকা আদায় হইবে না বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক পরিষদের সভ্যগণ ও সাহিত্যানুরাগিগণ যে এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন তাহা আমরা বেশ আশা করিতে পারি।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 'মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও বঙ্গসাহিত্য' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহারাজ বাহাদুর ১২৩৮ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কলিকাতাতে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ বাহাদুর যে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাহা তত্ত্ব-বোধিনীর ও ঈশ্বরচন্দ্রের যুগ। তিনি সর্ব্বাগ্রে সংবাদ প্রভাকরেই হস্তচালনা করেন। প্রভাকরে তিনি কেবল পদ্য লিখিতেন না, গদ্যও লিখিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে গদ্য সাহিত্যকে সুগঠিত করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এই নবগঠিত ভাষার শক্তি উপলব্ধি করিয়া ইহাকে নাট্য সাহিত্যের উন্নতিকল্পে চালনা করিবার জন্য যতীন্দ্রমোহন প্রভাকরের পৃষ্ঠায় তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাসুন্দর নাটক প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান', ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামক তিনখানি প্রহসন রচনা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালায় এই প্রথম সুসঙ্গত প্রহসনের আবির্ভাব বলিতে হইবে। প্রহসন প্রণয়নে মহারাজ বাহাদুরের রসিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহন নাটক রচনা ব্যতীত নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম প্রথম অভিনয়ে তিনি নিজে অভিনেতাও হইতেন। সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার যুগেও মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের কার্য্যকলাপ পরোক্ষে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। ইংরাজিতেও যতীন্দ্রমোহন কবিতা রচনা করিতেন এবং তাঁহার বাল্য কবিতাগুলি Flights of Fancy নামে ছাপা হইয়াছে। তাঁহার ইংরাজি গদ্যজ্ঞানের নিদর্শন তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতিতে

পাওয়া যায়। মহারাজ বাহাদুরের সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয়ও সংস্কৃত কবিতা রচনাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'ব্রহ্মময়ীস্তোত্রম্' 'ব্রহ্মগোপালস্তোত্রম্' প্রভৃতি অনেক কবিতা আছে। মহারাজ এক জন ক্ষমতাশালী সঙ্গীতরচনাকারী ছিলেন এবং তাঁহার উৎসাহেই মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্য লিখেন ও ইউরোপীয় প্রথায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা-লেখক ও গ্রন্থকারের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সাহায্যে পুস্তকাদি প্রচার করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক মৃত্যুর দশদিন পূর্ব্বে লিখিত 'ব্রহ্মময়ীস্তোত্রম্' প্রদর্শন করেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে যথার্থ বাগ্মীতা যতীন্দ্র-মোহনের একটী বিশেষত্ব ছিল। তিনি অত্যন্ত মিষ্ট কথাতে অপরকে উপদেশ দিতে পারিতেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে "খুঁটিনাটিতেও মহারাজের বিশেষত্ব দেখা যাইত। মহারাজ প্রকৃত সাহিত্যসেবা করিতেন ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল। তাঁহার নিকট সমস্ত সাহিত্যসেবীর সমান আদর ছিল। সমস্ত বিষয়েই তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার একখানি জীবনচরিত লেখা উচিত।"

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বলেন যে আমাকে মহারাজ প্রিয় বয়স্য আখ্যা প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। মহারাজের সমস্ত বিষয়ের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সাহিত্যালোচনার জন্য তাঁহার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। দিনে যখন লোকে ভাবিত তিনি নিদ্রা যাইতেছেন তখন তিনি মনোযোগ সহকারে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। ইদানীং পরলোক-তত্ত্বের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন এবং এরূপ লোক আমাদের দেশে বোধ হয় আর হইবে না।

৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও অসাধারণ লোক ছিলেন। তিনি রাজদ্বারে যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন এবং রাজনৈতিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও ধর্ম্ম সাহিত্যের চর্চ্চাতে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি কি ছিলেন তাহা সাধারণে জ্ঞাপন করা আমাদের প্রথম কার্য্য ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষা আমাদের দ্বিতীয় কার্য্য। তাঁহার জীবনচরিত লেখা উচিত, কিন্তু এই কার্য্য সহজসাধ্য নহে। যদি পরিবারস্থ কেহ অথবা বৈকুণ্ঠ বাবু চেষ্টা করেন তাহা হইলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গৃহ

তারিখ—৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা

এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত (সভাপতি)
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,
" পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী
" যতীন্দ্রনাথ মিত্র
" বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" বাণীনাথ নন্দী
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" ললিতচন্দ্র জ্যোতির্ষার্ণব
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বিএল
" তারকনাথ বিশ্বাস
" অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" আনন্দনাথ রায়
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ
" হেমচন্দ্রদাসগুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	২। রায় রামব্রহ্ম সান্ন্যাল বাহাদুর সি, এম, জেড্ এস্ আলিপুর
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৩। কবিরাজ হরিমোহন সেনগুপ্ত ৭৬ সভাবাজার ষ্ট্রীট
শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র
		(ছাত্রসভ্য)
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	১। শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসা, বহরমপুর কলেজ হোষ্টেল,
"	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৭ ডফ ষ্ট্রীট
		৩। শ্রীযশোদাকুমার মালাকার ৫ ভীম ঘোষের লেন।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ অর্পণ করা হইল—

(১) বিরাম সঙ্গীত or The Lays of Rest—শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।

(২) Medicine of Ancient India—Home Dept. India Gov. I,.

৬। তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'আয়ুর্ব্বেদে অস্থিসন্ধি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে অস্থি ও উপাস্থির বর্ণনা আছে। সেই সমস্ত বর্ণনার সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের মধ্যে অনেক সময়ে অনৈক্য দেখা যায়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও অস্থি প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিভাষা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত 'মোসলমান নামতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলেন যে 'পারসী' শব্দ যদি বাঙ্গালাতে তর্জ্জমা করা হয় তাহা হইলে বাঙ্গালার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করাই উচিত। যথা—জর্ম্মণ—Wilhelm শব্দ = ইংরেজী—William. তালিকা কিছু লম্বা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন যে তালিকা লম্বা করা আবশ্যক। নাম যদি সংশোধিত করিয়া লেখা যায় তাহাতে ক্ষতি কি?

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে লেখক শ্রীপুর, রাজাবাড়ীর মঠ, কেদার বাড়ী, কেশারমার দীঘী ও কাঁচ্‌কীর দরোজার উল্লেখ করেন। চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বিক্রমপুরস্থ রাজধানী শ্রীপুর এখন পদ্মাগর্ভে নিহিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে এই মঠের সংস্কার হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বার্গাঁচড়া নামক একটি গ্রামেও এই মঠের অনুরূপ একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই মঠও বিক্রমপুরের চাঁদরায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শীঘ্রই এই রায় বংশের কীর্ত্তিচিহ্ন মঠ পদ্মাগর্ভে নিমগ্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কেদার বাড়ীর অপর নাম কেদারপুর। কেশার মা কেদার রায়ের ধাত্রীমাতা ছিলেন। ধাত্রীমাতার স্মরণার্থ খোদিত এই দীঘি প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও একচতুর্থ মাইল প্রশস্ত। কাচ্‌কীর দরোজা একটি সুবৃহৎ রাস্তা; এখন ইহার কতকাংশ পদ্মার কুক্ষিগত, কতকাংশ অরণ্যানীতে, কতকাংশ কৃষকের ক্ষেত্রে। বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে এখনও সামান্য সামান্য পরিমাণে এই সুদীর্ঘ রাস্তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে এই প্রবন্ধ

আমার প্রণীত 'বারভুইঞা' নামক গ্রন্থের সার সঙ্কলন। রাজা শ্রীনাথ রায় কর্তৃক মঠের সংস্কার এই সংবাদ নূতন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে 'জাহ্নবী' পত্রিকাতে প্রকাশ যে শান্তিপুরের বাগাঁচড়ার মঠ চাঁদরায় নামক একজন ব্রাহ্মণ ১৫৮৭ শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন যে বোধ হয় বাগাঁচড়ার মঠ সম্বন্ধে 'জাহ্নবী' প্রকাশিত কথাই ঠিক।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে রাজাবাড়ীর মঠের চূড়াভাঙ্গা সম্বন্ধে যেরূপ অনেক প্রবাদ আছে, সেইরূপ অনেক প্রবন্ধে মেমারীতে একটি মঠের চূড়াভাঙ্গা সম্বন্ধেও আছে।

৯। কুমার সতীশচন্দ্র সিংহের মৃত্যুতে সহানুভূতি ও সমবেদনাজ্ঞাপক পত্রের উত্তরে কুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ যে ধন্যবাদসূচক পত্র পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইল।

১০। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — সম্পাদক

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু — সভাপতি

দশম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গৃহ

তারিখ—২রা চৈত্র, রবিবার অপরাহ্ণ

১। এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" বাণীনাথ নন্দী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্, এ, বি, এল,
" বিহারীলাল সরকার

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
" উমাপতি দত্ত পাঁড়ে বি,এ
" জগৎপদ হালদার
" নারায়ণ দাস বর্ম্মণ
" রাজকুমার বেদতীর্থ
" গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী
" কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্
" সরসীলাল সরকার এম্,এ,এল্,এম্,এস
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কৃষ্ণদাস বসাক
" বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,
" রামকমল সিংহ
" চিন্তাহরণ ঘটক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ,(সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ,
" মন্মথমোহন বসু বিএ,
} সহঃ সম্পাদক

২। শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। পূর্ব্বে দুই অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য-নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরাখাল দাস কাব্যতীর্থ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ পাঁড়ে বি,এ,
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীমন্মথনাথ লাহিড়ী, বগুড়া ১১।২ মধুরায়ের লেন
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীবিপিনবিহারী সেন এম্,এ, বি,এল, ৮৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীসত্যপ্রসন্ন মজুমদার এম্,এ বি,এল ১১।৫ গোবিন্দ সেনের লেন।
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেঃ কাঃ জঙ্গীপুর।
	"	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, বি,এল, মুন্সেফ, জঙ্গীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	"	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্, এ, রাভেন্স কলেজ, কটক
শ্রীচারুচন্দ্র বসু	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট্।
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগুণদাচরণ সেন এম্,এ বি, এল উকীল, হাইকোর্ট, কলিকাতা
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, এ,বি,এল উকিল, হাইকোর্ট, কলিকাতা
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	শ্রীসুরেশপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার কৃষ্ণপুর, গাজীপুর, পোঃ আঃ ময়মনসিংহ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্দ্দশ ভাগ

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা
২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত

১৩১৪

চতুর্দ্দশভাগের সূচীপত্র